নতুন চিঠি

নতুন চিঠি

২০২০

সম্পাদক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

প্রকাশক

দিনেশ ঝা

সম্পাদনা সহযোগিতায়

অরুণ মজুমদার, সুকৃতি ঘোষাল, শিবানন্দ পাল,
কাজি আব্দুল করিম, কিশোর মাকর, মুরারী মণ্ডল,
পার্থ চৌধুরী, ফজলুল বারি মিদ্দা, জহুর আলম

ব্যবস্থাপনায়

আবদুস সবুর

প্রচ্ছদ : **শ্যামলবরণ সাহা**
অক্ষরবিন্যাস-পৃষ্ঠাসজ্জা : **শ্যামসুন্দর বেরা, সনাতন বেরা, আবদুল্লা মিদ্দা**
অলঙ্করণ : **সমর মুখোপাধ্যায়, কুশল বণিক**
মুদ্রক : **নতুন চিঠি প্রেস**, বর্ধমান
মুদ্রণ সহযোগিতায় : **সাধনা প্রেস**, ১১ জে বি মিত্র রোড

মূল্য : ৫০ টাকা

WITH BEST WISHES FROM

A Well Wisher

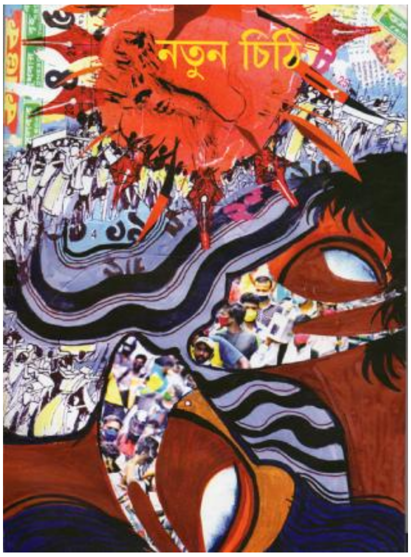

সম্পাদকীয়

‘নতুন চিঠি’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রাণপুরুষ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরবিদায়ের বেদনা বুকে নিয়ে নতুন চিঠি পরিবার তাঁরই লক্ষ্যপথে এবারের শারদ-সংখ্যাটি প্রকাশ করছে। ইতোমধ্যে তাঁর বহুমুখী কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত এবং বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত বিশিষ্টজনদের ও তাঁর জীবনসঙ্গিনী গৌরী ব্যানার্জীর স্মৃতিচারণায় সমৃদ্ধ একটি সংকলনগ্রন্থ ‘নতুনচিঠি’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ও বহু-প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান শারদ সংখ্যাটির সূচনা তাঁকে স্মরণ করেই, তাঁর প্রদর্শিত পথেই।

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতের রাজ্যগুলিতেও করোনা মহামারি গত ছ-মাসের ওপর ক্রমঃবিধ্বংসী চেহারা নিয়ে মারণযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও তার আক্রমণ ক্রম-বর্ধমান। বারংবার লকডাউনে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ। সাময়িকভাবে লকডাউন তুলে নিলেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরা সম্ভব হচ্ছে না। মাস্ক পরে পরস্পরের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার নির্দেশনাও প্রায়শই মানা হচ্ছে না। সমগ্র সমাজজীবন বিপন্ন। এই সার্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ, বিশেষত শারদ সংখ্যা প্রকাশ এক কঠিন দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমরা অবিচল আছি।

এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনোরকম সাংবিধানিক প্রথা-পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে, সংসদীয় প্রক্রিয়াকে জবরদখলে এনে, যেমন খুশি তেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, আইন প্রণয়ন করছে। প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর নির্মমভাবে দমন করছে। যাতে কোনো প্রতিকার না পাওয়া যায় তার জন্য বিচারবিভাগকেও করায়ত্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যগুলির ওপর দলীয় আস্থাভাজন রাজ্যপাল চাপিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারও চলছে তৃণমূল মহানেত্রীর যথেচ্ছায়। দলবাজি, দুর্নীতি ও বিরোধী কণ্ঠরোধ চলছে নির্বিচারে। রাজ্যপালের সঙ্গেও ক্ষণে ক্ষণে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। রাজনীতি হয়ে উঠেছে শুধু ক্ষমতার লড়াই। গণতন্ত্র বিপন্ন। শোনা যাচ্ছে ফ্যাসিবাদী আধিপত্যের আগমনধ্বনি।

এই সামগ্রিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ‘নতুন চিঠি’ তার লক্ষ্যে স্থির থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আর্থিকভাবে বিপন্ন ‘নতুন চিঠি’-র প্রতি যাঁরা নানাভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁরা তাঁদের লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদেরও অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। বাস্তব পরিস্থিতির চাপে পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার বাধ্যবাধকতায় প্রকাশযোগ্য সব লেখাও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত।

‘নতুন চিঠি’ সাপ্তাহিক পত্রিকার ও বিশেষ করে তার শারদ সংখ্যার মান বরাবরের যে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও তা অক্ষুণ্ণ রাখার সার্বিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে পাঠক নিজগুণে মার্জনা করছেন।

নতুন চিঠি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে শারদ শুভেচ্ছা জানাই।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উপবন

বোধপুর, বেলকাশ, পূর্ব বর্ধমান

যোগাযোগ : 9233339777, 9564800207

ফুল, ফল, বনসৃজন ও গৃহসজ্জার সমস্ত চারা উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়।

সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হয়।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

১ **সূর্যকান্ত মিশ্র** : অশোকদাকে হারানো—এক বড় ক্ষতি
৩ **মদন ঘোষ** : বাংলার 'দৈববাণী'?
৭ **অরিন্দম কোঙার** : বর্ধমান শহরে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র রাজ্য সম্মেলন
১১ **অমল হালদার** : কিছু অচেনা মানুষের জীবনকাহিনি
১৫ **আভাস রায়চৌধুরী** : হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা : ভারতীয় যুক্তিহীনতাবাদের এক শক্তিশালী তত্ত্ব
২১ **অচিন্ত্য মল্লিক** : চাই চিন্তার ঐক্য, কাজের ঐক্য, শৃঙ্খলার ঐক্য
২৩ **সেখ সাইদুল হক** : কাশ্মীরের অধিকার হরণ, সংবিধানের উপরই আক্রমণ
২৭ **অঞ্জন বেরা** : হিন্দু, হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দুরাষ্ট্র
৩১ **জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য** : মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নির্মাণ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ণয়ে এঙ্গেলস-এর ভূমিকা
৩৫ **অতনু হুই** : জন্ম দ্বি-শততম বর্ষে শ্রদ্ধা : মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা এঙ্গেলস : তাঁর জীবন ও শিক্ষা
৩৯ **অর্পিতা ব্যানার্জী** : লেনিন : এক আত্মসমীক্ষাময় অনন্য জীবন
৪৬ **মৃদুল সেন** : স্বপ্নে কথোপকথন ক্স রামলালা ও আমি
৪৯ **রথীন রায়** : করোনা বিশ্বযুদ্ধ, সীমান্ত সমস্যা ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য
৫৩ **হরিহর ভট্টাচার্য** : 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র', 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'
৫৫ **বিভাস সাহা** : মহামারি, ইতিহাস ও অর্থনীতি

কবিতা

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, সলিল ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্রনাথ চাকী, সুনির্মল কুণ্ডু ৬১; বিশ্বনাথ কয়াল, কুশল দে, অরবিন্দ সরকার, বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস, গৌতম সাহা ৬২; মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলবরণ সাহা, দেবেশ ঠাকুর, অরুণ মজুমদার ৬৩; মলয় রায়, সেখ জয়নাল আবেদীন, মনামী ঘোষ, পঙ্কজ পাঠক ৬৪; তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রভাত ঘোষ, জমর সাহানী ৬৫; রসুল করিম, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, মিনতি গোস্বামী ৬৬; দেবাশিস প্রধান, রীনা কুণ্ডু, স্বপন পাঁজা, অচিন মিত্র ৬৭; শুভজিৎ বোস, সব্যসাচী বাগ, অয়ন ঘোষ, আমির উল হক, দিলীপ সাঁতরা ৬৮

প্রবন্ধ

৬৯ **সুকৃতি ঘোষাল** : জাতীয়তাবাদ ও হিংসা
৭১ **যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী** : বাংলার উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু-মূর্তি
৭৯ **ড. রঙ্গনকান্তি জানা** : একুশ শতকে ভারতেতিহাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে
৮১ **সঞ্জীব চক্রবর্তী** : ভোলানাথ চন্দের বর্ধমান দর্শন : ১৮৬০
৮৫ **সলিল আচার্য** : ক্লান্তিহীন আমরা সব আলোর শিশুরা
৮৯ **গৌতম চট্টোপাধ্যায়** : ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের পর্যালোচনা
৯১ **কল্যাণী ভট্টাচার্য** : উনিশ শতক : স্ত্রী-শিক্ষায় নারীকণ্ঠ

গল্প

৯৫ **তপোময় ঘোষ** : গ্রন্থন
৯৯ **কাকলি ঘোষ** : ভাঙনকাল
১০৩ **অনিল মাইতি** : কম্প্রোমাইজ
১০৭ **গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী** : গ্রামসী টু গ্রান্ড-মা

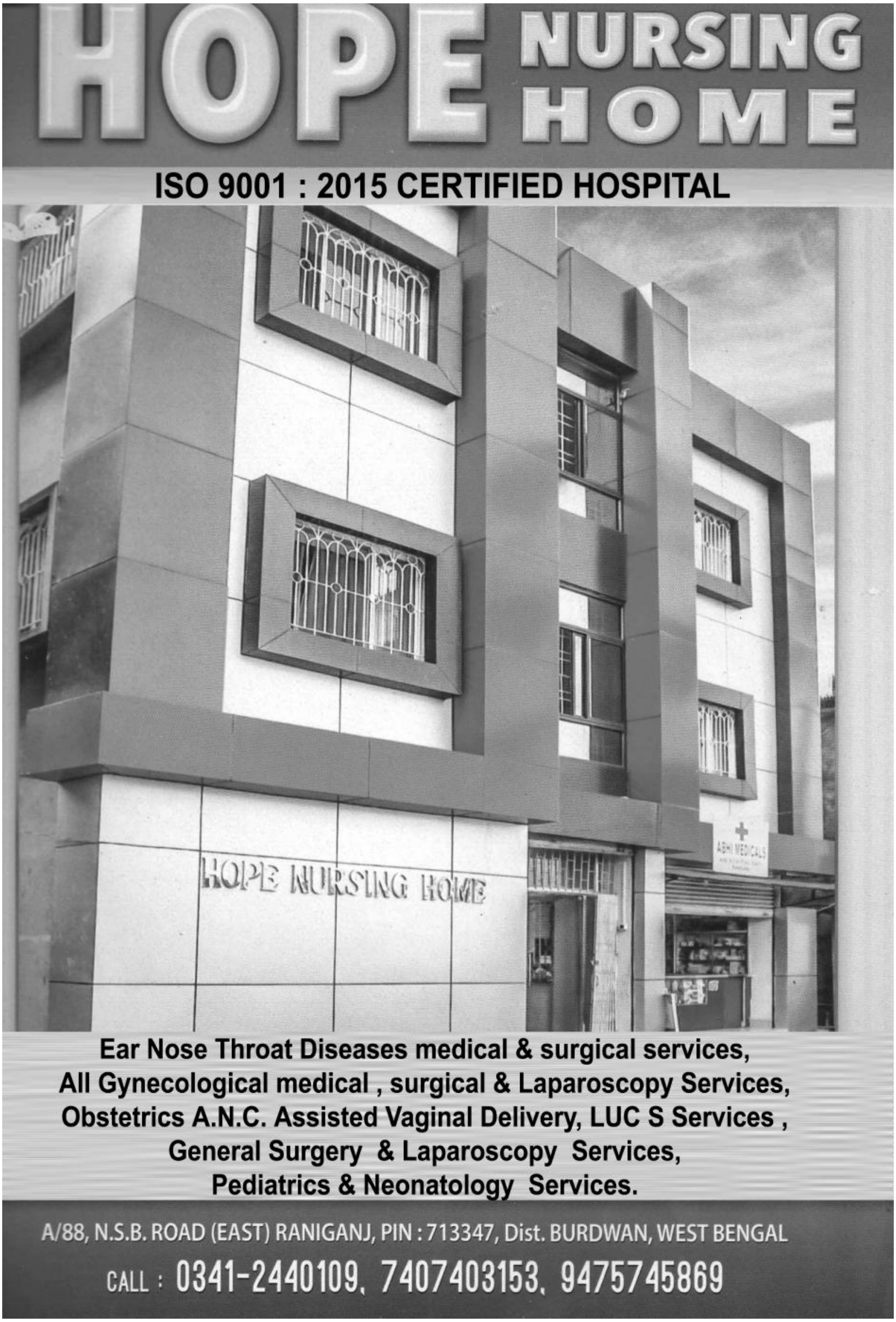
HOPE NURSING HOME
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED HOSPITAL
HOPE NURSING HOME
ABHI MEDICALS
Ear Nose Throat Diseases medical & surgical services,
All Gynecological medical , surgical & Laparoscopy Services,
Obstetrics A.N.C. Assisted Vaginal Delivery, LUC S Services ,
General Surgery & Laparoscopy Services,
Pediatrics & Neonatology Services.
A/88, N.S.B. ROAD (EAST) RANIGANJ, PIN : 713347, Dist. BURDWAN, WEST BENGAL
CALL : 0341-2440109, 7407403153, 9475745869

Sl. No. 94

সূচিপত্র

বিজ্ঞান

১১৭ **ড. অরবিন্দ দাশ** : জন্মশতবর্ষে 'ডার্ক লেডি অফ ডি এন এ'

১২১ **চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** : তথ্যবিপ্লব এক অন্য লড়াই

১২৩ **তানাজি সাঁতরা** : দিন ও বারের অসামঞ্জস্য ক্যালেন্ডারের একটি ভুল যা দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে চলছে

১২৫ **কৌশিক লাহিড়ী** : কোরোনা তোমার কোন পথ দিয়ে

১২৭ **প্রবাল সেনগুপ্ত** : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—কিছু কথা, কিছু স্মৃতি

স্মরণ

১৩১ **রীনা মিত্র** : শতবর্ষে স্মরণ : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫ **শ্যামসুন্দর বেরা** : ধর্মীয় স্থাপত্য নিয়ে গবেষণার বীজ ডেভিডের মধ্যে বপন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়

১৪১ **ঘনশ্যাম সরকার** : ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম বাঙালি শহিদ সোমেন চন্দ—জন্মশতবর্ষ

১৪৩ **চন্দ্রাবলী সেন** : কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি

ভ্রমণ

১৪৫ **বিলাস চ্যাটার্জী** : গোমুখ-তপোবন যাত্রা

১৪৯ **উৎপল দত্ত** : আন্দামান ভ্রমণ

১৫২ **মধুছন্দা মিত্র ঘোষ** : খিড়কিজল...

কবিতা

অনন্য ভট্টাচার্য, কুমুদবন্ধু নাথ, মৌসুমী মুখার্জী (ভট্টাচার্য), সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, মধুরা মিত্র ১৫৫; সুধাংশুরঞ্জন সাহা, আবির্ভাব ভট্টাচার্য, কালিদাস ভদ্র, সূর্য মণ্ডল, গৌরী সেনগুপ্ত ১৫৬; সৌরভ দত্ত, কঙ্কন সরকার, অভিজিৎ ঘোষ ১৫৭; সুকমল ঘোষ, লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা, রবীন বসু, উদয়ন ভট্টাচার্য ১৫৮; তপন দাস, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, রীতা বসু, বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, মলয়কান্তি মণ্ডল ১৫৯; রবীনকুমার দাস, পরেশ ঘোষ, বিকাশ বিশ্বাস, স্বরাজ ঘোষ ১৬০; রাজর্ষি মাইতি, জয়গোপাল মণ্ডল, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায় ১৬১; বিধানেন্দু পুরকাইত, শতদল চক্রবর্তী, তাপস রায়, অশোক অধিকারী, ১৬২; বিকাশ পণ্ডিত, গৌতম সাহা, কানাইলাল বিশ্বাস ১৬৩

গল্প

১৬৪ **পলাশ দাশ** : নবজন্ম

১৬৮ **বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়** : একটি কদমগাছ এবং ভাষাদিবসের গল্প

১৭১ **রেণুকা মুখার্জী** : হিরের আংটি

১৭৩ **অভিজিৎ মিত্র** : ৭০ কোটির চিঠি

১৭৫ **শিবানী পাল** : পারমিতার কয়েকটা দিন

১৭৯ **শুভময়** : বোধিবৃক্ষ

With best compliments of

GIL

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ মা মনসা ইন্ডাস্ট্রিজ

প্রসিদ্ধ গামছা, লুঙ্গি ও শাড়ি প্রস্তুতকারক

ভান্ডারটিকুরী, পোঃ পারুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান

প্রোঃ সুরেশ দেবনাথ

Sl. No. 67

অশোকদাকে হারানো— এক বড় ক্ষতি

সূর্যকান্ত মিশ্র

কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার চেয়ে ১০ বছরের বড়, কিন্তু কর্মজীবনে আমার সাথে তাঁর পরিচয় ৪০ বছরের কাছাকাছি। তাঁর কর্মজীবনের বড় অংশের সঙ্গে আমি সুপরিচিত নই। কিন্তু যা শুনেছি, পড়েছি, জেনেছি, তাতে এককথায় বলা যায় অশোকদা মানে—এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। জীবনে ব্লকে সরকারি চাকুরি, কারখানায় কাজ, শিক্ষকতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী—এসব তাঁর পেশাগত দিক। কিন্তু তাঁর মূল লড়াইটা হল মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম। পেশাগত শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলন তার একটা অংশমাত্র। সমবায় আন্দোলন তাঁর অবদান—সেটার সঙ্গে আরো অনেকের মতো আমি বেশি পরিচিত, তাই নিয়েই কিছু বলতে পারি। সমবায় তাঁর কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়, তিনি সমবায়ী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করতেন।

সমবায় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলন। বড়শুলে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনের সময়কালে অশোকদা, বৌদি ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গল্প অবলম্বনে একটি নাটক করেছিলেন 'হারানের নাতজামাই'। বিপ্লবী কৃষকনেতা ভুবন মণ্ডলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অশোক ব্যানার্জী ও ময়না চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বৌদি গৌরী ব্যানার্জী। এই সময়কালে গ্রাম-অন্বেষণ থেকে তাঁদের কন্যার নাম দিয়েছিলেন 'অন্বেষা'। অন্বেষা তাঁর পিতা-মাতার এই সাংস্কৃতিক ধারাকে বহন করতো।

আমার ধারণা তাঁর সংগ্রামী জীবনের শুরু একই সাথে কৃষক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে এবং সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর আত্মত্যাগ ও অবদান অনস্বীকার্য। জীবনে এরজন্য তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছে। আত্মগোপনে থাকার সময় আমাদের নেতৃত্বের উপরে আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সেটা সফল হওয়ার পরও ফেরার পথে তিনি নিজে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ার জন্য তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। চিকিৎসকরা কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটাবার চেষ্টা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। জেলখানায় বিনয় কোঙার ও গোপাল হালদার ভর দিয়ে হাঁটানো শুরু করেছিলেন। এর পূর্বে শিক্ষক আন্দোলনে যখন গ্রেফতার হন, ছাড়া পাবার পর কংগ্রেসিরা ওনাকে পুনরায় স্কুলে ঢুকতে দেয়নি।

১৯৭৭ সালের পর তিনি মূলত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্ধমান জেলা কৃষক কমিটির সদস্য ছিলেন। আগে বর্ধমান জেলায় 'নতুন পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ৭০-এর দশকের শুরুতে সন্ত্রাসের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদক ছিলেন সুশীল ভট্টাচার্য। ১৯৭৭ সালে 'নতুন চিঠি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অশোক ব্যানার্জী। যখন এই পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়, তখন ঠিক হয়েছিল—এই পত্রিকা পার্টির নামে হবে না। যাতে পার্টির পরিধির বাইরের মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। অশোকদা এই পত্রিকা প্রকাশের কাজ সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন। ১৯৮৯ সালে

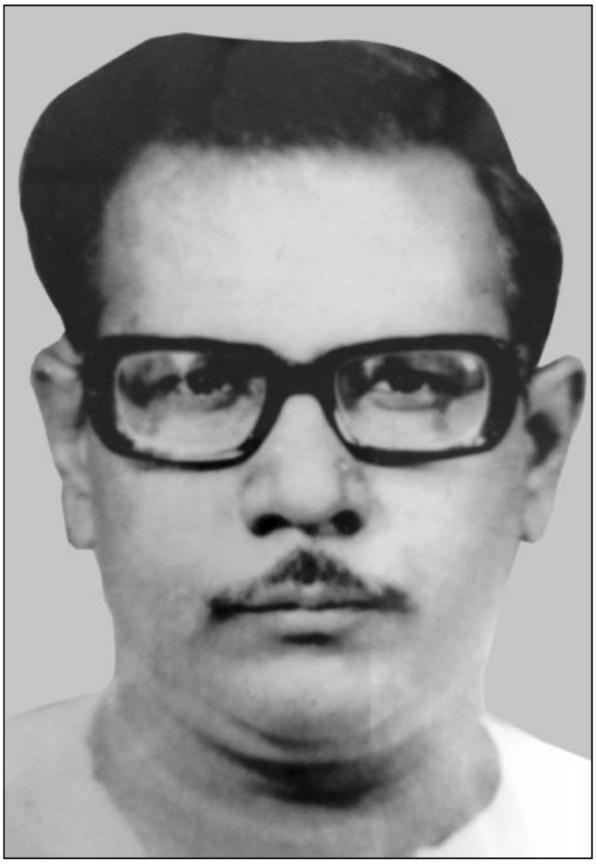

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বৃহত্তর দায়িত্বের কারণ তিনি 'নতুন চিঠি'র সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন, কিন্তু মুদ্রক ও প্রকাশক হিসেবে পত্রিকার সঙ্গেই থাকেন এবং আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৯৮৯ সালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হওয়ার পর আমার সাথে ওনার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ১৯৯১ সালে আমি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর পঞ্চায়েত ও সমবায় সংযোগসূত্র কীভাবে দৃঢ় করা যায়, তা নিয়ে তাঁর পরামর্শ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। এককথায়, তিনি আমাদের কাছে সমবায় আন্দোলনে অভিভাবকতুল্য ছিলেন। তখন একটি মোটামুটি হিসেব ছিল সামগ্রিক উন্নয়নকাণ্ডে যুক্ত কর্মসূচিগুলিতে রাজ্য-বাজেটে যা মোট বরাদ্দ তার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ আসতো ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাবস্থার ঋণ থেকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও রাজ্যগুলিতে ক্রেডিট-ডিপোজিট অনুপাতের কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। অথচ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে এই অনুপাত ছিল অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাতের ইতিহাস অনেক পুরানো। টিটি কৃষ্ণমাচারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন, স্বাধীনতার ঠিক পরে মাশুল সমীকরণ নীতি, লাইসেন্সিং ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। কমরেড জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে ও পরে এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ড. অশোক মিত্র যখন অর্থমন্ত্রী তখন ব্যাঙ্কগুলির এই বৈষম্যমূলক আচরণ তিনি নিয়মিত তদারকি, পর্যালোচনা ও এস এল, বিপিসি-র বৈঠকে নিয়মিত চাপসৃষ্টি করতেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে বিপর্যয়কর পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পর রাজ্য সমবায় আন্দোলনে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠন, কৃষি ও শিল্পায়নের সামনের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় নতুন পথের অনুসন্ধান শুরু হয়। কমরেড অশোক ব্যানার্জী হার মানতে জানতেন না। এই প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় তিনি অনেক বক্তব্য ও লিখিত নোট বার-বার দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সার্বজনীন সদস্যভুক্তি, ভূমি-সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জমির পুনর্বন্টন—ফলে এস.কে.ইউ.এসগুলিতে শ্রেণি-ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছিল। গ্রামের কায়েমি স্বার্থ কোণঠাসা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের শ্রেণিসুলভ তৎপরতার অবসান ঘটেনি। অশোক ব্যানার্জী এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমবায় আইনর প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কীভবে সমবায়ব্যবস্থাকে ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে আরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা যায় তার জন্য সর্বদা লড়াই করেছেন। তিনি সমবায়ব্যবস্থা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলনের মধ্যে সমবায়কে কী করে আরো শক্তিশালী করা যায়, তার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন।

প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করার এক বিশেষ প্রচেষ্টা থাকতো, যাতে ওই এলাকার উন্নয়নের কাজে লাগে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা-জাত উদ্যোগ নিয়ে তিনি এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিরন্তর বিকল্পের অনুসন্ধানের জন্য লড়াই জারি রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম বা পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ায় তিনি রাজ্যের আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছেন।

২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের সমবায় আন্দোলন ও অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর বিরাট আঘাত আসে। তখন কমরেড অশোক ব্যানার্জী 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ' করে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর একমাত্র কন্যা অন্বেষার মৃত্যু হয়। অন্বেষা ও তাঁর মাতা-পিতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় রাখতো, আবৃত্তি-অভিনয়ে দক্ষ ছিল। ২০১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে দেওয়ানদিঘিতে কমরেড প্রদীপ তা-এর সঙ্গে কমরেড কমল গায়েন-এর শহিদের মৃত্যুবরণ তাঁর জীবনে বড় আঘাত নিয়ে আসে। বয়স বাড়ছিল, অসুস্থতাও বাড়ছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হাই পাওয়ার বাই-ফোকাল লেন্সের আড়ালে চোখ দুটি বুজে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চোখে-চোখ মেলানোয় যে আত্মবিশ্বাস ও স্বস্তির ছোঁয়া পেতাম—তা থেকে এখন বঞ্চিত হলাম। সেটাই বড় ক্ষতি। অভিভাবক হারানোর ক্ষতি।

বাংলার ‘দৈববাণী’?

মদন ঘোষ

রবীন্দ্র-নজরুল-শরৎচন্দ্র-বঙ্কিম কেউ নন। এমনকি নেতাজি-চিত্তরঞ্জনও নন। বিধান রায়-জ্যোতি বসু? কংগ্রেস-সিপিএম-বামপন্থী বা বাংলার মানুষ যে যাই বলুন না কেন—এঁরা বড়জোর সাধারণের থেকে একটু উপরে। কারণ ডাক্তার বিধান রায় শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তখনকার সময়ের বড়মাপের চিকিৎসক বলে তাঁকে মানতেন বাংলার মানুষ। কিন্তু তিনিও জানতেন না যে জন্মকালে একটা শিশুর ওজন ‘দেড় হাজার কেজি’ হওয়া উচিত। বাংলার মানুষ গণআন্দোলনের নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিতেন জ্যোতি বসুকে। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনিই শুরু করেন প্রতি বছর সরকারি উদ্যোগে ৩০ জুন ‘হুল’ দিবস হিসেবে পালন করা। কিন্তু তিনি কোনোদিন ভাবেননি বিদ্রোহের নায়কদের পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে মঞ্চে আহ্বান করতে গিয়ে ‘ডহরবাবুর পরিবারের’ কাউকে আহ্বান করার কথা। তাঁদের এইসব ‘দুর্বলতা’ (!)-কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন একজনই। তিনি মমতা ব্যানার্জী ছাড়া আর কেউ নন। তাই ‘বাংলার গর্ব মমতা’। তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়া।

তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রাণিত হয়ে ‘মমতা বাংলার গর্ব’—এই আওয়াজ তুলেছেন ‘ভোট মাস্টার’ প্রশান্ত কিশোর। তাতে আহ্লাদিত ‘ল্যাম্পপোস্ট’ ও তাঁর আদরের ‘দুষ্টু-মিষ্টি’ কচি-কাঁচার দল। ‘ভোট মাস্টার’-কে কয়েকশো, কেউ কেউ বলেন ৫০০ কোটি টাকা দরে নিযুক্ত করা ‘গরিব পার্টি’-র ছেলেপিলেরা (ভুলেও যেন ঠাঙারে বাহিনী ভাববেন না) ব্যানারে ব্যানারে ছেয়ে ফেলেছে গ্রাম-শহরের অলিগলি। করবেই তো। কারণ তিনিই তো মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম একটা রেকর্ড গড়েছিলেন। হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট থেকে পায়ে হেঁটে কালীঘাট থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনেন পুলিশের চোখে অপকর্মের অপরাধী ‘দুষ্টুমিষ্টি’ ভাইদের। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের ‘দুষ্টু-মিষ্টি’ ভাইদের ও রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর কাছে তাঁর চাওয়ার বার্তা পৌঁছেও দিয়েছিলেন। এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছিলেন। রাজ্যের মুখ্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এর থেকে ‘মহৎ’ ও ‘গর্ব’ করার মতো কাজ আর কীই বা হতে পারে!

জনগণের দুঃখে মন কেঁদেছিল মুখ্যমন্ত্রীর। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যদি তাঁর দল বা সরকার সম্পর্কে কারোর কোনো অভিযোগ থাকে তবে সরাসরি তাঁর কাছে লিখিতভাবে জানাতে। তার জন্য হরিশচন্দ্র স্ট্রিটে নিজের বাড়িতে একটা দপ্তর খুলেছিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, হাজার হাজার মানুষ লাইন দিয়ে দরখাস্ত জমা দিয়েছিলেন সেখানে। তারপর অনেকগুলো বর্ষা পেরিয়ে গেছে। আদিগঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। দরখাস্তগুলোর ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। হয়তো সেগুলো বস্তাবন্দি হয়ে আদিগঙ্গা আরো একটু ভরাট করেছে। তাই বলে হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট সহ তিনটে রাস্তায় ৩৫টা প্লট তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে নানাভাবে এসেছে বলে প্রশ্ন তোলা কিন্তু উচিত হবে না। শুধুমাত্র স্মরণ করুন লরি বা বাসের পিছনে লেখা কথাটা—‘দেখলে হবে—খরচা আছে।’ এটা সামান্য একটু বদলে নিন। ‘দেখলে হবে—খুঁটি আছে’। দয়া করে ‘খুঁটি’-র নাম জানতে চাইবেন না। গঙ্গা দিয়ে দশটা বছরে অনেক জল বয়ে গেছে। বাদ যায়নি আদিগঙ্গাও। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে সংশয়চিত্ত হয়েছেন তিনি ও তাঁর ‘ল্যাম্পপোস্ট’ বাহিনী। তাই আমদানি করতে হয়েছে চিত্তাকর্ষক শ্লোগান। কিন্তু পঞ্চায়েত, পৌরসভায়, গ্রাম-শহরে যা পয়মাল করে রেখেছে তাঁর ভাই-ভাতিজারা, তাতে শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজবে কি?

অতীত কীর্তির লোকগাথা

শুরু থেকেই ভাবমূর্তি নির্মাণের মরিয়া প্রয়াসে ‘বাংলার গর্ব’-এর সাথ দিয়েছিল বাম-বিরোধী শ্রেণিস্বার্থের বাহক প্রচার মাধ্যম (পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম)। তাঁর এক বর্তমান সহকর্মী ও মন্ত্রিসভার সদস্য একসময় বলেছিলেন—‘কেন যে নতুন শাড়ি ছিঁড়ে পরে জানিনা’। তাঁরই মজাদার বিশেষণ যোগ ছিল ‘বেদের মেয়ে জোছনা’।

‘‘আমাকে আন্দোলন শেখাবেন না। আন্দোলন লগ্নে আমার জন্ম।’’ এই উক্তিই মনে করিয়ে দেয় কংগ্রেস দলের মধ্যে থাকা অবস্থায় আন্দোলনের নামে এক পুলিশ আধিকারিকের গালে আলকাতরা লেপে দেওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় রাইটার্স বিল্ডিং ‘দখল’-এর নামে মত্ত বাহিনী দিয়ে পুলিশকে আক্রমণের প্রচেষ্টার কথা। যার পরিণতিতে বিজন সেতু এলাকায় কিছু মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সেই ঘটনার ভিডিও ক্লিপিং সহ

The Telegraph

CALCUTTA SATURDAY 2 MARCH 1985 80 PAISE

City Cong(I) MP has bogus PhD

By Sattam Ghose

Mr Mamata Banerjee

তৎকালীন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব, বর্তমান তৃণমূল সাংসদ (রাজ্যসভা) মণীশ গুপ্তকে এফ.আই.আর দায়ের করতে হয়েছিল। এই ঘটনা সহ মন্ত্রিসভা গঠনের পর যতগুলো কমিশন গঠন করেছিলেন 'বাংলার গর্ব', তার একটাও রিপোর্ট দিনের আলো দেখেনি। 'সারদা' চিটফাণ্ড নিয়ে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট আংশিক জমা পড়লেও বিধানসভায় সেটা রাখা হয়নি।

১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন 'ডঃ' অর্থাৎ 'ডক্টরেট' মমতা ব্যানার্জী। ১৯৮৫ সালে সেটা জাল প্রমাণিত হয়। বন্ধ হয় 'ডঃ' বা 'ডক্টরেট' লেখা। এটা তো বাঙালি জাতিকে 'গর্বান্বিত' করার জন্যেই কলেছিলেন তিনি। সেটাও বুঝলো না রাজ্যের মানুষ। প্রশান্তকিশোরেরও সেটা বুঝতে এতটা সময় লাগা নিয়ে এমনকি নেত্রীর দলের মধ্যেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এখানেই শেষ নয়। তাঁর কীর্তি বহুধা বিস্তৃত। মনে আছে চম্পলা সর্দারের 'ধর্ষণ' কাণ্ডের নাটকের কথা? ১৯৯৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাত্র ৬টা দিন আগের কথা। বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গরের অশ্বত্থবেড়িয়া গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন চম্পলা। তিনি তাঁর স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে থাকতেন একটা ছোট্ট দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে। ওই রাতে তিনি শুয়ে ছিলেন মেঝেতে স্বামীর পাশে। পরের দিন ভোরে তাঁকে বাড়ির কাছে একটা পুকুর পাড়ে সচেতন ও নগ্ন অবস্থায় দেখে তার শরীরে একটা গামছা চাপা দিয়ে কথা বলেন মানুষ। শোনেন রাতে ৩-৪ জন সিপিআই(এম) কর্মী বাড়ি থেকে জোর করে তুলে এনে ধর্ষণ করেছে। বুঝুন কাণ্ড। দরমার ছোট্ট ঘর। স্বামীর পাশে শুয়ে তিনি। অজ্ঞান করা হয়নি। আওয়াজ হয়নি। দরমা ভাঙেনি। মেডিকেল পরীক্ষায় কোনও ক্ষত ধরাও পড়েনি। তবু সংবাদমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করলো 'আন্দোলন লগ্নে জন্মানো' নেত্রীর বক্তব্য। উড়ে এলেন তৎকালীন এন.ডি.এ-র আহ্বায়ক জর্জ ফার্নাণ্ডেজ। একেবারে হই-হই/রৈ রৈ কাণ্ড। তবু জেতেননি চম্পলা। দীর্ঘ মামলার পর সিপিআই(এম) কর্মীরা বেকসুর মুক্তি পেলেন। লক্ষণীয় যে, যেদিন নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন, সেদিন কোনো তৃণমূল নেতা বা কর্মী ছিলেন না চম্পলার সাথে।

কিছু পুরোনা কথা

তখন বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার দপ্তরবিহীন মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। দিল্লিতে উপস্থিত আর.এস.এস.-এর মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারা 'কমিউনিস্ট টেররিজম' নামক পুস্তক প্রকাশের জন্য। সে উপলক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় মমতার বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছিল, ''আপনারাই হচ্ছেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক.....। .... আমরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আপনাদের (আর.এস.এস-এর) সাথে আছি।'' তখনই তিনি রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ বলবীর মুঞ্জের কাছ থেকে 'মা দুর্গা' খেতাব পেয়েছিলেন। তার আগেই নির্বাচনে বিজেপির সাথে আসন সমঝোতা করেছিল টি.এম.সি। তখনই প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসু বলেছিলেন টি.এম.সি-র সব থেকে বড় অপরাধ যে তারা হাত ধরে আর.এস.এস-কে বাংলায় নিয়ে এসেছে।

মিলিয়ে যায় ফুলঝুড়ির আলো

বিনা পয়সায় একটা কাজ সহজেই করা যায়। সেটা হল মানুষকে জ্ঞান ও প্রতিশ্রুতি দান। এই কাজে ইতিমধ্যেই দেশে ও রাজ্যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন দু'জন। 'মিত্রো' ও 'গর্ব'। কেউ কেউ বলেন এঁদের সম্পর্কটা নাকি 'টক-ঝাল-মিষ্টি'। অনেকেই সেটা বুঝেছিলেন ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে মোদীজির 'বাংলার হাতে লাড্ডু' ও মমতার 'মোদীজির কোমরে দড়ি' পরানোর বক্তব্য শোনার সময় থেকেই। অতিমারির কালে বিনা টেণ্ডারে ভেন্টিলেটার ও কিটস কেনায় মিল দুজনেরই। সারদা-নারদা তদন্তের নামে ট্রপিজের খেলায় দুই ওস্তাদের খেল দেখছেন রাজ্যের মানুষ। এটা চলতেই থাকবে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে গোটা দেশে ৩০০-র বেশি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন কর্পোরেট নির্বাচিত দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনেকে বলেন, মানুষের স্মৃতি নাকি দুর্বল। মানুষ কি ভুলে গেছেন মোদীর দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো? মনে হয় না। বিশেষ করে 'নোটবন্দি', 'জি.এস.টি' ও সাম্প্রতিক 'লকডাউন' পর্বে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর বারবার সামনে এসেছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনী ইস্তাহার-এ 'আমাদের আবেদন' অধ্যায়ে লেখা হয়েছে 'উন্নয়ন-প্রগতি-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা' হোক আমাদের ব্রত। আমাদের মন্ত্র হোক 'সকলের পেটে ভাত, সকলের জন্য কাজ'। শেষে স্বাক্ষর আছে মমতা ব্যানার্জীর। রাজ্যের মানুষ ২০১১ সাল থেকেই 'উন্নয়ন' দেখছেন। নির্বাচিত হওয়ার একমাসের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন 'আমরা ৯৯ শতাংশ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি একমাসের মধ্যে'। আর ৪ বছরের পর বললেন '৪ বছরে আমি যা রাজ্যের উন্নতি করেছি গত ৪০০ বছরেও কেউ করতে পারেনি।' আপনার কথায় ধন্য ধন্য রব উঠেছে রাজ্য ও দেশে। দুষ্টজনেরা শুধু ২০১৫ সাল থেকে ৪০০ বছর পিছিয়ে গিয়ে কার রাজত্ব ছিল সেটা খুঁজতে ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে চলেছেন।

মাননীয়া, আপনার 'উন্নয়ন' তো রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। 'প্রগতি' অবশ্যই হয়েছে। সেটা ঋণ, দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের। 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে আমরা কিছু বলছি না। আপনি এ-সম্পর্কে নিজের মনকেই প্রশ্ন করুন। প্রকাশ্যে বলার দরকার নেই। কারণ সেটা করলে 'ঘোড়ায় হাসব'। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র প্রমাণ মানুষ অবশ্যই দেখেছেন। সংবিধান না মেনে সরকারি তহবিল থেকে মৌলভি-মোয়াজ্জেমদের ভাতা দেওয়া থেকে শুরু করে হাইকোর্টে হেরে সংখ্যালঘু উন্নয়নে পরোক্ষ সরকার-নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি তহবিল থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ১০,০০০ মাদ্রাসা খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খুললেন মাত্র ২৩৫টি। সেগুলোর গরিব পরিবারের চল্লিশ হাজার ছোট্ট শিশুরা মিড-ডে-মিল পাচ্ছে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বন্ধ। এই দুটো দাবিতে অবস্থান করে তাঁদের জুটেছে পুলিশের নির্মম প্রহার। বাদ যায়নি শিক্ষিকারাও। সম্প্রতি আপনি আট হাজার পূজারীকে শারদোৎসবের সময় মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। পরের তালিকায় কি গুরুদ্বারা? অতিমারিকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে আইসিডিএস/আশা কর্মীরা কাজ করছেন তাঁদের যদি দিতেন তাহলে পুজোর রোশনাই কি কমে যেত? 'সকলের পেটে ভাত'? বিহার নির্বাচনকে সামনে রেখে মোদীজি নভেম্বর পর্যন্ত দেশবাসীকে রেশন

দেওয়ার কথা বলার সাথে সাথেই আপনি প্রতিযোগিতায় নামলেন। আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত রেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু রেশনে এখন কত চাল/গম মিলছে আপনার সাধের ভাইকে একটু জিজ্ঞেস করবেন কি? লকডাউন পর্বে রেশনকার্ডহীনদের দু'মাসের ফুড কুপন দেওয়া হয়েছিল। আপনার আশ্রয় ও অনুপ্রেরণায় অধিকাংশ ডিলাররাই একমাসের রেশন দিয়ে কুপনটি হাতিয়ে নিয়েছে। কি অপার মহিমা আপনার। একটা সমীক্ষা বলছে উদারীকরণ-পর্বে দেশে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২০১১ সালে ছিল ৪৫ কোটি বা দেশের জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ। রাজ্যে এই সংখ্যা কত? মাননীয়া নোটবন্দি ও জিএসটি চালু হওয়ায় কাজ হারিয়ে রাজ্যে ফিরে আসা শ্রমিকদের মাথাপিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন। রাজ্যে কতজন এই টাকা পেলেন আপনার নিয়ন্ত্রিত দপ্তরের বিজ্ঞাপনের ছোট্ট এক কোণেও সে তথ্য কিন্তু আসেনি। এবার অতিমারির সময় কাজ-টাকা সব হারিয়ে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজ নিজ আত্মীয়ের কাছে ফিরলেন তার প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁদের জন্য না ছিল আশ্রয়, না ছিল খাবার। সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন তার কোনো বন্দোবস্ত করেনি। 'পেটে ভাত' তো দূরের কথা, উল্টে তাদের শুনতে হয়েছে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে 'করোনা' ছড়ানোর অভিযোগ। বামপন্থীরা ছাড়া এঁদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি।

কে কার বন্ধু

কোভিড-১৯ বা করোনা অতিমারির সংবাদ অনেক আগেই জেনেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু মোদীজির কাছে দেশের জনগণের জীবন-জীবিকার থেকে মহান বন্ধু ট্রাম্পের আগমন, 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠান অনক বড়। তাই তাদের নামার পর কারোর পরীক্ষা হল না। গুজরাতের জনগণের দারিদ্র যেন 'বন্ধু'-র চোখ না পড়ে সেজন্য ৩০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করে বিমানবন্দর থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত পুরো রাস্তার দুটো পাশে ৮ ফুট উঁচু প্রাচীর তোলা হল। রাজ্যের মানুষের অতিমারিতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকার কথা না ভেবে স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে একলক্ষ লোক জড়ো করা হল। কেন্দ্রীয় সরকার বুঝেছিল ঝুঁকি বাড়ছে অতিমারির। তবু 'বন্ধু' দেশ না ছাড়া পর্যন্ত লক-ডাউন করেনি কেন্দ্র। এর মাশুল গুনতে হল পরিযায়ী শ্রমিকদের। মাত্র ৪ ঘন্টার নোটিশে জারি হল লকডাউন। এই সময়কালে মোদী সরকার জন ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী ১১টি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। এর মধ্যেই ছিল কৃষি সংক্রান্ত তিনটি অধ্যাদেশ। এগুলো নিয়ে রাজ্যগুলোর সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠাতার কারণে কৃষি সংক্রান্ত বিল তিনটি পাশ হওয়া নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু রাজ্যসভায় এগুলি গৃহীত হওয়া নিয়ে সরকার নিঃসংশয় ছিল না। তাই এরজন্য ছক কষতে হয়েছিল শাসকগোষ্ঠীকে। রাজ্যসভার রেকর্ড যাই বলুক না কেন সভায় হট্টগোলের অভিযোগে ৮ জন বিরোধী সাংসদকে অধিবেশন থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারমধ্যে বাম-কংগ্রেস সহ টিএমসি-র ২ জন সাংসদও ছিলেন। পাঠককুলের জানা যে, এই বিল তিনটির (রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করার ফলে এখন আইনে পরিণত) মধ্যে কৃষিপণ্য বিক্রি করা সংক্রান্ত বিলটিও ছিল। কর্পোরেট স্বার্থবাহী আনন্দবাজার পত্রিকা গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে এনে ছিল কৃষিপণ্য বাজার সংক্রান্ত একটা সংবাদ। লেখা সংক্ষিপ্ত করার কারণে পুরো উদ্ধৃতি না দিয়ে শুধুমাত্র সংবাদ শিরোনামটাই তুলে দেওয়া হল ঃ 'কৃষিপণ্যের বাজারে বৃহৎ পুঁজি—ছয় বছর আগেই আইন বদল রাজ্যে'। এটা নেত্রীর দ্বিচারিতা কিনা মানুষই স্থির করবেন। শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দুটো কথা (এক) এই আইন করার আগে মোদী সরকার একটা 'মডেল কোড বিল' পাঠিয়েছিল রাজ্যগুলোকে। (দুই) এই আইন করার আগে রাজ্যে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে মুম্বাইতে একটা 'বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন' হয়েছিল মমতার অনুপ্রেরণায়। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী আম্বানির বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। তিনিও বিনিয়োগে সম্মত হয়েছিলেন। অনেকে বলছেন যে বেশ কয়েকটি জেলায় রাস্তার পাশে বিশাল পরিমাণ জমি কিনেছে আম্বানি। ভূমি-রাজস্ব দপ্তর কি তথ্যটা জানাবেন?

তথ্যের লুকোচুরি

অনেক চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় সরকার এটা আড়াল করতে পারছে না যে, নোটবন্দি, জিএসটি ও লকডাউনের পরিণতিতে দেশে কর্মহীনের সংখ্যা এখন ১৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের প্রভাব পড়ছে সাধারণ ভোগ্যপণ্য ছাড়িয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। রেল, তেল উৎপাদন, ব্যাংক, বিমা, বিমানবন্দর সহ নানা লাভজনক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর ঢালাও বেসরকারিকরণের ফলে কর্মহীনতার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। যে কৃষিক্ষেত্রে এখনও সবথেকে বেশি কর্মসংস্থান হয়, সেখানেও কমছে কাজের সুযোগ। বাড়ছে পুরুষদের তুলনায় নারীদের কর্মহীনতা। দিনমজুর, ঠিকা বা চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছাড়িয়ে স্থায়ী বেতনের কর্মীস্তরেও তা বিস্তার লাভ

করেছে। দেশব্যাপী এই কর্মহীনতার সময় 'বাংলার গর্ব' দাবি করেছেন যে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ কমেছে। এ দাবির জবাব দেবেন রাজ্যের মানুষ।

দেশের অর্থমন্ত্রী ২০২০-২১ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, ''কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ন্যূনতম একটা সরকারি সংস্থা থাকবে, বাকিগুলি বেসরকারি সংস্থার হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলির নামের তালিকা পরে ঘোষণা করা হবে।" এর ফলে দেশে কাজ হাবাবেন অনেক মানুষ।

কিছুদিন আগেই এই তথ্য সামনে এসেছে যে, দেশের গড় জাতীয় উৎপাদন কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। উর্ধ্ব নয়, এটা এখন (–) ২৩.৯ শতাংশ।। এই সময়েই আম্বানির সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ৩৮ শতাংশ। ২০১৯ সালে দেশে ধনীতম (বিলিওনিয়ার) ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৩৪ জন। ২০২০ সালে এই সংখ্যা হয়েছে ১৬৮ জন। কৃষকের ঋণমুক্তি হয় না। আয়কর দেন না এমন সাধারণ পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য মাসে ৭৫০০ টাকা, মাথাপিছু ১০ কিলো চাল/গম দেওয়া, রেগা প্রকল্পের কাজ বছরে ১০০ দিনের পরিবর্তে ২০০ দিন করার সাথে ওই প্রকল্পের কাজে নিযুক্তদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল বামপন্থীরা। সরকারি গুদামে চাল-গমের অভাব নেই। কৃষকদের ঋণমুক্তি ও গরিবদের নগদ দিতে অনীহা কেন্দ্রের। কিন্তু ব্যাংকের বড় বড় ঋণ ও সুদ ছাড় দিতে অর্থের অভাব হয় না।

বামপন্থীদের এইসব দাবি ও তার পিছনে যুক্তিকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য বক্তব্য হাজির করা হচ্ছে যে, দেশের মানুষের গড় মাথাপিছু আয় ২০১৯-২০ সালে আগের বছরের তুলনায় ৬.৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা। এই অংকটা বুঝে নেওয়া দরকার। আম্বানি-আদানির কথা বাদ দিলাম। ধরে নেওয়া যাক গ্রামের একজন শিক্ষক, যাঁর অন্য কোনো আয় নেই। মাসে বেতন পান ৭০ হাজার টাকা বা বছরে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আর অন্যজন ভূমিহীন কৃষক অর্থাৎ খেতমজুর। মাঠের কাজ, রেগার কাজ ও অন্য টুকিটাকি কাজ করে বছরে ৬০ হাজার টাকা। তাহলে দু'জনের মোট বাৎসরিক আয় ৯ লক্ষ টাকা। তাহলে তাঁদের গড় বাৎসরিক আয় সাড়ে-চার লক্ষ টাকা। এটাই হচ্ছে গড়ের খেলা। অনেক সময় মানুষ এত খুঁটিয়ে ভাবেন না। তাই নানা প্রশ্ন ও তার থেকে বিভ্রান্তি হয়। শাসকশ্রেণিগুলোর সমস্ত রাজনৈতিক দলই গরিব মানুষের এই অজ্ঞতার সুযোগ নেয়।

চলতি সময়—কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল

কেন্দ্রে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এনডিএ জোট হলেও তার প্রধান শক্তি বিজেপি। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে এককভাবেই বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দলটিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর.এস.এস। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ তো করেইনি। সময় সময় এরা বিরোধিতা করেছে। এদের শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার ব্রিটিশ শাসকদের কাছে মুচলেকা দিয়েছে। দলটা বর্ণবাদে বিশ্বাসী মনুবাদী দল। উচ্চ বর্ণেরই প্রাধান্য এই দলে। দলের প্রয়াত প্রথম সারির এক নেতা লিখিতভাবেই বলেছেন, কোনো দলিত পরিবারের প্রথম সন্তান ব্রাহ্মণের ঔরসে হওয়াই বঞ্ছনীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ওই নেতাই লিখেছিলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বৃথা শক্তিক্ষয় কোরো না। শক্তি সঞ্চয় কর। আগামীদিনে আমাদের তিন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এই তিন শত্রু হল— মুসলিম, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্ট।

অনেকেই ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে দেখেছেন যে, দেশে যত নারী নির্যাতন হয় (গার্হস্থ্য নির্যাতন ছাড়া) তার অধিকাংশই ঘটে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে। এর শিকার উচ্চবর্ণের পুরুষ দ্বারা প্রধানত দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েরা। এর অর্থ এই নয় যে, 'গর্ব' পরিচালিত এই রাজ্য এই বীভৎসতা থেকে মুক্ত। সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুসারে এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'দুষ্টু-মিষ্টি' ভায়েরা যুক্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে এই দুটো দল পুরোপুরি একই পথের পথিক না হলেও অনেক মিল পাওয়া যায়।

শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে

কিছুদিন আগে নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, কাটমানি, সিন্ডিকেট এসমস্ত চলবে না। তার কিছুদিন পর বললেন, যে যা তুলবে তার ৭০ শতাংশ দলীয় তহবিলে দিতে হবে। লোকমুখে শোনা যাচ্ছে যে, ওনার ভাই-ভাতিজারা যা তুলেছে আগেই তার ৭০ শতাংশ টাকা কেটে রেখে তোলা টাকার পরিমাণ দলকে জানাচ্ছে। তার অর্থ ১০,০০০ টাকা তুললে ৩,০০০ টাকা ঘোষণা করছে। সুতরাং ৭,৯০০ টাকা তোলাবাজদের কাছে থেকে গেল।

সারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত ছিলেন এক সাংসদ। সারদার টাকাতেই কয়েকটা পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তাঁরই। নাম জড়ানোর পর হঠাৎই তাঁকে জেলে পুরলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী। কোর্ট হাজিরার দিনগুলোতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকরা ভিড় করতো তাঁর কথা শোনার জন্য। সেকথা যাতে শোনা না যায় তার জন্য পুলিশকে সেসময় হল্লা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন সামনে। তাই পুরোনো কর্মীদের দলে ফেরার ডাক দিলেন নেত্রী। ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরল। সম্প্রতি রাজ্যের শাসকদলের রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছেন ছত্রধর মাহাতো. তাঁর পরিচিতি হয়েছিল দুটো কারণে—(১) মাওবাদী আন্দোলনের সময় মমতা ব্যানার্জীকে মোটর সাইকেলের পিছনে বসিয়ে সন্ত্রাসগ্রস্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া, (২) 'জনসাধারণ'-এর প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে। সংবাদপত্র সূত্র অনুসারে পুরনো 'প্রতিরোধ কমিটি' সদস্যদের নিয়ে তিনি সভা করছেন। ঝাড়গ্রামে আবার মাওবাদী পোস্টার পড়ছে। এটা কি কাকতালীয় ঘটনা?

২০১১ নির্বাচনের আগে ঘটেছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা। মনে রাখার মতো বিষয় যে শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের সময় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ছিলেন উত্তরবঙ্গে। সেখান থেকেই তিনি দায়ী করেছিলেন সিপিআই(এম)-কে। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার সাথে সাথেই প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন 'কাক' সহ একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

'ভোট মাস্টার'-এর স্মরণে এসব আছে। যাদের দ্বারা তিনি নিয়োজিত হয়েছেন সে দলটাকে তিনি চেনেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর বাহিনী মারফৎ একটা ধারণাও তাঁর গড়ে উঠেছে। তাই 'গর্ব'-এর সম্মতিতেই দলের ভাবমূর্তি ফেরানোর কাজে নেমেছেন তিনি। আর সেজন্যই বিজেপি নয়, রাজ্যের প্রধান বামপন্থী দলটির নেতা-কর্মীদের টিএমসি দলে টানার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

তাই শুধু বিপদে মানুষের পাশে থাকলেই চলবে না। একাজ বাদ দেওয়ার অর্থ হবে মানুষকে বিপদের ঘূর্ণির আবর্তে ছেড়ে দেওয়া। তাই এই বিপদকে রুখে দেওয়ার সংগ্রামের সাথে তাঁরই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করানো এবং বিজেপি শাসিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর জনবিরোধী নীতিগুলিকে তুলে ধরে শিক্ষিত করতে হবে। গ্রামে, মহল্লায় নেমে মানুষকে বোঝাতে হবে বাংলার 'গর্ব' মমতা নন, 'বাংলার 'গর্ব' বাংলার মানুষ। বিকল্প বিজেপি নয়। বিকল্প সংগ্রাম। আমাদের পূর্বসূরিদের সংগ্রাম, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ঐতিহ্য। এটাই হবে এখনকার কাজ।

বর্ধমান শহরে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র রাজ্য সম্মেলন

অরিন্দম কোঙার

কমিউনিস্ট আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা ধারা হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা, যার সূত্রপাত ধরা হয় প্রবাসে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। সেই হিসাবে ২০১৯-২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শতবর্ষ চলছে। দেশ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হওয়ার পরও এই আন্দোলন চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে, কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটানো। বড় কঠিন ও জটিল এবং আপাত-অবিশ্বাস্য কাজ। বড় ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে কন্টকাকীর্ণ পথে এগিয়ে যাওয়ার কাজ। তাই নিপুণ পরিকল্পনা দরকার, আর সেই পরিকল্পনার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সঠিক রণনীতি ও রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগী রণকৌশল প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে রীতিমতো মজবুত হতে হয়, যাকে বলা হয় বিপ্লবী সংগঠন। সর্বস্তরে সাংগঠনিক কাঠামোকে সক্রিয় রাখতে হয়, পার্টির মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ইচ্ছার ঐক্য, চিন্তার ঐক্য, কাজের ঐক্য স্থাপন করতে হয়। পার্টির সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ, পার্টির কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ সব সময়ে বিবেচনায় রাখতে হয়। তাই সংগঠন ও আন্দোলন নিয়ে পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত পার্টি কমিটির সভা করতে হয়। এই-সব সভা তো দৈনন্দিন কাজ পর্যালোচনার জন্য সভা। কমিউনিস্ট পার্টিকে একটু বেশি সময় ব্যবধানে, যেমন ২-৩ বছর অন্তর ৩-৪ দিন ধরে, পুরনো কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং নতুন কর্মসূচি স্থির করার জন্য নিয়মিত সম্মেলন করতে হয়। পার্টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে সর্বভারতীয় সম্মেলন বা ‘পার্টি কংগ্রেস’। তার আগেই রাজ্যস্তরে সম্মেলন করতে হয়। গত ১০০ বছরে সেইরকম মাত্র একটা সম্মেলন বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শতবর্ষে সেই সম্মেলনকে আমরা ফিরে দেখতে পারি।

রাজ্য সম্মেলন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয় ১৯৬৪ সালে। এর আগে পার্টির ৬টা কংগ্রেস ও ৯টা বঙ্গীয়/পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক/রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে বর্ধমান জেলায় মাত্র একটা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের ১৭-২২ জানুয়ারি নবম রাজ্য সম্মেলন। অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। তখন পার্টির রাজ্য সম্পাদক জ্যোতি বসু। পার্টির বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুবোধ চৌধুরী। বর্ধমান শহরে একমাত্র রাজ্য সম্মেলন হওয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে অবিভক্ত পার্টির শেষ রাজ্য সম্মেলন হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই সম্মেলনের বাড়তি গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়।

সম্মেলনের খুঁটিনাটি

অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই সর্বশেষ ও নবম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালের ১৭-২২ জানুয়ারি বর্ধমান শহরে। প্রতিনিধি সম্মেলন হয় নতুনগঞ্জের বর্ধমান রাজবাটির কমলা-কামিনীতলার কাছে আলমগঞ্জ রোডে। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ফাঁকা জায়গায় প্যাণ্ডেল তৈরি করে। সম্মেলনস্থলের নামকরণ করা হয় ‘সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’-কে

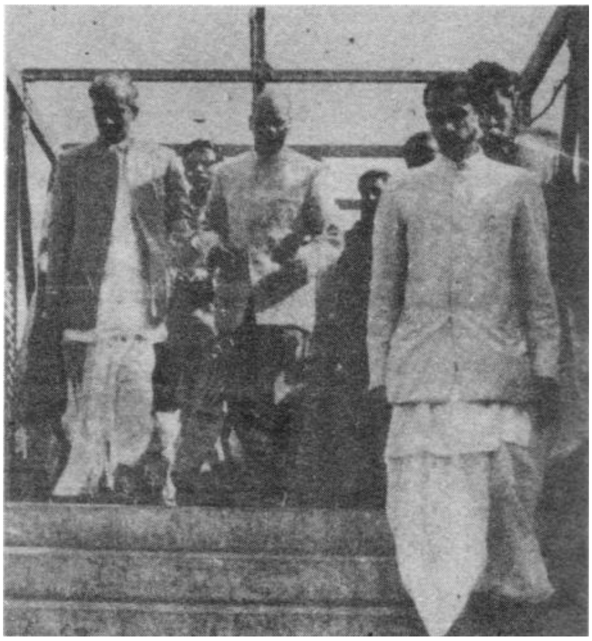

সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বর্ধমান স্টেশনের ওভারব্রিজ দিয়ে আসছেন অজয় ঘোষ, সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও হরেকৃষ্ণ কোঙার।
ছবি : শম্ভু ব্যানার্জী

সম্মেলনে পার্টির পতাকা উত্তোলন করছেন জ্যোতি বসু। ছবি : মলয় ঘোষ

স্মরণে রেখে। বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম শহিদ। রানিগঞ্জ পেপার মিল (পরবর্তীকালে বেঙ্গল পেপার মিল) ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হন রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুরে ১৯৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর। প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২২ জানুয়ারি বিকালে আফতাব ক্লাব ময়দানে। বর্ধমান টাউন হলে **'দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের উজ্জ্বল অগ্রগতি'** নামে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন ভূপেশ গুপ্ত।

১৯৬১ সালের ১৭ জানুয়ারি সম্মেলনের শুরুতে পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। সম্মেলন পরিচালনার জন্য কয়েকটা কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতিমণ্ডলী—মণিকুন্তলা কল (সেন), মনসুর হবিবুল্লাহ, সীতারাম সিং, গোপাল আচার্য, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। স্টিয়ারিং কমিটি—জ্যোতি বসু, মুজফ্‌ফর আহমদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, রণেন সেন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখার্জী। ক্রিডেন্সিয়াল কমিটি—জীবন মাইতি, গোপাল বসু, নরেন সেন।

সম্মেলনের সময় পশ্চিমবঙ্গে পার্টিসভ্য ছিলেন ১৭,৩২৬ জন, প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন ৩৩৬ জন, সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩০৯ জন। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট উত্থাপন করেন রাজ্য সম্পাদক জ্যোতি বসু। এই রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৩ জন প্রতিনিধি। আলোচনার ভিত্তিতে পার্টির সামনে জরুরি কাজের একটা কর্মসূচি গৃহীত হয়।

আলোচনা

সম্মেলনে মূল দলিল ছিল রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট। তাছাড়া ছিল ২৪টা প্রস্তাব। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্বের ৮১টা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ নভেম্বর বিপ্লবের ৪৩-তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মস্কোয় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা এক মহাসম্মেলনে মিলিত হন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে একটা দলিল (একাশি পার্টির বিবৃতি) তৈরি করেন। সেই সময়ে এই দলিলকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথনির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টের মূল অংশ—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, জাতীয় পরিস্থিতি, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, বিভিন্ন ক্যাম্পেন ও জনসাধারণের আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, আগামী নির্বাচন, আদর্শগত সংগ্রাম, পার্টি ও গণফ্রন্ট, দৈনিক পত্রিকা—স্বাধীনতা, পার্টিশিক্ষা, পার্টি ও আইনসভার কাজ, পার্টি সংগঠন, উপসংহার।

১৯৫৬ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র, বিপ্লবের স্তর, সমাজতন্ত্র অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে মত-পার্থক্য দেখা দেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেও মতাদর্শগত বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯ সাল থেকে অনভিপ্রেত চীন-ভারত সীমান্তবিরোধ শুরু হয়, উগ্র জাতীয়তাবাদ মথাচাড়া দেবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এই পটভূমিকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতির ছাপ পড়ে সম্মেলনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে ও সম্মেলনের আলোচনায়।

রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে পার্টি কর্মসূচির অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরে লেখা হয়—"আজ দীর্ঘদিন যাবৎ পার্টির কোনও প্রোগ্রাম নাই। পার্টি প্রোগ্রামই পার্টি সভ্যদের প্রাণবস্তু। লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলে পার্টি সভ্যদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি হয় না। এই উৎসাহই পার্টি সভ্যদের যে কোনও কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ করে। পার্টির মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা দূর করিয়া পার্টিকে সজীব করিতে হইলে প্রোগ্রাম রচনার কাজ কিছুতেই আর ফেলিয়া রাখা উচিত হইবে না। প্রোগ্রামের অভাব পার্টি বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।"

উপসংহারে আছে ঃ "পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের জীবনে যে নিদারুণ দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সমস্ত মেহনতি জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়া তুলিবার যতখানি প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তাহার তুলনায় আমাদের

প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন অজয় ঘোষ, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার।
ছবি : মলয় ঘোষ

পার্টির সত্যই অনেক দুর্বলতা রহিয়াছে। ইহার জন্য আজ আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন পার্টিকে শক্তিশালী করিয়া সংগঠিত করা, দ্রুতগতিতে পার্টির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্য ও দরদীকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে সংগ্রাম ও সংগঠনের কাজে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা, জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে পার্টি-পত্রিকা ''স্বাধীনতা''র প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ও কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া পার্টিকে জনগণের মধ্যে প্রসারিত ও সংগঠিত করার আশু কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই ইহা প্রয়োজন। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্টিকে প্রসারিত ও সংগঠিত না করিলে জনগণ হইতে উদ্ভূত এই কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী হইবে কী রূপে? আমরা জনগণের অগ্রগামী সচেতন অংশবিশেষ। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসাবে দেশের জনগণের প্রতি যে পবিত্র দায়িত্বে আমরা আবদ্ধ হইয়াছি, আসুন আমরা দৃঢ়তর সঙ্কল্প ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা লইয়া সেই কাজে অগ্রসর হই।''

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ১৮ জানুয়ারি অর্থাৎ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ইংরেজি বক্তৃতা ও বাংলা তর্জমাসহ ৯ ঘন্টা সময় লাগে। তিনি মূলত একাশি পার্টির দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা করেন। তিনি এই দলিলকে **'নয়া কমিউনিস্ট ইস্তাহার'** বলে অভিহিত করেন।

এই সম্মেলনে একাশি পার্টির দলিল বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে, দলিলের সমর্থনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তবে পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে এই দলিল ত্রুটিপূর্ণ।

কমিটি গঠন

অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মলন থেকে ১০১ জন সদস্য নিয়ে রাজ্য পরিষদ গঠিত হয়। রাজ্য পরিষদ আবার ২৫ জন সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে। সদস্যরা হলেন—প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ডাঃ রণেন সেন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি, সমর মুখার্জি, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, মহম্মদ ইসমাইল, বিশ্বনাথ মুখার্জি, নীরেন ঘোষ, খগেন রায়চৌধুরী, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানাই ভৌমিক, আবুল হাসান, বিজয় মোদক, বিনয় চৌধুরী, রতনলাল ব্রাহ্মণ, অমৃতেন্দু মুখার্জী, আবদুল্লাহ রসুল, বীরেন রায়, মণিকুন্তলা সেন, জলিমোহন কল। প্রথম ৮ জন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। সম্পাদকমণ্ডলীতে পরে আরও একজন সদস্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রমোদ দাশগুপ্ত। তারপর আমৃত্যু ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র) আরও পাঁচটা রাজ্য সম্মেলনেই তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৫ জন রাজ্য কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য হন—আবদুল্লাহ রসুল, বীরেন ব্যানার্জী, ধরণী গোস্বামী, গণেশ ঘোষ, সতীশ পাকড়াশী।

সম্মেলনের চিত্র

রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টও তা একেবারে চেপে যেতে পারেনি। রিপোর্টের এক জায়গায় আছে, ''কলকাতার এক শিল্পী দেবু মুখার্জী গেট অলংকরণ করেন। পার্টির বর্ধমান শাখা সম্মেলন উপলক্ষে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে জনসাধারণের, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাড়া ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সম্মেলনের জন্য অনেক বাড়ি ও গুদামঘর বিনামূল্যে ছেড়ে দেন এবং উদারভাবে অর্থ বা জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করেন। বিশেষ করে, জেলার পাঞ্জাবী সমাজের মানুষেরা দরাজ হস্তে সম্মেলন তহবিলে দান করেন। দেখে মনে হয়েছে, সম্মেলনের দিনগুলিতে সমস্ত শহরই ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর।'' এই দেবু মুখার্জী হচ্ছেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনের বেশ কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে বর্ধমানে এসে থেকে গিয়েছিলেন সম্মেলনের অলংকরণের জন্য।

তখন অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক বাংলা মুখপত্র ছিল 'স্বাধীনতা'। ১৯৬১ সালের ২৪ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা' পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লেখে, ''সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজনে কংগ্রেস শাসনে বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট সর্বশ্রেণির মানুষের উদ্যোগ ও সমাবেশে তাঁহাদের অংশগ্রহণ রাজ্যের ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির এই প্রতিনিধি সম্মেলন ও প্রকাশ্য অধিবেশনের সমাবেশ যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি, প্রভাব ও সংগঠন ক্ষমতা এবং এই পার্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার তাঁহারা অবশ্যই কিছুটা পরিচয় পাইয়াছেন।'' (কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান সম্মেলন) এই সম্পাদকীয়তে আরও লেখা হয়, ''বেআইনি অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৩৮ সালের চন্দননগর সম্মেলন ছাড়া অতীতের অন্য সবগুলি সম্মেলনই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন পর পুনরায় এই প্রথম কলিকাতার বাহিরে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্মেলন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি তাৎপর্য্যপুর্ণ ঘটনা। পার্টি গ্রামাঞ্চলে তাহার শক্তি ও সংগঠন বৃদ্ধি করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে।'' সুতরাং এটা বলা যায় যে সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে আয়োজিত হয় এবং বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে সম্মেলন প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়।

With best compliments of

SRMB

Leadership
through innovation

SRMB SRIJAN LIMITED

DURGAPUR WORKS
Sagarbhanga, Durgapur 713211, Dist. Paschim Bardhaman
Phone + 91(0343) 6450788 / 645 0877
Fascimile : +91 (0343) 255 9206 / 255 9205

Sl. No. 38

কিছু অচেনা মানুষের জীবনকাহিনি

অমল হালদার

আমাদের বাড়ির পাশে প্রহ্লাদকাকা থাকতেন। সেই সময়ে ওই এলাকায় একমাত্র ডাক্তার। আমরা সবাই ডাক্তারকাকা বলে সম্বোধন করতাম। পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, জ্বর, সর্দি সবেতেই আমরা ডাক্তারকাকার কাছে ছুটে যেতাম। আমার বয়স তখন ৭ কিংবা ৮ বছর। কাছে গেলেই নামতা, বানান জিজ্ঞাসা করতেন। কার্যত পড়া জিজ্ঞাসার ভয়ে ওনার কাছাকাছি হবার খুব সাহস হতো না। অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বাড়ির সামনের মাঠে আমরা খেলতাম, উনিও মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করতেন। ওই বাড়ির আসল মালিক ছিলেন করুণাদা, আমার বাবার সমবয়সী কিন্তু কী কারণে দাদা সম্বোধন করতাম এটা পরে জেনেছি। করুণাদা আর ডাক্তরকাকা ছিলেন নিকট আত্মীয়। দু'বোনের সাথে করুণাদা আর ডাক্তারকাকার বিবাহ হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ডাক্তারকাকার স্ত্রীকে বলতাম অশ্বিনী মাসি, কেন বলতাম জানি না। এটা আমাদের বাড়ির সব ছোটরাই বলতো। ডাক্তারকাকা মার্কসবাদের কিছু বই পড়াশুনা করতেন। মাঝে মাঝে কিছু পত্র-পত্রিকাও আসতো। আমার বাবা তা সংগ্রহ করে পড়তেন। মাঝে মাঝেই করুণা রায়, বাবা ও প্রহ্লাদ ঘোষ বসে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, সবটাই ছিল রাজনীতির কথা। আমি শুনতাম, কিছুই বুঝতে পারতাম না। গ্রামটিতে সামন্ততান্ত্রিক মেজাজের কিছু লোকজন ছিল, তাঁদের পরিচালনা করতেন একজন ধনী ব্যক্তি। গ্রামের বারোয়ারি পুজো বা উৎসব সব ক্ষেত্রেই এই অংশ ছিল মধ্যমণি। গরিব মানুষের অবস্থা ছিল খুবই করুণ, নামমাত্র মজুরিতে খাটতে হতো। যদি মুনিববাড়িতে দুপুরে খাওয়া জুটত তাহলে থালাবাটি পৃথক জায়গায় রাখতে হতো। এমনকি চায়ের কাপেও একই চেহারা ছিল। নানা মিথ্যা অভিযোগে গরিবদের উপর নির্যাতন হতো। বেঁধে রেখে মারা হতো। ছোটবেলায় তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। কারও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামে কিছু চুরি হলে নলগাছ আসত, চাল-পোড়া খাওয়ানো হতো, মজা হলো যাকে সন্দেহ করা হতো নল যেয়ে ঠিক পৌঁছাত। এগুলি কি অবৈজ্ঞানিক, তা ভাবার মতো বুদ্ধিজ্ঞান কিছুই ছিল না।

ছোটবেলাতেই আর ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেলাম। গ্রামে একটি ধনী কৃষক পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ির সন্তানদের পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সবাই ভূপেনবাবু বলে ডাকতেন। আমরা ভূপেন জেঠু বলতাম। তিনি যখন পড়াতেন তখন মাঝে মাঝে যেতাম। যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য তেমনি চমৎকার বাচনভঙ্গি। এক টিপ নস্যি নিয়ে যখন শুরু করতেন যেন শেষ হতো না। এইরকম একজন মানুষের সাহচর্য সত্ত্বেও ওই বাড়ির ছেলেদের শুধুমাত্র অন্যমনস্কতার কারণে লেখাপড়া আর হয়ে ওঠেনি। সেই ভূপেন জেঠুকে বাবার নির্দেশে প্রণাম করতে হতো, তিনি প্রণাম নেবেন না, আর বাবাও ছাড়বেন না। এ ঘটনা বহুদিন ঘটেছে। ভূপেনবাবুকে কমরেড বিনয় চৌধুরী জানতেন, অনেক পরে ভূপেনবাবুর বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। তখন শ্রদ্ধা আমার আরও বেড়ে যায়। যখন তাঁর সমস্ত পরিচয় পাই তখন তিনি মারা গেছেন। যখন আমি রাজনীতিতে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছি তখন শহিদ প্রভাত কুণ্ডু ভবনের নিচে বসতেন কমরেড বিনয় ভট্টাচার্য। তাঁর কাছেই ভূপেনবাবু, প্রহ্লাদ ডাক্তার, করুণা রায় ও আমার বাবার সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে নানা কথা শুনেছি। বিনয়বাবু বহুবার আমাদের বাড়ি গেছেন, থেকেছেন, গোপনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছেন, ইত্যাদি নানা বিষয় আমাকে বলতেন।

যে ঘটনা আমার কিশোর মনকে নাড়া দিয়েছিল সেই কথায় ফিরে আসি। ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের একটা ঘটনা এখনও মনে আছে। কমরেড বিনয় চৌধুরীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ বর্ধমানের রানি রাধারানী মহতাব। মহারানি গ্রামে প্রচারে বেরিয়েছেন, আমাদের গ্রামেও এলেন নতুন অ্যাম্বাসাডার চেপে, দারুন ভিড় মহারানিকে দেখা ও তাঁর গাড়িটিকেও একটু ছোঁয়ার

জন্য। কয়েক প্যাকেট লজেন্স বাচ্চাদের দেওয়া হলো, ক্লাবের ছেলেরা ফুটবল দাবি করলেন, মহারানি বললেন, তথাস্তু। গরিব পাড়ায় পানীয় জলের সমস্যা ছিল, সেটাও মিটে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। গ্রামের সেই বড় জমায়েতের সামনে একজন ব্যক্তি নির্দেশ দিলেন এবারে সব ভোট রানিমার জন্য, জোড়া বলদে ভোট দিতে হবে। একটাও ভোট অন্য জায়গায় দেওয়া যাবে না। রানিমা বাচ্চাদের গাল টিপলেন, অতিরিক্ত রুমাল দিয়ে নাকের সর্দি মুছে দিলেন, কিন্তু রাজনীতির কোনো কথা বললেন না। আমি তখন ১০ বৎসরে পা দিয়েছি, ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম সবাই এসেছেন সেখানে, অনুপস্থিত ডাক্তারকাকা, করুণাদা এবং আমার বাবা। নির্ধারিত দিনে ভোট হলো। আমাদের গ্রামে বুথ ছিল না, বুথ হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রাথমিক স্কুলে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরত্ব। ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে একটি চকচকে অ্যামাবাস্যাডর হাজির হলো। ভোটাররা সেজেগুজে আসার আগেই আমরা ড্রাইভারকে কাতর আবেদন করলাম আমাদের একবার গাড়ি চাপার সুযোগের জন্য। তিনি রাজি হলেন, আমাদের খুব আনন্দ জীবনে প্রথম গাড়ি চাপছি। চাপা শেষে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাবা প্রথমে তিরস্কার, পরে মার দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলাম। অন্যায় কী হলো তা বুঝলাম না। আসলে তখনকার সময়ে একটি সাইকেল কিনলে গ্রামের মানুষ দেখতে যেত, নদীর বাঁধের রাস্তায় মোটর সাইকেল গেলে দূর থেকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। এহেন অবস্থায় নতুন অ্যাম্বাস্যাডর চাপা সে তো বিরাট ব্যাপার। কিন্তু গাড়ি চাপার স্মৃতি প্রহারের চোটে ভুলে গেলাম। সকালের দিকে মধ্যবিত্তপাড়ার ভোটাররা গাড়ি চেপে ভোট দিতে গেলেন। ভোটকেন্দ্রে নামিয়ে আবার ভোটার তুলতে আসা—এটা সারাদিন চলছিল। এখনকার মতো নির্বাচন কমিশনের কোনো নির্দেশিকা ছিল না, কাজেই তখন ভোটার বহন করা, উৎকোচ দেওয়া—এগুলি সমস্যাই ছিল না।

দুপুরে ভাত খেয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো, পায়ে হেঁটে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। মোট ৬ জন, সঙ্গে আমি আমার বাবা, মা, করুণাদা ও বৌদি, ডাক্তারকাকা ও অশ্বিনী মাসি। করুণদার ছেলেবেলা থেকেই পায়ের সমস্যা ছিল, কিন্তু কোনোরকম পরোয়া না করে তিনি সঙ্গী হলেন। সদ্য মার খেয়েছি বাবার কাছে, আমাকে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ডাক্তরকাকাই অনুমতির ব্যবস্থা করে দিলেন। যাবার পথে তাকিয়ে দেখছি অ্যাম্বাসাডার গাড়িটার অন্তত চার-পাঁচবার গ্রাম থেকে ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত হয়ে গেল। কিন্তু অনমনীয় মন নিয়ে এই ছয়জনের হেঁটে যাওয়ার কারণ তখন আদৌ বুঝতে পারিনি। পাশের গ্রামের মণ্ডলবাড়ি থেকেও কয়েকজন হেঁটে গিয়েছিলেন। ভোট দেবার পর সবাই হেঁটেই বাড়ি ফিরলাম। আমার কৌতূহল শেষ হয়নি। অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন করুণাদা, সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম—করুণাদা আমরা গাড়িতে শ্রীরামপুর গেলাম না কেন? তিনি বললেন, ওরা মহারানিকে জোড়াবলদে ভোট দেবে, তাই রানিমা গাড়ি পাঠিয়েছেন, আর আমরা ভোট দিয়েছি বিনয় চৌধুরীকে কাস্তে ধানের শিষে ছাপ দিয়ে, বিনয়বাবু তো গাড়ি পাঠাননি তাহলে ওই গাড়িতে কীভাবে যাব বল্? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বিনয় চৌধুরী তো একটা রিক্সাও পাঠাতে পারত, সেটা কেন হলো না। করুণাদা বললেন—এটা কমিউনিস্ট পার্টি, কোথায় পাবে এত টাকা। আর কিছু বলিনি, মনে থেকে গেল শুধু কমিউনিস্ট পার্টি গরিবদের পার্টি। এদের টাকা নেই। কমরেড বিনয় চৌধুরী সেই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। কয়েকদিন করুণাদার মতো মানুষেরা হাসি-ঠাট্টার খোরাক হয়েছিলেন। সেগুলি কিছুটা বুঝতে পারতাম।

কিছুদিন পর ডাক্তারকাকা করুণাদার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করেন। '৬৭ সালের নির্বাচনের এক টুকরো স্মৃতি

উল্লেখ করছি। শ্রদ্ধেয় অসীম ঘোষ সেবার 'কাস্তে ধানের শিষ' প্রতীক নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টি ভাগ হবার পর কমরেড বিনয় চৌধুরীর প্রতীক 'কাস্তে হাতুড়ি তারা'। ডাক্তারকাকার বৈঠকখানায় অসীমবাবু হাজির। যেহেতু অতীতের নির্বাচনগুলিতে কমরেড বিনয় চৌধুরীর সাথী ছিলেন অসীমবাবু, তাই ডাক্তারকাকার সাথে ভালো পরিচয় ছিল। খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসার পথে বৈঠকখানায় ভিড় দেখে কৌতূহলবশত দাঁড়ালাম। সেখানে গ্রামের বেশ কিছু মধ্যবিত্ত মানুষও হাজির। অসীমবাবু কোনো কটূ কথা নয়, কমরেড বিনয় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কথা বলছিলেন। একজন বলে উঠলেন, ''আমরা বাবু বিনয় চৌধুরীকে চিনি, হরেকৃষ্ণ কোঙারকে চিনি, এঁরা যে পার্টিতে আমরা সেখানেই ভোট দেব।'' ব্যক্তিটির নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, তাঁর একমাত্র ছেলে মনমোহন ঘোষ এক সময় সিপিআই(এম) পার্টির কর্মী ছিলেন। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। ডাক্তরকাকা চা খাইয়ে অতিথিদের বিদায় জানালেন, প্রার্থীর জিপ চৈত্রপুরের দিকে যাত্রা করল। ডাক্তারকাকা সমবেত মানুষদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমাদের প্রার্থী বিনয় চৌধুরী, তাঁকেই আমাদের সমর্থন করা উচিত। সেই সময় একজন ব্যক্তি দু-চার কথা বলেছিলেন তাঁকে আমরা সুধীরকাকা বলে সম্বোধন করতাম। তিনি ছিলেন ফেরিওয়ালা, পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে এসে এখানে এই পেশাই বেছে নিয়েছিলেন। চুড়ি, ফিতা, আলদা ইত্যাদি বিক্রি করতেন। সব বাড়িতেই চুড়ি পরাবার সময় কিছু জ্ঞানের কথা বলতেন। তার সবটাই ছিল রাজনীতি। অন্তত ২০টি গ্রামে তাঁর ছিল গতিবিধি, পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে রাত্রে ঘোড়দৌড় চটিতে মনোহর ময়রার দোকানে থাকতেন প্রায় রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। সমস্ত পত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন। জীবনের শেষ দিকে যখন গোপন চিঠি পৌঁছে দেওয়া ছিল কঠিন কাজ, তখন সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতেন সুধীর কাকা। ওই এলাকার গরিব মানুষ আজও তাঁকে ভুলতে পারেননি। উনি দু-এক কথা বলার পরই উপস্থিত মানুষ বাড়ি চলে গেলেন। রাজনীতির কিছুটা জ্ঞান বাড়ার পর সেদিনের কথাটা আজও কানে বাজে। রাজনীতিতে ব্যক্তির ভূমিকা যে কতো বড়ো আজও তা স্মরণ করি। ডাক্তারকাকা নতুন জায়গায় বসবাসের কিছুকাল পর পুলিশলাইনে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন। ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে, তাঁদের পড়াশুনার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। পুলিশ লাইনে চলে যাবার পরও ডাক্তারকাকুর কাছে সময় পেলেই যেতাম, অশ্বিনীমাসির স্নেহ আজও ভুলতে পারবো না।

ওরা মহারানিকে জোড়াবলদে ভোট দেবে, তাই রানিমা গাড়ি পাঠিয়েছেন, আর আমরা ভোট দিয়েছি বিনয় চৌধুরীকে কাস্তে ধানের শিষে ছাপ দিয়ে, বিনয়বাবু তো গাড়ি পাঠাননি তাহলে ওই গাড়িতে কীভাবে যাব বল্? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বিনয় চৌধুরী তো একটা রিক্সাও পাঠাতে পারত, সেটা কেন হলো না। করুণাদা বললেন—এটা কমিউনিস্ট পার্টি, কোথায় পাবে এত টাকা। আর কিছু বলিনি, মনে থেকে গেল শুধু কমিউনিস্ট পার্টি গরিবদের পার্টি।

৬৭-৬৯ সালের সময়ে অনেক নতুন কর্মী পার্টিতে আসে। কর্মী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মন্টুদার (অমিয় দাঁ) অবদান ছিল বেশি। রণজিৎ মুখার্জী, মনমোহন ঘোষ, মদন মণ্ডল সহ অনেক গরিব ঘরের কর্মী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়। এক সময়ে কিছু ব্যক্তির মধ্যে যে সামন্ততান্ত্রিক মেজাজ দেখা যেত, গরিবরা ঐক্যবদ্ধ হবার পর তার ধীরে ধীরে তার অবসান হয়। যে গরিবরা একসময় ন্যূনতম প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না, তাঁদের মধ্যে প্রতিরোধস্পৃহা নজরে আসে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর কিছু পুলিশি আক্রমণ শুরু হয়, কিছু কর্মী আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন, কিন্তু গরিব মানুষের ঐক্যে কোনো চিড় ধরেনি। মিথ্যা মামলায় আমার বাবা জেলে যান, সেখানে অনেক নেতার সান্নিধ্যে আসেন। জেলখানায় দেখা করতে গেলে বাবাকে চিন্তিত মনে হতো না। এটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে যেদিন বাবার জামিন হলো, সেদিন প্রয়োজন ছিল জামিনদারের, একজন খবরটা দিতেই করুণাদা দলিলপত্র নিয়ে দুপুরে না খেয়ে বর্ধমানে গেলেন এবং জামিন করে নিয়ে এলেন। হাঁটতে কষ্ট হয়, এই মানুষটির হেঁটে যাওয়া আজও চোখের সামনে ভাসে।

জীবনের এই সময়ের ঘটনাগুলি আমার মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন মিথ্যা মামলার আসামি হলাম, গ্রামে এসে অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে রাত্রে থাকতাম। মন্টুদার নির্দেশে পাহারা থাকতো, তাই কোনো অসুবিধা ছিল না। মন্টুদা জেলে যাবার পর পাহারা বন্ধ হয়ে গেল, তখন করুণাদার কথায় তাঁর বাড়িতে রাত্রে থাকতাম। যেহেতু আমাদের বাড়ি থেকে দূরত্ব ছিল কম, তাই আশংকা থাকত, কিন্তু করুণাদা সাহস দিতেন। পুলিশ এসেছে করুণাদার বাড়িতে, অশ্লীল কথাবার্তা ও হুমকি শুনতে হয়েছে, কিন্তু করুণাদা বা বৌদি ভীত হননি, শুধু পরের দিন বলেছেন—''ভাগ্যিস তুই থাকিসনি।'' দুদিন পর থেকে আবার রাত্রে শোবার জন্য বলে যেতেন। এই মানুষগুলি সবাই প্রয়াত হয়েছেন। এঁরা কেউ পার্টির কোনো নেতা বা কর্মী ছিলেন না, কিন্তু পার্টির প্রতি ভালোবাসা, পার্টির ঘরছাড়া কর্মীদের প্রতি নজর রাখার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকাকে ভুলে যাওয়া যায় না। এই ধরনের মানুষদের অসংখ্য অবদানে গ্রামবাংলার পার্টি মজবুত হয়েছে। এক সময়ে কমরেড রামনারায়ণ গোস্বামী পাশের একটি পাড়ায় মধুদার বাড়িতে থাকতেন। আমার বাবা এবং করুণাদা প্রায়ই কিছু সব্জি, নারিকেল নিয়ে হাজির হতেন। কমরেড রামনারায়ণ গোস্বামী বহুবার আমাকে এইসব বিষয়গুলি বলতেন, শুধু ভাবতাম কঠিন সময়ে কমরেডদের পাশে দাঁড়ালে কতখানি মনের মধ্যে রেখাপাত করে। আজকে এই মানুষগুলি কেউ বেঁচে নেই, যাঁরা আছেন অতীতের সেই উজ্জ্বল ভূমিকা আজ আর নেই। বয়সকালে নানা অসুখে ভারাক্রান্ত, গ্রামে ছিলেন আমাদের একজন রামকাকা, তিনিও প্রয়াত হয়েছেন। আমাদের পার্টির সাথে কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু আমাদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা এত নিবিড় ছিল, আমার আত্মগোপনের সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি আর একটু বড় হবার পর যখন ভেবেছি, তখন এই শিক্ষা পেয়েছি মানুষের প্রতি ভালোবাসায় যেন কোনা ফাঁক না থাকে। দুর্দিনে মানুষকে চেনা যায়। ব্যক্তিজীবনে আমাদের দরকার সহজ, সরল আচার-ব্যবহার। আমাদের কাজকর্মের ধারা কাউকে যেন বিকর্ষণ না করে। আমি আমার সমস্ত জীবন মেহনতি মানুষের স্বার্থে ব্যয় করেছি, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় যেন এটা আমরা ভাবতে পারি। পূর্বসূরিদের কাজের ধারা থেকে শিক্ষা নিয়ে যেন এই শপথই নিতে পারি।

With best compliments of

M/s TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :
Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.

ESBY Industrial Estate
Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Paschim Bardhaman, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com
Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791
V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE
(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 59

হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা : ভারতীয় যুক্তিহীনতাবাদের এক শক্তিশালী তত্ত্ব

আভাস রায়চৌধুরী

৫ আগস্ট ২০২০ করোনা সংক্রমণের তীব্র আবহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করেছেন। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধান রক্ষার শপথ নেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মসজিদ ধ্বংসের পর ওই স্থানে মন্দির নির্মাণের মান্যতা দিতে যাওয়া অন্যায় ও ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। প্রধানমন্ত্রীর সফরের অনেক আগে থেকেই অযোধ্যার ওই স্থানে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও করোনা আবহের মধ্যেই ৫ আগস্ট দিনটিকে নির্ধারণ করা হলো। ৫ আগস্ট ২০১৯-এ অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক কলমের খোঁচায় জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে অবলুপ্ত করা হয়েছিল। যে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে কাশ্মীর প্রশ্নকে ব্যবহার করেছে আরএসএস বিজেপি, সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মেরুকরণকে দীর্ঘস্থায়ী করতেই রাম মন্দিরের শিলান্যাসের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ শতাব্দীপ্রাচীন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা থেকে ৫ আগস্ট ২০২০ প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা রাম মন্দিরের শিলান্যাস আধুনিক ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতির একটি প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল যাত্রার সমাপ্তি। এই পর্বের সমাপ্তি আগামীতে আরো বড় ও সংগঠিত প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তি-বিনাশী অনাধুনিক পর্বের সূচনা ঘটাল বোধ হয়।

এই পরিস্থিতিতে উৎসাহিত সংঘ পরিবার সহ সমস্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দু ভারত নির্মাণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। ১৯৯২-এর ওই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় ফাসিস্ট কার্যকলাপের এক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়াশীল পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। মাঝের ২৮ বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সূচিমুখে আরএসএস ভারত রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিটি অলিন্দে অনুপ্রবেশ করেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস সম্পর্কিত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবাসীর মনে এই আশঙ্কাকে আরো জোরদার করেছে বোধহয়। সামাজিকভাবে ও ফলিত রাজনীতিতে আরএসএস-এর হস্তক্ষেপ ক্রমবর্ধমান। এর সঙ্গে অর্থনীতির গুরুতর পরিবর্তনটি মনে রাখতে হবে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় এদেশে নয়া-উদারবাদের পথ চলা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। ২০২০-এর ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি কার্যত নয়া-উদারবাদের দখলে। বিশ্বব্যাপী নয়া-উদারবাদের এই পর্বে লুট ও জনগণের দুরবস্থা বেপরোয়া গতিতে বেড়েছে। এর মধ্যে ২০০৮ থেকে চলা সংকট ও মন্দার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন ভারতে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির তীব্র সংকট কোভিড ১৯-এর পৃথিবীতে বিপর্যয়ের কিনারায় পৌঁছে গেছে। একমাত্র চীন ছাড়া বিশ্বের প্রায় সব কটা সামনের সারিতে থাকা দেশে গড় জাতীয় উৎপাদন ব্যাপকহারে নিচের দিকে নেমে গেছে। ভারতের জিডিপি পতন সবথেকে বেশি, ২৩.৯ শতাংশ। প্রায় তিন দশক ধরে চলা এই নয়া-উদারবাদী পথে আর্থিক সংকট ও মন্দা অতিক্রম করার পথ বন্ধ হতে শুরু করেছিল। কোভিড ১৯-এর এই চলতি প্রায় এক বছরের অভিজ্ঞতায় অর্থনীতির পণ্ডিতেরা নিশ্চিত যে বর্তমান সঙ্কটের কোনো সমাধানই আর নয়া-উদারবাদে নেই। তাই পুঁজিবাদী বিশ্বেও বিকল্প প্রস্তাবগুলি আলোচিত হচ্ছে। প্রাক্-কোভিড পৃথিবীতে নয়া-উদারবাদী আর্থিক পথের ব্যর্থতা ঢাকতে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থী পথে সংকট সমাধানের রাস্তা গ্রহণ করেছিল। বিগত সাত-আট বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অতি-দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা দখল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থাকেই আরো বেশি আগ্রাসী, সংগঠিত ও শক্তিশালী করেছে। মার্কিন দেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রাজিলে বোলসেনারো এবং ভারতে মোদির ক্ষমতা দখল এই বর্ধিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থার উদাহরণ।

চলতি সংকট ও মন্দা এবং বর্তমান বিপর্যয় কাটাতে যখন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনকে পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ও বিনিয়োগ জরুরি, তখন অতি দক্ষিণপন্থী শাসনাধীন দেশগুলিতে নয়া উদারবাদী পথের গতানুগতিকতা ও চালু লুণ্ঠন থেকে সরে আসার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ সর্বত্র, বিশেষত এই দেশগুলিতে কর্পোরেটের মুনাফার পরিমাণ কিংবা পুঁজির কেন্দ্রীভবন প্রবলভাবে ক্রমবর্ধমান। আমাদের দেশে যখন জাতীয় গড় উৎপাদন ২৪ শতাংশ কমছে তখন আম্বানির মুনাফা বাড়ছে ৩৪ শতাংশ। মোদি সরকার যে আম্বানি-আদানিদের 'চৌকিদার', এ বিষয়ে ভারতবাসীর আজ কোন সন্দেহ নেই। আর ওদিকে মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি নিজেই তো কর্পোরেটের শিরোমণি। তাই আগামীতে আমাদের দেশ কিংবা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজ অর্থনীতি রাজনীতিতে রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থা আরো আগ্রাসী, সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে চলেছে। এই আগ্রাসী রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থা যে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল তা ব্যাখ্যার বোধহয় কোনো প্রয়োজন নেই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নোয়াম চমস্কি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ব্রাজিল, ভারত, ইউনাইটেড কিংডম, মিশর, ইজরায়েল এবং হাঙ্গেরি সমন্বিত একটি নতুন 'প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক'-এর মাথা বলে বর্ণনা করেছেন। পশ্চিম গোলার্ধে শীর্ষস্থানীয় প্রার্থী হলেন বোলসেনারোর ব্রাজিল। তাঁর কথায় বোলসেনারো ট্রাম্পের একটা ছোটখাটো ক্লোন। মধ্যপ্রাচ্যে এটি পারিবারিক স্বৈরশাসনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে, যা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে গণ্য হয়। আবদেল আল সিসির মিশর, সে দেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম একনায়কতন্ত্র। ইজরায়েল এতটাই দক্ষিণ পন্থার চরমে চলে গেছে যে একে দেখতে এখন টেলিস্কোপ প্রয়োজন! এটা বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে তরুণরা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়েও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।

তিনি আরো যোগ করেছেন, মোদি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, মুসলিম জনগণকে মারাত্মকভাবে দমন করছে, কাশ্মীরে ভয়াবহ ভারতীয় দমনকে প্রসারিত করেছে। ইওরোপে শীর্ষস্থানীয় প্রার্থী হলেন হাঙ্গেরির ভিক্টর অর্বন, তিনি একটি প্রোটো-ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তৈরি করেছেন। ইতালিতে মাত্তেও সালভিনির মতো লোকও এই তালিকায় আছেন, যিনি ভূমধ্যসাগরে শরণার্থীদের ডুবতে দেখে উৎফুল্ল হন।

ইউনাইটেড কিংডম প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বরিস জনসন লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে নাইজেল ফারাজ তার যোগ্যতম বিকল্প হিসেবে উঠে আসবেন। ইউ কে'র সরকারের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুমকি একটি বিবর্ণ ব্রিটেনকে, যা ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুচর, তাকে মার্কিনদের সামন্ত রাজ্যে পরিণত করবে। 'মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বিশ্ব'—নোয়াম চমস্কি। [সি.পি.আই.(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন, ২০.০৯.২০২০]

ওই একই সাক্ষাৎকারে চমস্কি বলেছেন, মার্কিন সরকারের নির্বাহী দিকটি থেকে যে-কোনো ধরনের বিরোধী কণ্ঠস্বর মুছে ফেলা হয়েছে, এটি এখন একদল স্তাবকের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র দেশ, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের শিরোমনি দেশ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শ কাঠামো মার্কিন দেশের এই স্বৈরাচারী কার্যকলাপের অনুসারী মোদির ভারত সরকার। বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রে স্বৈরাচার কিংবা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার নিয়ন্ত্রক ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী আরএসএস।

এই প্রেক্ষাপটেই এখন এদেশে উত্থাপিত হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিকে বিচার করতে হবে। এখনো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই দাবির সঙ্গে সহমত নয় বলেই মনে হয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে এই দাবি সংগঠিতভাবে তোলা হচ্ছে। ভারত কেন হিন্দুরাষ্ট্র হবে না, এই দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সমগ্র জনসমাজে এই যুক্তি-বিনাশী চিন্তা ও কাজের প্রতি সম্মতি নির্মাণে আরএসএস মরিয়া। এ দেশের তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীদের এই প্রচেষ্টা শতাব্দীপ্রাচীন। আজকে অনুকূল পরিবেশে দ্রুততার সঙ্গে আগ্রাসীভাবে এই দাবির প্রতি জনসম্মতি নির্মাণে তৎপর সংঘ পরিবার। ভারত রাষ্ট্রকাঠামোকেও তারা এই কাজে সুচারুভাবে ব্যবহার করছে। আধুনিক প্রগতি-ভাবনার অনুসারী মানুষ এই উদ্যোগকে পশ্চাৎগামী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করছেন। উল্টোদিকে মধ্যযুগের ফেলে আসা মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় বিশ্বাসীরা এর সমর্থক। শুধু সমর্থক নয় উগ্র প্রচারক। এই বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব আসলে প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক চিন্তা, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ভাবনার মধ্যে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব।

প্রথমে দেখে নেওয়া যাক ভারতে শতাব্দীপ্রাচীন হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনার তাত্ত্বিকরা কী বলছেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে সাভারকার যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ''আমি এই বলে হিন্দুদের সতর্ক করছি, এমনকি ইংল্যান্ড যদি কখনও এদেশ থেকে চলে যায়, তখনও মুসলমানরা আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র এবং একটি সাধারণ ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হবে''। সাভারকারের কাছে স্বরাজ্যের অর্থ হল, ''পৃথিবীতে ভারত নামক একটি অঞ্চলের শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতা নয়। হিন্দুদের কাছে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা তখনই উপযুক্ত বিবেচিত হবে যদি তা তাদের হিন্দুত্ব , তাদের ধর্মীয়, জাতিগত (রেসিয়াল) ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নিশ্চিত করে। আমরা এমন 'স্বরাজ্য'র জন্য সংগ্রামে নেমে পড়বো না বা প্রাণ দেব না যার বিনিময়ে আমাদের 'সত্তা' হিন্দুত্ব অর্জিত হয় না।'' ('সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদ ভিত্তি উদ্ভব বিকাশঃ আপডেট স্টাডি গ্রুপ।')

অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্রবাদীদের কাছে ধর্ম-পরিচয় ও জাতি-পরিচয় একাকার। আধুনিক অর্থনীতি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক জাতির ধারণাকে মান্যতা দেয় না। তাতে অবশ্য হিন্দুত্ববাদীদের কোন সমস্যা নেই, কারণ তাঁরা আটকে আছেন প্রাক্-আধুনিক সময়ে। যে কোন ধর্মীয় মৌলবাদই এই একই অবস্থানে অনড় অচল থাকে। চিন্তার বিকৃতি রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্ম দেয়। ইতিহাসে যা বারে বারে প্রমাণিত। সাভারকার যখন এইসব

ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তাঁর অনুগামীরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলায় এবং আরো কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি সংঘ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'কে দুর্বল করেছিলেন।

সংঘ পরিবারের প্রিয় শব্দ রাষ্ট্রবাদে অহিন্দুদের কোন স্থান নেই। এমন কি 'হিন্দু' বলে পরিচিত নিম্নবর্ণের সকলেই কি হিন্দু রাষ্ট্রে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন? একটু পরে আমরা এ প্রশ্নের আলোচনায় আসবো। আরএসএস ভারতীয় সংবিধানকে মান্যতা দেয় না। কারণ তাদের মতে এই সংবিধান 'মনুস্মৃতি' অনুসারে রচিত হয়নি। তাদের মতে ভারতের প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যকে পরিহার করে পশ্চিমি গণতন্ত্রের ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে ভারতের সংবিধানে। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের সমাজ ইতিহাসে নিজস্বতার মধ্যে প্রতিটি প্রগতি ভাবনা সংরক্ষণ করে এগিয়ে যেতে হবে এবং পশ্চাৎমুখী ভাবনাগুলোকে বর্জন করতে হবে। ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ কোন কাজের কথা নয়, প্রগতি ভাবনাও নয়, এমনকি আধুনিকতা তো নয়ই। কিন্তু এটাই ঐতিহাসিক সত্য যে ইউরোপের রেনেসাঁ গোটা পৃথিবীকে আধুনিকতার আলোতে উদ্ভাসিত করেছে। আধুনিকতার প্রাণ ভোমরা যুক্তিবাদকে নিজের সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করতে হয়। আধুনিক ইউরোপ থেকে কতটা নেব কতটা বর্জন করব, আন্তর্জাতিকতায় কেমন ভাবে ভারতবর্ষীয় হয়ে উঠব তা আমাদের সমাজে সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী সংগ্রাম ও অনুভূতি থেকে উঠে আসে। এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ দেখাতে পারেন। আসলে হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা চিন্তা ও কাজে সেদিন ছিলেন প্রাক্-আধুনিক, আজও তাই আছে।

আজ মোদি সরকারের সময়ে সংবিধানের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৬১তে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে গোলওয়ালকরের পাঠানো প্রস্তাবে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের সরকার শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদেরই জন্ম দেয় না, তা এই অনুভূতিকে পুষ্ট করে এমনভাবে যে তা এক নেশনকে স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করে। একে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করতে হবে, সংবিধানকে বিশুদ্ধ করতে হবে এবং এককেন্দ্রীয় ধরনের সরকার স্থাপন করতে হবে।

প্রাক্-স্বাধীনতা কিংবা আজকের হিন্দুত্ববাদীদের সেকুলারিজমের প্রতি বিদ্বেষের ব্যাখ্যা এখানে অপ্রয়োজনীয়। কারণ ধর্ম-পরিচয়কে জাতি-পরিচয় হিসেবে তুলে ধরতে চাওয়া শক্তির কাছে এটা স্বাভাবিক। ধর্মভিত্তিক জাতির ধারণা, ধর্মরাষ্ট্র গঠন করতে চাওয়া কিংবা ধর্মের নামে রাজনীতি করতে চাওয়া—সব ধরনের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি এটাই চায়। মানব ইতিহাসে দেখা যায় এর পরিণতি সবসময়ই ধ্বংসাত্মক। প্রতিবেশী পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। এই ধরনের ভাবনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে খাপ খায়। বুর্জোয়াদের স্বাভাবিক বিকাশও আধুনিকতার সঙ্গে মেলেনা। তবে নয়া-উদারবাদী পর্বে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি-সত্তার রাজনীতির দাপাদাপির সময়ে ধর্মপরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতি ভারতের শাসকশ্রেণির শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

রাজনীতি ও রাষ্ট্র ভাবনার কেন্দ্রীয় বিষয় 'ক্ষমতা'। এই ক্ষমতা অবশ্যই শ্রেণি-ক্ষমতা। বর্তমান শাসক শ্রেণির ক্ষমতা ধরে রাখা এবং বর্তমানের শাসিত ও শোষিত শ্রেণির ভবিষ্যতে ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রাম। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সংকট শাসকশ্রেণির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটায়। প্রতিটি দেশের সমাজ অর্থনীতি রাজনীতির ইতিহাসে নির্দিষ্ট পর্বে। শাসকশ্রেণির বৈশিষ্ট্য অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেয়, ভারতেও তাই। ব্রিটিশ ভারতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বহুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। এটাই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান ও যুক্তিসঙ্গত ধারা। পাশাপাশি ঔপনিবেশিকতার পত্রপুটে বিকাশের অসম্পূর্ণতা ও শ্রেণি সীমাবদ্ধতার কানাগলিতে প্রায় একই সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়েছিল। দু বছরের ব্যবধানে সাভারকার এবং জিন্নার হাত ধরে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে এই যুক্তিবিনাশী চিন্তা কাঠামোগত রূপ নিয়েছিল। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ আরএসএস মুখপত্র অর্গানাইজার 'হুইদার' নামক সম্পাদকীয় কলমে লেখে, ''আমাদের আর জাতীয়তার ভ্রান্ত ধারণায় প্রভাবিত হওয়া চলবে না। হিন্দুস্তানে শুধু হিন্দুরাই নেশন গঠন করেছে এবং জাতীয় কাঠামোকে এই নিরাপদ ও সবল ভিত্তির উপর গঠন করতে হবে। এই সরল সত্যটাকে স্বীকার করে নিলেই অনেক মানসিক বিভ্রান্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক সমস্যা দূরীভূত হবে।" নেশনকে শুধুমাত্র হিন্দুদের দ্বারা, হিন্দু ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মতাদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার উপর গঠিত হতে হবে"। এর ঠিক ৫ মাসের মাথায় নাথুরাম গডসের হাতে শহিদ হলেন গান্ধীজী।

ভারতের যে হিন্দুত্ববাদী নেতারা আরএসএস গঠন করেছিলেন তাঁরা দার্শনিক উপাদান ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন যথাক্রমে জার্মান যুক্তিবিনাশী দার্শনিক নিৎসে ও হিটলারের কাছ থেকে। অর্থাৎ জার্মান যুক্তিবিনাশী দর্শন ও মতাদর্শ তারা ভারতীয় সমাজে হিন্দুত্বের ভাবনা কাঠামোতেই প্রতিফলিত করেছেন। হিটলারের মতো যাদের লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। ইহুদি-বিদ্বেষের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে হিটলারের 'জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব' তত্ত্বের মতই আরএসএসের রাজনৈতিক হিন্দুত্বের নির্মাণ। এদেশে হিন্দু জনসংখ্যার পরেই সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিমদের সংখ্যা। তাই মুসলিম-বিদ্বেষ ও বিরোধিতাকে আরএসএস তাদের রাজনৈতিক হিন্দুত্ব নির্মাণে অপরিহার্য হিসেবে হাজির করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, রাজনৈতিক হিন্দুত্বের লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র গঠন এবং হাতিয়ার হল মুসলিম-বিরোধী ঘৃণা ও মেরুকরণের রাজনীতি। এবং অবশ্যই ধর্মপ্রাণ হিন্দুদেরকে 'ধর্মবিশ্বাসী' অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে জঙ্গি রূপ দেওয়া। সাভারকার যাকে বলেছেন, 'রাজনীতির হিন্দুকরণ এবং হিন্দুধর্মের সামরিকীকরণ' (খাকি প্যান্ট, গেরুয়া ঝাণ্ডা)। শতাব্দীপ্রাচীন হিন্দু জাতীয়তাবাদ এখন মনে করছে হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের এটাই উপযুক্ত সময়। আরএসএস-প্রধান মোহন ভগবত বলেছেন, ''হিন্দুস্থান হল একটি হিন্দুরাষ্ট্র, যা একটি সত্য। আমরা এই 'ধারণা' নিয়ে এগিয়ে চলেছি। এই নেশনকে মহান করে তুলতে সমস্ত হিন্দুদের সংগঠিত করতে হবে। আমরা কী করতে চাই তা আমাদের জানা আছে। এটাই সংঘের কাছে উপযুক্ত সময়।"

ভারতে নয়া-উদারবাদের সুবিধাভোগী শাসক শ্রেণি আজ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চলছে। কর্পোরেট ও হিন্দুত্ব পরস্পরকে পুষ্ট করছে। এই সময়ের তথাকথিত উত্তর-আধুনিক জীবনবোধে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা মানুষদের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে একই সঙ্গে প্রাক্ আধুনিক ভাবধারার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া ও এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলগুলি এই আকর্ষণ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই পরিবেশে কর্পোরেটের মুনাফা ও হিন্দুত্বের প্রসার হাত ধরাধরি করেই এগিয়ে চলেছে।

শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব এবং সংগ্রামী ঐক্য ভেঙে ফেলা কর্পোরেট ও কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় থাকা আরএসএস-বিজেপি উভয়ের প্রয়োজন। তাই অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার

প্রয়োজন থেকেই গড়ে উঠেছে কর্পোরেট হিন্দুত্ব এবং তা জনসমাজে প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল। ভুলে গেলে চলবে না, এই হিন্দুত্ববাদীরা উদারবাদের প্রথমদিকে 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ' গড়ে তুলেছিলেন। মঞ্চের নেতারা এখন কোথায়? আরএসএস-বিজেপিতে তাদের হয়তো প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসা আরএসএস-বিজেপির মূল কর্মসূচি ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের নামে শপথ নিয়েই সংবিধান পরিবর্তন করে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাতিল করতে চাওয়া হল প্রস্তাবিত হিন্দুরাষ্ট্রের সোপান নির্মাণ। এই হিন্দুরাষ্ট্রে কর্পোরেটের সমস্ত স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

২০১৭-তে কর্নাটকের কোপ্পাল জেলায় ব্রাহ্মণ যুব পরিষদের সভায় বিজেপি নেতা ও মোদি সরকারের মন্ত্রী অনন্ত কুমার হেগড়ে বলেছিলেন, ''এখন ধর্মনিরপেক্ষদের এক নতুন সংস্কৃতি আমদানি হয়েছে। কেউ যদি বলে আমি মুসলমান অথবা খ্রিস্টান কিংবা আমি হিন্দু, তাহলে আমার ভালই লাগে কেননা তাদের একটা উৎস আছে। কিন্তু যে সমস্ত লোকেরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে আমি জানিনা আমি তাদের কী বলে ডাকবো। তারা হলো ঠিক সে রকম লোক যাদের বাবা-মায়ের ঠিক নেই অথবা তারা জানে না যে তাদের রক্তরেখা কী। তারা নিজেরাই নিজেদের জানেনা। তারা বাবা-মাকে জানেনা, কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে। কিছু লোক বলে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি উল্লিখিত আছে, তাই তোমাকে একমত হতে হবে। যেহেতু এটা সংবিধানে আছে, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অদূরেই তা পাল্টে যাবে। সংবিধান আগেও নানা সময় পাল্টেছে। আমরা এখানে আছি এবং এখানে এসেছি সংবিধান পাল্টে দেবো বলেই। আমরা এটা পাল্টে দেবো।'' সোশ্যাল মিডিয়া, ফলিত রাজনীতি বা অন্যত্র সেকুলার মতামত কিংবা হিন্দুত্ববাদের সমালোচনাগুলিকে যে কুৎসিত ভাষায় ভক্তকুল আক্রমণ করেন তা নিছক আবেগে নয়। পরিকল্পিত প্রচার-কৌশল।

সমাজের ভিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আধুনিক সমাজে মানুষের উপরিকাঠামোর অন্যান্য পরিচয়গুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বুনিয়াদি পরিচয়টি হলো শ্রেণি পরিচয়। বুর্জোয়ারা যখন আধুনিক যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল তখন মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবর্তে যে আধুনিকতার বার্তা বহন করেছিল তা তাদের শ্রেণি-পরিচয়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেই। বুর্জোয়া প্রগতি-ভাবনা রাষ্ট্রকাঠামোকে ধর্মীয় নৈতিকতা ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেছিল শ্রেণি-পরিচয়ের চওড়া রাস্তাতে। রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করে জন্ম নিয়েছিল সেকুলারিজমের ধারণা। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুক্তিসম্মত পথ আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল। ইওরোপে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম ও মতাদর্শ যতই সংগঠিত হয়েছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে, বুর্জোয়ারা ততই বুর্জোয়া প্রগতি-ভাবনার বদলে রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রাক্-আধুনিক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা সংরক্ষিত করেছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে উদীয়মান বুর্জোয়ারা বহুক্ষেত্রে এই ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। তাই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনায় সেকুলারিজমের মূল কথা রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের পুরোপুরি বিযুক্তি ঘটল না। তবুও স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণকারী ভারতের বহুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্র গড়ে উঠলো। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করে আধুনিকতার বিচারে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছি। আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ভাবনা প্রবল আক্রমণের সামনে।

হিন্দুত্ববাদীদের যুক্তি-বিনাশী নেশায় বুঁদ ভক্তকুল বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ হলে কেন ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবেনা। অর্থনৈতিক সংকটে ভুক্তভোগী, ভবিষ্যতের কোনো আশার আলো দেখতে না-পাওয়া ইতিহাস-বিযুক্ত, হতাশা, অনিশ্চয়তা ও গতানুগতিকতার জীবনে আটকে থাকা উদ্‌ভ্রান্ত যুব জনঅংশের কাছে এই যুক্তি-বিনাশী 'যুক্তি' সাময়িক উত্তেজনা ও আরাম সরবরাহ করে। জর্জি লুকাস তাঁর 'ডেস্ট্রাকশন অফ রিজন' রচনায় এই ধরনের আশঙ্কার উল্লেখ করেছিলেন। প্রকৃত যুক্তি জনসমাজে এই প্রশ্ন হাজির করে, জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিসেবে যে হিন্দুদের দেখানো হয় তা তো ব্রিটিশদের নির্মিত 'মনোলিথিক হিন্দু কনসেপ্ট'। সংঘ পরিবার উপনিবেশিক সময়ে নির্মিত এই হিন্দু ধারণাকেই বহন করে চলেছে। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে অসংখ্য সম্প্রদায়গত বিভাজন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারা কি তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিসর পাবে? আজকের হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ব আসলে 'হিন্দু' পরিচয়ের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সংগঠিত উদ্যোগ। সংঘের নেতারা ভারতের বর্তমান সংবিধানের পরিবর্তে প্রথম থেকেই মনুস্মৃতিকে প্রয়োগ করতে আগ্রহী ও দায়বদ্ধ। সংঘ পরিবারের চিন্তাবিদ ও নেতারা মনুস্মৃতিতে নির্দেশিত বর্ণ-ব্যবস্থার প্রচারক। দার্শনিক নিৎসে মনুবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বস্তুত মনুবাদ, হিন্দুত্ববাদ, নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে।

২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী ৮০ শতাংশ হিন্দুদের মধ্যে ৪২.৮ শতাংশ শূদ্র, অতিশূদ্র বা দলিত ২২.২ শতাংশ এবং এর বাইরে ৯ শতাংশ আদিবাসী। মনুস্মৃতির বিধান অনুযায়ী জগতের সমৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মা যথাক্রমে নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় থেকে সৃষ্টি করেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রদের (সূত্র ১/৩১)। ১/৯১ সূত্রে এই শুদ্রদের জন্য একটি মাত্র পেশাই নির্দিষ্ট করেছেন ঈশ্বর, অন্য তিন বর্ণের সেবা করা। অন্যথায় কঠিন, অমানবিক শাস্তির বিধান দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। আজকের রাজনৈতিক হিন্দুত্বের পথপ্রদর্শক মনুস্মৃতি। দলিত এবং আদিবাসীরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিধানে অস্পৃশ্য, তথাকথিত 'অসবর্ণ' অর্থাৎ যারা বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে বা 'অন্ত্যজ'। মনুস্মৃতি নারীকে মানুষের সমমর্যাদার বাইরে রেখে গৃহকর্ম ও সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে শূদ্র, দলিত বিপুল জনগণের স্থান কোথায় হবে? মনুবাদ অনুসারে তাদের স্থান পায়ের তলায়। তাই তথাকথিত হিন্দুরাষ্ট্রে গণতন্ত্র, ব্যক্তির অধিকার অলীক বস্তুতে পরিণত হবে। আসলে ধর্মকে ব্যবহার করে দুনিয়ার সব কটা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মতাদর্শের এটাই হলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার কোন ধর্মরাষ্ট্রেই গণতন্ত্রের পরিসর অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। স্বৈরাচারই জনগণের একমাত্র ভবিতব্য। গণতন্ত্রের পরিসর মানে মানুষের দ্বিমত প্রকাশ করা কিংবা প্রশ্ন করার অধিকার ভোগ করা। এগুলো সবই আধুনিক প্রত্যয়। আর ধর্ম বা ধর্মের নামে রাজনীতি ও রাষ্ট্র চালানোর মূল ভিত্তি হলো অন্ধবিশ্বাস ও প্রশ্নহীন আনুগত্য।

হিন্দুরাষ্ট্রে সব হিন্দু যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে? সব হিন্দুর সন্তান দুধে-ভাতে থাকবে? কখনোই না। নয়া উদারবাদী ভারতে কোভিড ১৯-এর দিনগুলিতে যে কোটি কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে, সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, বলার অপেক্ষা রাখে না জনসংখ্যার স্বাভাবিক হিসেবে তার সিংহভাগ হিন্দু মানুষ। আসলে কাজ পাওয়া না-পাওয়া ব্যক্তি-মানুষের ধর্ম-পরিচয়ের উপর নির্ভর করে না। এই প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত মানুষকে তার শ্রেণি-পরিচয়ের চওড়া রাস্তাতেই নিয়ে যায়। এই পরিচয়কে পিছনে ফেলে দিতেই আজকের হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের বেপরোয়া উদ্যোগ চলছে। তার প্রতিক্রিয়ায় ঘনীভূত হচ্ছে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই পরিবেশকে রাজনৈতিক

হিন্দুত্বকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে ব্যবহার করছে সংঘ পরিবার। আমরা ফলিত রাজনীতিতে যাকে মেরুকরণ বলেছি। আজ এদেশে, এরাজ্যে এই মেরুকরণের বৈশিষ্ট্য হলো বহুমাত্রিক।

একবিংশ শতকে ধর্মরাষ্ট্র কোন সমাধানের পথ নয়। প্রাচীন হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল ক'বছর আগে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুদান মুসলিম রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ ভারত সহ বেশকিছু দেশে রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আজকের দিনে এই ভাবনার অর্থ হলো সমাজ-ইতিহাসকে পশ্চাৎমুখী করা। এটা সভ্যতার পরিপন্থী। মানবপ্রজাতির বিকাশের পরিপন্থী। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও বাস্তব জীবনে শাসকের পৃথকীকরণ ঘটিয়ে যে 'সেকুলারিজম' গড়ে উঠেছিল, তা মানব সমাজের ইতিহাসকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে গণতন্ত্রের পরিসর নির্মাণ করেছিল, প্রসারিত করেছিল, ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীনতা ও অধিকার প্রত্যয়ের নির্মাণ ব্যক্তি-মানুষকে সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। ধর্মবিশ্বাসী মানুষের স্বাধীনতা অধিকার যেমন পূর্ণ মর্যাদার আসন পেয়েছে, তেমনই নাস্তিকতাও মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

বাস্তব জগতে মানুষ যে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে তার বিপরীত ছবি সে দেখতে চায়। ধর্ম তাকে সেই ছবি দেখায়, মনের আরাম পৌঁছে দেয়। সমাজে শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন, কষ্টভোগ যখন উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে, তখন থেকে মানুষের হয়তো কল্পনার জগতে আরাম কিংবা সুখ খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। তখন হয়তো আজকের মত ধর্মবোধ ও আচরণের প্রয়োজন পড়বে না। হয়তো ধর্মরাষ্ট্রের ভাবনা তখন সত্যি করেই মিউজিয়ামে স্থান খুঁজে নেবে। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের বিজয়ের সঙ্গে এই 'হয়তো'গুলো সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীদের আঘাত না করেই বাস্তব জগতের জীবন-সংগ্রামে শ্রেণি-পরিচয়কে খুঁজে নেওয়া দরকার।

বুর্জোয়া প্রগতি ভাবনার আঁতুড়ঘরে যে সেকুলারিজমের জন্ম, আজ দেশে দেশে বুর্জোয়ারা যখন প্রাক্-বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে সংরক্ষণ করতে ব্যস্ত, তখন রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ, ব্যক্তি ও ধর্মের সম্পর্ক নিরুপণে সেকুলারিজমকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত করতে হবে। আজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থার জোট তৈরি হয়েছে তাতে ভারতে এই রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থার হাতিয়ার হল হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন। পৃথিবীতে ভুক্তভোগী ও সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষ এবং পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থা। ভারতেও শ্রমজীবী ভারতবাসী ও কর্পোরেটের লুটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের ডাক। ভারতের শ্রেণি-শোষণ ও সামাজিক নিপীড়ন হাত ধরাধরি করে চলে। এটা ভারতীয় সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এটা ভারতীয় শাসকশ্রেণির হাতিয়ার। আজকের কর্পোরেট হিন্দুত্ব এবং প্রস্তাবিত হিন্দুরাষ্ট্রের প্রকল্প শাসকশ্রেণির শোষণ ও শাসনের আরো সংগঠিত ও আগ্রাসী রূপ।

শ্রমজীবী মানুষের 'শ্রেণি' হিসেবে গড়ে ওঠার পথে অন্যতম বাধা বুর্জোয়া হেজিমনির শিকার হয়ে থাকা। ভারতের সমাজে শূদ্র, দলিত ও আদিবাসীরাই শ্রমজীবীদের সর্ববৃহৎ জন-অংশ। শ্রেণি পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই শ্রমজীবীদের একাংশ যেমন বুর্জোয়া হেজিমনির শিকার, তেমনি সামাজিক মতাদর্শের বিচারে ভারতের শাসকশ্রেণির কাছ থেকে এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের ভাগ গ্রহণ করে ও বহন করে চলেছে। হিন্দু রাষ্ট্রের ভাবনা এই মতাদর্শগত ভিত্তিতে নিজের শক্তি সঞ্চয় ও শক্তিকে প্রসারিত করতে সচেষ্ট। তাই সামাজিক নিপীড়নের শিকার এই অংশের মানুষদের পরিচিতিসত্তার গণতান্ত্রিক দাবি ও সমস্যাগুলিকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এই স্তরে আটকে থাকলে চলবে না। সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে এই অংশের মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও সংগ্রাম কোন ধরনের সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আটকে না পড়ে। তা যদি হয় তবে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রকল্প সফল ও শক্তিশালী হবে। এই আশঙ্কার বাস্তব ভিত্তি প্রতিদিন স্পষ্ট হচ্ছে। তাই এই বিপুল অংশের শ্রমজীবী মানুষদের শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শের নিবিড় বন্ধনে যুক্ত করতে হবে।

আজ নয়া-উদারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রকে রক্ষার সংগ্রাম পরস্পরের পরিপূরক। সচেতন শ্রমিকশ্রেণিকেই অন্যান্য আক্রান্ত শ্রেণিগুলি ও সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতীয় জনগণের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তার জন্য নিজেদের মধ্যে, নিজের শ্রেণির মানুষের মধ্যে, বৃহত্তর জনসমাজে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শের প্রচার গড়ে তুলতে হবে। ক্রমশ শ্রেণি-আন্দোলন ও গণ-আন্দোলন শক্তিশালী হবার যে পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তাকে আরো গতিশীল ও প্রসারিত করতে হবে। ভারতীয় সমাজ রাজনীতি সংস্কৃতি আশঙ্কাজনক ভাবে ক্রমশ ফ্যাসিবাদী ধরনের আক্রমণের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। অথচ জনগণের বিপুল অংশের মধ্যে সেই সচেতনতা এখনো গড়ে তোলা যায়নি। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো শ্রমিকশ্রেণির উপযুক্ত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা জরুরি।

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কালেশ্বর সমবায় সমিতি লি.

আমাদের ব্যবসা

কৃষকদের ঋণদান, মিনি থেকে কৃষিজমিতে জলসেচ, বন্ধকী স্বল্প সুদে,
ব্যাঙ্কিং, ট্রাক্টরের মাধ্যমে জমি চষা ও থ্রেসারের মাধ্যমে কুটি ওড়ানো।

Sl. No. 79

With best compliments of

JAISHREE TIMERS

M I L L
Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rabari-713358
Phone : 0341-2444002
E-mail : jaishreetimbers@rediffmail.com

R E S I
18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 60

চাই চিন্তার ঐক্য, কাজের ঐক্য, শৃঙ্খলার ঐক্য

অচিন্ত্য মল্লিক

‘কমিউনিস্টরা এক ভিন্ন ধাতুতে গড়া’—বলেছিলেন কমরেড যোসেফ স্তালিন। দৈনন্দিন জীবনচর্যা, নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে সমাজের সাধারণ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া মানুষদের থেকে কমিউনিস্টরা পৃথক। এক উন্নত মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা কমিউনিস্টদের পরিচালিত হতে হয়।

পুঁজিবাদী সমাজ মানুষকে একা একা বাঁচতে শেখায়। সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত সম্পর্কই এ সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখেই পরিচালিত হয়। আমরা বাস করছি এমনই সমাজের পরিমণ্ডলের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাও এই সমাজেরই অংশ। স্বাভাবিকভাবেই, কমিউনিস্টদের যে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে—তা অর্জন করা এক কঠিন কঠোর সংগ্রাম।

কমিউনিস্টদের সংগ্রাম করতে হয় তিনটি ক্ষেত্রে। সমাজের শ্রেণি-শত্রুদের বিরুদ্ধে, পার্টির অভ্যন্তরে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, আর তৃতীয়টি হলো নিজের সঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ার মধ্যে দিয়েই আপনা আপনি কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তে নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই জারি রাখতে হয়—একজন কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য। এই সমাজের যতকিছু ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সংগ্রাম একজন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যের কাছে তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবনচর্যা এবং জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাকে যত্নবান হতে হয়। জীবনধারার প্রতিটা পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক মানবিক মূল্যবোধের বন্ধনে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যেই পরিচালিত হতে হয়। পার্টির অভ্যন্তরেও এই লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, মানবিক মূল্যবোধের অভাব হলে তা কখনো ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে পারে না।

আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হলো অর্থনীতিতে নয়া উদারীকরণের যুগ। নয়া উদারীকরণের অর্থনীতির অনিবার্যতায় মানুষকে বেশি বেশি করে আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, এই প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্য কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম যেমন জরুরি, তেমনই একজন ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে একজন ভালো কমিউনিস্ট হতে গেলে, তার আগে একজন ভালো মানুষ হতে হবে। একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠার কাজের ধারায় যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়েই জনগণকে আকৃষ্ট করার বাস্তবতা তৈরি হয়।

স্বাভাবিকভাবেই, যারা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, তাদের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়েই মানুষের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। মানুষের কাছে যেতে হবে, তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মানুষকে শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়, তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তারা জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পারবো। জনগণের প্রতি লোকদেখানো ভালোবাসা নয়, মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত মানবপ্রেমের আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষের সাথে কমিউনিস্টদের সম্পর্ককে আরো নিবিড়, আরো জীবন্ত করে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হতে হবে।

কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা পার্টির অভ্যন্তরে এবং কখনো কখনো জনগণের সঙ্গে যে ভাষায় এবং যেভাবে বলা উচিত, তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে কমিউনিস্ট মূল্যবোধের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে। সকলকে সচেতনভাবেই জনগণের সামনে এবং পার্টি-অনুগামীদের মধ্যে উদাহরণ হওয়ার লক্ষ্যে আন্তরিক প্রয়াস জারি রাখতে হবে। নিজেকে জাহির করা নয়, জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেই তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু হতে হবে। জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে সামিল করার কাজে নীতিনিষ্ঠ হতে হবে। নীতিনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হল বলা ও কাজের মধ্যে মানুষ যেন মিল খুঁজে পায়। কমিউনিস্ট মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে তারা আজকের পরিস্থিতিতে সময়োপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভারতবর্ষের মাটিতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব সমাধা করতে চায়। তাই, পার্টিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন ও নীতিসমূহের ভিত্তিতেই কার্যকলাপ পরিচালিত করতে হয়। কারণ একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদই শোষণের অবসান করতে এবং শ্রমজীবী মানুষের পূর্ণমুক্তি ঘটাতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, শোষণব্যবস্থার অবসানের সংগ্রাম জটিল, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। তাই, বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রক্ষমতার অপসারণ ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি বিরাট মার্কসবাদী পার্টি ছাড়া সাফল্য অর্জন করা যায় না। একটি সুসংহত, সুশৃঙ্খল, কেন্দ্রীভূত মার্কসবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ এবং বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কমিউনিস্ট পার্টি গঠনই বিপ্লব সমাধার একমাত্র হাতিয়ার। সর্বস্তরের পার্টি কর্মীগণ সেই পার্টি গড়ে তোলায় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং দায়বদ্ধ।

পার্টি-সদস্যদের জনগণের ও পার্টির স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে এবং নিষ্ঠা সহকারে জনসাধারণের সেবা করতে হবে। পার্টিতে পরস্পরের প্রতি কমরেডসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের মাধমে ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সময়ে দীর্ঘমেয়াদি সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের আগ্রাসী ভূমিকা লক্ষণীয়। এরই ফলশ্রুতিতেই আমাদের দেশে, রাজ্যে যে বহুমুখী আক্রমণ চলছে, তাকে মোকাবিলা করে সামনে এগোনোর যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে চাই একটি সুশৃঙ্খল পার্টি। মনে রাখতে হবে, ‘চিন্তার ঐক্য’, ‘কাজের ঐক্য’, ‘শৃঙ্খলার ঐক্য’ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই একটা কমিউনিস্ট পার্টি তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম—এই লক্ষ্যে সকল কমিউনিস্টকে যত্নশীল প্রয়াসী হতে হবে।

With best compliments of

M/s PRAKASH CONSTRUCTION

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR
& GENERAL ORDER SUPPLIER

Qr. No. L/32, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211
Phone : 2558523, Mobile : 9332017271, 9932653994

Sl. No. 61

With Best Compliments from

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, PASCHIM BARDHAMAN

Sl. No. 62

কাশ্মীরের অধিকার হরণ, সংবিধানের উপরই আক্রমণ

সেখ সাইদুল হক

বর্তমান ঘটনাবলী

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অপেক্ষা মোদি-সরকার দমন-পীড়নের পথকেই বেছে নিয়েছে। সংঘ পরিবারের নির্দেশিত পথকে মান্যতা দিয়ে ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট একটি গোটা রাজ্যের অধিবাসীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হলো। জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে ৩৭০ নং ধারা এবং ৩৫-এ ধারাকে বাতিল ঘোষণা করে এবং রাজ্যটিকে তিন টুকরো করে দেশের সঙ্গে সংহতিস্থাপনের অজুহাতে গোটা রাজ্যকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে নিয়ে আসা হল। কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষকে নিজভূমে, নিজগৃহে কাঁটাতারের বেষ্টনীতে এবং বন্দুকের নলের সাহায্যে শৃঙ্খলিত করা হল, যোগাযোগের যাবতীয় ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হল। ১৯৪৭ সালের ২৪ হতে ২৬ অক্টোবর পাকিস্তানি মদতপুষ্ট হানাদারদের আক্রমণের মুখে উদ্বেগ, আতঙ্ক এবং স্বাতন্ত্র্য হারানোর চিন্তা আবার কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে ফিরে এসেছে অন্যমাত্রায়। তখন মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানে যোগ দেয়নি। তারা বেছে নিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে। তাই তারা পাক হানাদারদের মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। আর ২০১৯ সালের ১ অক্টোবর হতে ৫ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি তাদের মধ্যে একই উদ্বেগ, আতঙ্ক ও স্বাতন্ত্র্য হারানোর চিন্তার উদ্রেক ঘটিয়েছিল। তাহলে কি ৩৭০ নং ধারা ও ৩৫-এ ধারা কেড়ে নিয়ে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা হরণ করা হবে? ঘটল তাই। সংবিধানের ৩ নং ধারাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মর্যাদা কেড়ে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে ভাগ করা হল।

কেন ৩৭০ ও ৩৫-এ অনুচ্ছেদ বাতিল

সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫-এ বাতিল করার সপক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে যা বললেন তা শুধু সত্যের বিকৃতিই নয়, তা শঠতা, প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজিতে পরিপূর্ণ। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির এবং বিশেষ মর্যাদা লাভের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে আড়াল করে বলা হল এক দেশ এক বিধান (সংবিধান) থাকা উচিত। ওই দুটি ধারার জন্য কাশ্মীরের উন্নয়ন হচ্ছে না, বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। তাই সংবিধানের ঐ দুটি অনুচ্ছেদ তুলে দিলে কাশ্মীরে ঘটবে উন্নয়ন এবং বিকাশ। এগুলি সবই কেন মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তা ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা সম্পর্কে কিছুটা প্রশ্নোত্তরের ধরণে আমি বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। তার আগে জেনে নেব কেন জম্মু-কাশ্মীরের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশেষ ব্যবস্থা এই কারণে যে যেখানে পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু বিহার, বাংলা প্রভৃতি রাজ্যগুলির সংযোগেই ভারতীয় যুক্তরাজ্য ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট তৈরি হয়েছিল, সেখানে জম্মু-কাশ্মীর পরে ভারতে যোগ দিয়েছিল।

স্বাধীনতার সময় জম্মু-কাশ্মীর ছিল আলাদা দেশীয় রাজ্য। রাজা

ছিলেন ডোগরা বংশীয় হরি সিং। তিনি চাইলেন জম্মু-কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হবে। পাকিস্তান সায় দিয়ে সেই সুযোগে পাকসেনাবাহিনীর সাহায্যে উপজাতি হানাদারদের কাশ্মীরে ঢুকিয়ে দিল কাশ্মীরকে কব্জা করতে। কাশ্মীর জনগণের অবিসংবাদী নেতা সেখ আবদুল্লাহ জেলে। হরি সিং তাঁকে জেল হতে মুক্তি দিলেন তাঁর সাহায্যলাভের জন্য। অপরদিকে ভারত সরকারের সাহায্য চাইলেন ভারতের সাথে চুক্তির শর্তে। আবদুল্লা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈরি করে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে পাক হানাদারদের বিতাড়িত করলেন। এরপর ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর রাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন' সই করে কাশ্মীরকে ভারত-ভুক্ত করলেন।

এই ভারতভুক্তি শর্তাধীন ছিল। ভারত সরকারের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি এবং যোগাযোগ। বাকি বিষয় থাকবে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের হাতে। আপতকালীন অবস্থা কেটে গেলে 'গণভোট' নেওয়া হবে। তার মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরের জনগণই ঠিক করবেন তারা কোন দেশে থাকবেন। ভারত তা মেনে নিল। গণভোট হয়নি। সে দাবি আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরি জনগণ তোলেনি কেননা তাদের দাবি মেনে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও মর্যাদা এবং অধিকার রাখা হলো। সেই সূত্রে ৩৭০ নং ধারা।

৩৭০ নং ধারায় কী আছে?

জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় কাশ্মীরের জন্য ৩০৬ নং ধারায় বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা রাখা হলো। পরে গণপরিষদে পাশ করিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৭ মে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ নং ধারা সংবিধানে যুক্ত হল। বলা হলো প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, যোগাযোগ এবং মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এর বাইরে রাজ্য সরকার আইন তৈরি করবে। এক্তিয়ারের বাইরে কেন্দ্র-তালিকা বা যুগ্ম তালিকার কোনো আইন এখানে লাগু করতে চাইলে কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগবে। রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন। ভারতীয় সংবিধানের পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব একটি সংবিধান থাকবে। রাজ্য সরকারের কর্ম সেই সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। ১৯৫৭ সালে রাজ্য সংবিধান গৃহীত হয়। ভারতের পতাকা ছাড়া এরাজ্যের নিজস্ব একটি পতাকা থাকবে। সুপ্রিমকোর্টের বিষয়ে দেশের সংবিধানের ১৩১ ধারা কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে। রাজ্য আইনসভার সুপারিশে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান নিয়োগ করবেন। রাজ্যপালকে 'সদরে রিয়াসৎ' এবং মুখ্যমন্ত্রীকে 'ওয়াজিরে আজম' (প্রধানমন্ত্রী) বলা হবে। দেশের সংবিধানের ৩৫২ ধারাবলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে চাইলে এই রাজ্য সরকারের সম্মতি অথবা 'অনুরোধে' করতে পারবেন। ১৯৫২ সালে রাজ্য সরকারের সাথে ভারত সরকারের চুক্তি হয় (নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তি) এবং ১৯৭৫ সালে পুনরায় চুক্তি হয় (ইন্দিরা-আবদুল্লা চুক্তি)। উভয় চুক্তিতেই ৩৭০ নং ধারা এবং সেই ধারার সূত্রে তৈরি ৩৫-এ ধারাকে মান্যতা দেওয়া হয়। তবে সদরে রিয়াসৎ ও ওয়াজিরে আজম পদবি বাদ দেওয়া হয়।

৩৭০ নং ধারা কি সাময়িক বা তাকে 'রদ' করা যাবে?

নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে করা যাবে। কাশ্মীরের 'ভারত-ভুক্তি'র ৫ এবং ৭ নং উপধারায় বলা ছিল ভারত-ভুক্তির শর্তাবলীকে ভবিষ্যতে ভারত সরকার কর্তৃক সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বা সংবিধানের মাধ্যমে বদলানো যাবে না। পরে অন্তর্ভুক্ত ৩৭০ নং ধারায় বলা হল এটি স্থায়ী নয়। এটাকে রদ করা যাবে। তবে তা করতে হলে রাজ্যের গণপরিষদ (পরে বিধানসভা)-র সুপারিশ প্রয়োজন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এটাকে তখন সাময়িক বলা হয়েছিল 'গণভোট'-এর পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে। ১৯৬৯ সালে সম্পৎ প্রকাশ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট ৩৭০ নং ধারাকে সাময়িক বলে মানতে অস্বীকার করে। ২০১৭ সালে কুমারী বিজয়লক্ষ্মী দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন যে ৩৭০ নং ধারা সাময়িক হওয়ায় তাকে তখনও বহাল রাখা দেশের প্রতি জালিয়াতি। হাইকোর্টে মামলা খারিজ করে বলে এটা আর সাময়িক নেই। সুপ্রিমকোর্টে গেলে কোর্ট রায় দেয় শিরোনামে সাময়িক লেখা থাকলেও ৩৭০ নং ধারা আর সাময়িক নয়।

৩৭০ নং ধারা কি সংশোধিত বা আক্রান্ত হয়েছে?

বাতিল বা 'রদ' হলেও সংশোধিত বা আক্রান্ত হয়েছে। যে আবদুল্লা পাক-হানাদরদের রুখেছিলেন এবং নবগঠিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভূমিসংস্কারসহ কিছু জনহিতকর কাজ করেছিলেন, তাঁকেই দু-দফায় ১৪ বছর জেলে পুরে রাখা হল পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আমলে। তারপর ৩৭০ নং ধারায় উল্লেখিত অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার কেড়ে নিতে থাকে। সংবিধানিক নির্দেশের নামে একটার পর একটা আইন কাশ্মীরের ওপর চাপাতে থাকে। দেখা গেল সংবিধানের ৩৮৫টি ধারার মধ্যে ২৬০টি জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হল। ৪৭টি যুগ্মতালিকার মধ্যে ২৬টি রাজ্যের অধিকারের বাইরে রাখা হল। এতে কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হতে লাগল, সক্রিয় হল বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। পাকিস্তানি মদতে সীমান্ত-সন্ত্রাসও বাড়ল। অপরদিকে সন্ত্রাস দমনের নামে ভারত সরকার কর্তৃক সামরিক দমন-পীড়নও বাড়তে লাগল, যা কাশ্মীরের মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে বাড়তে সাহায্য করেছে। এসব সত্ত্বেও কাশ্মীরি জনগণ ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর আস্থা দেখিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে যেখানে মাত্র ৭ শতাংশ ভোট পড়েছিল সেখানে পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক সত্ত্বেও ৬৫ শতাংশের উপর ভোট পড়েছে। শেষ বিধানসভায় মেহেবুবা মুফতির পি.ডি.পি এবং বিজেপি একসাথে সরকার চালিয়েছে।

৩৫-এ ধারা কী?

৩৭০ নং ধারার সূত্রেই ৩৫-এ ধারা। এটি পরে যুক্ত হয়। এই ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার ঠিক করবে রাজ্যের বাসিন্দা কারা এবং তাদের অধিকার কী কী? এই ধারা বলে রাজ্যের বাসিন্দা ছাড়া অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবে না। এই ব্যবস্থা প্রথমে চালু করেছিলেন সেখ আবদুল্লা নন—কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিং ১৯৩৫ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আবেদনে সাড়া দিয়ে। লক্ষ্য ছিল কাশ্মীরের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, জনগোষ্ঠী বিন্যাস এবং আঞ্চলিক চরিত্র যাতে নষ্ট না হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তি দিচ্ছে ৩৫-এ অনুচ্ছেদ তুলে দিলে কাশ্মীরে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা খুলে যাবে। আঞ্চলিক কাঁচা মাল ছাড়া অন্য মাল পরিবহন করে কাশ্মীরে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা কম। কেননা তা লাভজনক হবে না। পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। আঞ্চলিক কাঁচামাল যেমন পশম, ফল, কাঠ এবং মাংসকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে। রাজ্য সরকার ৯৯ বছরের লিজে অ্যাড হক ভিত্তিতে ঐ ধরনের কারখানা খুলতে জমিও দিয়েছে। তাই ৩৫-এ কাশ্মীরে শিল্প স্থাপনে বাধা নয়। এটি বিজেপির অপপ্রচার। নেহেরু ও বল্লভভাই-এর উদ্যোগে ৩৫-এ অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যাতে স্থানীয় গরিব মুসলমানদের জবরদস্তি করে বা প্রলোভন দেখিয়ে জমি মাফিয়ারা বা বড় বড় বেনিয়ারা অন্য রাজ্য হতে গিয়ে কাশ্মীরে জমি দখল করতে না পারে এবং যাতে কাশ্মীরের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

করা যায়। বিজেপির আর একটি অপপ্রচার ৩৭০ তুলে দিলে কাশ্মীরে শিক্ষার অধিকার, সংবিধানের অধিকার, সংরক্ষণের অধিকার লাগু হবে। এটিও অপপ্রচার। ৩৭০ অনুচ্ছেদের দৌলতেই সেখ আবদুল্লাহ-র আমলে কাশ্মীরে সফল ভূমি-সংস্কার হয়েছে। কাশ্মীরের নিজস্ব আইনেই ২০০৭ সাল থেকে দলিত, গুজ্জর ও বাকরাওয়ালা জনগোষ্ঠীর জন্য সংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ চালু হয়েছে। কাশ্মীরের নিজস্ব আইনে প্রথম শ্রেণি হতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার চালু আছে।

এই বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার কি অন্য কোনো রাজ্যে আছে?

আছে। সংবিধানের ৩৭১ নং ধারা বলে (যা সংবিধান রচনার সময় ৩৭০ ধারার সঙ্গে একই সঙ্গে চালু হয়) হিন্দুপ্রধান হিমাচল প্রদেশে বিশেষ কিছু অধিকার আছে। সেখানে বাইরের রাজ্যের লোক জমি বাড়ি কিনতে পারবে না। মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকা, 'বিদর্ভে' এবং গুজরাটের 'কচ্ছে' ৩৭১ ধারাবলে একই ব্যবস্থা আছে। পরে ৩৬৮ ধারাকে সংশোধন করে ৩৭১ 'এ' হতে 'এল' ধারাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্যে একই ব্যবস্থা লাগু হয়। নাগাল্যান্ডের অধিবাসী নিজেদের তৈরি আইনে চলে। অন্য কেউ জমি কিনতে পারবে না। ৩ আগস্ট ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী মোদি নাগা সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি করেন সেখানে এই সুবিধা সহ নাগাদের নিজস্ব মুদ্রা-ব্যবস্থাও মেনে নিয়েছেন। মিজোরামে ও মণিপুরে একই মর্যাদা ও অধিকার চালু আছে। চালু আছে ত্রিপুরা ও আসামের উপজাতি এলাকায়। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে যেমন বাইরের কেউ জমি, বাড়ি কিনতে পারবে না (লিজ নিতে পারবে), তেমনি এই রাজ্যের কোনো নারী বাইরের রাজ্যের কাউকে বিবাহ করলে তার সম্পত্তির অধিকার হারাবেন। পৃথক পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগাল্যাণ্ডের নিজস্ব পতাকা আছে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রতি অবিচার প্রসঙ্গ

বলা হচ্ছে সব কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীরের মুসলমানরা তাড়িয়ে দিয়েছে। এর সবটা ঠিক নয়। মুসলমানরা নয়, কিছু পরিবারকে তাড়িয়েছে জঙ্গিরা। আর জঙ্গিদের কোনো ধর্ম হয় না। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া কাশ্মীরে ঐতিহ্যগত সম্প্রীতি আছে। এটা হল সর্বধর্মসমন্বয়ী ঐতিহ্য। তাই ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশের অন্যত্র দাঙ্গা হলেও কাশ্মীরে হয়নি। দেশভাগ এবং পাকহানাদারির সময় কিছু পণ্ডিত নিরাপত্তার কারণেই হোক বা জীবিকার তাড়নায় হোক কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়েন। কাশ্মীরে পশম বা ফল-এর পরিকল্পিত প্রক্রিয়াকরণ হয় না। প্রচুর জলসম্পদ আছে। তাকে ব্যবহার করা হয়নি। পানীয় জলের সংকটে পর্যটন-শিল্প মার খাচ্ছে। ওখানে বেকারত্বের হার ভারতীয় গড় হারের চেয়ে বেশি। কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারগুলি শিক্ষায় অগ্রসর। ফলে কর্মসংস্থানের জন্যই যেমন অনেকে অন্যত্র এসেছেন তেমনি একটা বড়ো অংশ ১৯৮৯ সালে আদবানির রথযাত্রার পর ১৯৯০ সালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হলে মৌলবাদী জঙ্গিরা পণ্ডিতদের হুমকি দিলে বেশ কিছু পরিবার জম্মু চলে আসেন। এখনও বহু পরিবার কাশ্মীরে বাস করছেন। এটাই কাম্য যে পণ্ডিত পরিবারগুলি ফিরে যাক। জম্মুতে ৫৮ শতাংশ হিন্দু জনগোষ্ঠী। ওখানে কী হচ্ছে? কাঠুয়ার 'আসিফার' কথা কি ভুলে যাব? কাশ্মীরেও জম্মুতে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হুঙ্কার বন্ধ হোক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কাশ্মীরের বাইরে যে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ও তাদের পরিবার বসবাস করছেন তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা আবার লাগু করা হোক এবং জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ভবিষ্যৎ প্রভাব কী পড়তে পারে

সন্ত্রাসবাদী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপকে আমরা কেউই সমর্থন করি না। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে 'সিমলা' চুক্তি বা 'লাহোর সমঝোতা' এক সময় ইতিবাচক বাতাবরণ তৈরি করেছিল। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের নৈতিক প্রক্রিয়া ছাড়া দমন-পীড়নের পথ নিলে তাতে বিপদের মাত্রা বাড়বে। এখন ৩৭০ নং ধারা বাতিল হল। রাজ্য ভাগ হল। এর প্রভাব কী পড়বে তা ভবিষ্যৎই বলবে। কিন্তু যে প্রশ্নগুলি ভাবাচ্ছে— (১) এই ধারা বাতিলের ফলে ভারত-ভুক্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠবে না তো? কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীরাও এটা বাতিল হোক চাইছিল। (২) আবার গণভোটের দাবি উঠবে না তো? (৩) কাশ্মীরে মোদি-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ব্যাপকহারে জমি কিনতে থাকলে তাতে কাশ্মীরের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটবে না তো? (৪) এতে কাশ্মীরিরাই আঘাতপ্রাপ্ত হবে না তো? (৫) বিচ্ছিন্নতাবাদের গণভিত্তি বাড়বে না তো? (৬) পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মতো কাশ্মীরবাসীরা ভারত-অধিকৃত কাশ্মীর বলবে না তো? এই সব নানা প্রশ্ন ভাবাচ্ছে। মনে রাখা দরকার ৩৭০ ধারাবলে কিন্তু কাশ্মীরিদের পৃথক কোনো নাগরিকত্ব ছিল না। ৩৭০ অনুচ্ছেদ (তার সূত্রেই তৈরি ৩৫এ) ছিল ভারত ও কাশ্মীরের একাত্মতার সেতু। ভারত এখন ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে দিয়েছে। তাই এইসব প্রশ্ন উঠতে পারে। পাকিস্তান যেমন নিজের দেশের রাজনীতিকে মাথায় রেখে ভারতের এই পদক্ষেপ কাশ্মীরের ওপর আগ্রাসন বলে প্রচার চালাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘে বিষয়টি নিয়ে যেতে চাইছে, অপরদিকে বিজেপি ফ্যাসিবাদি কায়দায় (বলা ভালো আরএসএস) পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতভুক্তির জিগির তুলে দেশের মানুষকে একটি উগ্রজাতীয়তাবাদী উন্মাদনার মধ্যে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

উপসংহার

তাই সঠিকভাবেই দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক মানুষ পথে নেমেছে জম্মু-কাশ্মীরের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে, ৩৭০ এবং ৩৫-এ পুনরায় লাগু করতে। তাদের দাবি বেয়োনেট দিয়ে নয় রাজনতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কাশ্মীরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কেননা এর সাথে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নই শুধু নয়, দেশের অখণ্ডতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সংবিধান রক্ষার প্রশ্ন জড়িত। তৃণমূল দল দ্বিচারিতার অবস্থান নিয়েছে। সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে বলে আবার ওয়াকআউট করে সরকারেরই সুবিধা করে দিয়েছে। কংগ্রেসের অবস্থান দোদুল্যমান। নেতৃত্বের একটা অংশ সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। আবার বিজেপি দল চাইছে ধর্মের নামে বিভাজন তৈরি করে উগ্র জাতীয়তাবাদকে গড়ে তুলতে। কাশ্মীরের নারীদের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য করা হচ্ছে। এতে আপতত ভোট মিললেও 'ভারত'বর্ষ হারিয়ে যাবে। আশার কথা ভারতের জনগণের বৃহৎ অংশই ধর্মনিরক্ষেপতার পক্ষে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কাশ্মীরের অধিকার হরণকে দেশের সংবিধানের উপর আক্রমণ হিসাবে বর্ণনা করে ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত জাতীয় সম্মেলনে ফারুক আবদুল্লাহ, ইউসুফ তারিগামি সহ অন্যান্য নেতা-নেতৃত্বরা যে সম্মিলিত আহ্বান জানিয়েছেন, যা 'গুপকার ঘোষণা' হিসাবে রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে এসেছে, সেটি ভারতীয় সংবিধান-বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করার প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। এই পটভূমিতে বামপন্থীদেরই সংগ্রামের ময়দানে সামনে দাঁড়াতে হবে কাশ্মীরের জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পক্ষে, সংবিধান রক্ষার পক্ষে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপক্ষেতা রক্ষার পক্ষে।

With Best Compliments of

MALAKAR ENTERPRISE

CIVIL, MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

D-25/S, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Paschim Bardhaman
Mob. 9474444867, 7797770088

Sl. No. 42

With best compliments of

GULSON CONSTRUCTION

CIVIL, REFRACTORY, MECHANICAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

In Front of Hindustan Refractories
Sagarbhanga (Near 112 No. Rail Gate)
Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 41

হিন্দু, হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দুরাষ্ট্র

অঞ্জন বেরা

দিল্লিতে গত দাঙ্গার সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র চিত্র সাংবাদিক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা নিজেই লেখেন। মৌজপুর মেট্রো রেল স্টেশনে পৌঁছতেই গেরুয়াবাহিনী তাঁর কপালে তিলক এঁকে দিতে হামলে পড়ে। আপত্তি করলে তাঁকে শুনতে হয়, 'ভাই, আপনিও তো হিন্দু। তা হলে অসুবিধা কিসের?' সেখান থেকে এগিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ছবি তুলতে যাচ্ছেন জানতে পেরে তাঁকে আবার আটকানো হয়। আবার শুনতে হয়, 'ভাই, আপনিও তো হিন্দু। তা হলে ওখানে কেন যাচ্ছেন? আজ হিন্দুরা জেগে উঠেছে।' শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে তিনি রেহাই পান।

দাঙ্গাবাজদের যুক্তিটা এরকমই। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় যেহেতু জন্মসূত্রে 'হিন্দু' তাই তাঁকে গেরুয়াবাহিনীকে সমর্থন দিতেই হবে। মুসলিম মহল্লায় তাণ্ডবেরও সমর্থক হতে হবে।

পরিচিতিসত্তার আত্মসাৎ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা চেনা কৌশল। সংঘ পরিবারের দাবি, তারা হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একচ্ছত্র প্রতিনিধি। স্বাধীনতার আগে হিন্দু মহাসভা যে রকম 'হিন্দু'দের এবং মুসলিম লিগ যেরকম 'মুসলিম'দের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের জাহির করতো। আজকের ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ এতটাই আগ্রাসী রূপ নিয়েছে যে ভিন্নতর কোনো বয়ান প্রতিষ্ঠা করা এখন বেশ শক্ত কাজ। যুক্তিবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করেই আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রোপাগান্ডা কৌশলের মূল ভিত্তি, আগ্রাসী মিথ্যাচার এবং যুক্তিবোধহীনতা। নয়া-উদারবাদ পর্বে বি-রাজনীতির প্রবল প্রসার যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক শক্তি সামাজিক রাজনৈতিক পরিসরে প্রভাব বাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে উস্কানি দিয়ে। এভাবেই সংখ্যাগুরু অংশ মনে করতে থাকে সংখ্যালঘু অংশকে যত কোণঠাসা করা যাবে তত তাদের স্বার্থরক্ষা হবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এই মিথের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও বাস্তবে সাম্প্রদায়িকতা শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুরুরও বিপদ। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু কোনো অংশেরই স্বার্থপূরণ করা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে সম্ভব নয়।

হিন্দুত্ববাদীরা দাবি করে তারাই 'হিন্দু' ধর্মাচরণের একমাত্র ঠিকাদার। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মাচরণ এক নয়। হিন্দুত্ববাদ আর হিন্দুধর্মে বিশ্বাস এক নয়।

হিন্দুত্ববাদ চায় রাজনৈতিক হিন্দু। ইসলামি মৌলবাদও চায় রাজনৈতিক ইসলাম। সাম্প্রদায়িক শক্তির লক্ষ্য সাধারণভাবে ধর্মাচরণ নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। 'গেরুয়া'বসন পরা মন্ত্রী, এম পি, এম এল এ-তে বিজেপি রাজত্ব ছয়লাপ। হিন্দুত্ববাদী গেরুয়াধারীরা শুধু ভণ্ড নয়, ক্ষমতার জন্য হিংস্রতাও তাদের জপমালা। বহু মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মাচরণ করেন কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের বিরোধী। ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোনো মিল নেই। সঙ্ঘ পরিবারের শক্তি বৃদ্ধি হলে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি-মানুষের কোনো লাভ নেই। বরং ক্ষতি।

হিন্দুত্ববাদীরা বোঝাতে চেষ্টা করে, ধর্মীয় সত্তাই অবিকল্প পরিচিতি সত্তা। এম এস গোলওয়ালকার তাঁর 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড' গ্রন্থে যেমন লিখছেন, হিন্দুস্তানে ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের সর্বভূতে বিরাজমান অস্তিত্ব' (রিলিজিয়ান ইজ় অ্যান অল-অ্যাবজর্বিং এন্টিটি')। এর অর্থ, একমাত্রিক ধর্মীয় পরিচিতি সত্তাই স্বতসিদ্ধ। বিষয়টি মুসলিম মৌলবাদের ক্ষেত্রেও পৃথক কিছু নয়। আপনি হয় হিন্দু, নয় মুসলিম, নয় জৈন, নয় খৃস্টান। মানুষ যেন একমাত্রিক।

বাস্তবে সমাজ কিন্তু এরকম একমাত্রিক একশিলা নয়। সমাজ নানা স্তরে বিভক্ত। ধর্মীয় সত্তা কখনই সব মানুষের জন্য অবিকল্প পরিচিতি নয়। সমাজে যেমন ধর্মাচার মানেন এমন মানুষ আছেন, তেমনই ধর্মে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক এমন মানুষ আছেন। ধর্ম সম্পর্কে সংশয়বাদীরাও আছেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা বলেছিল, ''ব্যক্তিও নেই সমাজও নেই, অথচ ধর্ম আছে, এমন ধর্মকে আমি মানি নে।'' এও একটা বয়ান।

আবার বহু মানুষ হয়তো নাস্তিক নন, কিন্তু বহু ধর্মীয় আচার সেভাবে মানেন না। যেমন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পৌত্তলিকতায় অনাগ্রহ দীর্ঘ দিনের প্রবণতা। একেশ্বরবাদও অন্যতম প্রবণতা। দীর্ঘদিন যাবৎ। হিন্দু ধর্মীয় আচারের একমাত্রিকতা যদি সব হিন্দু অকাট্য ধরে নিতেন তাহলে সতীদাহ কিংবা বিধবাবিবাহ বন্ধ হতো না। তাছাড়া, আদিবাসীদের ধর্মাচার বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এই বৈচিত্র্য মানতে চায় না। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে সমাজকে দেখে বা দেখাতে চায় তার সঙ্গে বাস্তব সমাজের কোনো মিলই নেই। শুধু হিন্দু নয়, মুসলিম সমাজও একমাত্রিক নয়। বহু মুসলিম ধর্মস্থান আছে যেখানে বিশ্বাসী হিন্দুরা যায় প্রার্থনা করতে। লালন কি প্রচলিত অর্থে মুসলিম ছিলেন?

মোদী সরকারের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বয়ানেও যেমন ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রতিবেশী দেশগুলিতে মুসলিম ধর্মীয় সত্তা একমাত্রিক একশিলা অবিকল্প পরিচিতি। যেন সব মুসলিম একদিকে, সব হিন্দু ও অন্যান্যরা অন্যদিকে। তাই প্রতিবেশী দেশের কোনো মুসলিম বৈধ কাগজপত্র ছাড়া আসতে পারবেন না এবং সব হিন্দুই বৈধ কাগজপত্র ছাড়া আসতে পারবেন। ধরেই নেওয়া হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলিতে হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন প্রশ্নাতীত, সর্বজনীন বাস্তব। যেন মুসলিম মানেই হিন্দুবিরোধী এবং মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংখ্যালঘু নিপীড়ন-বিরোধী জনমতের কোনো অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদ-বিরোধিতা যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম উপাদান তা সবাই দেখেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষ পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তবুও হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি তা মানতে চায় না। দ্বিমাত্রিকতাকে যদি জনপ্রিয় করা যায় তাহলে সহজেই মগজধোলাই সম্ভব।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ স্বীকারই করতে চায় না যে, বৈচিত্র্য সমাজের স্বাভাবিক রূপ। বৈচিত্র্য স্বাভাবিক হওয়ায় বহুত্ববাদ এবং পারস্পরিক সমন্বয়ই সার সত্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদের ভিত্তিই হলো বিরোধ, বিদ্বেষ এবং সংঘাত। সমন্বয় ও সহাবস্থানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য সত্ত্বেও 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'-র প্রবক্তারা আমাদের বুঝিয়েছিল, হিন্দু আর মুসলিম একসঙ্গে বাস করতে পারে না। দুই সম্প্রদায়ের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র দরকার—দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থানের যেন কোনো উপায় নেই। দ্বিজাতিতত্ত্ব কেমন অবাস্তব এবং অসার তার জলজ্যান্ত উদাহরণ পাকিস্তানের পরিণতি। অন্য ধর্মাবলম্বী তো দূরের কথা, একই ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে দুটি পৃথক ভাষার অস্তিত্ব মানার ন্যূনতম সহনশীলতাও ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তানে স্বীকৃতি পায়নি। পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। চোখের সামনে এই নজির থাকা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র হিসেবে জন্ম নেওয়া ভারত আজ হিন্দুত্ববাদের খপ্পরে পড়ে আঁকড়ে ধরছে দ্বিজাতিতত্ত্বের বাতিল প্রকল্পকে।

সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরুবাদ সংখ্যালঘু-বিরোধী তো বটেই, সেইসঙ্গে তা কখনই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী নয়। এদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মৌল নীতিগুলি মানে না; ক্ষমতার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মেরুকরণ তাদের সম্বল।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মেরুকরণ শুধুমাত্র অন্য ধর্মের জন্যই নয়। হিন্দুত্ববাদ কি 'হিন্দু' কোনো সার্বজনীন পরিচয় বলে তারা মনে করে? করে না। হিন্দুত্ববাদ বর্ণবাদ ছাড়া অচল। চতুর্বর্ণ প্রথা, জাত-পাত বর্ণ-ব্যবস্থায় শতধাবিভক্ত একটি ব্যবস্থা। হিন্দু ধর্মে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বিরাট অংশের মানুষ (যেমন, শূদ্র) শুধু ব্রাত্যই নয়, অস্পৃশ্য। হিন্দুত্ববাদ শুধু ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগ করে না; জাতপাতের ভিত্তিতে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদেরও ভাগ করে। হিন্দুত্ববাদে মুসলিমরা অস্পৃশ্য, হিন্দু দলিতও অস্পৃশ্য।

হিন্দুত্ববাদ ভারতের মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য অহিন্দু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কেও সহিষ্ণু নয়। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও স্বীকার করে না। অভিন্ন 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর ধুয়ো তুলে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি ধর্মগুলিকেও হিন্দু সম্প্রদায়েরই 'অন্তর্ভুক্ত' করে ফেলতে চায়। আত্মসাৎ করতে চায়।

যে-কোনো সাম্প্রদায়িকতা লিঙ্গবৈষম্যেরও ধ্বজাধারী। হিন্দুত্ববাদ যেমন হিন্দু নারীর সমানাধিকার স্বীকার করে না। ১৯৫১ সালে হিন্দু বিবাহ আইন সংসদে পেশ হবার পর হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ সদস্যরা বিরোধিতা করেন। সেই বিরোধিতার নেতৃত্ব দেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ১৯৫১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর লোকসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকাকালে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ঘটনা খুবই সামান্য। এটা কোনো সমস্যাই নয়। হিন্দু কোড পুরোটাই পাশ করান। কিন্তু তা মানা না মানা স্বেচ্ছামূলক রাখুন। যারা মানতে চাইলো তারা মানলো।'' কী অদ্ভুত যুক্তি! তাঁর কথায়,''বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা ধর্মসম্মত বিবাহের মূলনীতি ধ্বংস করবে। হিন্দু সমাজ সচল এবং ইহাই তাহার শক্তি'' (যুগান্তর, ১৮ সেপ্টম্বর ১৯৫১)। বোঝাই যায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যত ক্ষমতাশালী হবে তত জোরালো হবে লিঙ্গবৈষম্য। হিন্দু নারীরাও রেহাই পাবেন না।

'ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজম' গ্রন্থে দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ''ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্মের প্রতি উদাসীনতার মনোভাব) এবং রাষ্ট্র (স্টেট) পরস্পরবিরোধী ধারণা। রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্মরাজ্যই হতে পারে, অন্য কিছু নয়।'' বলাবাহুল্য, এটি একটি ইতিহাস-বিরোধী প্রাগাধুনিক বাগাড়ম্বর ছাড়া অন্য কিছু নয়। হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তারা 'হিন্দুরাষ্ট্র' সম্পর্কে নানা সময়ে যা বলেছেন

সেগুলি থেকে স্পষ্ট, 'হিন্দুরাষ্ট্র' একটি সামন্ততন্ত্র-জর্জরিত ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যদিও হিন্দুত্ববাদীরা অতিচালাকি করে বলে, 'হিন্দুস আর এ নেশন'। হিন্দুরা একটি জাতি এবং হিন্দু জাতি-রাষ্ট্র নাকি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র (থিওক্রেটিক স্টেট) নয়। রাষ্ট্রের জাতি পরিচয় ঘোষণা মানে নাকি রাষ্ট্র ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় না এবং হিন্দু রাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র একইসঙ্গে হওয়া সম্ভব!

অপযুক্তির উৎসস্থলটি কী? প্রথমত, অন্য ধর্মের অস্তিত্বই হিন্দুত্ববাদের অভিধানে নেই। দ্বিতীয়ত, হিন্দুত্ববাদের শর্ত মানলে হিন্দুস্তানে সবারই 'হিন্দু' হবার দাওয়াই রয়েছে। দাওয়াইটি কী? ভারতকে পিতৃভূমি এবং 'পুণ্যভূমি' বলে মেনে নাও। তাহলেই তুমি হিন্দু। এই ফর্মূলায় একজন নাস্তিকও হিন্দু।

বাস্তবে 'হিন্দুরাষ্ট্র'-র মতো ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্বই নেই। জনগণ যদি সার্বভৌম না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক কাঠামো সেখানে অনুপস্থিত হতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক কাঠামো অনুপস্থিত বলে রাষ্ট্র কোথাও শাসককে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করে না।

অতিসক্রিয় রাষ্ট্র কখনও স্বাধীন বিচারব্যবস্থাকেও মর্যাদা দেয় না। যদিও নাগরিক স্বার্থে তা ভীষণই জরুরি। তারা রাজনৈতিক বহুত্ববাদ মানে না। ভাষার ক্ষেত্রে বহুত্ববাদ মানে না। সংস্কৃতির বহুত্ব মানে না। সব নাগরিকের সার্বভৌমত্ব সেখানে অস্বীকৃত। সংখ্যাগুরুবাদই মূল চালিকা নীতি। সংখ্যাগুরুবাদ যেহেতু স্বৈরাচারী, তাই শুধু সংখ্যালঘুদের প্রতি স্বৈরাচারী নয়, সংখ্যাগুরুদের প্রতিও স্বৈরাচারী।

'হিন্দুরাষ্ট্র' সব 'হিন্দু'র প্রতি দায়বদ্ধ? 'হিন্দুরাষ্ট্র' কি সব হিন্দুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে? সব হিন্দুর জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা? সব হিন্দুর ক্ষুধা নিবারণ? সব হিন্দুর জন্য সার্বজনীন শিক্ষা? পাকিস্তানে হয়েছে সব মুসলিমের জন্য? পৃথিবীর কোথাও ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্যও এসব কাজ করেনি। করার দায়িত্ব আছে বলেও মানেনি। নয়া-উদারবাদের সবচেয়ে আগ্রাসী একনিষ্ঠ সমর্থক হিন্দুত্ববাদীরাই। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ থেকে কৃষিবিলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে দেশের নাগরিক। কর্মহীনতার দুরবস্থায় বিপর্যস্ত হচ্ছেন সব ধর্মের মানুষই। 'হিন্দু' বলে কোনো বাড়তি সুবিধা আছে? নেই।

সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরুবাদ শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্য ধর্মীয় মোড়কে একটি প্রতারণা প্রকল্প। 'হিন্দুরাষ্ট্র' আসলে চরিত্রলক্ষণের দিক থেকে অতি-সক্রিয় ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের মতো। আধুনিক নাগরিক সত্তার সঙ্গে তার বিরোধ মৌলিক।

আরও স্পষ্ট করে বললে,'হিন্দুরাষ্ট্র' কোনো 'রাষ্ট্র'ই নয়, মানে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়। রাষ্ট্র একটি আধুনিক ধারণা, নাগরিকদের ভূমিকার ওপর যা নির্ভরশীল। নাগরিক সমাজই একটি আধুনিক রাষ্ট্রে সবার ওপরে। সার্বজনীন গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তার মৌলিক ভিত্তি।

'হিন্দুত্ব'বাদীরা আধুনিক সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিরূপ। 'হিন্দুত্ব'বাদীরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও ঘোষিত বিরোধী এবং 'এককেন্দ্রিকতা'-র ঘোষিত সমর্থক। রাজ্যগুলির 'ইউনিয়ন'-এর ধারণাকেও তারা সমর্থন করে না। সেই কবে 'বাঞ্চ অফ থটস' বইয়ে সংকলিত 'ওয়ান্টেড এ ইউনিটারি স্টেট' শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন আর এস এস প্রধান গোলওয়ালকার লিখেছেন: ''...সবচেয়ে জরুরি এবং কার্যকরী পদক্ষেপ আমাদের দেশের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যাপারে যাবতীয় আলোচনাকে চিরকালের মতো সমাহিত করা...জারি করো 'এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক আইনসভা, এক সরকার'..। আসুন সংবিধান নতুন করে খতিয়ে দেখি, নতুন করে লিখি, যাতে এককেন্দ্রিক ধাঁচের সরকার গঠন করা যায়।'' সংঘ পরিবারের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর 'ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজম' (এপ্রিল ১৯৬৫) বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ভারতীয় সংবিধানের একটি 'মৌলিক ভ্রান্তি' ('ফান্ডামেন্টাল এরর') হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর দাবি, সংবিধান বদলে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা লাগু করা হোক। যদিও সকলেই জানেন, ভারতের মতো বিপুল বৈচিত্র্যময় দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়।

আধুনিক সমাজ মৌলিকভাবেই পরস্পর-নির্ভর। আধুনিক সমাজ বাঁচে সামাজিক ঐক্য ও সংহতির ওপর। সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বাঁচে রাষ্ট্র-স্বীকৃত সমতা-নির্ভর কাঠামোর ওপর। সাম্প্রদায়িকতা কাঠামোগত ভাবেই বিদ্বেষ-নির্ভর। যত তীব্র বিদ্বেষ তত সফল সাম্প্রদায়িকতা! আজকের আধুনিক সমাজের কোনো চ্যালেঞ্জ অতিক্রমের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা কোনো ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না। বরং তা আমাদের পিছন দিকে টানে। এমন এক সমাজ হিন্দু বা মুসলিম কারও স্বার্থ পূরণ করতে পারে না।

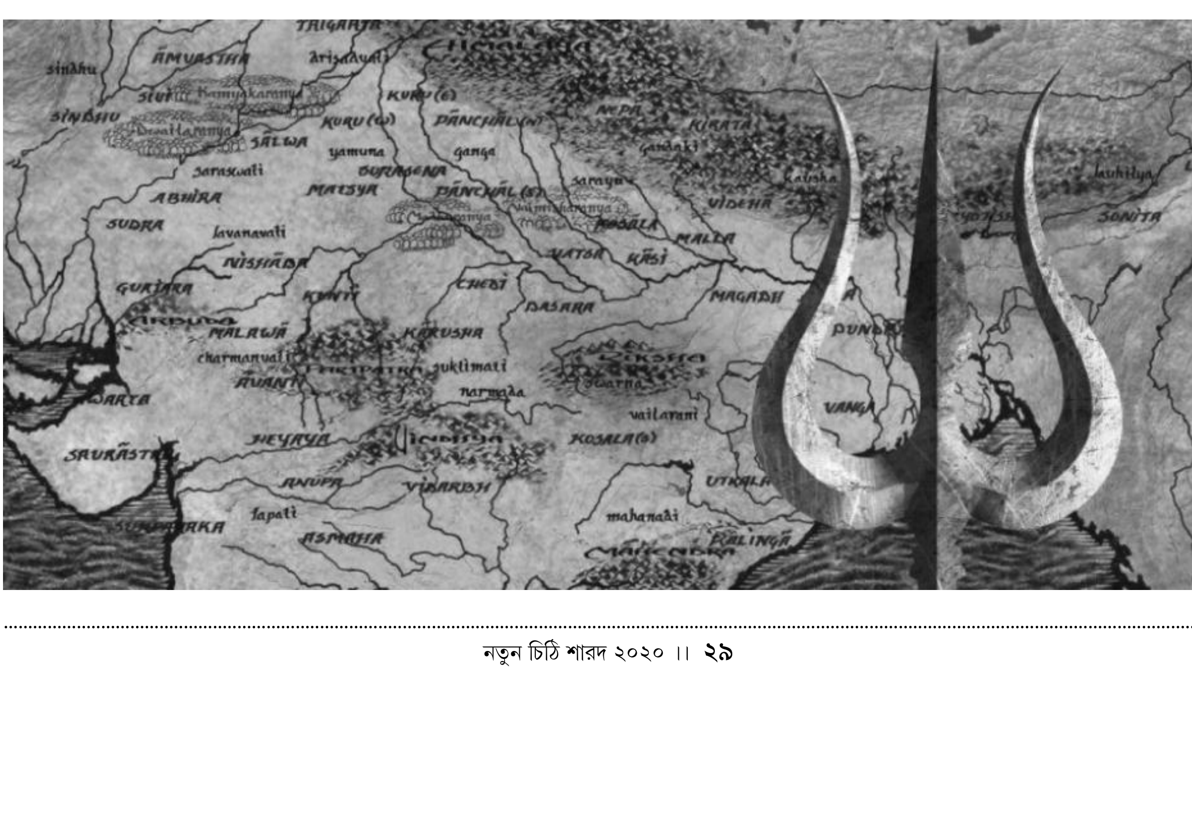

With best compliments from

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 37

উৎসব শুভেচ্ছা জানাই

সাহিত্যিক **শেখ জয়নাল আবেদীন**-এর সৃষ্টিসম্ভার

- **কাব্য** : (১) আবাহন (১৯৮২) মূল্য ২.৫০ টাকা, (২) আমরা করবো জয় (১৯৯০) ৭ টাকা, (৩)রক্ত গোলাপ (২০০২) ৩০টাকা, (৪) রাজামশাই নমস্কার (২০০২) ২০ টাকা, (৫) শব্দের মিছিল (২০১২) ৩০ টাকা, (৬) যে এলো চেনা সে (২০১৪) ৩৫ টাকা, (৭) বাঁধন ছিঁড়ে ফেরা (২০১৫) ৬০ টাকা, (৮) সিঞ্চিতা (২০১৬) ৩০০ টাকা।
- **ছড়া** : (৯) সুখ দুঃখের ছড়া (২০০৩) ২৫ টাকা, (১০) হাসি কান্নার ছড়া (২০১৩) ৩৫ টাকা।
- **শায়েরি** : (১৩) জোট বাঁধো তৈরী হও (১৯৬৬) ১ টাকা, (১৪) সর্ষের মধ্যে ভূত (২০০৩) ১৫ টাকা, (১৫) পরিবর্তন (২০০৩) ১৫ টাকা, (১৬) শ্রীকবিকঙ্কণ (২০১২) ২০ টাকা, (১৭) স্বামীজি (২০১২) ২০টাকা, (১৮) ভিটের দোষ (২০১২) ২০ টাকা।
- **ছোটোগল্প** : (১৯) নতুন দিনের গল্প (২০০৩) ২৫ টাকা
- **প্রবন্ধ** : (২০) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম (২০০৪) ২০ টাকা, (২১) চেতনার বিবর্তন (২০০৪) ২২ টাকা
- **বৃত্তান্ত** : (২২) সৃষ্টির ঠিসানা (২০১২) ৯.৫০ টাকা
- **অভিধান** : (২৩) আমার মায়ের ভাষা (আরবি, ফার্সি তুর্কি, উর্দু থেকে বাংলা) (২০১৫) ১০০ টাকা
- **সঙ্গীত** : (২৪) এক মুঠো গান (২০১২) ২০ টাকা

যোগাযোগ : ৯৪৭৫০৫১৯০৯

Sl. No. 5

মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নির্মাণ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ণয়ে এঙ্গেলস-এর ভূমিকা

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

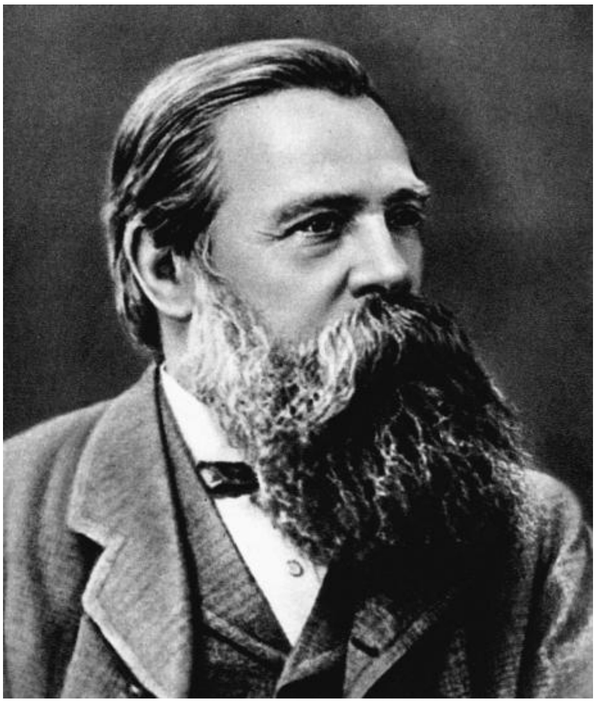

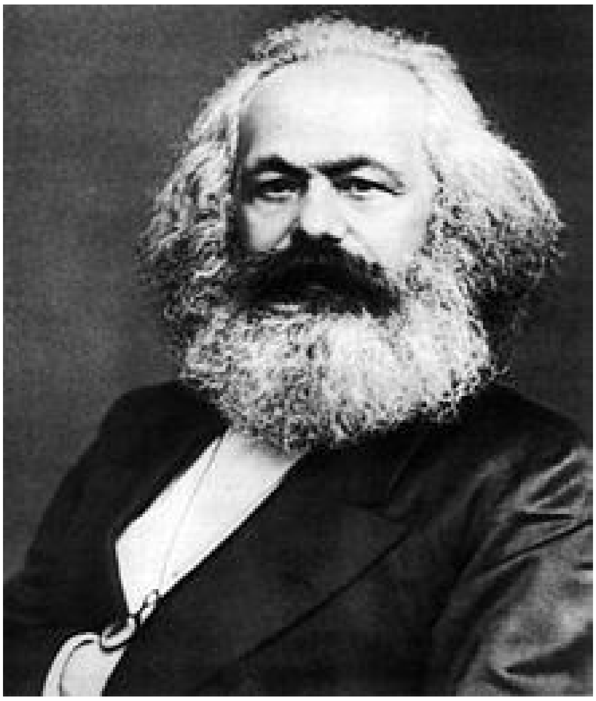

'মার্কসবাদ' নামটির মধ্যে এঙ্গেলস অনুপস্থিত। তাহলে এই বিপ্লবী তত্ত্ব প্রণয়নে কি এঙ্গেলস-এর উল্লেখ করার মতো কোনো ভূমিকাই ছিল না? তথাকথিত মার্কসবাদ-বিশেষজ্ঞ কিছু পণ্ডিত অবশ্য তেমনটাই বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সত্য এই যে মার্কসবাদী তত্ত্বের নির্মাণ মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুই মনীষী ও সংগ্রামীর, তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবিদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও মনন-সংশ্লেষেরই ফসল। মার্কসবাদ তাই শুধুমাত্র মার্কসের নাম বহন করে চললেও এঙ্গেলস সেই নামেরই অনিবার্য সম্প্রসারণ। এঙ্গেলসের মনীষা তাঁর একক রচনাগুলিতেও যেমন উদ্ভাসিত, মার্কসের সঙ্গে যুক্ত রচনাগুলির মধ্যেও তেমনি এক অতুলনীয় সংশ্লেষে আবদ্ধ। আসলে মার্কস ও এঙ্গেলস হয়ে উঠেছিলেন একে অপরের পরিপূরক। কখনও তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধিক শ্রমকে একত্রিত করেছেন, কখনও বিভাজন করে নিয়েছেন, কিন্তু সর্বদাই পারস্পরিক আলোচনা ও বিতর্কের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে চিন্তার নব নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। মার্কসবাদের তত্ত্ব নির্মাণে এঙ্গেলসের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয়ে তাই মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের মনন-সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটিকে একটু গোড়া থেকে দেখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেখা প্রয়োজন মার্কসের মৃত্যুর পরেও কীভাবে তিনি এই চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করে গেছেন।

যুগ্ম ভূমিকায় মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলস

মার্কস থেকে এঙ্গেলস আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। মার্কসের জন্ম ৫ মে, ১৮১৮ আর এঙ্গেলসের ২৮ নভেম্বর, ১৮২০। দুজনেরই জন্ম জার্মানির রাইন প্রদেশে। ১৭ বছর বয়সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ ঘটিয়ে এঙ্গেলসের বয়ন-ব্যবসায়ী পিতা তাঁকে পারিবারিক ব্যবসার শিক্ষানবিশিতে লাগিয়ে দেন। এই বাধ্যতার মধ্যেও এঙ্গেলস অবসর সময় কাটাতেন ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি অধ্যয়নে ও কবিতা লেখায়। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিতও হতে থাকে। উদ্বিগ্ন পিতা এবার ব্যবসায়ে এঙ্গেলসের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রিমেন-এর এক রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী চাকরিতে। ১৮৪১-এর মার্চে সেখান থেকে ঘরে

ফিরে আসার পরই এঙ্গেলসকে এক বছরের জন্য বার্লিনে যেতে হয় সামরিক বাহিনির তলবি সেবায়। সেখানে গোলন্দাজ বাহিনির দক্ষ ভলান্টিয়ার হিসাবে এক বছর কাটিয়ে ১৮৪২-এর অক্টোবরে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই আত্মশিক্ষালব্ধ জ্ঞানের গভীরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এঙ্গেলস প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার যে প্রকাশ ঘটিয়ে জার্মানির বৌদ্ধিক জগতে আলোড়ন তুলে ফেলেছেন, তাতে তাঁর রক্ষণশীল পিতা বিশেষভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। জার্মানি থেকেই এঙ্গেলসকে সরিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে করে তিনি তাঁকে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠিয়ে দেন নিজের অংশীদারিত্বে পরিচালিত বয়ন কারখানার বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষার জন্য। ১৮৪২ সালের নভেম্বরে এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যাবার পথে এঙ্গেলস কোলোন-এ Rheinische Zeitung পত্রিকার দপ্তরে যান। এই পত্রিকায় তিনি লিখতেন। অন্যদিকে মার্কসও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের পর অধ্যাপনার বদলে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে সেই বছরই এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৮৪২-এর নভেম্বরে এই পত্রিকার দপ্তরেই মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু সে সাক্ষাৎ ছিল নিতান্তই শীতল, কেননা জার্মানিতে নানা চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বসংকুল সম্পর্কের আবহে এঙ্গেলসের তৎকালীন গোষ্ঠীগত অবস্থান, বিশেষত The Free নামক একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ, মার্কসের ঠিক মনঃপুত ছিল না।

কিন্তু এঙ্গেলসকে বুঝতে মার্কস ভুল করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে Young Germany ও পরে The Free গোষ্ঠীর সঙ্গে এঙ্গেলসের সংযোগের পর্যায়গুলি ছিল একের পর এক নেতির মাধ্যমে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার ক্রমিক উদ্বর্তনের যে ইতিহাস তারই অঙ্গ। Hegel-এর দ্বন্দ্ববাদ ও Feuerbach-এর বস্তুবাদের সারবস্তুর সংশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণে ক্রমশ তিনি মার্কসের সমীপবর্তী হয়ে উঠছিলেন। ইংল্যান্ডে যখন তিনি এলেন তখনও সেখানে সদ্য-সমাপ্ত চার্টিস্ট (Chartist) আন্দোলনের উত্তাপ বর্তমান। এই আন্দোলনকে লেনিন বলেছিলেন 'প্রথম ব্যাপক, প্রকৃতপক্ষেই গণচরিত্রের এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলন'। চার্টিস্টদের সঙ্গে এবং শ্রমিক ও শ্রমিক-সংগ্রামে যুক্ত মানুষদের সঙ্গে এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জার্মান কমিউনিস্ট কর্মীদের গুপ্ত সংগঠন League of the Just-এর লন্ডন-নেতাদের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ঘটে, কিন্তু তাঁদের সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও ষড়যন্ত্রমূলক চরিত্রের জন্য এই সংগঠনে যোগদানের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। প্রায় দু-বছর এঙ্গেলস ইংল্যান্ড থাকেন এবং শ্রমিক জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই সময়কালেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দীপ্ত বিকাশ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের অনিবার্যতাবোধে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৪৫ সালে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রয়াসে রচিত এঙ্গেলসের Condition of the Working Class in England গ্রন্থে তার স্বাক্ষর মেলে। তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সারসত্য ও আর্থ-সামাজিক ফলাফলের সুগভীর বিশ্লেষণ করেন এবং শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থার মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরে তাকেই পুঁজিবাদের কবর-খনকের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের যোগ্য শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন।

ইতোমধ্যে ১৮৪৪ সালেই মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের চিন্তাগত সামীপ্য উভয়ের সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক যুগ্ম প্রয়াসে পরিণত হয়েছে। সরকারি কোপ ও তদনুযায়ী Rheinische Zeitung পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে মার্কস পত্রিকার সম্পাদকপদ ও সেইসঙ্গে জার্মানি ছেড়ে ফ্রান্সের প্যারিসে চলে আসেন এবং আর্নল্ড রুজ-এর সঙ্গে Deutsch-Franzosische Jahrbucher পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন। তিনি ও রুজ এই পত্রিকায় লেখার জন্য এঙ্গেলসকে অনুরোধ জানান। এঙ্গেলস চারটি প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে ১৮৪৪-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত Outlines of a Critique of Political Economy শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি মার্কসের নজর কাড়ে এবং তাঁর ও এঙ্গেলসের মধ্যে পত্রযোগে ভাবের আদন-প্রদান শুরু হয়। আগস্ট মাসের শেষ দিকে ব্যবসারসূত্রে প্যারিসে এসে এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে দশ দিন কাটিয়ে যান এবং তাঁদের আজীবন বন্ধনের সূত্রপাত ঘটে। এঙ্গেলসের নিজের কথায়, "১৮৪৪-এর গ্রীষ্মকালে প্যারিসে আমি যখন মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন সমস্ত তাত্ত্বিক প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ণ ঐকমত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের যুগ্ম প্রয়াসেরও শুরু সেই সময় থেকেই।" ১৮৪৪-এই প্রথম তাঁরা যুগ্মভাবে রচনা করেন The Holy Family। এই গ্রন্থে তাঁরা নব্য হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ার ও তাঁর সহচিন্তকদের ভাববাদী দর্শনের বিধ্বংসী সমালোচনা করে বলেন—বীরেরা নয়, জনগণই ইতিহাস রচনা করে এবং শ্রমিক শ্রেণিই সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

ফ্রান্সে বেশিদিন থাকাও মার্কসের পক্ষে সম্ভব হল না। সাইলেসিয়ান তাঁতিদের বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন এবং তাকে দমনের জন্য জার্মান তথা প্রাশিয়ান সরকারের সমালোচনায় ক্ষিপ্ত প্রাশিয়া ফ্রান্স সরকারের উপর চাপ দেওয়ায় সরকারি নির্দেশে মার্কসকে ফ্রান্স ছাড়তে হয়। ১৯৪৫-এই জার্মান নাগরিকত্ব খারিজ করে দিয়ে তিনি বেলজিয়ামের ব্রুসেলসে চলে আসেন। পিতার চাপে অতিষ্ঠ এঙ্গেলসও ব্রুসেলসে চলে এসে মার্কসের সঙ্গে মিলিত হন। ১৮৪৬ সালে তাঁদের যুগ্ম প্রয়াসে রচিত হল দ্বিতীয় গ্রন্থ German Ideology। তবে প্রকাশক না মেলায় তাঁদের জীবৎকালে গ্রন্থটি প্রকাশ পায়নি। এই গ্রন্থে তাঁরা হেগেলের ভাববাদী দর্শন, নব্য হেগেলপন্থীদের মন্ময় ভাববাদ এবং ফায়েরবাখীয় যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক ধারণাগুলি সূত্রায়িত করেন। মার্কসবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি হয়। প্রকৃত বিচারে এই গ্রন্থটিকেই মার্কস ও এঙ্গেলসের মনন-সংশ্লেষে রচিত প্রথম গ্রন্থ বলা যায়, কেননা The Holy Family ছিল তাঁদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে লিখিত বিভিন্ন পরিচ্ছেদের একটি সংকলন।

কমিউনিস্ট মতাদর্শীদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য ১৮৪৬ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস বিভিন্ন দেশে Communist Correspondence Committee গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৪৭-এ তাঁদের উদ্যোগেই কেন্দ্রীয়ভাবে League of the Just-কে পুনঃসংগঠিত করে Communist League-এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার আদর্শবাক্য All men are brothers-কে পাল্টে করা হয় Workers of all countries unite। লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মার্কস এবং ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত লিগের কংগ্রেস থেকে তাঁকে ও এঙ্গেলসকে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক দলীয় কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বেলজিয়ামের পুলিশ মার্কসকে গ্রেপ্তার করে ও দেশত্যাগে বাধ্য করে। মার্কস ফ্রান্সে চলে আসেন এবং সেখানে ১৯৪৮-এর বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে এঙ্গেলসের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচনা করেন কালজয়ী Manifesto of the Communist Party। জার্মান ভাষায় রচিত এই ইস্তেহারটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। এর পর একের পর এক ফরাসি,

ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। মেনিফেস্টোর ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস এর মর্মবস্তু সম্পর্কে বলেছেন ঃ "অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে উদ্ভূত প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের সমাজ-কাঠামোই সেই যুগের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করে। তার ফলে (আদিম যৌথ ভূমি-মালিকানা পর্যায়ের অবসানের পর থেকে) সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সমগ্র ইতিহাসই আধিপত্যকারী ও আধিপত্যাধীন শ্রেণিগুলির মধ্যে, শোষক ও শোষিতদের মধ্যে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রাম এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণি (প্রলেটারিয়েট) একই সঙ্গে সমস্ত সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণিগত পার্থক্য এবং শ্রেণি-সংগ্রাম থেকে মুক্ত না করে নিজেকে তার শোষক ও নিপীড়ক বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না।"

মেনিফেস্টোর এই মর্মবস্তু মার্কসবাদেরও মর্মবস্তু এবং তা কার্যত মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েরই মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ-জাত অভিন্ন এক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ-প্রকল্প। কিন্তু এঙ্গেলস কখনাই এক্ষেত্রে নিজের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে চাননি। 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'-র ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় তিনি সবিনয়ে বলেছেন, "কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো আমাদের যুগ্ম রচনা হলেও একথা আমি বলতে বাধ্য যে এর মর্মবস্তু একান্তভাবেই মার্কসের।.... জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনর তত্ত্বের যে অবদান, ইতিহাসের ক্ষেত্রে মেনিফেস্টোর তত্ত্বের অবদানও তাই। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই সেই দিকে এগোচ্ছিলাম। এককভাবে আমি কতদূর এগোতে পেরেছিলাম তা আমার Condition of the Working Class in England গ্রন্থেই ধরা আছে। কিন্তু ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রুসেলস-এ যখন মার্কসের সঙ্গে আমার দেখা হল তখন দেখলাম সে পুরো বক্তব্যটাই চমৎকারভাবে তৈরি করে ফেলেছে।"

মেনিফেস্টো প্রকাশের পর থেকে একদিকে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিকাশ ঘটাবার জন্য নিরন্তর প্রয়াসের কারণে এবং অন্যদিকে সরকারের কোপ ও পুলিশের তাড়নায় মার্কস ও এঙ্গেলস কোনো জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারেননি। ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম, সেখান থেকে আবার জার্মানি। জার্মানি থেকে আবার তাঁরা বিতাড়িত হন। ইতিমধ্যে Neue Rheinische Zeitung নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেও মাত্র এক বছরের (এপ্রিল, ১৮৪৮-মে, ১৮৪৯) তা চালাতে পেরেছিলেন এবং এঙ্গেলস একাই তাতে একশোটির উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জার্মানির পর মার্কস আবার ফ্রান্স ও সেখান থেকে ইংলণ্ডে যান। সাংগঠনিক কাজে এবং কখনো কখনো পৈতৃক ব্যবসায়সূত্রেও এঙ্গেলসকে অনেক সময়েই মার্কসের সঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হতো। তিনিও ইংলন্ডে চলে এলেন। এখানেই ১৮৫০ সালে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ১৮৪৮-৪৯ সালে জার্মানিতে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করে লিখলেন The Peasant War in Germany। এছাড়াও জার্মানির বিপ্লবী পরিস্থিতি ও প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমেরিকার বাম-মনস্ক পত্রিকা New York Daily Tribune-এ এঙ্গেলস Revolution and Counter-Revolution in Germany শীর্ষক যে প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন তার প্রত্যেকটিই পাঠাবার আগে মার্কস দেখে দিতেন।

১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে পিতা, স্ত্রী ও এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরপর মৃত্যুও এঙ্গেলসকে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। তবে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতির মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হল। ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান, পোলিশ ও ইটালিয়ান শ্রমিক প্রতিনিধিরা ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে সমবেত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংগঠন International Working Men's Association। মার্কস তার General Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং নিয়মাবলী রচনা করেন। মার্কস সমস্তকিছুই পত্রযোগে এঙ্গেলসকে জানান এবং এঙ্গেলসও ফিরে এসে এই আন্তর্জাতিকের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দশ বছরের বেশি এই সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা না গেলেও মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু রইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতা হিসাবেই।

মার্কসবাদের মতাদর্শগত দিকটিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলার কাজে এবার তাঁরা বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেন। মার্কসের জীবৎকালে অনেকানেক প্রবন্ধ ছাড়াও এঙ্গেলস দুটি গ্রন্থ রচনা করেন যা মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ্য প্রয়াস হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ১৮৭৩ সালে এঙ্গেলস Dialectics of Nature গ্রন্থটি রচনার প্রস্তুতি শুরু করেন ও ১৮৭৮ থেকে রচনার কাজে হাত দেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এটাই প্রমাণ করা যে ইতিহাসের আপাত সংযোগহীন ঘটনাবলীর মধ্যে যে গতির দ্বান্দ্বিক নিয়ম ক্রিয়াশীল, প্রকৃতির অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও তা একইভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাঁর নিজের জীবৎকালে ভূমিকা আকারে তার অংশবিশেষ প্রকাশত হলেও পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ইতোমধ্যে ১৮৭৬-৭৮ সালে তিনি রচনা করেন Anti-Duhring নামক দ্বিতীয় গ্রন্থটি, যাকে মার্কসবাদের জ্ঞানকোষ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বস্তুবাদ ও ভাববাদের মৌলিক পার্থক্যকে গুলিয়ে দিয়ে এক 'মধ্যপন্থী' দার্শনিক অবস্থান থেকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Eugen Duhring যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রকেই চূড়ান্ত সত্য হিসাবে তুলে ধরে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন, তাকে পদে পদে খণ্ডন করে এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যথার্থতা প্রতিপাদন করলেন। 'দর্শন', 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' ও 'সমাজতন্ত্র' এই তিনটি অংশে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটিতে মার্কসবাদের উৎস ও পূর্ণ অবয়বটিকে তিনি তুলে ধরলেন। ছাপাতে দেবার আগে এঙ্গেলস পুরো পাণ্ডুলিপিটিই মার্কসকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং মার্কস তার দশম পরিচ্ছেদের অর্থনীতি-বিষয়ক একটি অংশ নিজে লিখে দিয়েছিলেন। পল লাফার্গ-এর অনুরোধে ১৮৮০ সালে এঙ্গেলস ফরাসি পাঠকদের জন্য Anti-Duhring-এর নির্বাচিত কয়েকটি অংশ সামান্য পরিবর্তন ও সংযাজন সহ Socialism Utopian and Scientific নাম দিয়ে একটি প্রচারপুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। মার্কস একটি ভূমিকাও লিখে দেন। পরে ইওরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় পুস্তিকাটি অনূদিত হয় এবং মার্কসবাদ প্রচারে এবং ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মার্কসের মৃত্যুর পর একক ভূমিকায় এঙ্গেলস

এঙ্গেলস-এর সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত যে বারো বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, সেই সময়কালে তাঁর ভূমিকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদের বোধকে সমৃদ্ধ ও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মার্কসের অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা, নবতর রচনা, চিঠিপত্র ও বাখ্যার মাধ্যমে মার্কসবাদকে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর করে তোলার কাজে। সেই সঙ্গে একদিকে কল্পবাদী ও পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সমস্তরকম বিকৃতি

এবং অন্যদিক বুর্জোয়া কুৎসা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-এ সদা-নিরত থেকেছেন। সর্বোপরি তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ও প্রয়োগ থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদকে সমৃদ্ধতর করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। মার্কসের Capital গ্রন্থের অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের সম্পাদনা ও প্রকাশনা এবং দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা তাঁর এই প্রয়াস ও তার অপরিমেয় অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ১৮৮৪ সালে রচিত Origin of the Family, Private Property and the State গ্রন্থটিতে এঙ্গেলস মানবসমাজের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস তথা আদিম সাম্যবাদী সমাজ, তার ক্রমিক অবসান ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তিশীল শ্রেণি-সমাজের উদ্ভব, রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার মৌল চরিত্র, এবং শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অনিবার্য অবলুপ্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পরিবার ও তার বিবর্তনের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করেন। আর ১৮৮৬ সালে রচিত Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy গ্রন্থে তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার দার্শনিক উৎস নির্ণয় এবং পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক মতবাদের ত্রুটি ও তাদের সঙ্গে এই বিশ্ববীক্ষার পার্থক্য নিরূপণ প্রসঙ্গে হেগেল ও ফায়েরবাক-এর দর্শনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। এই দুটি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এঙ্গেলস বারংবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে মার্কসবাদ একটি সৃষ্টিশীল মতবাদ, প্রায়োগিক বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো তাত্ত্বিক গোঁড়ামি নয়, তাই পরিবর্তমান সামাজিক বাস্তবতার উপযোগী নতুন নতুন সিদ্ধান্ত তাকে গ্রহণ করতে হবে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর এঙ্গেলস বিশেষ আলোকপাত করেছেন, যার মধ্যে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই বিষয়ে যাতে স্থূল কোনো যান্ত্রিক ও একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে আচ্ছন্ন না করে, সেজন্য তিনি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন যে, চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন-সম্পর্ক, উৎপাদনের পদ্ধতিই উপরিকাঠামো তথা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক চিন্তা-চেতনার নির্ণায়ক, কিন্তু ভিত্তি পাল্টালেই উপরিকাঠামো যান্ত্রিকভাবে পালটে যায় না। বিপরীত প্রক্রিয়ায় উপরিকাঠামোগত উপাদানগুলিও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। ১৮৬৪ সালে যুগ্ম প্রয়াসে রচিত German Ideology গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রকৃত দেখা হলো একটি বিষয়কে সামগ্রিকভাবে দেখা, অর্থাৎ তার বিভিন্ন দিকগুলিকে একে অন্যের উপর ক্রিয়াশীল হিসাবে দেখা। ‘‘পরিস্থিতিই মানুষকে তৈরি করে ঠিক যেমন মানুষই পরিস্থিতিকে তৈরি করে।’’ এই দ্বান্দ্বিক বিশ্ববীক্ষাকে যান্ত্রিক ও অধিবিদ্যাবাদী বীক্ষার শিকার হতে দেখে মার্কস নাকি সখেদে বলেছিলেন, ‘‘আমি শুধু এইটুকুই জানি যে আমি একজন মার্কসবাদী নই।’’ মার্কসের মৃত্যুর পর মার্কসবাদকে বিকৃত করার এই চেষ্টা আরও বেড়ে যায়। এঙ্গেলসকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৯০-৯৪ সালের মধ্যে যোশেফ ব্লক, কনরাড স্মিড্ট্, ফ্রাঞ্জ মেহরিং, ডাব্লিউ বোরজিয়াস প্রমুখ বহু সমালোচকদের কাছে লিখিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে তিনি তার জবাব দেন। চিঠিগুলি Progress Publishers, Moscow কর্তৃক প্রকাশিত Marx and Engles : Selected Correspondence গ্রন্থে সংকলিত আছে। উদাহরণ হিসাবে ১৮৯৪ সালের ২৩ জানুয়ারি বোরজিয়াসকে লেখা একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে এঙ্গেলস অত্যন্ত সংক্ষেপে স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, ‘‘রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশ অর্থনৈতিক বিকাশের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু এদের সবগুলিই একে অপরের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও প্রতিক্রিয়া করে।’’ ভাববাদের ভাব-সর্বস্বতা ও বস্তুবাদের বস্তুসর্বস্বতার মতো কোনো একপাক্ষিক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়েও মানুষ যেমন আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রকৃতিজগতের উপর ক্রিয়া করে, একটি ঐতিহাসিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়েও মানুষ যেমন আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমাজের উপর ক্রিয়াশীল, তেমনি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা নির্ণীত হলেও মানুষের চেতনা দ্বারা নির্মিত উপরিকাঠামোর উপাদানগুলিও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও ক্রিয়া করে। উপরিকাঠামোর এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ছাড়া দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াশীলতা ও সম্মুখগতি সম্ভব নয়।

মার্কসবাদ এইভাবেই একটি বস্তুগত পরিস্থিতির মধ্য থেকে এবং সেই পরিস্থিতিরই দাবিতে উদ্ভূত একটি মতবাদ ঠিকই, কিন্তু চিন্তার স্তরে তা আবার পূর্ববর্তী চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি—যেমন হেগেল ও ফায়েরবাখের চিন্তার ধারা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে মার্কসবাদের। এইখানেই তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য। অন্যদিকে আবার, এই মার্কসবাদই যখন জনগণের মতবাদে পরিণত হয়, তখন তা এক বস্তুগত শক্তির রূপ নেয়। আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বলে তা-ই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পরিবর্তন করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বিপ্লবের মাধ্যমে তত্ত্ব ও বাস্তবের সাযুজ্য স্থাপিত হয়। (Marx : Contrubution to the critique of Hegel’s Philosophy of Right, Progress Publishers, Moscow. p. 52)

মার্কসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রতি এঙ্গেলসের মন্ময় নিষ্ঠা যেমন ইতিহাসে অতুলনীয়, তেমনি সেই বন্ধুত্বজাত ঐতিহাসিক সৃষ্টির প্রতি আত্মগরিমাহীন তন্ময় নিষ্ঠা তাঁকে এক অতুলনীয় মহত্বে উত্তীর্ণ করেছে। মার্কসের জীবৎকালে যেমন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও নিজের জন্য কোনো স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দাবি করেননি এঙ্গেলস। ফ্রান্‌জ্ মেহরিং প্রণীত Lessing-Legende নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে’ অংশটির উচ্চ প্রশংসা করে ১৮৯৩ সালের ১৪ জুলাই তাঁকে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, ‘‘এর মধ্যে আপত্তির যদি কিছু তাকে তা হল যতটা কৃতিত্ব আমার পাওনা নয়, ততটা কৃতিত্ব আপনি আমায় দিয়েছেন। আমি যখন যা কিছু নিজের থেকে খুঁজে বের করেছি তার সবকিছুকে ধরে নিয়েই বলছি, মার্কস কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত পর্যবেক্ষণ ও গভীরতর দার্শনিক প্রজ্ঞার সাহায্যে সে-সব অনেক আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। মার্কসের মতো একজন মানুষের সঙ্গে চল্লিশ বছর ধরে কাজ করবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, তার পক্ষে নিজের যতটা স্বীকৃতিই পাওয়া উচিত বলে মনে হোক না কেন, সেই মানুষটির জীবিতাবস্থায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। সেই মহত্তর মানুষটির মৃত্যুর পরে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিটিকে সহজেই যতটা নয় ততটা বড় করে দেখানো যায়। আমার ক্ষেত্রেও বোধহয় ঠিক সেই বাপারটাই ঘটেছে। ইতিহাসই শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে।’’

এঙ্গেলস-এর দ্বিশততম জন্মবর্ষ মার্কসবাদের নির্মাণ ও প্রয়োগে তাঁর এই ইতিহাস-নির্ণীত সমুজ্জ্বল ভূমিকাকেই তুলে ধরে।

জন্ম দ্বি-শততম বর্ষে শ্রদ্ধা

মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা এঙ্গেলস : তাঁর জীবন ও শিক্ষা

অতনু হুই

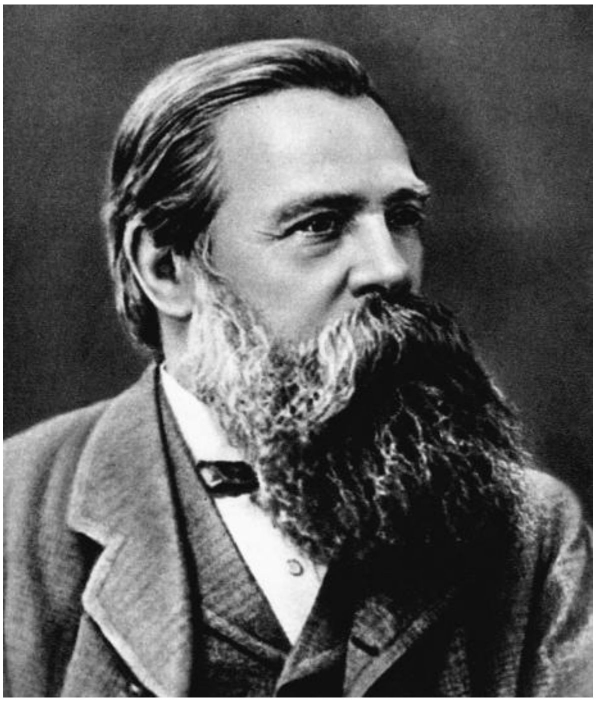

মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। কল্পনা-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের সময়কাল থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা পর্যন্ত এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়, জ্ঞানচর্চার বহমান বিশ্বে মার্কস-এঙ্গেলস দুজন ছিলেন পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। মার্কসবাদ তথা শ্রমিক শ্রেণির বিজয়ের মতাদর্শ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে তাই উচ্চারিত হয় মার্কস-এঙ্গেলসের নাম।

জার্মানির রাইন শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ বার্মেন শহরে ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর এক সুতিবস্ত্র উৎপাদকের পরিবারে জন্ম হয় এঙ্গেলসের।

পারিবারিক সূত্রে শিল্প-মালিকের সন্তান হয়েও শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবর্তে মজুরের জীবনযাত্রা গ্রহণের বাধ্যতা দেখে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছিল তাঁর হৃদয়। ধর্মের অনুশাসন, মাদকের নেশা তিলেতিলে কীভাবে শ্রমিকদের জীবনকে ধ্বংস করছে তা দেখে সর্বদা ব্যথিত ছিলেন তিনি। জাহাজঘাটাতে শ্রমিকের জীবনযন্ত্রণা দেখতে দেখতে সহজে শিখে ফেলেছিলেন বহু বিদেশি ভাষা। বোন মেরিকে রহস্য করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ২৫ টির বেশি বিদেশি ভাষায় পড়তে পারেন তিনি। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করেই পরিবারের ইচ্ছায় এক সওদাগরি হাউসের কর্মচারীর কাজে যোগ দেন। যদিও এই কাজে তাঁর আগ্রহের প্রধান দুটি কারণ ছিল সামরিক এবং বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ।

প্রথম জীবনে মার্কসের মতো হেগেলীয় মতবাদের প্রাবল্য দেখা যায় এঙ্গেলসের মধ্যেও। হেগেলিয়ান দর্শনের প্রশস্ত সড়কে হাঁটতে হাঁটতে, হেগেলের প্রাশিয়ান সরকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখে, এই অত্যাচারী ব্যবস্থার সমর্থক দার্শনিক শিক্ষকের মতবাদের দিক থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নেন এঙ্গেলস। এর মধ্যেই জার্মানিতে প্রভুত্বকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিরন্তন মতাদর্শের বিকাশ ঘটতে থাকলে সেই নতুন ধারণা সঞ্চারিত হয় তাঁর মধ্যে।

১৮৪২ সালে এঙ্গেলসকে তাঁর পিতা পারিবারিক ব্যবসাগত কারণে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে পাঠিয়ে দেন। পিতার অংশিদারী এক কারখানায় সামান্য কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে করতে মাত্র ২২ বছর বয়সেই এঙ্গেলস চার্টিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময় থেকেই তাঁর মনে সাম্যবাদী চিন্তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এই সময় তাঁর রচনা—'দ্য ক্রিটিক্যাল এসেস অন পলিটিক্যাল ইকনোমি' লেখাটি মার্কস-সম্পাদিত প্যারিসের একটি পত্রিকা থেকে প্রকাশিত হয় (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে)। এই লেখায় সমকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুখ্য বিষয়গুলিকে তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছান, ব্যক্তিগত সম্পদের আধিপত্যমূলক শাসনের অনিবার্যতার কারণেই এই ধনবৈষম্য। কাজ করতে করতে যন্ত্রণাদীর্ণ ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা বিশ্লেষণ করে 'কণ্ডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড' অর্থাৎ, 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' নামে তিনি আরো একটি বই লেখেন। এই গ্রন্থটি শ্রমিক শ্রেণিকে বুঝতে একটি অমূল্য গ্রন্থ। এখানে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন ধন-সম্পদ ইংল্যাণ্ড শাসন করছে, আর আইন দরিদ্রদের পেষণ করছে এবং ধনীরা আইনকে শাসন করছে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক জ্ঞানভাণ্ডারে এক উজ্জ্বল মানিক্য হিসাবে আজও বিবেচিত হয়। বলা বাহুল্য, তখনো সমাজতান্ত্রিক

ধারণার বীজমন্ত্র 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' কিন্তু রচনা হয়নি।

১৮৪৪ সালে প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই অবিচ্ছেদ্য দুই বন্ধুর মতাদর্শ সংস্থাপনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পথচলার সূচনা ঘটায়। এই দশদিনের মত-বিনিময়ের পরিণতিতে দুই বন্ধুর যৌথ লেখনীর ফসল 'হোলি ফ্যামিলি' বা 'এ ক্রিটিক অফ ক্রিটিক্যাল ক্রিটিসিসিম' গ্রন্থটি। এর প্রথম অংশ এঙ্গেলস্ লেখেন এবং তা শেষ করেন কার্ল মার্কস। সেই সময় ব্রুনো বেয়ার ও তার পরিবারের কল্পসমাজতন্ত্রের ধারণাকে সমালোচনা করে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়।

১৮৪৫ সালে পরিবারের সঙ্গে মানসিক বনিবনা আর না হওয়ায় তিনি পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। এই সময় দুই বন্ধুর যৌথ প্রস্তুতি—'জার্মান আইডিওলজি'। যদিও এই গ্রন্থটি তাঁদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁদের মৃত্যুর বহু বছর পরে ১৯৩২ সালে প্রথম জার্মান ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ইতিহাসের বিচার পদ্ধতি, তার বস্তুগত দিক, যা সেই আর্থ-রাজনৈতিক ভিত্তিমূলের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত, তা তিনি দেখিয়ে দেন। এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বই যে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তার মূলে থাকে জনশক্তি, তা প্রমাণ করে দেন।

এরপর থেকে তাঁরা দুই বন্ধু শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির কর্মযজ্ঞে একসঙ্গে আত্মনিবেদন করেন। প্যারিসে গড়ে ওঠা প্রথমে 'লিগ অব দি জাস্ট' তারপর 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর ভিতরে কাজ শুরু করেন। এবং তাঁদের দায়িত্বেই ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয় 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'। যেখানে বুর্জোয়ার উচ্ছেদ এবং সর্বহারা শাসন প্রতিষ্ঠা, শ্রেণি বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরানো সমাজের অবসান ও শ্রেণিহীন শোষণহীন নতুন সমাজ গড়ে তোলার রূপরেখা ব্যক্ত করা হয়। পূর্বের 'সমস্ত মানুষ ভাই ভাই' আহ্বানকে বদল করে ইশতেহারে বলা হলো— 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'।

এই সময় মার্কসের 'দি এইট্টিন্থ ব্রুমেয়ার অফ্ লুই বোনাপার্টি' যেমন সাড়া ফেলে তেমনি এঙ্গেলসের লেখা—'দি পেজেন্ট ওয়ার ইন জার্মানি' এবং 'রেভোলিউশন অ্যান্ড কাউন্টার-রেভোলিউশন ইন জার্মানি' গ্রন্থ-দুটিতে বিপ্লবের প্রয়োজনে কৃষক শ্রেণির সহযোগিতা কত প্রয়োজন তা যেমন দেখানো হয়, তেমনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে জার্মানিতে অভ্যুত্থান ও তার সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়।

পরিবারিক কাজ ইত্যাদি সূত্রে প্রথম জীবনে এঙ্গেলসের বুর্জোয়া সঙ্গী-সাথী কম ছিল না। তাদের পার্টিতে যাতায়াত, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ, ভোজসভায় হাজির থাকা ছিল এঙ্গেলসের বর্ণময় রঙিন জীবনের আরেকটি অধ্যায়। চমৎকার ঘোড়সওয়ার ছিলেন তিনি। এক গ্লাস মদ্যপানের তারিফ করা সদা হাস্যময় এই মানুষটির এরূপ বৈভব জীবনের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা—যা বোঝার উপায় তাঁর বুর্জোয়া বন্ধুদের কখনো হয়ে ওঠেনি।

১৮৪২ সালে সম্ভবত 'রাইনিস জেটুং' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের প্রথম পরিচয় হয়। এই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল আমৃত্যু পর্যন্ত। দুটি মানুষের সম্পর্ক থেকে দুটি পরিবারের মধ্যে একই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধন গড়ে ওঠে। মার্কস ছিলেন স্বভাব-নেতা। তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তাকেই তিনি প্রভাবিত করেছেন। এবং এক্ষেত্রে এঙ্গেলস ব্যতিক্রম ছিলেন না।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যর্থতা-জনিত পরিস্থিতি উভয়কে দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখনই এঙ্গেলস্ ম্যাঞ্চেস্টারে সওদাগরি অফিসে কেরানির কাজ নিয়ে চলে আসেন। আর মার্কস লন্ডনে। তবে উভয়ের পত্র-যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। পরে ব্যবসায়িক পারিবারিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে মার্কসের বাড়ির কাছে আস্তানা গাড়েন এঙ্গেলস। দুপুরে, রাতে, সময় পেলেই একসাথে, পার্কে একসঙ্গে হাঁটা, আর চিন্তার বিনিময় দুজনকেই জ্ঞানের সুউচ্চ মিনারে তুলেছিলো। দুজনেই দুজনকে যারপরনাই সাহায্য করতেন। মার্কসের লেখার ইংরেজি অনুবাদে সাহায্য করতেন এঙ্গেলস, আবার অর্থনৈতিক সূত্র স্থাপন করার কাজে এঙ্গেলসকে সাহায্য করতেন মার্কস। সর্বদা একে অপরের কাছ থেকে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর জন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত দুজনেই সংশয়মুক্ত হতে পারতেন ততক্ষণ সেই বিষয়ে পড়াশোনা আর আলোচনা চলত একই সঙ্গে।

যৌবনকাল থেকেই এঙ্গেলস্ সাজগোজের বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। ছিপছিপে রিজু লম্বা চেহারার মানুষটির মধ্যে ছিল এক সমরনায়কের প্রতিচ্ছবি। জীবনে কিছুদিন তিনি সামরিক বিভাগে কাজ করেছিলেন শুধু সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এঙ্গেলস জার্মানি, ফ্রান্স সহ বেশ কিছু দেশের যুদ্ধকৌশল ভালোভাবে নজরদারি করেন এবং যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফলকে ঘনিষ্ঠমহলে যুক্তিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেন। এ কাজ একজন সামরিক জেনারেল ছাড়া কখনোই সম্ভব ছিল না। মনে করা হয়, বৈপ্লবিক যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধাবলী এবং সেখানে সামরিক বিশ্লেষণ দেখে মনে হতে পারে এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো সেনা জেনারেলের কথা। এই কারণে মার্কসের বড় কন্যার সুবাদে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়মহলে এঙ্গেলসকে 'জেনারেল' নামে ডাকা হতো।

মার্কস ও তাঁর পরিবারকে অনাহার থেকে বাঁচাতে, মেহনতির মুক্তিমন্ত্রের উদ্ভাবক, তার চিরস্রষ্টাকে তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে, একদা অনিচ্ছুক এঙ্গেলস বাধ্য হন পারিবারিক ব্যাবসায় ফিরে যেতে। যে পরিবারকে, পারিবারিক বিলাস-বৈভবকে এক লহমায় ছেড়ে চলে এসেছিলেন একদিন, তিনি সেখানেই ফিরে যান কেবল বন্ধুকে রক্ষা করতে, যাতে তার কিছু আর্থিক সংস্থান করতে পারেন। মার্কসকে পাওনাদারদের হামলা থেকে রক্ষা পেতে অনেক সময় লুকিয়ে বেড়াতে হতো। তাঁর একমাত্র পুত্র কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। নিজ স্ত্রী, আদর্শ প্রেমিকার মৃত্যু এঙ্গেলসকে যতটা না মর্মাহত করেছিল, তার থেকে বেশি বন্ধু মার্কসের জীবন যন্ত্রণায় তিনি কাতর ছিলেন।

এই সময় মার্কস তাঁর রচনা ছাপিয়ে যাতে কিছু রোজগার করতে পারেন তার জন্য পত্রিকা দপ্তরের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখনই 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখার জন্য আমন্ত্রণ পান। কিন্তু 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের কাজ বন্ধ রেখে নিয়মিত এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তখন বন্ধুর প্রয়োজনে এই দায়িত্ব এঙ্গেলস্ নিজ কাঁধে তুলে নেন। ওই পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের এক-তৃতীয়াংশ কার্যত এঙ্গেলসের লেখা। ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক মার্কসকে 'বিশ্বকোষ' লিখতে বললে মার্কস সে দায়িত্ব এঙ্গেলসের কাঁধে তুলে দেন। বন্ধুকে বাঁচাতে শত কাজের ভিড়ে সেই দায়িত্ব হাসিমুখে গ্রহণ করেন এঙ্গেলস্। যখন এঙ্গেলস্ জানতে পারেন আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে মার্কস পোষাকের অভাবে বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না, লেখালেখির জন্য সামান্য কাগজ কেনার পয়সাটুকু নেই, তখন এঙ্গেলস্ বিন্দুমাত্র দেরি না করে মার্কসকে

অর্থ-সাহায্য পাঠান, তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

১৮৬৭ সালে মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করেন। এই যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রকাশের পরেও বুর্জোয়া মহলে নীরবতা ও আগ্রহহীনতায় মার্কস বিস্মিত হন। তখন মার্কসের সঙ্গে পত্রযোগে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন বুর্জোয়া কাগজে এঙ্গেলস্ সুকৌশলে ক্যাপিটাল গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনার ভঙ্গিতে এই রচনার কিছু অংশ, আসলে এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তুলে ধরতে থাকেন। এই কৌশল সফল হয়। বুর্জোয়া, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মহলে সমালোচনার দৌলতে গ্রন্থটি নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। চর্চা ও মতবিনিময় শুরু হয়। ফলে গ্রন্থটির প্রকাশ ও বিক্রি বেড়ে গেলে মার্কস কিছুটা আর্থিক নিশ্চয়তা ফিরে পান। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ শেষ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী দু'খণ্ড অমানুষিক পরিশ্রম করে শেষ করেন এঙ্গেলস। তাঁর প্রচেষ্টায় পৃথিবী জানতে পারলো 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'। অমরত্ব পেল-মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ।

মার্কস-এঙ্গেলসের জীবদ্দশাতেই, এঙ্গেলসের রচনার কথা তুলে ধরে তিনি কতোটা মার্কস-বিরোধী এবং তিনি মার্কসকে কতটা ছাপিয়ে গেছেন, এ ধরনের মিথ্যা, কুৎসা প্রচার করে, অন্যান্য অনেক রকম প্রচেষ্টার মতো কার্যত মার্কসবাদকে আক্রমণ করা শুরু হয়। এঙ্গেলস্ এর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেন এবং জবাব দেন। 'ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান ফিলজফি অ্যাণ্ড ফয়েরবাখ্' সংক্রান্ত এক গ্রন্থে মার্কসের অবদান প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন— ''মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে ৪০ বছরের বেশি একসাথে কাজ করবার সময়ে বা তার পূর্বে তত্ত্বের ভিত্তি রচনায় ও তা প্রসারিতকরণে আমার কিছু হয়তো স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল। কিন্তু প্রধান মৌলিক তত্ত্বগুলি রচনায় ও চূড়ান্ত চমকপ্রদ সূত্রায়ণের অবদান মার্কসেরই। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আমার যা অবদান তা মার্কস আমার সহায়তা ছাড়া স্বচ্ছন্দে করে নিতে পারতেন। কিন্তু যতখানি তিনি সমর্থ হয়েছেন আমি ততোখানি নাও হতে পারতাম। মার্কস এক উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সকলের চেয়ে দ্রুতগতিতে তাঁর মতামত গড়ে তুলতে পারতেন। মার্কস হলেন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি আর আমাদের অন্যদের বড়জোর গুণী বলা যেতে পারে। তাই খুব সঠিকভাবেই এই তত্ত্ব তাঁর নাম বহন করছে।'' আত্মস্বার্থলেশহীনতা ছিল এঙ্গেলসের জীবনের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি সর্বদা তাই বলে গেছেন— 'মূল গায়েন ছিলেন মার্কস, আমি ছিলাম দোহার মাত্র'।

১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ মার্কসের মৃত্যু হয়। দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতা, মানবমুক্তির দিশারী, এক মহান প্রাজ্ঞকে হারালেন। লন্ডনের হাইগেট সমাধিস্থলে মার্কসের সমাধি-পাশে বিদায়-বেলায় প্রিয় বন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এঙ্গেলস্ বলেন—'......তাঁর নাম এবং সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে স্থায়ী থাকবে'। অশ্রুসজল নয়নে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজও কতোটা সত্য ও প্রাসঙ্গিক তা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের দিন বদলের লড়াই প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দেয়।

খাদ্যনালীতে ক্যান্সারের কারণে ১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে দান করেন। একাংশ দিয়ে যান মার্কসের কন্যাদের,যাতে তাদের আর দারিদ্রের যন্ত্রণার মুখোমুখি না হতে হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। শেষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক নেতাদের উপস্থিতিতে তাঁর প্রিয় সমুদ্রতীর, ইস্টবোর্নের সাগরের জলে দেহভস্ম ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমজীবীর আন্তর্জাতিকতায় চিরবিশ্বাসী এক বিশ্বনাগরিক এভাবে নির্দিষ্ট দেশের সীমানা পেরিয়ে বসুন্ধরার কোলে নিজেকে বিলীন করে দেন।

আজ তাঁর জন্মের দ্বি-শততম বর্ষে প্রয়োজন এই মহান মানুষটিকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করা। কেবল মার্কসের নামের পাশে উচ্চারিত এঙ্গেলস এক নাম নয়, তিনি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ং এক মানবমুক্তির মতাদর্শের চির-উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মার্কসবাদের সাথে এঙ্গেলস বেঁচে থাকবেন একসাথে অবিচ্ছেদ্য দুই বন্ধুর মতাদর্শের যুগলবন্দিতে, এবং নিজ স্বকীয়তায় আলোক উদ্ভাসিত-হয়ে।

কৃতজ্ঞতা

১. মার্কস-এঙ্গেলস্ স্মৃতি—অনুবাদ ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

২. এঙ্গেলস—ইয়েভগেনিয়া স্তেফানোভা

৩. মানব মুক্তির মনীষা—অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী

Sl. No. 51

With best compliments of

SRB REFRACTORIES ENTERPRISE LTD.

61, Kankulia Road, Flat No. 202B, 2nd Floor, Kolkata-700 029, WB
Mob. 9832195056, 9830472172, E-mail : sgupta.srbc@gmail.com

Specialist in

MAKING ALL TYPES OF BAKING, RE-BAKING FURNACES, TUNNEL, GRAPHITISATION UNIT, CIVIL, ANNUAL MAINTAINANCE OF ANY TYPES OF FURNACES, CASTING REFRACTORY SPECIALIST.

Sl. No. 75

লেনিন : এক আত্মসমীক্ষাময় অনন্য জীবন

অর্পিতা ব্যানার্জী

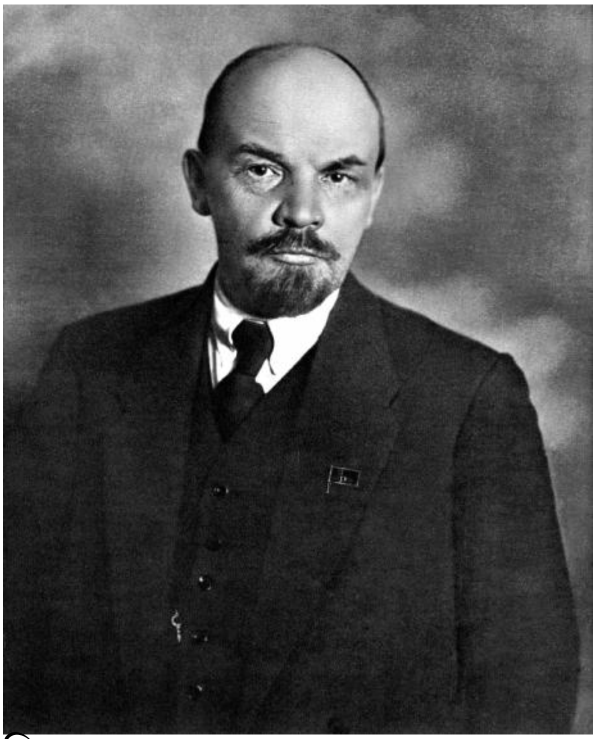

তিনি থাকেন আমাদের চেতনায়, আমাদের অপরাজিত স্বপ্নে, বাস্তবের অভিঘাতে সম্বিত ফিরে পাওয়ার মুহূর্তগুলিতে—তিনি থাকেন বিপ্লবের সর্বপ্লাবী আবেগের উৎসমুখ হয়ে। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ ওরফে লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। কৈশোর থেকেই লেনিনের বক্তিগত জীবন উপল-সঙ্কুল।

প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হুমকিতে ত্রস্ত এবং অকাল অবসর গ্রহণে নিতান্ত বাধ্য হয়ে পড়া বাবার মৃত্যু এবং তার অনতিকাল পরেই ১৮৮৭ সালে প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার উইলিয়ানভের (যিনি নারদনিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন) মৃত্যুদণ্ড আমূল নড়িয়ে দেয় কিশোর লেনিনের চেতনাকে। কঠোর-বাস্তবের এই অভিঘাতেই সম্ভবত এক অনিবার্য মানসিক উত্তরণ ঘটার পূর্বপ্রেক্ষা নির্মিত হচ্ছিল লেনিনের অন্তর্বিশ্বে। বিষয়টি আরও ত্বরান্বিত হয় ১৮৮৮ সালে, যখন কাজামে প্রায় নির্বাসিত জীবন অতিবাহনের সময় তাঁর পরিচয় ঘটে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কসের একাধিক রচনা, বিশেষত রাজনৈতিক অর্থনীতি সংক্রান্ত 'দ্যাস্ ক্যাপিটাল'-এর সাথে। প্রসঙ্গত প্রবন্ধের সূচনাতেই এই বিষয়টিকে স্বীকার করে নিতে হয় যে লেনিনের মতো এক বিপুল ব্যক্তিত্বের চিন্তাজগতের বিস্তৃত পরিধিকে প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সচেতনভাবেই প্রাবন্ধিক বেছে নিয়েছেন এমন কিছু বিষয় যা লেনিনের সমকালে এবং বর্তমানের প্রেক্ষিতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক—যেমন প্রলেতারীয় আন্দোলন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট জটিলতা, পার্টির সদস্যপদ এবং নেতৃত্ব প্রসঙ্গে লেনিনের অবস্থান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক অবস্থান বা নীতিগুলির পুনর্বিবেচনা এবং পুনঃসমীক্ষা।

লেনিনের সমসাময়িক, এমনকি সাম্প্রতিক সমালোচকদের একটি বড় অংশই তাঁর ব্যক্তিত্বকে ব্যবচ্ছেদিত করে তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন এক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু ইতিহাসের নিরাসক্ত এবং কিছুটা সচেতন দূরত্বে থেকে যদি তৈরি করা যায় কোনো সমান্তরাল পাঠসম্ভাবনা—তবে হয়তো সুবিচার পাবে এই আদ্যন্ত আত্মসমীক্ষক ব্যক্তিত্বটি। কারণ তিনিই সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি ভয়াবহ স্বাস্থ্যহানির কাছে অনিবার্য পরাজয়ের ভবিতব্যকে নিশ্চিত জেনেও পুনর্বিবেচনা করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রণনীতিগুলিকে। এমনকি কঠোর পরিশ্রমে লালিত তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিগুলির পুনঃসমীক্ষা করে, সেগুলির মধ্যেও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা পরিমার্জন আনতে কুণ্ঠিত হননি—আর সেখানেই তিনি অনন্যসাধারণ।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে লেনিনের পরিচয় রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের প্রধান নেতা এবং রণনীতি নির্মাণকারী এবং পরবর্তীকালে (১৯১৭-২৪) সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্মাতা এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বামপন্থী রাজনীতিকে একটি বিকল্প রাজনীতির ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কমিনটার্ন (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল) গঠন থেকে শুরু করে একটি বিশিষ্ট মার্কসবাদী ভাষ্যের (মার্কসবাদ-লেনিনবাদ) জনকরূপেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কিন্তু একথা দাবি করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, অজস্র প্রাতিষ্ঠানিক পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও লেনিনের সবচেয়ে বড় গ্রহণযোগ্যতা সম্ভব সেই পরিস্থিতিকে ঘিরে যেখানে তিনি মার্কসবাদকে একটি রণনীতিগত কৌশলে বাস্তবায়িত করতে উদ্যত হন। মতাদর্শ এবং তার রূপায়ণ, এ-ও আবার রাশিয়ার মতো জারশাসিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে—বিষয়টি যে কতখানি জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত সমস্যাসঙ্কুল, প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তার কিছুটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা চলবে।

১৮৮৯-এর মধ্যেই লেনিনের মার্কসীয় ভাবাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ পর্বটি মোটামুটিভাবে সুসম্পন্ন হয়। এরপর বেশ কিছু পরিচিতি এবং পারস্পরিক ভাবনা আদানপ্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে লেনিনের

সমাজতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার রূপরেখাগুলি স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৯৫-এ পশ্চিমে যাত্রাকালে বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্লেখানভ এবং ওই বছরই রাশিয়ায় ফেরার সময় অপর বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক (এবং পরবর্তীকালে মেনশোভিক গোষ্ঠীর প্রধান) এন. মারটভের সাথে তাঁর পরিচিতি। মূলত এঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে রাশিয়ার বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয় এবং জন্ম নেয় 'Union for the Struggle for the Liberation of the Working Class'। এই সংগঠনটির মূল কাজ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব স্বার্থবিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। তবে এইসব বৈপ্লবিক কাজে ইন্ধন যোগানোর ক্ষেত্রে লেনিনের ভূমিকার বিষয়ে অবগত প্রশাসন, ১৯৮৫তে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে তাঁকে প্রথমে পনেরো মাস এবং পরে প্রায় তিন বছর সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করে। নির্বাসন-শেষে যেন আরও দ্বিগুণ উৎসাহে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন লেনিন। প্লেখানভ, মারটভ এবং অন্যান্য তিনজন সম্পাদকের সাথে একত্রিত হয়ে তাঁরা প্রকাশ করেন বৈপ্লবিক পত্রিকা 'Iskra' যার আক্ষরিক অর্থই ছিল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। 'Iskra' প্রকাশনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলগুলি এবং রাশিয়ার মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করা। বলা বাহুল্য যে, রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষভাবে সাড়া জাগায় 'Iskra'। এই জাতীয় ঘটনাক্রম নিঃসন্দেহে লেনিনকে একটি বৈপ্লবিক মার্কসবাদী পার্টি গঠনে প্রণোদিত করে। তবে অচিরেই আসে আত্মমূল্যায়ন এবং পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন—১৮৯৮-এ মিনস্ক এবং ১৯০৩-এ লন্ডনে পরপর দুটি কংগ্রেস চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুটি বিষয় নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ক্রমশই বিতর্কও ঘনীভূত হতে থাকে। প্রথমত, কারা পাবেন পার্টির সদস্যপদ এবং কেমনই বা হবে পার্টির আভ্যন্তরীণ শৃখলা; দ্বিতীয়ত, সর্বহারার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর পার্টির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত থাকবেন সর্বহারা/প্রলেতারীয় শ্রমিকশ্রেণি। এর মধ্যেই ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় লেনিনের 'What is to be Done' এই সময় থেকেই 'স্বতস্ফূর্ততার' তত্ত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধতা দেখাতে থাকেন লেনিন। লেনিন প্রায় দ্বিরুক্তিহীনভাবেই বলেন যে পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্ম হবে এবং পার্টি কেবল একটি সঞ্চালক সংস্থা বা coordinator হিসেবে কার্য সম্পাদন করবে—এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অলীক। সম্পূর্ণরূপে পূর্ণসময়ের জন্য নিয়োজিত প্রশিক্ষিত নেতৃত্ব বা 'ভ্যানগার্ড' নেতৃত্ব ছাড়া শ্রমিকশ্রেণিকে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব নয় বলেই লেনিন মনে করতেন। এ বিষয়ে লেনিনের বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেন, পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে প্রলেতারীয় বা সর্বহারা শ্রেণির জন্ম হয় ঠিকই, কিন্তু শ্রেণি হিসেবে এই 'class -in-itself' সচেতন নয়, একে সচেতন এবং একটি বৈপ্লবিক শ্রেণিতে পর্যবসিত করতে হলে, অর্থাৎ 'class-for-itself' হিসেবে সংগঠিত করতে হলে প্রয়োজন সুশৃঙ্খলভাবে সুদক্ষভাবে পরিচালিত প্রশিক্ষণ। সেই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব থাকবে পেশাদারিভাবে সুদক্ষ পার্টি সদস্য বা ভ্যানগার্ডদের উপর। এক্ষেত্রে লেনিন তাঁর সমসাময়িক অর্থনীতিবিদ (Economist) এবং উগ্রপন্থাবাদী (terrorist) সকলের ব্যর্থতাকেই তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। প্রসঙ্গত Marxism After Marx এ David McLellan-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন, 'His main point was that these groups showed inadequate leadership and inablity to articulate the role of the proletariat as leader of all classes in the struggle against the autocracy'.[1] (MeLellan 92)

লেনিনের কাছে রাশিয়ার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেমন তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, রাশিয়ার হস্তশিল্পনির্ভর শ্রমিক বাহিনী জাতীয় পুঁজিবাদী বিকাশের একটি সমান্তরাল ধারা হিসেবে গড়ে ওঠার দক্ষতা তখনও অর্জন করতে পারেনি। আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ায় পুঁজিবাদের যে অপরিণত বিকাশ, তা থেকে জন্ম নেওয়া শ্রমিক বাহিনীর চেতনাবিশ্ব-ও অপরিণত। একটি আদ্যন্ত বিকশিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকবাহিনীর মধ্যে তৈরি হওয়া বৈপ্লবিক চেতনার সাথে প্রতিতুলনায় এই অপরিণত অবস্থার বিষয়টিকে পৃথকভাবে ভেবে দেখা তাই একান্তভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন এক্ষেত্রে তাঁর প্রায় সমকালীন সমাজতান্ত্রিক (যদিও তারা লেনিনীয় ঘরানার সমালোচক ছিলেন) প্লেখানভ এবং অ্যাক্সেলরডের মতোই বিশ্বাস করতেন যে, যদি প্রলেতারীয়দের তাদের স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতেই সচেতন হতে দেওয়া হয়, তবে অনিবার্যভাবেই তারা অনুসরণ করবে বুর্জোয়া মতাদর্শকে। লেনিন তাঁর 'What is to be Done?'-এ এ-কথা খুব স্পষ্টতই উল্লেখ করেন যে, বাস্তবত শ্রমিকদের কাছে বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক—এই দুটি মতাদর্শই খোলা রয়েছে—এক্ষেত্রে কোনও মধ্যমপন্থার অবকাশ নেই। তাঁর ভাষায়, 'Hence, to belittle the socialist ideology in any way, to turn aside from it in the slightest degree, means to stnengthen bourgeois ideology. There is much talk of spontaneity. But the spontaneous development of the working class movement leads to its subordination to bourgeois idology, to its development along the lines of the credoprogramme, for the spontaneous working class movement is trade-unionism.... and trade-unionism means the ideological enslavenent of the workers by the bourgeoistie.'[2] (Lenin 156)

সুতরাং সামান্যতম ব্যতিচারও যে শ্রমিকদের পাতিবুর্জোয়া সংস্কৃতির অনুবর্তী করে তুলতে পারে সে বিষয়ে লেনিন ক্রমশই দৃঢ় ধারণা পোষণ করতে থাকেন। শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা যেন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কৃতির মধ্যে বদ্ধ হয়ে না পড়ে, সে বিষয়টিকে বারবার সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন লেনিন। তাই 'What is to be Done?'-এর চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা হয় যে, এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে গড়ে তুলতে হবে একটি আন্তঃরুশ প্রতিষ্ঠান—যার মূল মুখপাত্র হিসেবে থাকবে 'Iskra'। এই সংগঠনের মূল কাজ হবে সমগ্র রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির মধ্যে এক ধরনের গোপন সংযোগসাধন এবং কেন্দ্রীকরণ, বিশেষীকরণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে একটি মৌলিকতত্বভিত্তিক কর্মপরিচালনধারা গড়ে তোলা। আর সম্ভবত পেশাদার পর্যায়ে প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে পার্টিকে গঠন করবার এই লেনিনীয় অবস্থান/প্রচেষ্টা 'রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি'র মধ্যে ক্রমশ একটি বিভেদরেখা স্পষ্ট করে তোলে—যাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী লেনিনপন্থী বলশেভিক এবং অন্যটি মারটভপন্থী মেনশেভিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

লেনিন পার্টির সদস্যদের পেশাদারিত্ব বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, প্রথমত, পার্টি-সদস্যদের ক্ষেত্রে পূর্ণসময়ের জন্য আত্মনিয়োজিত থাকা এবং পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত হওয়া বাধ্যতামূলক হবে; দ্বিতীয়ত, এঁরাই শ্রমিকবাহিনীকে যথার্থভাবে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে প্রশিক্ষিত করে তুলবেন। লেনিন এবার স্পষ্টতই বললেন, 'the struggle against the political police requires special qualities, it requires professional

revolutionaries.'[3] (Lenin 215)

তবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে গণসংস্থা বা 'mass organization'-এর বিষয়ে লেনিনের আপত্তি ছিল। তবে তিনি স্পষ্টতই যে-কোনো গণসংস্থা থেকে পার্টি-প্রবরদের স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে লেনিনের একটি বিবৃতি আমাদের বিশেষভাবে নজর টানে। লেনিন লিখছেন—'We must have such circles, trade unions and organisations everywhere in as large a number as possible and with the widest variety of functions; but it would be absurd and harmful to confound them with the organisation of revolutionaries, to efface the border-line between them, to make still hazy the all too faint recognition of the fact that in order to serve the mass movement we must have people who will devote themselves exclusively to Social-Democratic activities.'[4] (Lenin 215)

এমনকি লেনিন পার্টির অভ্যন্তরেও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু তিনি যা বারবার মনে করিয়ে দিতে চাইছিলেন সেটিও তার সমকালের প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই। তিনি মনে করেছিলেন তৎকালীন রাশিয়ার পরিস্থিতি এমনই সংকটময় এবং অস্থিরতাপূর্ণ যে পার্টির সমস্ত পদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয়, বরং কিছু প্রাধান্যশীলের নেতৃত্ব বা 'অলিগারকি'-র নীতি মেনেই এক্ষেত্রে পার্টির নেতৃত্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে। তাঁর ভাষায় — 'The leadership would thereforce have to be chosen through the oligarchical praincipile of co-option.'[5] (Lenin 229ff)

তবে পার্টির সদস্যপদ সম্পর্কে 'What is to be Done'-এ যে অবস্থান লেনিন গ্রহণ করেন তা থেকে তিনি নিজেই কিছুটা সরে আসেন ১৯০৫-এর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, কারণ সেই সময় পার্টির সদস্যপদ প্রায় দশগুণ বেড়ে যায় এবং ভ্যানগার্ড পার্টির সনাতন চরিত্র এবং গণপার্টি বা মাস-পার্টির মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্য ঘুচে যেতে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে গুপ্তপার্টি (clandestine party) হিসেবে পার্টির গুরুত্ব এখনও পুরোপুরিভাবে নস্যাৎ করছেন না লেনিন, কিন্তু পরিস্থিতি সাপেক্ষে নিজেই লিখছেন 'our party has stagnated while working underground.'[6] (Lenin 32) ফলত পার্টির কেন্দ্রবর্তী বৃত্তকে প্রসারিত করার উদ্যোগ লক্ষ করা যায় যা আগের থেকে নমনীয় এবং মুক্ত। লেনিন এক্ষেত্রে পার্টি-সংগঠনের কিছু বাছা বাছা নীতি প্রয়োগ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা হ্রস্বায়নে স্বয়ং আত্মনিয়োজিত হন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণভোটের উপরও তিনি গুরুত্ব দিতে থাকেন। ফলত তৈরি হয় এক নতুন পার্টিতত্ত্ব, যাকে এককথায় বলা হয় 'democratic centralism' বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। লেনিন নিজেই এবার স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির স্বীকৃতি দিলেন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক একক হিসেবে এবং পার্টির উচ্চপদগুলিতে নির্বাচনের উপরও গুরুত্ব দিলেন। পদগুলিকে দায়বদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার কথাও বললেন সরাসরি। লেনিনের ভাষায়— '(this means) working tirelessly to make the local organisations the principal organisational unit of the party in fact, and not merely in name, and to see to it that all the highest standing bodies are elected, accountable and subject to recall.'[7] (Lenin 376) শুধু তাই নয়, পার্টির মধ্যে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাদের অধিকারকেও সুরক্ষিত রাখতে বদ্ধপরিকর পার্টি, একথাও স্বীকার করে নেন লেনিন।

বলা বাহুল্য যে, পার্টি-প্রশ্নে লেনিনের এমন অবস্থানগত প্রতিসরণের কিছু বাস্তবিক ভিত্তি ছিল। ১৯০৫-০৬ সমগ্র রাশিয়াতে যে বৈপ্লবিক আবহের সঞ্চার হয়েছিল তার গণভিত্তিকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। ১৯০৫-এর বিপ্লব ব্যর্থ হলে ১৯০৮-১২-র মধ্যে বলশেভিক এবং মেনসেভিকদের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। ফলত বলশেভিক পার্টি-প্রবণতার ধ্রুপদী রূপকে চালিয়ে নিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়ার আশংকা বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় পার্টির গণতান্ত্রিক ভিত্তিটিকে নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা লেনিনের মতো দূরদর্শী নেতার অনবগত ছিল না। এর ফলশ্রুতিতেই পার্টির সদস্য গ্রহণ এবং পার্টি পরিচালনায় কিছুটা গণতান্ত্রিক শিথিলতা আনয়নের প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। ১৯১৭ সালে বাস্তবিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই সময় আবারও পার্টির সদস্যপদ দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলত লেনিনীয় ধ্রুপদী বলশেভিক মডেলে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা হয়। বোঝা যায় যে, এই নবোত্থিত পরিস্থিতিতে 'একপাথুরে' (monolithic) এবং 'ভীষণভাবে কেন্দ্রীত' (highly centralised) পার্টি-কাঠামোকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। একদা ট্রটস্কিকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে সমালোচনা করলেও তাঁর মতামতের সাথে এবার কিছুটা সহমত হন লেনিন। ফলত বলশেভিক পার্টি সংক্রান্ত মতাদর্শের এক সাময়িক নমনীয়তা লক্ষ করা গেল এই সময়ে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই নমনীয়তা স্বাভাবিক কারণেই খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বাস্তব সমস্যাকে মাথায় রেখেই আবারও ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে পার্টি শৃঙ্খলার পুরাতন চেহারা ফিরে আসতে থাকে। অর্থাৎ বাস্তবোচিতভাবে লেনিনকে পার্টির আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ বা পেশাদারিত্বের বিষয়টিকে বারবার পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে, এর ফলে দলের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয় দিক থেকেই বিপুল বিতর্ক এবং সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি।

বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নেয় ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে। এই সময় একাধিক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন বলশেভিক আন্দোলনের নেতা লেনিন। এই সময়ের সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোভিয়েতগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ে আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণ, শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যেকার সাম্পর্কিক জটিলতা হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় রণনীতি উদ্ভাবন, জার্মানদের সাথে নতুন সাম্পর্কিক সমীকরণ স্থাপন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি। একদিকে কমিউনিস্ট পার্টির উপর ক্ষুব্ধ হতে থাকা জনগণ, অন্যদিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে শ্লিয়াপ্নিকভ এবং কোলোনটাই-এর নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রমিক বিক্ষোভগুলির আবহে পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রমিক বিক্ষোভগুলির মূল দাবি ছিল শ্রমিক সংগঠনগুলির দ্বারাই নেতা নির্বাচন এবং পার্টি নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, পার্টির অভ্যন্তরে উদারীকরণ নীতির প্রয়োগ এবং আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির হাতে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদানের দাবিও জোরালো হতে থাকে। কিন্তু ১৯২১ সালে ক্রনস্টাডট্ বিদ্রোহকে নির্মমভাবে রোধ করে বলশেভিকরা। এর পরই লেনিনের নেতৃত্বে ২১ মার্চ দশম পার্টি কংগ্রেসে এক অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা লেনিনীয় উদ্যোগে তাঁরই তৈরি রাজনীতির ধারাবাহিকতায় এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক এনে দেয়। এক্ষেত্রে লেনিন দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেন—বলা হয় যে, প্রথমত, পার্টি একতার পরিপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে (যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল Worker's Opposition Group) তাদের ভিত্তি-নির্বিশেষে অবিলম্বে ভেঙে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে চলবে বহিস্কারের পন্থা পদ্ধতি প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, Worker's Opposition Group-কে বিশেষভাবে

অভিযুক্ত করা হয়, যা কিনা ১৯১৭-র গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনগুলির মূল মেজাজের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলেও দাবি করা হয়। আরও দাবি করা হয় যে, রাজনৈতিক দল হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করবে কমিউনিস্ট পার্টি—কারণ এই পার্টিই পথপ্রদর্শক বা ভ্যানগার্ড পার্টি হিসেবে শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে। দাবি করা হয় যে, এই পার্টির উদ্যোগেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ঘনায়মান পাতিবুর্জোয়া প্রবণতা এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য, লেনিনের এমন ঘোষণামাত্রই পার্টিতে আবার ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের একটি চরম রূপ পরিলক্ষিত হয়—পার্টি থেকে সদস্য বহিষ্কার যেমন প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠল, তেমনই আবারও একটি ঐতিহাসিক ঘটনারও সূত্রপাত হল—সেটি হল পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পদে আসীন হলেন স্তালিন।

প্রবন্ধটির এই অংশে পৌঁছে পাঠকমাত্রেরই মনে হতে পারে যে, লেনিন এক অনন্যসাধারণ এবং বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হলেও ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণ থেকে শুরু করে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ যেমন তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, তেমনই ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাবও হয়ে উঠেছিল প্রত্যাশিত। লেনিন সংক্রান্ত উপরিতলগত যে-কোনো পাঠে তাই একধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দোলাচলগ্রস্ত হয়ে পড়েন পাঠক। একদিকে অনমনীয়, দূরদর্শী এবং অভাবনীয়ভাবে প্রতিভাবান নেতা, অন্যদিকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী এবং খানিক স্বৈরাচারী এক বিপ্লবী নায়ককে যেন সহাবস্থিত মনে হয় লেনিন নামক ব্যক্তিত্বটির মধ্যে। ফলত, আমাদের সরল দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যায় সেই মানুষটিকে যিনি অনেক আত্মসমীক্ষা, আত্মসংস্কারের মধ্যে দিয়ে অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করতে চান। আর এই ব্যক্তিত্বটিকেই চিনে নিতে আমাদের সহায়তা করেন Moshe Lewin তাঁর 'Lenin's Last Struggle' (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮) গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে। মূলত ১৯২১-২৪ সালের মধ্যে তৈরি হওয়া একাধিক পরিচালনাগত ও রাজনৈতিক জটিলতার প্রশ্নে লেনিনের অবস্থান, নিজের পুরাতন অবস্থানগুলির পুনঃসমীক্ষা, এবং এক ভয়াবহ স্বাস্থ্যহানির মধ্যেও বারবার শারীরিক সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরিত হয়ে তাঁর স্বপ্নের সোভিয়েত ইউনিয়নকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নির্মাণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি পার্টির কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থার মধ্যে ক্ষমতার কুক্ষীভবন এবং আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি প্রতিরোধের অন্তিম প্রচেষ্টার একটি তথ্যভিত্তিক সনদ এই গ্রন্থটি। কমিউনিস্ট পার্টি তথা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে রাষ্ট্রদানব বা 'লেভিয়াথান' হয়ে ওঠা থেকে প্রতিহত করতে লেনিনের এই অন্তিম সংগ্রামের কথা হয়তো সমালোচক এমনকি অনুরাগী গোষ্ঠী অনেকেরই যথেষ্ট নজর কাড়েনি। আর ওই অনবধানের মধ্যে দিয়েই তৈরি হয়েছে এক বিপুল বিভ্রান্তির সম্ভাবনা।

এক্ষেত্রে লেনিনের প্রতি কিছুটা সত্যনিষ্ঠ গবেষণা চালাতে গেলে আমাদের খুব সংক্ষেপে বুঝে নিতে হবে আভ্যন্তরীণ এবং বাস্তবক্ষেত্রে তিনি যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার একটি চলনসই রূপরেখাকে।

প্রসঙ্গত এ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২১-এর বেশ কিছু আগে থেকেই লেনিন একথা বুঝতে পারেন যে, দীর্ঘকালীনভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে খুব বেশিদিন অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণির সাথে একেবারে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন ভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয়। ১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিন তাই লিখছেন, 'We have always proclaimed and repeated this elementary truth of Marxism, that the victory of socialism came in the joint efforts of workers in a number of advanced countries'.[8] (Lenin 14)

ফলত, শ্রমিক আন্দোলনগুলির সংযুক্তি, আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে যেমন মাথা ঘামাতে হয়েছে, তেমনই অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭) উত্তর সময়পর্বে যে আভ্যন্তরীণ সংকটগুলির উদয় হয়েছিল সেগুলির বিষয়েও পূর্বানুমান করা খুব সহজ হয়নি। লেনিন অবশ্য একথা নিজেই স্বীকার করে নেন যে, শ্রমিকদের উপর প্রশাসনিক কার্য চালাবার গুরুভার চাপিয়ে দেওয়াটা বাস্তবিক প্রয়োজনভিত্তিক হলেও খুব একটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। লেওয়িন (Lewin) এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'Lenin himself said that the strength of the proletariat had been sapped above all by the creation of the state machine, and added that the proletariat had become de-classe, that is, it had gone off the rails as a class.'.[9] (Lenin 9)

তাছাড়া অক্টোবর বিপ্লবের প্রায় দুবছর পর লেনিন স্বীকার করে নেন যে, সোভিয়েতগুলি অনেকক্ষেত্রেই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। শ্রমিকস্বার্থে শ্রমিকদের দ্বারাই প্রশাসনিক প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত করার পরিকল্পনা থাকলেও, বাস্তবত দেখা গেল এক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাধারণ অংশ দ্বারা নয়, সোভিয়েতগুলি পরিচালিত হতে থাকলো শ্রমিক শ্রেণির অগ্রসর অংশের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা। লেনিন-এর ভাষায়—'the Soviets, which according to their program were organs of government by the workers by the most advanced seetion of the proletariat, but not by the working masses themselvs.'[10] (Lenin 170)

আর এই বিশেষ আত্মসমীক্ষার কারণেই সম্ভবত পাঠকমহল অভিভূত হয়ে দেখেন যে, সংকটকালে পার্টি যে প্রকৃত ক্ষমতাকে কুক্ষীগত করে রেখেছে, সে ব্যাপার লেনিন প্রায় অকুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করে নিলেন। শুধু তাই নয়, অক্টোবর বিপ্লবোত্তরকালে বা গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে শ্রমিকশ্রেণি যে স্বয়ং এককভাবে প্রশাসন, এমনকি কারখানাগুলিকে পরিচালনায় সক্ষম নয়, সেটি পরিষ্কার হয়ে যায় লেনিনের কাছে। অত্যন্ত অসন্তোষের সঙ্গে তিনি এটিও লক্ষ করেন যে, গৃহযুদ্ধোত্তর রাশিয়াতে জারবাদী আমলারা যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছেন এবং দেশের রাজনৈতিক আবহেও পুরোমাত্রায় তাঁদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। লেওয়িন এক্ষেত্রে লেনিনের অবস্থানটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "In fact Lenin was deeply concerned and displeased at the way the administration as a whole exercised its power and carried out its everyday tasks, whatever its composition. He was forever criticizing heroes of the civil war who proved incapable of carrying out peacetime tasks – he was the only political leader to do so with impunity. Even in Moscow, where tens of thousands of the best Communist cadres were concentrated, he discovered and rooted out red tape and inefficiency.'[11] (Lewin 10)

লেউয়িন দেখান যে, পার্টির অভ্যন্তরে পাতিবুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকায় লেনিন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সংকট ঘনাচ্ছিল অন্য একটি দিক থেকেও। কিন্তু কী সেই সংকট? বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেউয়িন বলেন ভ্যানগার্ড পার্টি হিসেবে শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করতে যে পার্টি সংগঠনের স্বপ্ন

দেখেছিলেন লেনিন, তাতেই ঘনায়মান হচ্ছিল প্রবরতান্ত্রিক (elitist) প্রবণতা—এর ফলে পার্টির বিবিধ স্তরে থাকা সাধারণ শ্রমিকদের গুরুত্ব যেমন কমতে থাকে, তেমনই নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে তারা অনবগত থেকে যায়। বলা বাহুল্য বিষয়টি লেনিনকে স্বস্তি দেয়নি। পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেউয়িন বলেন, “It must be recognised that Party's proletarian policy is determined at present not by its rank and file but by the immense and undivided authority of the tiny section that might be called the Party's Old Guard.'.[12] (Lewin 12).

পার্টির মধ্যে তৈরি হওয়া দুর্নীতি এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার দায়কে কেবল গৃহযুদ্ধ বা বলশেভিক আন্দোলনের থেকে উদ্ভূত বাস্তবিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে না দেখে সমালোচকদের একটি বড় অংশই বিষয়টির দায় চাপিয়ে দেন বলশেভিক পার্টি-তত্ত্বের স্রষ্টা ভি.আই. লেনিনের উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই কি এক্ষেত্রে সমগ্র দায়ভার যুক্তিসঙ্গতভাবে কেবল লেনির উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়? ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এসময় পরিস্থিতির চাহিদা ঠিক কী ছিল। একদিকে গৃহযুদ্ধকালীন শক্তিশালী 'whites'দের (যা ছিল বিবিধ পশ্চিমী রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট) প্রতিরোধ করতে, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণভাবে ঘনিয়ে আসা অসন্তোষের আবহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার্টির কেন্দ্রীকরণ এবং তার উপর কঠোর শৃঙ্খলা আরোপণ ছিল প্রায় আবশ্যিক। একটি জঙ্গম/চলিষ্ণু যুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতি এবং জরুরি অবস্থার অনির্দিষ্টকালব্যাপী সম্প্রসারণ বহুক্ষেত্রেই সোভিয়েত নেতৃত্বকে অত্যন্ত কঠোর হতে বাধ্য করেছিল। লেউউন-এর মতো বিশ্লেষণকারী মনে করেন যে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের তখন এক অনিশ্চিত নৈরাজ্যময় সময়ে যে-কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা অবশ্যই রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার সামিল হতো, সেটা বলাই-বাহুল্য। একদিকে কৃষক বিদ্রোহগুলির বাড়বাড়ন্ত, অন্যদিকে ক্রনস্ট্যাডট্ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে পার্টির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা প্রায় ছিল না। কার্যত এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে পলিটব্যুরো, সেক্রেটারিয়েট এবং অর্গব্যুরো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। পার্টির যে-কোনো সিদ্ধান্তই এখন পলিটব্যুরোর মধ্যে দিয়েই বাধ্যতামূলকভাবে পাশ হতে থাকে। এমনই একটি পরিস্থিতিতে স্ট্যালিন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ায় প্রমাদ গোণেন ট্রটস্কি। লেনিনের এসব সিদ্ধান্তর ফলাফল যে সুদূরপ্রসারী ছিল সেটি অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এমন একটি পরিস্থিতিতেও লেনিন তাঁর আত্মসমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবং আত্ম-সন্দিগ্ধ মুহূর্তে তিনি প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ এবং প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। লেনিনের অস্বস্তিটি এবার ফুটে উঠছে এইভাবে, 'The edverse forces of a moribund capitalism could still regain power from us.'.[13] (Lewin 16) আসলে এ যেন লেনিনের সেই আত্মোপলব্ধির মুহূর্ত যা তাঁকে তারই লেখা 'State and Revolution' (1917)-এর পুনঃসমীক্ষা, এমনকি পুনর্মূল্যায়নে বাধ্য করেছে। তাঁর এই ঘটনাক্রমগুলির ক্রমাঙ্ক অনুসারী গভীর বিশ্লেষণ থেকে একথা বলাও হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, “Leninist doctrine did not originally envisage a monolithic state, nor even a strictly monolithic party; the dictatorship of the party over the proletariat was never part of Lenin's plan, it was the completely unforseen culmination of a series of unforseen circumstances.”.[14] (Lewin 17)

শুধু তাই নয়, লেনিনই সম্ভবত প্রয়োগিক স্তরে নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর বৈধতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দেন। ফলত অর্থনীতির সাথে সংস্কৃতি তথা রাজনীতির যান্ত্রিক সংযোগ বা প্রতিষঙ্গ স্থাপনের তত্ত্বকে (যাকে মূলত ধ্রুপদী মার্কসবাদে 'economic determinism' নামে অভিহিত করা হয়েছিল) পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রেও লেনিনের অবদানকে স্বীকার করা প্রয়োজন। আর সম্ভবত দূরদর্শিতার এই বিরল গুণটিই বিপ্লবান্তে বা গৃযুদ্ধের শেষে পাতিবুর্জোয়া এবং প্রতিবিপ্লবী সংস্কৃতি তথা পার্টির মধ্যে ঘনায়মান প্রবরতান্ত্রিক গোষ্ঠীতন্ত্রের সংকট বিষয়ে লেনিনকে গভীরভাবে ভাবিত করেছিল। একদিকে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি থেকে আসা প্রকাশ্য এবং গুপ্ত আক্রমণ, অন্যদিকে পার্টির মতাদর্শগত পবিত্রতা রক্ষার পথে ক্রমশ বাধা হয়ে ওঠা ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি কার্যত লেনিনকে মরিয়া করে তোলে। আর এমনই একটি প্রেক্ষিত থেকে লেনিন গ্রহণ করলেন 'New Economic Policy'। গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে 'War Communism' -এর অবসানে বিক্ষুব্ধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শান্ত করতে এবং সামগ্রিকভাবে RSFSR (Russian Soviet Federation Socialist Republic)-কে রক্ষা করতে এই পদক্ষেপটিকেই সবচেয়ে শ্রেয় বলে বেছে নিলেন লেনিন। বলা বাহুল্য, NEP ছিল যথেষ্ট বিতর্কিত এবং একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনস্থ হিসেবেই স্বদেশে খাদ্যশস্য সরবরাহের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে কৃষকদের জন্য কিছু ছাড় বরাদ্দকরণ থেকে শুরু করে একধরনের রাষ্ট্র-পুঁজিবাদ (State capitalism) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। লেনিন অবশ্য বিষয়টি সম্পর্কে যেন কোনো প্রকার বিভ্রান্তির উদ্রেক না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে বললেন, “a capitalism that we must and can accept and to which we can and must assign certian limits, for it is necessary to the great mass of the peasantry and to the trade that enables the peasants' needs to be satisfied. We must arrange things in such a way that the regular operation of the economy and patterns of exchange characteristic of capitalism become possible. It must be so for the sake of the people. Otherwise we should not be able to live.'.[15] (Lewin 22)

বলা বাহুল্য, লেনিনের এমন পদক্ষেপ যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে লেনিনের নিজ মহল থেকেই উঠতে থাকে সমালোচনার ঝড়—বলা হতে থাকে লেনিনের এই পদক্ষেপ আসলে তাঁর মার্কসবাদী অবস্থান থেকে একধরনের উল্টোমুখী প্রতিসরণ। প্রশ্ন হল, এমন বিতর্কের অবকাশ যে আছেই সে-সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন লেনিন, তবুও তিনি কেন এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? লেউয়িন এক্ষেত্রে লেনিনের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, লেনিন-বর্ণিত 'state capitalism'-এর ধারণাটির একটি অন্যরকম অর্থানুষঙ্গ ছিল। তিনি আসলে রাশিয়ার পুঁজিবাদের (এমনকি কিছুক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজিবাদ-এরও) কিছু বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার অপরিণত পুঁজিবাদকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে, তার মধ্যে পুঁজিবাদী সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এবং প্রকৌশলগত দক্ষতাগুলিকে পরিণত করে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ সমাজতন্ত্রে উত্তরিত হওয়ার পূর্ব শর্তরূপে পুঁজি এবং তৎসংলগ্ন বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্ভাবনাগুলিকে অর্জন করা তাঁর Workers' State-এর পক্ষে বিশেষভাবে জরুরি ছিল।

তবে এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাথে এই বিকাশপর্বের মৌলিক পার্থক্যকে সচেতনভাবে রক্ষা করার উপর অর্থাৎ কঠোর তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বজায় রাখার উপর লেনিন গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে লেনিনের কাছে বৃহৎ পুঁজিবাদের উত্থান-সম্ভাবনা আশংকার কারণ ছিল না, কারণ সেটির কোনো বাস্তব ভিত্তিকে তিনি তাঁর সমকালীন আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খুঁজে পাননি। বরং তাঁর কাছে RSFSR-এর সামনে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হিসেবে পাতিবুর্জোয়া প্রবণতার বিকাশ সম্ভাবনাই প্রকট হয়েছিল। অন্যদিকে State Capitalism যে দরকারি ছিল সেটিকে বোঝাতে গিয়ে তিনি যুক্তি দেন—"Only big capital possessed the qualities that were useful to progress, its ability to organize on a large-scale, its tendency to plan and its sense of disciplinge This was why the Workers' State should conclude an alliance with it in order to combat the pernicious influence of the already tottering petite bourgeous element."[16] (Lewin 27)

অন্যদিকে অপর বিতর্কিত পদক্ষেপ NEP-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য। আসলে NEP (New Economic Policy) ছিল মার্কসবাদের একধরনের সৃজনধর্মী পুনর্গঠন। যা রাশিয়ার মতো একটি কৃষি-অধ্যুষিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রিত রূপের বপণ করতে চেয়েছিল মূলত সমাজতন্ত্রের বস্তুগত প্রাক্‌শর্তটিকে সুনিশ্চিত করার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ আধা-সামন্ততান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র অর্জনের যে প্রাক্‌শর্তগুলি পুঁজিবাদের মধ্যে থেকে নির্মিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাকে একটি নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষিতে জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন লেনিন। কিন্তু এই বিষয়টিকেও তিনি কোথাও অস্বীকার করেননি যে, NEP কোনও দীর্ঘস্থায়ী বিষয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তা কেবল একটি উত্তরণকালীন পর্ব হিসেবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

কিন্তু ১৯২১ থেকেই লেনিন বারবার অত্যন্ত গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ট্রটস্কিকে তিনি একথাও বলেন যে, এক অসহনীয় অসুস্থতার মধ্যে তাঁকে ক্রমাগতই নতুন নতুন পরিস্থিতির উপযোগী নতুন শিখন প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োজিত হতে হচ্ছে। তাঁর ভাষায় "I could not even speak or write and I had to learn everything all over again'[17] (Trotsky 475)

এমতাবস্থাতে ১৯২২ সালে লেনিনের তদারকি এবং অনুমোদনেই স্তালিন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পদে অভিষিক্ত হন। আর এই বাস্তবটিও ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে যে, "As Lenin was losing his capacity for work and the conduct of affairs was slipping increasingly from his hands, Stalin was gaining in ease and assurance, often in opposition to Lenin.'[18] (Lewin 34)

বিষয়টি আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে এই কারণেই যে দীর্ঘ অসুস্থতা এবং অনুপস্থিতির কারণে তিনি নিজেও যে পার্টিতে ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন, এ বিষয়টি তাঁর অনবগত ছিল না। ১৯২১-এর শেষ থেকেই যেমন বিদেশি বাণিজ্য একচেটিয়াকরণ নীতিকে স্থগিত করবার একটি প্রস্তাব পার্টির উচ্চপর্যায় থেকেই উঠে আসছিল, NEP-এর মূল মেজাজের সাথে বিষয়টি সঙ্গতিপূর্ণ বলেও সহমত হয়েছিলেন অনেকেই, কিন্তু লেনিন এই বিষয়ে চরম বিরোধিতা করেন। লেনিনের যুক্তি ছিল বিদেশি বাণিজ্যাধিকারের ক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলীকরণের অর্থ হলো পুঁজিবাদী বৈদেশিক স্বার্থকে স্বদেশে সজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া। যার ফলশ্রুতি হতে পারে মারাত্মক—যেমন এর মধ্যে দিয়েই স্বদেশি কৃষকবাহিনী তাদের নিজস্ব স্বার্থে বিদেশি পুঁজির সাথে সমাতন্ত্রবিরোধী অশুভ আঁতাত গড়ে তুলতে পারে। ফলত, দুর্বল রুশ অর্থনীতির দুর্বলতর হয়ে পড়বার আশংকা থেকেই যায়। এক্ষেত্রে লেউয়িন লেনিনের অবস্থানটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "Only the strict maintenance of the monopoly would remedy the economic weakckness of the country. One had to consider the ability of foreigners to offer special prices, not to mention conditions in the international market that were in themselves very advantageous for Russing agricultural produces. The slightest breach in the defence would end by destroying the already weak national industries, and help to forge an alliance between the forces of international capitalism and the Russian businessmen on the one hand and the mass of the Russina peasantry on the other against the power of Soviets'[19] (Lewin 36)

লেনিনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবস্থানটি খুব সহজে গৃহীত হয়েছিল এমন হয়তো বলা যাবে না। কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন বিতর্কে লেনিনের অবস্থানটির একটি বিরোধিতাও যে স্পষ্ট হচ্ছে সে সত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন তিনি। তবে ১৯২১ সালের ২২ মে পলিটব্যুরো প্রাথমিকভাবে একচেটিয়াকরণ সম্পর্কে লেনিনের অবস্থানটি মেনে নেয়। এরপরই লেনিনের প্রথম পক্ষাঘাত কার্যত এক অকল্পনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ওই সময়ই ৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ সকলনিকভ্-এর প্রস্তাবমতো একচেটিয়াকরণ শিথিলের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আশ্চর্যজনকভাবে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোটাভুটির পর্যায়ে এমনকি জেনারেল সেক্রেটারিও লেনিনের অবস্থান বিষয়টি খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, "Comrade Lenin's letter has not made me change my mind as to the correctness of the decision of the plenum.... concerning external trade."[20] (Lewin 38)

কিন্তু নিদারুণ অসুস্থতার মধ্যেও অনমনীয়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী লেনিন ১৫ ডিসেম্বর জানাচ্ছেন যে, পরিস্থিতি তাকে অবসর গ্রহণের দিকে ঠেলে দিলেও, "(he declared) I have also come to an agreement with Trotsky on the defence of my views on the monopoly of foreign trade"[21] (Lewin 39)

প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে সম্ভবত লেনিনের মতো এক বিপুল ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় অবদানের খুব অল্প অংশকেই তুলে ধরা সম্ভব। তবুও স্বল্প সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ১৯২৩-এর কিছু ঘটনা এবং কাজের বিষয়ে উল্লেখ না করলে সমগ্র আলোচনাটির প্রতি একটি অমার্জনীয় অপরাধ সংঘটিত হবে। আসলে ১৯২৩-এর জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিন যে যে পাঁচটি প্রবন্ধ এবং টীকাতে তাঁর শেষ সংগ্রামের চিহ্ন রেখে যান তাতে ধরা পড়ে আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটির দুর্দমনীয় 'আত্মশক্তি'। শুধু যে দুর্লঙ্ঘ্য শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এই নিদারুণ সময়ে লেনিনকে তাঁর রণনীতি এবং আত্মসমীক্ষার সুকঠিন পথগুলিকে চিহ্নিত করতে হয়েছিল তাই নয়, অত্যন্ত বেদনার সাথে তিনি একথাও অনুভব করতে শুরু করেছিলেন যে, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ক্ষমতার কুক্ষীভবন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুক্তিকামী প্রকল্পের

মূলে কুঠারাঘাত করবে অচিরেই—ফলত সময়টি আত্মসমীক্ষার, পুনর্বিবেচনার এবং প্রয়োজনে সংস্কারের। লেনিনের আপ্তসহায়ক ফটিয়েভার স্মৃতিচারণে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, লেনিন বৃহৎ শহরগুলিতে রাষ্ট্রকৃত্যকদের পরিসংখ্যান এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে রিপোর্ট চাইলেও আমলাতন্ত্রের গোষ্ঠীপ্রবণতা এবং দুর্নীতির চিত্রটি লুকিয়ে ফেলার সবরকম প্রয়াসই চলেছিল লেনিনের জীবনদ্দশাতেই। এ বিষয়ে লেউয়িনের তথ্যপ্রমাণ সহ আলোচনা পাঠকমাত্রেরই নজর টানে। (লেউয়িন-এর Lenin's Last Struggle-এর পৃষ্ঠা ৯২-৯৬-এ দ্রষ্টব্য)। তবে এতে দমে যাননি লেনিন। তিনি পার্টির সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশনের সাথে শ্রমিক এবং কৃষক কমিশারিয়েটকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব নির্মাণ করেন, একই সাথে জর্জিয়া প্রশ্নে Dzerzhinsky কমিশনের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Ordzhonnikidze-এর ভূমিকা পুনর্বিবেচনার কথাও উঠে আসে। বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্যপ্রমাণকে সুনিশ্চত করতে Gorbunov, Fotieva এবং Glissex-দের নিয়ে সমান্তরাল অনুসন্ধান কমিটিও নির্মাণ করেন লেনিন। দুঃসহ শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যে লেনিন তখন ট্রটস্কিকেই তাঁর প্রধান মুখপাত্র হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও তিনি ট্রটস্কির উপর চাপিয়ে দেননি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। তিনি লিখছেন, "I earnestly ask you to undertake the defense of the Georgian affair at the central committee of the Party. That affair is now under 'persecution' at the hands of Stalin and Dzerzhisky and I cannot rely on their impartiality. Indeed, I could be at rest. If for some reason you do not agree send me back all the papers. I will consider that a sign of your disagreement.'[22] (Lewin 99)

বলা বাহুল্য, এমন একটি বিপদসঙ্কুল প্রকল্পের দায়দায়িত্ব একা নিতে চাননি ট্রটস্কি। তিনি বিষয়টিকে কামেনেভ-কে জানাতে চাইলে ফটিয়েভা মারফত তার তীব্র প্রতিবাদ করেন লেনিন। বিষয়টিকে গুপ্ত রেখে একটি নিরপেক্ষ আত্মবিশ্লেষণ এবং পার্টির কার্যপদ্ধতির পুনর্নিরীক্ষণ-ই ছিল লেনিনের লক্ষ্য—কামেনেভ মারফত বিষয়টি ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কাকে তাই তিনি উড়িয়ে দিতে পারেননি। এর পরের ঘটনা সম্ভবত সচেতন পাঠকমাত্রের কাছে অজানা নয়। এই বিপুল শারীরিক এবং মানসিক টানাপোড়েনের মাঝে অনতিবিলম্বেই এক অপূরণীয় শূন্যস্থান তৈরি রেখে ২১ জানুয়ারি ১৯২৪ সালে চলে গেলেন লেনিন। কিন্তু নাতিদীর্ঘ তাঁর কর্মময় জীবন আমাদের দিয়ে গেল এক অনন্য জীবনদর্শনের ঠিকানা—যা কেবল বৈপ্লবিক, প্রতিস্পর্ধী বা অনুকরণীয় সাহসিকতার নিদর্শন নয়, বরং এমন এক অনন্যসাধারণ আত্মসমীক্ষার সনদ, লেউয়িন যাকে যথার্থভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন— 'Lenin's injunction to communists to retain 'strength and flexibility' and to be always ready 'to go back to the beginning', they must not lose their critical spirit and must be willing, it necessary to rebuild all or much of what has been attempted.'[23] (Lewin 36)

কেবল লেখনীকৌশল এবং অসাধারণ কথন মুন্সিয়ানায় পাঠক বা অনুগামীমহলকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে সীমিত ছিল না লেনিনের প্রয়াস। আক্ষরিক অর্থেই তিনি আজীবন যথাসম্ভব অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন স্ব-নির্দেশিত পথকে। ফলত তাঁর জীবন যেন হয়ে উঠেছে আত্ম-অনুশীলনের গবেষণাগার। যেমন পার্টিতে শৃঙ্খলার প্রাথমিকতা বা ভ্যানগার্ডদের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ অনুসরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েও তিনি সমর্থন করেননি পার্টির ভিতর প্রবরতান্ত্রিক উন্নাসিক স্বৈরতন্ত্র, বিচলিত হয়েছেন শ্রমিকবাহিনীর সাথে পার্টির ক্রমবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে। এমনকী বাস্তবোচিতভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগের স্তরে উন্নীত করতে তিনি ধ্রুপদী মার্কসবাদের কিছু সংস্কারও করেন—সেগুলি মার্কসবাদের মৌলিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনেনি ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা মোকাবিলায় অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছে, যেমন War Communism -অন্তে NEP-র মতো পদক্ষেপ গ্রহণ।

ফলত একথা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, 'State and Revolution' বা 'What is to be Done'-এর রচয়িতা স্বপ্নালু এক নেতামাত্র হিসেবে তাঁকে গণ্য করা সত্যের অপলাপই হবে। বরং পরিণত লেনিনকে দেখতে হবে একজন স্থিতধী, আত্মপ্রত্যয়ী, বাস্তববাদী রাষ্ট্রনেতা হিসেবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যিনি লড়ে গিয়েছেন গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে। একথা ঠিক যে, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর পরিকল্পিত অনেক প্রকল্পই কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়। তথাপি এই দীর্ঘ আলোচনার সূত্র ধরে আমরা হয়তো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, লেনিনীয় বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার অন্তর্জগতে ছিল এক গভীর বাস্তববোধের শিক্ষা—যা ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়ণকালে যুগোপযোগী আত্মসংস্কার এবং পৌনঃপুনিক পুনর্মূল্যায়নে পিছুপা ছিল না। আর সেখানেই তিনি অনন্যসাধারণ।

সূত্রনির্দেশ :

১. McLellan David. Maxism After Marx. Fourth ed, Palgrave Macmillan. 2007

২-৪. Lenin, Vladlmir–What Is to be Done, Selected Works. Vol-1, Progress Publishers. 1970

৫. Lenin, Vladimir–Collected Works. Vol-6, (fourth edition) Progress publishers. 1977

৭-৬. Lenin, Vladimir–Collected Works. Vol-10, (fourth edition) Progress publishers. 1965

৮. Lenin, Vladimir–Sochineniya (works) Vol-XLIV, 5th ed., Institute of Marxism–Leninism. 1965

৯. Lewin, Moshe–Lenin's Last Struggle, Fourth Ed. University of Michigan Press 2008.

৭. Lenin, Vladimir–Sochineniya (works) Vol-XVXVIII, 1st ed., Institute of Marxism–Leninism. 1965

১১-১৬. Lewin, Moshe–Lenin's Last Struggle, Fourth Ed. University of Michigan Press 2008.

১৭. Trotsky, Leon–My Life. Charles Scribner's Sons. 1950

১৮-২৩. Lewin, Moshe–Lenin's Last Struggle, Fourth Ed. University of Michigan Press 2008.

স্বপ্নে কথোপকথন : রামলালা ও আমি

মৃদুল সেন

নাঃ ঘুম আসছে না। কাল ভারতের সংবিধানের লেজ-মুড়ো কাটা পড়বে। আম্বেদকর সাহেব প্রণীত দেশের সংবিধানের খসড়া—যা দেশের গণপরিষদে গৃহীত, মোদীজি তাকে কাঁচকলা দেখাবেন, আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে তা নীরবে মেনে নিতে হবে! মনে হচ্ছে যেন ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি। ফ্যাসিবাদ আসে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে। দেশে মানুষের মঙ্গল করবে এই ভরসা দিয়ে ফ্যাসিবাদ মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখায়, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন।

মুখে দেশের মানুষের জন্য মোদীজির প্রাণ কাঁদে, যদিও উদ্দেশ্য হিন্দুরাষ্ট্র কায়েম করা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তার জন্মলগ্ন থেকে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর। গোলওয়ালকরের ভাষায় হিন্দু ভিন্ন অন্যেরা এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাই সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে মোদীজি কাঁচকলা দেখাবেন এটাই স্বাভাবিক। আর.এস.এস-প্রধান মোহন ভাগবত ইতোমধ্যেই বলেই দিয়েছেন সব ভারতীয়ই হিন্দু। এদেশে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরিত হিন্দু।

মোদীজির প্রথম ইনিংস মোটেই সুখকর ছিল না। যত দিন গড়াতে লাগল তাঁর 'আচ্ছে দিন' আনেওয়ালা ভাষণ মানুষের কাছে তেতো হয়ে উঠল। আম্বানি, আদানি আর তাঁদের দলবলের পকেট ভর্তি হল বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের পকেট তখন গড়েরমাঠ। বেকারি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, কৃষিসঙ্কট, মজুর ছাঁটাই একের পর এক কারখানা বন্ধ করে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো দেখা দিল জি.এস.টি ও নয়া নোট চালু করার নামে কালো টাকা সাদা করার হাতসাফাই।

কিন্তু মোদীজি শেষ বলে একেবারে ওভার-বাউণ্ডারি হাঁকালেন। মোদীজি কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গল সাফারিতে গেলেন আর এদিকে পুলওয়ামারে জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে আতঙ্কবাদী হামলায় চল্লিশজন সি.আর.পি.এফ জওয়ান নিহত হলেন। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা কিনা বলা যাবে না। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করতে সাহায্য করল এই ঘটনা। মিডিয়ার চাপান-উতোর। দেশে যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি। পাকিস্তানকে একহাত দেখে নেবার হুঙ্কার, আর এর মধ্যে সাধারণ নির্বাচন। আর যায় কোথায়—মোদীজির মতো কড়া হাতের লোক ছাড়া দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। অতএব ভোটবাক্সে ঢালাও প্রতিক্রিয়া। বিজেপি একাই লোকসভায় ৩০৩টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। ১৯৮৪-তে বিজেপি-র লোকসভায় ছিল মাত্র ২টি আসন, তারাই এখন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই জয় সম্পর্কে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ অমর্ত্য সেন লিখেছিলেন—মোদী ক্ষমতার লড়াই-এ জিতেছেন, মতাদর্শে নয়।

তাই মোদীর এবারকার লড়াই মতাদর্শের লড়াই। ছলে-বলে-কৌশলে যে প্রকারেই হোক আর.এস.এস-এর মতাদর্শ সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া—যে মতাদর্শের মূল কথা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা, সরযূ নদীর জলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া। তাই বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল করার এইতো সময়।

দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর মুখেই মোদীজি আবার ভেক ধরলেন। লোকসভার সেন্ট্রাল হলে ঢোকার মুখে ভারতীয় সংবিধানের যে বিশাল অবয়ব রক্ষিত আছে, মোদীজি সেই সংবিধানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুজলেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল এবার সংবিধানের দফা রফা করা হবে। এর পূর্বেই আদালতের নিরপেক্ষতা হরণের তাগিদে বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সুনিশ্চিত করেছেন। এবার বিপুল গরিষ্ঠতা পেয়ে সংবিধানের তিন স্তম্ভ আইনসভা, বিচারব্যবস্থা ও সাধারণ প্রশাসনের

উপর হস্তক্ষেপ শুরু করলেন—যা ফ্যাসিবাদের পূর্বলক্ষণ।

ফলে তাঁর হাঁটু গেড়ে সংবিধানের সামনে চোখ বুজে বসার একটাই ব্যাখ্যা হয়—সংবিধানের ওপর এবার ছুরি চালানো হবে।

হলোও তাই—প্রথমে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করা হল (যে চুক্তির বলে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল)। এমনকি কাশ্মীরকে ত্রিধা বিভক্ত করে দেওয়া হল সেখানকার নাগরিকদের কোনো মতামত পর্যন্ত নেওয়া হলো না।

সুপ্রাচীন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন যাঁরা তাঁদের কোনো সাজা তো হলই না, উপরন্তু সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রায়দান করলেন ওখানেই রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

যাইহোক, এসব সাতপাঁচ ভেবে ঘুমটা একদম চটকে গেল। একটা ভ্যালিয়াম-৫ গিলে ঘুমোবার চেষ্টা। কিছুক্ষণ পরেই কড়া নাড়ার শব্দ। 'আবার কে এল এই রাতের বেলায়'—রেগে-মেগে দরজা খুলতে গিয়ে দেখি রামলালা। হুড়মুড় করে ঢুকে গিয়ে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। মুখে বেশ উৎকণ্ঠার ছাপ।

বললাম 'কী ব্যাপার লালাজি তুমি এখানে? আর কয়েক ঘন্টা বাদে তোমার বসতবাড়ির ভূমিপুজো হবে। যাযাবরের মতো আর ঘুরে ঘুরে মরতে হবে না। মাথায় বিশাল কারুকার্যমণ্ডিত শ্বেতপাথরের ছাদ আর গর্ভগৃহে মণ্ডা-মিঠাই মিষ্টান্ন সহযোগে ভূরিভোজ—এসব ছেড়ে এই অভাজনের পর্ণকুটিরে পদার্পণ? কেন, কারণ কী?'

—কারণ পরে শুনবি, এখন আমাকে তোর খাটের এককোণে চাদরমুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকতে দে। শয়তানের জাত—নইলে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আমার গর্ভগৃহের সন্ধান করে? আমি মহাকবি বাল্মীকির কল্পলোকের রাম। আমার জন্মের আগেই মহাকবি তাঁর কাব্যসুষমায় আমাকে নিয়ে এক বিশাল কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেন। দেশ-বিদেশে সুখপাঠ্য সেই কাজ শয়তানদের হাতে পড়ে কেমন মার-দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়েছে দেখছিস না? দণ্ডকারণ্যের আদিবাসীরা বলে রাম আমাদের জনজাতির লোক। নেপাল বলে রামের জন্মস্থান নেপালে। তারা খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে। জাভা, সুমাত্রার লোকেরা বলে রাম আমাদের লোক। ওরাও রামের পূজারী। একটা মহাকাব্যের চরিত্র যা হয়। বিভিন্ন স্তরে গিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যাখায়িত হয়। হোমারের রচিত ইলিয়ড, ওডিসি কি শুধু হোমারের দেশের মহাকাব্য, না বিশ্বের মহাকাব্য? আমাদের দেশের কিছু ধান্দাবাজ শুধু রাজনীতি করার তাগিদে তাকে বিশেষ সম্প্রদায়ের স্ট্যাম্প মারতে চাইছে—স্রেফ রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে।

আমি বললাম, ভাবতে পারো। কারখানা বন্ধ, কাজ নেই। মোদীজি বলছেন চা বিক্রি করে সংসার চালাতে। ওনার নাকি ছোটবেলা চা বিক্রি করে কেটেছে।

—সব আষাঢ়ে গল্প, বুঝলি না। স্টান্টবাজি।

—সে আর বলতে? আমরা সাধারণ মানুষ সে কি বুঝি না। এখন আবার বলছে খেলনা বানাও দেশ বাঁচাও। দেশের সব ইণ্ডাস্ট্রি বেচে দিয়ে আদানি-আম্বানির পকেট ভর্তি করে দিয়ে এখন জ্ঞান দিচ্ছেন। ওনার জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। মানুষ 'মন কি বাত' শুনতে চাইছে না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর চিন্তিত।

—সব বেচে দিচ্ছে শুনছি।

—শুনছো মানে, বেচা শুরু হয়ে গেছে। সংসারে অভাব অনটন দেখা দিলে যেমন কাঁসার থালা-বাসনও বেচতে হয়—তেমনি দেশের জিডিপি তলানিতে এখন তা ঠেকাতে সব রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের বিমানবন্দরগুলি ইতিমধ্যে আদানির কাছে বেচে দেওয়া হয়েছে। কয়লাখনিগুলি বিক্রি হব হব করছে—মুখে 'জয় শ্রী রাম'।

—এসব অপকর্ম করে আবার আমার নাম?

—প্রভু, সবই তো তোমার নামে চলছে। গুণ্ডামি, লুচ্চামি, সংখ্যালঘুদের ঠেঙিয়ে মারা—সবই তোমার নামে। পাশাপাশি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে গাদা-গাদা যুদ্ধাস্ত্র কেনা আর কাটমানিতে অনিল আম্বানির পকেট ভর্তি।

—আসলে কি জানিস—ইংরাজদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতই তীব্রতা লাভ করতে লাগল ততই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ফাটল ধরাবার কাজে উঠেপড়ে লাগল—একদিকে মুসলিম লিগ, অন্যদিকে আর.এস.এস, হিন্দু মহাসভার মতো

সংগঠনগুলি। রামায়ণের রামচরিত্র আর তুলসীদাস-কৃত 'রাম চরিত মানস' দুটি গ্রন্থের আবেদনও আলাদা। বাল্মীকি রামায়ণে রাম যোদ্ধা, আর তুলসীদাসের রামলালা শিশু রামলাল। যশোদাদুলাল কৃষ্ণের মতোই মা কৌশল্যার সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মত্ত রামলালা। সবই কবির কল্পনা। প্রায় চারশো বছর পূর্বে নির্মিত বাবরি মসজিদটি বাবরের দ্বারা নির্মিত কিনা তাও বিতর্কিত বিষয়। আবার এতই যদি হিন্দু-বিরোধিতা থাকত তাহলে আকবরের আমলে তুলসীদাস 'রাম চরিত মানস' লিখতে পারতেন? অথচ আকবরের মন্ত্রিসভার আর এক সেনাপতি খান আব্দুল রহিম খানের মদতে তুলসীদাস রামায়ণের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। আকবরের তুলসীদাসের সঙ্গে চাক্ষুষ দর্শন না হওয়া সত্ত্বেও আকবর বিদ্বজ্জনদের শ্রদ্ধা করতেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এরপর মসজিদের বাইরে চবুতরায় রামলালা নামে আমার এক পুতুল দেখা দিল। শুরু হল পূজা-আচ্চা। বলা হল—রামলালা তার নিজ বাসস্থানে ফিরে এসেছেন। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। দেশ স্বাধীন হল বটে তবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রধান প্রবক্তা গান্ধীজিকে হিন্দু মহাসভার লোকেরা খুন করল আর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ধীরে ধীরে জায়গা করে নিল। এবার বেশ ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে গেল। সন্ন্যাসীদের এবার আরও তাকত বেড়ে গেল। প্যাটেলজির মতো সাচ্চা হিন্দু এখন দেশের গৃহমন্ত্রী। আর বিলম্ব না—অভীরাম দাস নামে সাধুবাবাজি আমার পুতুল একেবারে বাবরি মসজিদের অভ্যন্তরে বসিয়ে দিয়ে কাঁসর ঘন্টাসহ পূজা শুরু করে দিল। এতদিনে রামের গর্ভগৃহের খোঁজ পাওয়া গেল। আর যায় কোথা? কাঁসর ঘন্টা নিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসর মাত করতে লাগল। বায়না উঠল ওখানে রামলালার মন্দির গড়তে হবে।

রামলালাকে বললাম—লালাজি আর বলতে হবে না। এর পরের ঘটনা আমরা জানি। আর.এস.এস, হিন্দু মহাসভা, বজরং দল, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এসব নানান নামে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির দেশে আবির্ভাব এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে রাজনৈতিক সংগঠন।

রামলালা বললেন—আর শোন, দল গড়লে তো হবে না, ভোটে জিততে হবে। কেন্দ্রে সরকার গড়তে হবে। ১৯৮৪-তে সংসদে মাত্র ২টি আসন পেল এই দল। এবার আদবানীজির নেতৃত্বে শুরু হল রাম মন্দির গড়ার ডাক। আদবানীজি রথযাত্রা শুরু করে হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে ধরলেন আর তারপর বাবরি মসজিদ ভাঙার কাজ। উগ্র হিন্দুত্ববাদী শ্লোগানে দেশে শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হলো না, শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর ফায়দা তুলল ভারতীয় জনতা পার্টি। এবার শুরু রামমন্দিরের শিলান্যাস পর্ব। এছাড়া মোদীজির বিকল্প কোনো পথ নেই। মোদীজির সব প্রতিশ্রুতি বাতেল্লাতে পরিণত হয়েছে। হু হু করে বেকার বাড়ছে, কলকারখানা সব বেচে মোদীজি সংসার চালাচ্ছেন। দেশের জিডিপি তলানিতে এসে ঠেকেছে। সারা দেশ করোনাতে ছেয়ে গেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ কষ্ট অবর্ণনীয়, মোদীজির কাঁসর-ঘন্টা আর মোমবাতি জ্বালাবার চমক করোনাকে দমাতে পারেনি। বরং বিশ্বে এখন এক নম্বরে স্থান করে নিতে চলেছে। ছেঁড়া কাঁথায় আর কত তাপ্পি দেবেন। তাই মন্দির বানাও, ভূমি পূজা কর।

রামলালার সঙ্গে এসব আলোচনা করতে করতে রাত কাবার, ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

বাড়ির বাইরে যেন কিসের ফিসফিসানি। রামলালা বলল—দেখছিস ব্যাটারা এখানেও ধাওয়া করেছে। আমাকে ধরে ভূমিপুজোয় নিয়ে যাবে। ওরা যোগী আদিত্যনাথের লোক।

আমি বলি—তাহলে এখন করবে কী? ওদের সঙ্গে যাও।

—মাথা খারাপ? ভূমি পুজোর নামে এখন আমার করোনা হয়েছে। আরো কতজনের কপালে আছে কে জানে?

—পালাবে কী করে?

—দেখবি, ম্যাজিক দেখবি? রামলালা হঠাৎ বায়বীয় পদার্থ হয়ে গেল। শুধু শব্দ পেলাম—আমি ফুরুত।

ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে লাগলাম। একি স্বপ্ন না মায়া!

দেখি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজানুলম্বিত হয়ে পুজোস্থানে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। সত্যিই ভূমিপুত্র।

পুনশ্চ : প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির গড়ার আন্দোলনকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। খাটো করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানকে। তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসু বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে দেশের কলঙ্কিত অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন এটাই বর্বরতা। অথচ মোদীজি রামমন্দিরের আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যেভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা করলেন—দেশের অভ্যন্তরে তার বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রতিবাদ উঠল না। তবে কি দেশ স্বৈরতন্ত্রের পথে?

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী

পল্লীমঙ্গল, নবস্থা, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 50

করোনা বিশ্বযুদ্ধ, সীমান্ত সমস্যা ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য

রথীন রায়

বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে বিশ্ববাসী ঐক্যবদ্ধ। এই অতিমারি বর্তমান সভ্যতাকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছে। বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় প্রতিষেধকের জন্য। দেশে দেশে গবেষণা চলছে। এই আবহে পরিষ্কার দুটি ছবি মানুষের সামনে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দৈন্য, অন্তঃসারশূন্যতা, দম্ভ এবং মুনাফার জন্য লালসা। মানুষের বিপর্যয়ের মধ্যেও মুনাফার দগদগে লালসা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা ক ে ব . হ চলেছেন---ভ্যাকসিন আমাদের হাতের মুঠোয়, আমরাই আগে বাজারে ছাড়বো। দেশগুলিকে বলছেন, আগাম বরাত দাও। আমাদের ত্রিকালজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন— ১৫ই আগস্ট ভারতে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ঘোষণা

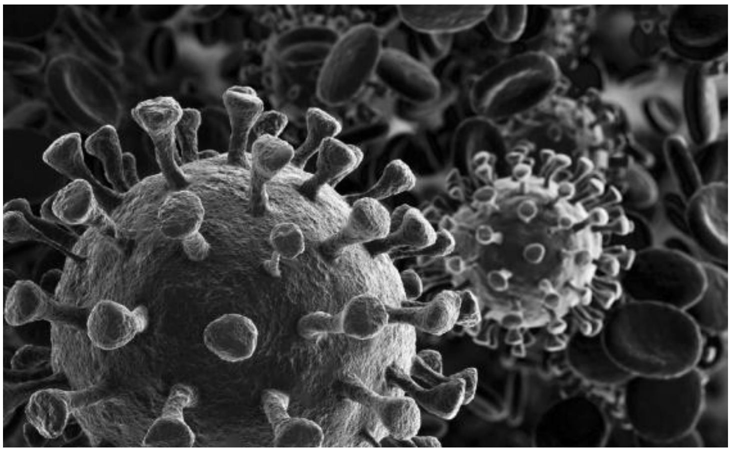

বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করে মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে, প্রশ্ন করার প্রবণতা থেকে দূরে রাখা। দেখতে পাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের গলা-আস্ফালন—চীনই ভাইরাস তৈরি করেছে। চীনের উপর খুবই কুপিত। কেন চীনে আমেরিকার থেকে কম লোকের মৃত্যু হল? ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন চীনকে আড়াল করছে এই অজুহাতে 'হু' থেকে বেরিয়ে এলো—মানবজাতির এই সংকটে সকলের ঐক্যবদ্ধ লড়াই যখন সময়ের চাহিদা। কতখানি বর্বর হলে এমন পদক্ষেপ নেওয়া যায়! ব্রাজিলের প্রধানমন্ত্রী আমাজনের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে আনন্দ করেছেন। সবার উপরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডারা। করোনা ভাইরাস, ও কিছু না। মোমবাতি না থাকলে মোবাইল-এর আলো জ্বালাও। কাঁসর বাজাও, না থাকলে থালা বাজাও। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। চেলাদের কারো কারো নিদান গোমূত্র অব্যর্থ। আর একজন আরএস.এস. যোদ্ধা নিদান দিলেন পাঁপড় ভাজা খাওয়ার। মনে করার কারণ নেই যে এঁরা সব নির্বোধ। এরা শয়তান! করোনা বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞান-চেতনাকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাতে চায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা করোনা মোকাবিলায় সাধারণ ভাবে ব্যর্থ। নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। পুঁজির মুনাফা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেয় না। চিকিৎসাবিজ্ঞান মুনাফা শিকারের অন্যতম উপকরণ। সব ব্যক্তি-মুনাফার ব্যবসা। সরকারের কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে, ঘটে চলেছে। প্রথম বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ধ্বস্ত অবস্থা। করবেন। কোথায় কী? কিছুই জানেন না। রাশিয়া ভ্যাকসিন আবিষ্কার ঘোষণা করে দিল। লক্ষ করুন, নামটা ব্যবহার করেছে 'স্পুটনিক'। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অন্যতম সাফল্যের নামে।

বিশ্ববাসীর কাছে করোনা অতিমারির মোকাবিলায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকাও পরিষ্কার। চীনদেশের উহানে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ হয়। জনস্বাস্থ্যে দায়বদ্ধ একটি রাষ্ট্র অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এখন পৃথিবীর দেশে দেশে ডাক্তার, পিপিই, টেস্ট করার সামগ্রী সরবরাহ করছে। ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। ভিয়েতনামে একজন মানুষেরও মৃত্যু হয়নি। উল্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। মাই লাই-এর ঘটনা ভুলে। মানবিকতার কারণে। উত্তর কোরিয়ায় করোনা কোনো দাগই কাটতে পারেনি। ছোট্ট কিউবা। আমেরিকার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও সফল মোকাবিলা করছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ৪৬টা দেশে ডাক্তার নার্স ঔষধ ও নানা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করছে। ইতালির কথা তো আমরা সবাই দেখেছি। সংবাদপত্রে ও সোস্যাল মিডিয়ায়। ইতালির মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কিউবাকে নোবেল প্রাইজের জন্য অনুরোধ করেছে। ঘরের কাছে নেপাল। সেখানকার কমিউনিস্ট সরকার মসৃণভাবে সামলাচ্ছে। ঘরের মধ্যে কেরালা দেখুন। সব রাজ্যসরকারগুলির ব্যর্থতার মধ্যে কেরালা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'হু' কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। বিশ্বে কেরালা মডেল নামে খ্যাত হয়েছে। করোনা বিশ্বযুদ্ধে নতুন করে আবার প্রমাণিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উন্নততর ব্যবস্থা।

করোনা যুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং মমতা ব্যানার্জীর পরিচালনায় রাজ্য সরকার দিশাহীন, পরিকল্পনাহীন, চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ—নোট-বন্দির মতো লকডাউন ঘোষণা করা হলো মাত্র ৪৮ ঘন্টার নোটিশে। সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক, যাদের উপর দেশের উৎপাদনের ৭০ শতাংশ নির্ভর করে, তাদের কথা হিসাবেই রাখা হলো না। কাজ বন্ধ হলে খাবে কী, ভাবা হলো না। ফিরবে কীভাবে, কোনো ব্যবস্থা নাই। কয়েকটি খণ্ডচিত্রই ব্যর্থতা ও বীভৎসতা বোঝাতে যথেষ্ট।

রেল লাইনের ধারে রক্তমাখা পোড়া রুটি, কয়েকটি পরিযায়ী-শ্রমিকের মৃতদেহ, স্টেশনে মৃত পরিযায়ী মা-এর আঁচল নিয়ে একটি শিশু খেলা করছে, অথবা একটি ট্রলি স্যুটকেশের উপর একটি শিশু ঘুমিয়ে আছে, একজন শ্রান্ত মা টেনে চলেছে নিজের রাজ্যে, একজন কিশোরী বৃদ্ধ বাবাকে সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে ২৪০ মাইল পাড়ি দিচ্ছে বাড়িতে ফিরবে বলে। সমগ্র দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিডিয়া ধ্যানগম্ভীর। রাষ্ট্রের মানুষের জীবন-জীবিকার যারা শেষ আশ্রয় সেই সুপ্রিম কোর্ট সমাধিমগ্ন। নাহলে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বলতে হবে। অনেক পরে কয়েকজন বিবেকবান আইনজ্ঞের পত্রাঘাতে একটু সক্রিয় হয়েছিল মাত্র। কাজের কাজ কিছু হয়নি। শেষে ট্রেনের ব্যবস্থা করা হল। ভাড়া কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিধ্বস্ত শ্রমিকদেরই ভাড়া গুনতে হয়েছে। অনেকে দেশে যেটুকু জমি, বউয়ের গয়না বিক্রির টাকা দিয়ে বাস ভাড়া করে ফিরেছে। সেই ট্রেন আসতেও বাধা দিয়েছে তৃণমূলের সরকার। মমতা ঘোষণা করল—করোনা এক্সপ্রেস। দাবি করা হল পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যই রাজ্যে সংক্রমণ বাড়ছে। পরিযায়ীরা কি সব কলকাতা শহরের বাসিন্দা? প্রশ্ন করেনি কোনো মিডিয়া। গোটা ঘটনাপ্রবাহে রাষ্ট্রের শাসকদলের কোনো মানবিক মুখ দেখা যায়নি। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই রাজ্যে, ভিন-রাজ্যেও বামপন্থীরা পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। তারপরও গ্রামে স্থান পায়নি। আমতলায়, বাঁশঝাড়ে, আদারে-বাদারে, শ্মশানে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। ফুড কুপন পায়নি, ১০০ দিনের কাজ পায়নি। সরকার নিরুত্তাপ। যতটুকু সাহায্য-সহযোগিতা বামপন্থীরাই করেছে। যুব-ছাত্রদের ভূমিকা খুবই প্রশংসাযোগ্য।

অপরিকল্পিত লকডাউন। সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য কাঠামো যথাযথ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। মোমবাতি আর থালি বাজানোর গল্প ছাড়া। কোভিড চিকিৎসার কেন্দ্র গড়ে তোলা, সেগুলির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, পিপিই, টেস্টিং কিটস্-এর ব্যবস্থা, কোয়ারান্টাইন সেন্ট্রার, ব্যাপক সচেতনতার প্রচার, সঠিক তথ্য জানানোর ব্যবস্থা করা—এসবের কিছুই করা হয়নি। পরিস্থিতি কেমন তার খণ্ডচিত্র সংবাদমাধ্যমে কিছু প্রচারিত হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থেকে মৃত্যু। কোভিড পেসেন্টরা সুব্যবস্থার দাবিতে হাসপাতালের বাইরে এসে বিক্ষোভ করছে। মৃতদেহ বাড়িতে পড়ে থাকছে ১০/১২ ঘন্টা। অ্যাম্বুলেন্স বিপুল ভাড়া চাইছে। প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হলেই ১৫ লক্ষ টাকা। সরকারি ওয়েবসাইটে অসংখ্য বেড খালি দেখানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে অন্তহীন ছোটার বিরাম নেই। সরকার চলছে।

আনলক ঘোষণা আরও বেশি পরিকল্পনাহীন ও হঠকারী। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থতমত খেয়ে সাপ্তাহিক লকডাউনের দিন প্রতিদিনই পরিবর্তন করছেন। এদের সাফল্য এমনই যে এখন প্রতিদিন ১ লক্ষ ছাড়িয়েছে সংক্রমণ। অনতিবিলম্বে বিশ্বে আমেরিকাকে টপকে প্রথম স্থানাধিকারী হবে। সাফল্যে বিমোহিত প্রধানমন্ত্রী প্রশান্তচিত্তে চার রকম ড্রেস পরে ময়ূরকে দানা খাওয়াচ্ছেন। ভাগ্যক্রমে এমন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি আমরা।

যখন দেশে ব্যাপক ব্যয়-বরাদ্দ হওয়া প্রয়োজন স্বাস্থ্যখাতে, তখন তিনি ‘আমেদাবাদে নর্মদায় হোভারক্র্যাফ্ট চালাচ্ছেন। তার জন্য নর্মদায় বাঁধ দেওয়া হলো। হাজার হাজার আদিবাসীর জমি জলের তলায় চলে গেল। হোভারক্র্যাফ্টটি এখন কোন কাজে লাগছে জানতে ইচ্ছে করে! হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বুলেট ট্রেন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। মুম্বাই থেকে আমেদাবাদ। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি চলে যাবে। জাপানি সহযোগিতায় যে সময় লাগবে তার থেকে কম খরচে কম সময়ে প্লেনে যাওয়া যাবে। এই অর্থ জনস্বাস্থ্য খাতে খরচ করলে ভালো হতো না? কে বোঝাবে। ১৮০০ কোটি টাকা খরচে সর্দার প্যাটেলের মূর্তি গড়া হয়েছে আমেদাবাদের কাছে। তা না করে ওই টাকায় এইম্স-এর মতো কয়েকটি হাসপাতাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়া যেত। রায়গঞ্জে একটি হওয়ার কথা ছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার অনুমোদন করেছিল। কৃষকরা স্বেচ্ছায় জমি দিল। হল না। কারণ রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস কখনো জেতেনি। মমতা ব্যানার্জী করতেই দিলেন না। হলে উত্তরবঙ্গের কতো উপকার হতো। দিল্লি সংসদ ভবন ইত্যাদি নতুন করে তৈরি করার কাজ চলছে। হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পরামর্শ দিচ্ছে—ওসব স্থগিত রেখে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ করা হোক। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।

করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে মূলত রাজ্যগুলিকেই লড়তে হচ্ছে। জি.এস.টি-র টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। অন্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক বার বার দাবি করছেন করোনা মোকাবিলার নামে যে হাজার হাজার কোটি টাকা পি.এম. কেয়ার্স ফাণ্ড তোলা হয়েছে তার থেকে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করা হোক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার স্বার্থে। কা কস্য পরিবেদনা।

যাই হোক, কারোনা আবহে অনেক মহান কাজের মধ্যে আন্দামান সেলুলার জেলে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তালিকা থেকে অগ্নিযুগের বাঙালি বিপ্লবী ৫০০ জনের নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

অভূতপূর্ব আর্থিক সঙ্কটে দেশ

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে এমন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়নি ভারত। ’৯০ দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি পুঁজিবাদী বিশ্ব। যখন বড় বড় মার্কিন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হচ্ছিল তখন রাষ্ট্রকেই নিজের কোষাগারের টাকায় বেল-আউট করতে হয়েছিল। সেই টালমাটালের সময়ও ভারতে তার আঁচ সামান্যই ছিল। কারণ ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার প্রাধান্য। ব্যাংক বিমা সহ মৌল উৎপাদন পরিকাঠামো ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত। সেই সময় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর বিমল জালান মহাশয় বামপন্থীদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাঁচানোর সংগ্রামকে তারিফ জানিয়ে হ্যাটস্ অফ্ বলেছিলেন।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রলোভন, বাক্চাতুর্য, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করে যে শক্তি ক্ষমতায়, তাদের প্রধান কাজই হল উৎপাদনের মৌল কাঠামো যা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে তৈরি হয়েছিল সেগুলি জলের দরে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া। নেহেরুর আমলে তৈরি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থা নাকি ভুল ছিল। সেজন্য নরেন্দ্র মোদীর বাণী রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার জন্মই হয়েছে মৃত্যুর জন্য। ভাগ্যিস রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ গড়ে উঠেছিল,

সেজন্যই বিক্রি করতে পারছেন। শুধু কর্পোরেট তোষণ করে সংকট কাটবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী বলছেন সংকটের কারণ ভগবানের মার। হয়তো ঠিকই, বিজেপি সভাপতি নাড্ডা তো বলেই দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ভগবানের অংশ। তাছাড়া বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে আর একটা ৩০০ বছরের রামমন্দির ভেঙে আর.এস.এস. রামন্দির প্রতিষ্ঠা করতে নামলো। তাহলে ভগবানের মার হতে যাবে কেন?

সংকট আগে থেকেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। মোদীজির প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে লাগামহীন কর্পোরেট তোষণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে। একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত, অন্তঃসারশূন্য চমক দেশের অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় আগেই নিয়ে গিয়েছে।

যে দেশে পৃথিবীর সব থেকে বেশি নিরক্ষরের বাস, উৎপাদনের ৮০ ভাগ ঠিকা প্রথায় হয়, যেখানে খুচরো ব্যবসাই বড় বাজার, আর্থিক লেনদেন পুরোটাই হয় নগদ অর্থে—সেখানে ঠোঁটে রং লাগিয়ে প্লাস্টিক নোট, নগদশূন্য লেনদেন ইত্যাদি কথা বলা বাচালতা মাত্র। এই আবহে মধ্যরাত্রে ম্যাজিক। একঘন্টা সময় দিয়ে নোটবন্দী। চোখ বড় বড় করে বলা হল কালো টাকা উদ্ধার হবে। এক টাকাও উদ্ধার হয়নি। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ নাকি বন্ধ হবে। হয়নি। পুলওয়ামার হত্যাকাণ্ড সরকারের ব্যর্থতার বড় প্রমাণ। নিজের গচ্ছিত টাকা তুলতে ব্যাংকে লাইন, লাইনে মৃত্যু, আমরা দেখেছি। অপরিণামদর্শী এই পদক্ষেপ অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল। নগদ অর্থে যাদের কারবার, ছোট শিল্প ছোট কারখানা ছোট ব্যবসা নগদ অর্থের অভাবে সব গুটিয়ে গেল। কাজ হারালো শত শত শ্রমিক। ধ্বংস হয়ে গেল ছোট কারবার। জিডিপি নেমে গেল ৪-এর মতো।

অপরিকল্পিত লকডাউনের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব জিডিপি চলতি আর্থিক বছরে (এপ্রিল-জুন) সংকোচন হয়েছে (–) ২৩.৯ শতাংশ।

শিল্পক্ষেত্রে সংকোচন হয়েছে (–) ৩৮ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং-এ (–) ৩৯.৯ শতাংশ, পরিষেবা ক্ষেত্রে (–) ২২.৭ শতাংশ, বাণিজ্য ক্ষেত্রে (–) ৪৭ শতাংশ, খনিতে (–) ২৩.৩ শতাংশ, নির্মাণ ক্ষেত্রে (–) ৫৩.৩ শতাংশ। শহরে সংগঠিত ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার ৯.৮৩ শতাংশ। প্রতি ১০ জনে একজন বেকার। নিয়মিত বেতন পেয়ে থাকেন এমন ১ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছনে জুলাই পর্যন্ত। শ্রমিশক্তির ২১ শতাংশ।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রচুর ঢক্কা নিনাদ সহ ২০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষিত হলো। পর্বতের মুষিক প্রসব হলো। মানুষের হাতে অর্থ জোগানোর কোনো ব্যবস্থা হলো না। কর্মসংস্থানের কোনো কর্মসূচি নেই। বাজারে তেজিভাব আনার কোনো পদক্ষেপ নেই।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে। মূলধন আসবে ব্যাংকের ঋণ থেকে। তারপরে উৎপাদিত পণ্য কিনবে কে? বাজার নেই। সুতরাং ধার নিয়ে কেউ উৎপাদনে যাবে না। যাচ্ছেও না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সহ বামপন্থীরা বলে এসেছে মানুষের হাতে টাকার যোগান বাড়াতে হবে। সেজন্য আয়কর দেয় না এমন মানুষের হাতে ৭৫০০ টাকা করে দাও। বাজার চাঙ্গা হবে। উৎপাদন বাড়বে।

আসলে প্যাকেজ পুরোটাই ভাওতা। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ যখন ঘরবন্দী, সেই সুযোগে একটার পর একটা জনবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকলো। ঘোষণার মর্মবস্তু হলো কর্পোরেটদের আরও সুযোগ দেওয়া। কৃষিতে কর্পোরেটের থাবা সুনিশ্চিত করা। শ্রম আইন সংশোধনে শ্রমিকের অধিকার খর্ব করা। কাজের ঘন্টা বাড়ানো। জাতীয় সম্পদ দেশি-বিদেশি পুঁজির কাছে বেচে দেওয়া। সবই হচ্ছে, কিন্তু এত তোষণ সত্ত্বেও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে না। কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। কর্মহীনতা সর্বকালীন রেকর্ড অতিক্রম করলো। পণ্য উৎপাদন স্তব্ধ হলো। এর নাম মেক-ইন-ইন্ডিয়া।

প্রধানমন্ত্রী ৪১টি কয়লাখনি অঞ্চল কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেবার ঘোষণা করলেন। দেশের মানুষের নাকি সেটাই ইচ্ছা। কয়লাখনি অতীতে ব্যক্তি-মালিকানাতেই ছিল। সেই সময়ের অরাজকতা আমরা দেখেছি।

বিমানবন্দর, রেল, ইসরো, তৈলক্ষেত্র, ইস্পাত, ব্যাংক, বিমা এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা বেচা হবে না। সবই কর্পোরেটের স্বার্থে। বিজেপির কাছে ওটাই দেশের স্বার্থ। দেশ জাহন্নামে যাক, কিছু যায় আসে না। উৎপাদন নেই, শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ নেই, কাজ নেই, দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। করোনা সংক্রমণের সঙ্গে তাল দিয়ে পেট্রোপণ্যের মূল্যে লাগাতার বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। দেশের আর্থিক অবস্থা গভীর খাদে নিমজ্জিত।

এই গভীর সংকটে কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রায় শূন্য। ১৩০ কোটির দেশে ক্রেতা নেই। মনে করার কারণ নেই, প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু আম্বানি-আদানিদেরও বুঝি মুনাফা কমছে। খবরে প্রকাশ, বিশ্বের প্রথম ১০জন ধনীর মধ্যে মুকেশ আম্বানির স্থান নবম। আহা কী আনন্দ! ধান্দার ধনতন্ত্রের কী অপার মহিমা।

ভ্রান্ত বিদেশনীতি

আমাদের নীতি ছিল স্বাধীন সার্বভৌম জোট-নিরপেক্ষতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালে জোটনিরপেক্ষ শান্তিকামী মানুষের কাছে সমাদৃত ছিল। জোটনিরপেক্ষ নীতির অঙ্গহানি হয়েছিল কংগ্রেসি আমলেই। মনমোহন সিং বামপন্থীদের হাত ছেড়ে মার্কিনীদের হাত ধরে শান্তি পেয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য কোনো চক্ষুলজ্জা নেই। রাস্তার মাঝখান দিয়েই চলেন। এখন কোলাকুলি চলছে। চিরকালই আর.এস.এস/বিজেপি সাম্রাজ্যবাদের কাছে মুচলেকা দেওয়া পার্টি।

সফল বিদেশনীতির প্রথম কাজ হল প্রতিবেশীদের বন্ধুত্ব অর্জন। পাকিস্তানের সাথে সীমান্ত-বিরোধ জন্মলগ্ন থেকেই আছে। সমস্যা মেটাতে কেউই আন্তরিক নয়। উভয়েরই শ্রেণি-স্বার্থে বিরোধ জিইয়ে রাখা জরুরি। বাংলাদেশ যারা আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল, তারা আর ঘনিষ্ঠ নেই। দোদুল্যমান। বাংলাদেশের নাগরিকদের সম্পর্কে আপত্তিজনক কথা বলা হবে, দেশে বিভাজনের রাজনীতি করতে গিয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ করা হবে, এমনকি ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ফকরুদ্দিন আলি আহমদ-এর ভাই আত্মীয়দের পর্যন্ত বলছে বিদেশি, শুধুমাত্র মুসলিম বলে। বাংলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তো মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তাদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। নেপাল ভুটানের মতো দেশ যেখানে যেতে ভিসা পর্যন্ত লাগতো না, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। ধর্মীয় বিভাজনের নীতি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তার বিচার করার প্রয়োজন নেই। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আরবের দেশগুলির প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রাখা হচ্ছে না। শুধু ট্রাম্পের বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য জুতা খুলে প্রণামের ভঙ্গি করতেই হবে? ইরানের চাবাহার বন্দর থেকে আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত রেল লাইন তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিল ভারত। প্রকৃতপক্ষে যৌথ উদ্যোগ। বিদেশে

ভারতের একটা ডক থাকতো। ইরান চুক্তি থেকে ভারতকে বের করে দিয়েছে। ভারত নাকি মার্কিনী চাপে ইচ্ছা করেই বিলম্ব ঘটাচ্ছিল? মহা শত্রু আমেরিকার সাথে ভারতের এত সখ্য ইরানের রাগের প্রধান কারণ।

চীনের সাথে সীমান্ত নিয়ে সমস্যা বহুদিনের। ১৯৬২ সালের সেই সীমান্ত সংঘর্ষের সময়কাল থেকেই। সীমান্তে কাল্পনিক সব লাইন, ম্যাকমোহন লাইন ইত্যাদি চিহ্নিত। সুতরাং দুই দেশেরই সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্বে চীন অরুণাচল প্রদেশ তাদের বলে দাবি করেছিল, বামপন্থীরা তা সমর্থন করিনি। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য আছে। আমাদের দুই মহান দেশই অনেকগুলি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী-সদস্য। সুস্থিতিতে উভয়েরই মঙ্গল।

বিভাজনের রাজনীতি করতে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর আলাদা করা হলো। দুই জায়গাতেই নির্বাচিত সরকার নয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এসব করার সময় অসহিষ্ণু প্রতিবেশীর কথা ভাবা উচিত। এসব সমালোচনা বিজেপির সহ্য হবে না! পার্লামেন্টে অমিত শাহ সদম্ভে ঘোষণা করেন, জম্মু ও কাশ্মীর বলতে গিলগিট ও আকশাই চীনও বোঝাবে। চীনকে ঘিরে ফেলার মার্কিন রণনীতির শরিক হতে যাব আমরা কার স্বার্থে। দক্ষিণ চীন সাগর ও মালাক্কা প্রণালীতে, যেখান দিয়ে চীনের পেট্রোপণ্যের মূল পথ, সেখানে মার্কিন নৌবহর, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার সাথে যৌথ নৌ-মহড়া প্রতিবেশীরা ভালো চোখে দেখবে না।

গালওয়ানে সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘর্ষ ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়াসমূহ

আমাদের ২০ জন জোয়ান ছেলে শহিদ হলো। ১০ জন বন্দী হলো। চীন স্বীকার করেছে তাদেরও একজন কমাণ্ডার নিহত হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের অভ্যন্তরে কেউ ঢোকেনি, কোনো চৌকিও দখল হয়নি। সেনারা প্রস্তুত আছে। খুবই বিচক্ষণের মতো কথা। আমাদের জোয়ান ছেলেদের মৃত্যুতে ক্রোধ ও আবেগ-মথিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিপজ্জনক দিক হচ্ছে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির অপচেষ্টা।

যদিও বামপন্থীরা গোটা দেশে দুর্বল, কারও কারও দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়, তবুও তাদেরকেই টার্গেট করা হচ্ছে। সংবাদ বিকৃত করে ছবি বিকৃত করে মিথ্যা সংবাদ তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। বিনয়ের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বামপন্থীদের দেশভক্তি শেখানোর চেষ্টা না করে তাদের কাছ থেকেই দেশপ্রেম শিখুন।

প্রথম বহিঃপ্রকাশ ছোট দোকানগুলি থেকে চীনা পণ্য রাস্তায় জড়ো করে পোড়ানো। ছোট দোকানদারদের ক্ষতি করে লাভ হবে না। ওরা চীন থেকে মাল কিনে আনে না। ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে আমদানি-রপ্তানিকারীরা চীন থেকে মাল নিয়ে আসে। ওখানে ধরতে হবে।

এখন তো দেখা যাচ্ছে সীমান্তে লাগাতার সমস্যা তৈরি হয়েই চলেছে। দুই দেশই পরস্পরকে দোষারোপ করছে। মন্ত্রী-পর্যায়ের বৈঠকের পর আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। ভালো কথা।

ভারত সরকার অনেকগুলি চীনা এ্যাপ-এর ব্যবসা ভারতে বন্ধ করে দিয়েছে—'টিকটক' ইত্যাদি ইত্যাদি। পেটিএম বাদ। ওটাও চীনা। তবে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিজ্ঞাপনের মুখ ছিলেন। বলা হল টিকটক মারফৎ নাগরিকদের তথ্য চীনে চলে যাচ্ছে। টিকটক বলল আমাদের তথ্য চীনে নয় সিঙ্গাপুরে যায়। যাই হোক টিকটকের শেয়ারের দাম পড়ে গেল। মুকেশ আম্বানি কিনে নিল। চীন ফেসবুক ইউটিউব ইত্যাদি মার্কিন বহুজাতিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। চীন ফেসবুককে তাদের দেশে নিষিদ্ধ করেছিল। কোনো অসুবিধা হয়নি। ট্রাম্প এসব বরদাস্ত করবে কেন। ইতিমধ্যে ফেসবুক ইউটিউব জিও প্ল্যাটফর্মের ১০ শতাংশ ও ৭ শতাংশ শেয়ার কিনেছে। মুকেশ আম্বানির ঘরে হাজার হাজার কোটি টাকা মুফতে ঢুকে গিয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, গুগুল সবারই তথ্য আমেরিকায় সঞ্চিত থাকে। মার্কিনী আইন অনুযায়ী সব সিআইএ-কে সরবরাহ করতেই হবে। জিও-র সাথে ফেসবুক-ইউটিউবের একচেটিয়া ব্যবসা। ভারত তো নিজে কিছু তৈরি করতে পারলো না।

একশ্রেণির সংবাদমাধ্যমে রাফাল যুদ্ধবিমান নিয়ে তুমুল শোরগোল ফেলেছে। আর চিন্তা নেই, চীনকে রাফাল দিয়েই শায়েস্তা করা যাবে। ভক্তরা জানেন না আকাশপথে ভারত রাফাল ছাড়াই চতুর্থ শক্তি। আসল কথা হল হট্টগোলের মধ্যে রাফাল নিয়ে দুর্নীতির বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া গেল। ১৪ শত কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের তৈরি সর্দার প্যাটেলের মুর্তিটি কিন্তু থেকেই যাবে।

আমরা যুদ্ধ চাই না। যুদ্ধোন্মাদনাও বাঞ্ছনীয় নয়। যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়। সমস্যা তৈরি করে। সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ চায়। তাদের সমরাস্ত্র বিক্রি করবে। সার্বভৌম স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে পারবে। এই যুদ্ধে কেউই বিজয়ী হবে না। আমেরিকা রাশিয়া ইজরায়েল ফ্রান্স ইত্যাদি দিশের অস্ত্র-কারবারিরা খুশি হবে।

স্বাধীন সমমর্যাদায় যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সীমান্ত সমস্যার সমাধান একান্ত কাম্য। সেটাই হবে প্রাজ্ঞতার পরিচয়। গভীর আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি যুদ্ধ যুদ্ধ আবহে ঘটবে না। ইতিমধ্যেই জনজীবন দারুন দুর্দশাগ্রস্ত। ভয়াবহ অবস্থা। মানুষের দুর্দশা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আর্থিক সংকট গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে অভূতপূর্ব। আশু সমাধানের সম্ভবনা কম। করোনা মহামারিতে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ায় বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। প্রয়োজন গবেষণায় আরও বেশি অর্থ যোগানের। কৃষির সংকট নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিন মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছে। কৃষি শিল্প সার্ভিস সেন্টার এমনকি পুলিশ মিলিটারিতে কাজ না পেয়ে হতাশায় যুবকদের আত্মহত্যা উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। অপুষ্টিজনিত কারণে যক্ষ্মায় প্রতি বছর করোনার থেকেও বেশি লোক মারা যায়। তাদের কী হবে। ২০১১ সালের আদমসুমারির তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ মানুষ দেশের অভ্যন্তরে নিত্য ঠাই বদল করতে বাধ্য হচ্ছে। কাজের খোঁজে। ভারতে নতুন বেদুইনের দল তৈরি হয়েছে। সেই পরিযায়ী শ্রমিক শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে দেশময়। এত বছর স্বাধীনতার পরও জনসংখ্যার ২০ শতাংশ নিরক্ষর। এ লজ্জা ঘুচবে কবে। এর মধ্যেই আমেরিকা ভিসার নয়া ফরমান জারি করেছে। হাজার হাজার তথ্যপ্রযুক্তির পেশাদাররা দেশে ফিরতে বাধ্য হবে। তাদের কী হবে! শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে, লক্ষ লক্ষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে আরও বেশি ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন। অস্ত্র কেনার বদলে সমস্যাগুলি সমাধানে আরও বেশি আন্তরিক ও সর্বস্বপণ লড়াই কর্তব্য।

কেন্দ্রের শাসকদল এ রাজ্যের শাসকদল অতিমারি মোকাবিলায় ব্যর্থতা, আর্থিক সংকট সমাধানে দিশাহীনতা, দুর্দশাজনিত কারণে মানুষের ক্ষোভকে বিভ্রান্ত করার বাসনায় ধর্মীয় বিভাজন ও যুদ্ধোন্মাদনা তৈরির দিকেই বেশি মনোযোগী। সর্বনাশা খেলা বন্ধ করার জন্য জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে।

‘বুর্জোয়া রাষ্ট্র’, ‘বুর্জোয়া গণতন্ত্র’

হরিহর ভট্টাচার্য

১৯৯০-এর দশকের কোনো এক সময়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানর এক আমন্ত্রিত অধ্যাপককে একান্তে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, ‘‘আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি তো ‘মার্কসবাদী’ এবং বাম-সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক, বলুন তো, পশ্চিমবঙ্গ বা দেশের অন্যত্র যে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠত হয়েছে সেটা ভারতের বুর্জায়া রাষ্ট্রের অংশ কিনা।’’ তিনি বলেছিলেন, ‘‘পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থা দেশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ।’’ তিনি হয়তো ঠিক বলেছিলেন। তারপর যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘তা হলে বামফ্রন্ট সরকার, তথা পঞ্চায়েত শাসন কীভাবে শ্রেণি-সংগ্রামের হাতিয়ার হল? অর্থাৎ সরকার কীভাবে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়? মার্কসবাদীদের কাছে শ্রেণিসংগ্রাম সরকার-নির্ভর হতে পারে না।’’ তিনি একটু বিরক্ত হয়ে উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন। ওই শ্লোগানের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক তাৎপর্য হয়তো তিনি বোঝার চেষ্টা করেননি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এ ব্যাপারে Confusion থাকাটা স্বাভাবিক, বিশেষ করে, যাঁরা বিষয়টি নিয়ে একটু সিরিয়াসলি ভাবেন। আপাতত এই ধাঁধার মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। সেই প্রশ্নের একাধিক অংশ আছে। প্রথমত, সরকার বলতে কী বোঝায়? যাদের রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন যে, সরকার বলতে শুধু মন্ত্রীদের বোছায় না। মন্ত্রীরা বা মন্ত্রী পরিষদ তো পাঁচ বছরের জন্য। সরকারের স্থায়ী এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আমলাতন্ত্র, পুলিশ ব্যবস্থা ও আইন। বিচারব্যবস্থাকে সীমিত অর্থে সরকারের অংশ বলা যায় না, কিন্তু এটা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ এবং বিচারব্যবস্থার উপর দলীয় সরকারের কোনো হাত থাকার কথা নয়। সরকারের কাছে বিচারব্যবস্থা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি মেনে নির্বাচিত দল যে সরকার গঠন করে তাকে মার্কসীয় শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তার চরিত্রায়ণ সম্বন্ধে অনেক সাবধানতা প্রয়োজন। কোনো বামপন্থী দলের উদ্দেশ্য হতে পারে রাজ্য-স্তরে (এখন কেন্দ্রীয় স্তরেও) ক্ষমতায় গিয়ে, সরকার গঠন করে ‘বুর্জোয়া গণতন্ত্রের’ সীমাবদ্ধতা মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করা এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, ইত্যাদি। এই থিসিস বেশ স্ব-বিরোধী। সরকারে অংশগ্রহণ করলে তাকে তো ভালোভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। ভালো কাজ করলে কেন মানুষ সরকার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা করবেন? তৃতীয়ত, প্রচলিত ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ যদি হয় ‘নেতিবাচক’, সেক্ষেত্রে জনমানসে তার কার্যকারিতা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। একটি মুক্ত উদারনৈতিক গণতন্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ তার ভোটদান ও সমর্থনের হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে ওই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই সন্দিহান হয়ে পড়ে। সবশেষে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি যদি ব্যবহারমূলক হয়, তখন যেটা বাকি থাকে তা হলো সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্মমভাবে দলদাসে পরিণত করা, প্রতিষ্ঠানগুলিকে তার নিজস্ব কার্যকারিতা প্রমাণ করতে অসমর্থ করে তোলা, শেষবিচারে মানুষকে প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিচ্যুত করে দেওয়া। এর করুণ পরিণতি হতে পারে এই রকম ঃ অন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তি সেগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে ‘নামকে ওয়াস্তে’ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে অতি সহজেই, কেননা তা করার ক্ষেত্রে কোনো জনবিরোধ তৈরি হয় না। যেহেতু ওইসব প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নানা রসদ, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা। শেষ বিচারে, গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন বা তৃণমূলীয় গণতন্ত্র নামক আদর্শগুলি হয়ে দাঁড়ায় এক রকম রাজনৈতিক প্রহসন।

মার্কসবাদের আলোকে যে তাত্ত্বিক-ধারণাগত বিভ্রান্তি উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত সেটা আরও পরিষ্কার

করা দরকার। এখানে আরও একটি প্রশ্নে আমার এক সহকর্মী অধ্যাপক (যিনিও বামপন্থী)-কে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভারতের পার্লামেন্টের বামপন্থী সদস্যরা ভারতীয় 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্রের অংশ কিনা। তিনিও জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, না তাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ নয়। এখানে আবার ধাঁধা এসে গেলো। আইন-সভা, শাসনবিভাগ ইত্যাদি 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র' কিন্তু তার বামপন্থী সদস্যরা তার অংশ নয়। আমি কী বলতে চাই বুঝলেন, কিন্তু বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না। যাক সে কথা।

উপরের যে-দুটি উদাহরণ দিয়েছি তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমার মনে হয়েছে, বামপন্থী মার্কসবাদী চিন্তায় 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র' ও 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তি আছে। বিপ্লবী যুগে লেনিন রাশিয়ার 'ডুমা' সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন এবং কী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। ১৯১৭ সালে লেনিন তাঁর সুবিখ্যাত 'দ্য স্টেট এন্ড রেভল্যুশান'-এ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে সাধারণীকরণ করেছিলেন তাও ছিলো তৎকালীন রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিশেষ প্রেক্ষিতে। লেনিনের 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' (১৯০২) বই-এ তিনি পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাশিয়ার মতো দেশের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যে তুলনা করেছিলেন, সেটার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। কেন অনেকটা সত্য ছিলো তা বুঝতে এবার আমাদের মার্কসকে অবলম্বন করে 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র' বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার করতে হবে।

এ ব্যাপারে মার্কসের চিন্তা কী ছিলো তা জানার আগে ইউরোপের ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়কে মাথায় রাখতে হবে। ইউরোপে সামন্ততন্ত্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে শেষ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে, কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে মোটামুটি ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) পর্যন্ত সময়ে বৃহৎ রাজতন্ত্রভিত্তিক এক বিশেষ ধরনের সামন্তবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেগুলি গড়ে ওঠার পিছনে প্রধান কারণ ছিলো সামন্তবাদকে পুনরুদ্ধারের শেষ রাজনৈতিক চেষ্টা, যা সফল হয়নি। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক পেরী অ্যান্ডারসন এক অনবদ্য ও অবিসংবাদিত গবেষণা করেছেন। অ্যান্ডারসন বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে এই বৃহৎ রাজতন্ত্রগুলি যাদের তিনি 'Absolutist' বলেছেন, প্রথম দেড়শো বছর ধরে সামন্তবাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে উদীয়মান পুঁজিবাদের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করে তার সেবায় নিযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন উদাহরণস্বরূপ ফরাসি বিপ্লবের দেড়শো বছর আগে থেকে ফরাসি রাজতন্ত্র উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করতে থাকে। এই রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এবং ভয়ানক হিংসার প্রয়োগ হয়। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের ছাত্ররা জানবেন গোটা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে ইরোপে যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছিল। প্রায় তিনশো বছর ধরে গড়ে ওঠা এই রাজতন্ত্রগুলির যুদ্ধের প্রয়োজনে রাষ্ট্রগঠনে আমলাতন্ত্র, জাতীয় কর-ব্যবস্থা, গোটা দেশে একই আইন, কূটনীতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়ে যায়। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার জঠরেই ভবিষ্যতের আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র জন্মলাভ করে ও অনেকটা বিকশিত হয়। এই অদ্ভুত রাষ্ট্রব্যবস্থার আসল প্রকৃতি নিয়ে স্বয়ং মার্কস ও এঙ্গেলস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন—কখনো বলেছেন এক অদ্ভুত 'পুঁজিবাদী রাষ্ট্র' কখনো বা 'সামন্তবাদী রাষ্ট্র', যে অনেক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে, ইত্যাদি।

উপরের ইতিহাস থেকে যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, পাশ্চাত্যের পুঁজিপতিরা কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তৈরি করেনি, একের পর এক বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ওই সব 'রেডিমেড' রাষ্ট্রগুলির দখল নিয়েছে এবং সেগুলি নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে ব্যবহার করেছে। ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব রাজশক্তির ক্ষমতা খর্ব করে। বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক জন লক এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা চালনার নীতিগুলি স্থির করে দেন, অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে সীমিত; এখানে আইনের অনুশাসন থাকবে; বিচারব্যবস্থা হবে নিরপেক্ষ; রাষ্ট্রের কাজ হবে ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। মার্কস যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কথা বলে গেছেন তা ছিল এই লকীয় বা লক-পরবর্তী রাষ্ট্র। মার্কস এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই তার চারদিকের ঐতিহাসিক পরিগুলে দেখেছিলেন এবং তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছিলেন। সুদীপ্ত কবিরাজ বলেছেন, মার্কসের দেখা ওই বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র ছিল না এবং মার্কসের জীবিতকালে ইউরোপে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' ছিল বিরল। খোদ ইংল্যান্ডে ১৯২৮ সালে সত্যিকারে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে মার্কসকে ভুল বুঝলে চলবে না। উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের মাঝখানে বসে কোন্ দেশে কী পরিবর্তন হচ্ছিল তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অন্বেষণ করতেন। ইংল্যান্ডে চাক্ষুষ করেছেন একাধিক গণ-আন্দোলন এবং তার প্রভাব। ১৮৬৭ সালে দ্বিতীয় সংস্কার আইনে শ্রমিক শ্রেণির সীমিত ভোটাধিকারকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। ওই বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় জানুয়ারি, ১৮৬৯ থেকে। মার্কসের জীবন-সায়াহ্নে লেখা ও চিঠিপত্রে ইউরোপের দু-একটি দেশের (যেমন হল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের) সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাচীনত্ব লক্ষ করে বলেছেন, ওইসব দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও হতে পারে, যদিও সেটাকে এক ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখা উচিত।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়ার আছে। পাশ্চাত্যে 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র'কে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' রূপে রূপান্তরিত করেছে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ। বুর্জোয়া শ্রেণির নিজস্ব কৃতিত্ব এখানে খুব একটা নেই। বুর্জোয়া শাসক শ্রেণি বরং তাদের রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণকে রুখে দেওয়া বা নানা অছিলায় বিলম্বিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ইংল্যান্ডের The Cat and Mouse Act 1913 একটি উদাহরণ। ইংল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে বিনষ্ট করার আরও নানা কৌশল ও আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস করা হয়। মার্কস তাঁর জীবনকালে 'বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্র' দেখতে পেলে কী বলতেন সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তিনি কিন্তু এই গণতন্ত্র বোঝার মূল সূত্রটা আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন—তথাকথিত বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্যটা কিন্তু শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের। এটা তাদের নানা সংগ্রামের ফসল। তাই 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র' ও 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'কে এক করে দেখলে হবে না। এবং 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'-কে শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে সেটা মার্কস-বিরোধিতা হবে। তা হলে, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে অসম্মান করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার মূল কৃতিত্বটা বামপন্থীদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ও আন্দোলনের ফল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র'-ব্যবস্থার অংশ বলে এক চূড়ান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এবং সংকীর্ণ দলদাসে পরিণত করে দিলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হয়। এক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা এক বিরাট সাক্ষ্য বহন করে।

এই লেখাটি ভবিষ্যতে একটি বড় লেখার ভূমিকা এবং কাঠামো মাত্র।

মহামারি, ইতিহাস ও অর্থনীতি

বিভাস সাহা

যুদ্ধ, বাণিজ্য ও ধর্ম—এই তিনটির সাথে মহামারি তথা অতিমারির সম্পর্ক দীর্ঘকালের। চীনের উহান শিল্পপ্রধান শহর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে চীনের পঞ্চম ধনী শহর, মাথাপিছু আয় ২৪,০০০ ডলার (তুলনায় ভারতের সর্বাধিক ধনী শহর মুম্বাই-এর মাথাপিছু আয় ১৭,০০০ ডলার)। এই শহরেই প্যাঙ্গোলিনের মাধ্যমে বাদুড়বাহিত করোনা ভাইরাসের মানুষ-আক্রমণ নিতান্তই কাকতালীয় ও আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু উহান থেকে দ্রুত বাকি পৃথিবীতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া কাকতালীয় নয়। উহান থেকে মিলান শহর হয়ে বাকি ইউরোপে এবং নিউইয়র্ক হয়ে আমেরিকায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণ বাণিজ্য। মিলান ইটালির মূল বাণিজ্যশহর। বর্তমান বাণিজ্য-ব্যবস্থায় যে-কোনো দেশের তুলনায় চীনের গুরুত্ব অনেক বেশি, তাই উহান শহরের ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক গাফিলতি বাকি বিশ্বে ভাইরাস দ্রুত ছড়াতে সাহায্য করেছে। তবে একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে চীন যেভাবে হুবেই প্রদেশের মধ্যেই ভাইরাসকে আটকে রাখতে সফল হয়েছে, তার থেকে পশ্চিমের দেশগুলি বা ভারত যদি অর্ধেক শিক্ষাও নিত, তাহলে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে তারা অনেক সফল হতো। শিক্ষা না নেওয়ার কারণ অংশত রাজনৈতিক এবং অংশত অর্থনৈতিক। অর্থাৎ ২০২০-র প্রথম তিন মাস চীনের অর্থনীতি যখন ভাইরাসের আক্রমণে কাবু হয়ে পড়েছে, পশ্চিমের দেশগুলি ভেবেছিল চীনকে টেক্কা দেওয়ার এই সুযোগ এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গেলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখতে হবে। বাস্তবে অবশ্য হিতে বিপরীত হয়েছে। সে অন্য কথা।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি নতুন মহামারির জন্ম দিয়েছে। তার দুটি কারণ হয়, এক, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে আসা মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ, এবং দুই, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার প্রবণতা ও সেই সূত্রে অন্যান্য প্রাণীর সংস্পর্শে আসা। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল সতর্কবার্তা দিয়ে আসছেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা এই সতর্কবার্তা অবহেলা করেন। বর্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে অর্থনীতির এই স্ব-বিরোধী চরিত্রের কথা আলোচনা করবো।

বাণিজ্য ও প্লেগ প্যানডেমিক

বাণিজ্যের কারণে মহামারি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া আগেও হয়েছে, সেটি হচ্ছে প্লেগ (Bubonic and pneumonic plague)। ইতিহাসে প্লেগের তিনটে অধ্যায় রয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি ভয়ংকর, এবং তৃতীয় দফার প্লেগ ভারতকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল। সে কথায় পরে আসছি। প্রথম পর্বের প্লেগ শুরু ইথিওপিয়ায় ৫৪০ খ্রিস্টাব্দে। সেখান থেকে আলেক্সান্দ্রিয়া (তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যবন্দর) হয়ে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথে

তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তানবুল) পৌঁছায় ৫৪১ খ্রিস্টাব্দে। তখন সেখানে বাইজেনটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান-১ রাজত্বে। প্লেগের আক্রমণ এত ভয়ংকর হয় যে কনস্টান্টিনোপল শহরে ৫৪২ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে প্রতিদিন ৫,০০০ থেকে ১০, ০০০ মানুষ মারা যায়, শহরের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কনস্টান্টিনোপলকে শেষ করে প্লেগ উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে যায় এবং ৫৪২ থেকে ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি ১০ কোটি মানুষের প্রাণ নেয়। উপরন্তু পরবর্তী দেড়শো বছর প্লেগের প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন পর্যায়ে চলতেই থাকে।

এসবের ফলশ্রুতি হিসাবে ইউরোপের অর্ধেক জনসংখ্যা শেষ হয়ে যায়। ফলে দেখা দেয় ব্যাপক খাদ্য সংকট, বাণিজ্য বিপর্যয়, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব এবং শেষমেষ বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের পতন। ইউরোপেও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে ফিউডাল তথা এক নতুন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পত্তন হয়।

দ্বিতীয় প্লেগ প্যানডেমিক পর্বটি মধ্যযুগে ৮০০ বছর বাদে চতুর্দশ শতাব্দীতে। এ সময় প্লেগ ইউরোপে এসেছিল সিল্করুট দিয়ে এবং পৃথিবীকে ছারখার করে দিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সিল্করুটের (বারোডের) গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সাড়ে চার হাজার মাইল দীর্ঘ সিল্করুটের পূর্ব প্রান্তে ছিল চীনের রাজধানী বেজিং ও চীন সাগরের তীরে হাংজৌ শহর, এবং পশ্চিম প্রান্তে ছিল মিশরের কায়রো ও তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল। মাঝে অতিক্রম করছে তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, পার্সিয়া, জর্ডন, সিরিয়া। এই রাস্তা দিয়ে সিল্ক, চা, পোর্সিলিন ইত্যাদির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ছিল। সিল্করুটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার প্রাচীন বাণিজ্যপথ এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি। ব্ল্যাক সী-র মাধ্যমে তুরস্ক ও রাশিয়ার বাণিজ্য সংযোগ এবং ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্য সংযোগ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা দরকার, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে বাণিজ্য করার জন্যে পূর্বদিকে তাকানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, কারণ তখনো আমেরিকা আবিষ্কার হয়নি আবার ভারতে আসার সরাসরি সমুদ্রপথও আবিষ্কার হয়নি। তাই সিল্করুটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

সম্ভবত এই পর্যায়ের প্লেগের উৎপত্তি গোবি মরুভূমিতে, অর্থাৎ দেশ হিসেবে চীনে অথবা মোঙ্গোলিয়ায়। সেখান থেকে মোঙ্গোলিয়ান সৈনিক এবং ব্যবসাদারদের মাধ্যমে ক্রাইমিয়ায় পৌঁছায়। সেখানে ১৩৪৬ সালে বড় আকারে ছড়ায়। সংক্রমণের সূত্রপাত মোঙ্গোলিয়ান সম্রাট জানিবেগ যখন ক্রাইমিয়ার বন্দর শহর কাফা দখলের চেষ্টা করে। প্লেগে মৃত সৈনিকদের মৃতদেহ শহরের দেওয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে আতংক সৃষ্টির চেষ্টা করতে গিয়ে এই রোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির ব্যবসাদাররা তখন ভেনিস-কনস্টান্টিনোপল-ক্রাইমিয়া এই পথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। জাহাজে করে ইঁদুরের মাধ্যমে প্লেগ ইতালিতে এসে পৌঁছায় ১৩৪৭ সালে এবং জেনোয়া বন্দরশহর থেকে বাকি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালি থেকে ধাপে ধাপে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড হয়ে প্লেগ ১৩৪৯-এ নরওয়ে পৌঁছায়, তারপর ১৩৫১ সালে উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ায়। ইউরোপের বাইরে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং ভারতেও রোগ ছড়িয়েছিল। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৭ , এগারো বছর ধরে উত্তাল হওয়া এই মহামারিতে ইউরোপে আড়াই কোটি মানুষ মারা যায়, যার ফলে ইউরোপের ৩০ শতাংশ জনসংখ্যা শেষ হয়ে যায়। এই প্লেগকে Black Death বলা হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন ইউরোপ ও সেন্ট্রাল এশিয়ায় অন্তত সাড়ে-সাত কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল। শুধু ইউরোপেই কম করে পাঁচ কোটি মারা গিয়েছিল। প্যারিস, ফ্লোরেন্স, লন্ডন এবং হামবুর্গ শহরে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ মানুষ মারা যায়। লন্ডনের জনসংখ্যা তখন এক লক্ষের কাছাকাছি। এই সময় প্যারিস ও ফ্লোরেন্স জনসংখ্যায় লন্ডনের থেকে দুই থেকে আড়াই গুণ বড় শহর ছিল, সম্পদের দিক দিয়েও ধনী ছিল অনেক। ইউরোপে প্লেগের ধাক্কায় যে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিল, সেই জনসংখ্যা ফিরে পেতে ইউরোপকে আরো দুশো বছর অপেক্ষা করতে হয়। ইউরোপের বাইরেও (বর্তমান) মধ্যপ্রাচ্যে, এশিয়ায় এবং উত্তর আফ্রিকায় প্লেগ ছড়িয়েছিল বিপুলভাবে। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৭ এই এগারো বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ কোটি। পৃথিবীর জনসংখ্যা তখন ৪৫ কোটি।

এ প্রসঙ্গে সাহিত্যপ্রেমীদের স্মরণ করাতে পারি ১৩৫৩ সালে লেখা জি ও ভানি বোকাচিও-র 'ডিক্যামেরন' গ্রন্থটির কথা। দেখা যাচ্ছে, অভিজাত সম্প্রদায়ের সাত নারী ও তিন পুরুষ ফ্লোরেন্স শহরের বাইরে আশ্রয় নিয়েছে এক নির্জন বাড়িতে এবং তাদের মুখ দিয়ে বলা একশো গল্প নিয়ে লেখা ডিক্যামেরন। এ নিয়ে রবার্টো পাসোলিনির একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রও আছে। বোকাচিও গল্পের শুরুতেই লিখছেন কীভাবে সমাজের তিনটে শ্রেণি প্লেগের মোকাবিলা করেছিল। যারা অত্যন্ত ধনী তারা শহর ছেড়ে গ্রামে তাদের বিলাসবহুল এস্টেট বা ভিলায় চলে গিয়েছিল। যারা উচ্চবিত্ত তারা শহরেই গৃহবন্দি হয়েছিল, এবং চমৎকার মদ, পানীয়, খাবার এবং সংগীত উপভোগ করেছিল। আর বাকি যারা, যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না, বা আয়শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের গৃহবন্দি হয়েও রেহাই ছিল না। প্লেগে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। দরিদ্ররা ধনীদের বাড়িতে কাজ করতে যেতে বাধ্য হতো এবং অসুস্থদের সেবা করতে গিয়ে নিজেরাও মারা পড়তো। এই চিত্র আজ ভারতেও দেখা যাচ্ছে করোনা লকডাউনের মধ্যে।

ইংল্যান্ডে প্লেগ এসে পৌঁছায় ১৩৪৯ সালে (নাবিকের মাধ্যমে)। এ সময় ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ (বর্তমানে ৬ কোটির একটু বেশি), তাব. মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থেকে ৪৫ শতাংশ মারা গিয়েছিল বলে ধরা হয়। সে-সময় মৃত্যুর হিসাব ঠিক রাখা হতো না। ফলে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক মতানৈক্য আজও মেটেনি।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে বাণিজ্য রোগ বয়ে আনে, সেখানে রোগ সংক্রমণের একটা ভৌগোলিক প্যাটার্ন আছে। বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে, অর্থাৎ বড় শহর থেকে ছোটশহর ও গ্রামের দিকে যাত্রা করে। অর্থনৈতিক দিকে ধনিকশ্রেণির মধ্যে প্রথম সংক্রমণ হবে, কিন্তু তা শীঘ্রই দরিদ্রদের আঘাত করবে, কারণ তাদের গৃহবন্দি থাকার আর্থিক সঙ্গতি নেই।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, যে উত্তর ইতালিতে জেনোয়া বন্দর শহর ১৩৪৮ সালের প্লেগের এপিসেন্টার হয়েছিল এবং গোটা ইউরোপে প্লেগ ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই উত্তর ইতালিই আবার ২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের ইউরোপীয়ান এপিসেন্টার হয়, তবে এবার অন্য শহরে, মিলান এবং তার নিকটবর্তী শহর বা গ্রামে। এর কারণ শুরুতেই বলেছি। ইউরোপের ফ্যাশন রাজধানী মিলানের সঙ্গে উহান শহরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। এছাড়া মিলানের নিজস্ব পর্যটন আকর্ষণ আছে। তাই এখানেই ভাইরাস প্রথমে এসে পৌঁছায়। কাছের বারগামো শহর টুরিস্টদের প্রিয় স্কি শহর। এই দুয়ের সংমিশ্রণ অগ্নিতে ঘৃতাহূতি দিয়েছে।

সর্বত্রই সংক্রামক রোগে দরিদ্র মানুষ মারা যাবে বেশি। তার মানে শ্রমিক বা কাজের লোকের সংখ্যা কমবে। এর ফলে কৃষি ও

শিল্পে মজুরি বেড়ে যাবে। ব্যবসার ক্ষতি হবে। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব বাড়বে। সামাজিক সংঘাত বাড়বে। একই সঙ্গে বহিরাগতদের সন্দেহ করা বা দোষ দেওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকবে। যেমনটি আমরা এখন দেখছি চীন ও আমেরিকার মধ্যে উত্তপ্ত সম্পর্কে। চতুর্দশ শতাব্দীতেও বহুমাত্রিক সংঘাত হয়েছে। ইউরোপে ইহুদী এবং রোমানি জনগোষ্ঠীর (রোমানিদের জিপসি বলে ডাকা হয় এবং এরা ভারত থেকে আগত বলে মনে করা হয়) উপর নৃশংস আক্রমণ হয়। এর মধ্যে নৃশংসতম ঘটনাটি ঘটে ফ্রান্সের (জার্মানির বর্ডারের কাছে) স্ট্রাসবুর্গ শহরে ১৩৪৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি—প্লেগের বাহক এই সন্দেহে প্রায় ২০০০ ইহুদীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। প্লেগের প্রকোপে ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই খাদ্য রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং আমদানির উপর শুল্ক চাপিয়েছিল। জমির দাম কমে যায় সর্বত্রই, কারণ জমির তুলনায় মানুষ হঠাৎ কমে গিয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে শুরু হওয়া প্লেগ মাত্র এগারো বছরে শেষ হয়নি, বরং দফায় দফায় তিনশো বছর ধরে চলেছিল। দ্বিতীয় প্লেগ প্যানডেমিকের শেষ ধাক্কা আসে লন্ডনে ১৬৬৫ সালে। ততদিনে লন্ডন মহানগরী হয়ে উঠছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ইউরোপের বড় শহরগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে। লন্ডনের জনসংখ্যা তখন ৪ লক্ষ। প্যারিসের ৪.৫ লক্ষ। মনে রাখা উচিত তিনশো বছর আগে যখন প্লেগের প্রথম ওয়েভ আসে, তখন লন্ডন প্যারিসের আর্ধেকের কম ছিল আয়তনে, এবং লন্ডনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলতে মূলত উল রপ্তানির বন্দর ছিল। তবে রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে লন্ডন সেই রোমান যুগ (প্রথম শতাব্দী) থেকেই ইংল্যান্ডের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। রোমান রাজত্বের অবসান হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত ভাইকিং (নরওয়ে থেকে আগত), স্যাক্সন (উত্তর জার্মানি থেকে আগত) এবং নর্মান (উত্তরপশ্চিম ফ্রান্স থেকে আগত) শাসন বা প্রভাবাধীন হয়ে ইংল্যান্ড, এবং বিশেষত লন্ডন শহর, প্রকৃত অর্থে ইউরোপীয়ান হয়ে ওঠে। লন্ডন বহু ভাষার ও জাতির মানুষের কাছে গন্তব্য শহর হয়ে ওঠে।

কিন্তু লন্ডনের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন হতে থাকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ততদিনে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন (স্প্যানিশ সরকারের অর্থসাহায্যে এবং পরিকল্পনায়) এবং ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা আটলান্টিক হয়ে ভারতে আসার রাস্তা বের করেছেন। এই দুটি ঘটনা বিশ্ববাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন করে দেয়। মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিসমের জন্ম হয়। ভারত মহাসাগরে আরব ব্যবসায়ীদের আধিপত্য কমে যায়। সিল্করুটের গুরুত্ব কমতে কমতে কয়েকশো বছর বাদে শূন্যে নেমে আসবে। সবচেয়ে বড় কথা ইউরোপের পূর্ব অংশ থেকে ক্ষমতা ও আধিপত্য পশ্চিম অংশে সরে আসে। প্রথমে স্পেন ও পর্তুগাল এবং তারপর ব্রিটেন, হল্যান্ড ও ফ্রান্স এই নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থায় বড় খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে উপনিবেশ পত্তনের পাশাপাশি ক্রীতদাস ব্যবসা খুব লাভজনক হয়ে ওঠে। এই সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ক্রীতদাস ব্যবসার মুনাফা এবং উদীয়মান অন্যান্য ব্যবসার টাকায় লন্ডন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাঠক মনে করতে পারেন, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তুলো, সিল্ক, লবণ, মশলা, চা ইত্যাদির ব্যবসায় ক্রমশ তার আধিপত্য বাড়তে থাকে।

একই সঙ্গে বাড়তে থাকে মহামারির ঝুঁকি। লন্ডনের সবচেয়ে বড় প্লেগ-পর্বটি হয় ১৬৬৫ সালে, যাকে বলা হয় গ্রেট প্লেগ অফ লন্ডন। এক বছর চলেছিল প্লেগের দাপট। এই সময় লন্ডনের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ৪০০,০০০ থেকে ৪৬০,০০০। এর মধ্যে মারা যায় ১০০,০০০ মানুষ, অর্থাৎ প্রায় এক-চতুর্থাংশ। প্লেগের মোকাবিলা করার জন্য লন্ডন থেকে বেরনো ও লন্ডনে ঢোকা দুটোই নিয়ন্ত্রণ করা হতো। লন্ডন থেকে বেরোতে গেলে নীরোগ সার্টিফিকেট দেখাতে হতো। যথারীতি ধনীরা সপরিবারে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়, এবং দরিদ্ররা লন্ডনে থেকে মারা পড়ে। ক্রমশ গ্রামের দিকেও বহিরাগতদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তৈরি হয় এবং বহু সচ্ছল মানুষও কোথাও থাকতে না পেরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

তৃতীয় দফার প্লেগ শুরু হয় চীনের ইউনান প্রদেশে ১৮৫৫ সালে, অনুমান করা হয় তামার খনিতে অত্যধিক খনন কাজ করতে গিয়ে। ক্রমশ প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে বাকি চীনে ও সত্বর হংকং হয়ে ভারতে এসে পৌঁছায়। ১৮৫৫ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত ভারতে মারা যায় প্রায় ১ কোটি মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ বন্দরশহর করাচি, বম্বে এবং কলকাতা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছিল।

এই প্লেগ পর্বের প্রায় ৪৭ বছর আগে কলেরা মহামারি শুরু হয় ১৮১৭ সালে বঙ্গদেশে যশোর শহরে। কলকাতা পৌঁছাতে সময় লাগে না এবং শীঘ্রই তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে কলেরার জীবাণু এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় হাজির হয় ও বাকি ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী কয়েক বছরে ভারতে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, দশ হাজার বৃটিশ সৈন্যও মারা যায়। ক্রমশ কলেরা পূর্ব এশিয়াতেও ছড়ায় ব্যাংকক, চীন, ইন্দোনেশিয়া অবধি। শুধুমাত্র জাভাদ্বীপেই একলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, ব্যাংককে তিরিশ হাজার। ইতিমধ্যে হজ তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে পশ্চিম দিকে আরব দেশগুলিতে ও তারপর সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে যায়। উত্তরে পৌঁছায় রাশিয়ায় ১৮২৩ সালে। ১৮১৭ থেকে ১৮২৩ অব্দি পৃথিবীর প্রথম কলেরা প্যান্ডেমিক। এই রাশিয়া থেকেই পশ্চিমদিকে পোল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন হয়ে ইংল্যান্ডে কলেরা পৌঁছায় ১৮৩২ সালের। লন্ডনে মারা যায় ৬,৫৩৬ জন আর গ্রেটব্রিটেনে ৫৫,০০০। প্যারিসে মৃত্যু হয় ২০,০০০ মানুষের, গোটা ফ্রান্সে এক লক্ষ।

কলেরার উৎস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন যে বাংলার মানুষদের তখন কলেরার বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল, কারণ দীর্ঘকাল তারা স্থানীয় জলসম্পদের সাথে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা আসার পর তাদের সংস্পর্শে এসে কলেরার জীবাণু পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তখন স্থানীয় মানুষেরা এবং ব্রিটিশ বহিরাগতরা সবাই কলেরায় আক্রান্ত হতে শুরু করে (Srabani Sen (2012), Indian Cholera- A myth– Indian Journal of History of Science, 47.3 : 345-64)

১৮২৩ সালের পরেও বহুবার কলেরা এপিডেমিক ছড়িয়েছে এবং এখনো ঝড়-বন্যার পর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৮৫৪-র লন্ডনে এক মারাত্মক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয় ব্রডস্ট্রীট (বর্তমান নাম ব্রডউইক স্ট্রীট) এলাকায়। এখানে মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটার দূরত্বে ছিলেন কার্ল মার্কস ও তাঁর পরিবার। যদিও মার্কস-পরিবার কলেরার আক্রমণ এড়িয়ে যায়, তাদের ছয় সন্তানের মধ্যে তিনজন শিশু অবস্থায় মারা যায় দারিদ্রজনিত অসুখে। মার্কস ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই নানা অসুখে জর্জরিত হন। আর্থিক অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী (সূত্র : Thomas C Jones– S201/V Libertyós Refuge - A History of Political and Religious Asylum in Britain– Harvard University Press)।

লন্ডনের এই কলেরা পর্যায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর পরিপ্রেক্ষিতেই ডাঃ জন স্নো আবিষ্কার করেন যে কলেরা জীবাণু (bacteria)-ঘটিত রোগ এবং এই জীবাণু-দূষিত জলের মধ্য দিয়ে

ছড়ায়। তাঁর গবেষণার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে কলেরার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন প্যারিসের লুই পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ইউক্রেনিয়ান গবেষক ওয়াল্ডেমার হ্যাফকিন। তিনি ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ সালে কলকাতায় ৪০,০০০ রোগীর উপর পরীক্ষা করে সাফল্য পান এবং কলেরা প্রতিরোধের উপায় বের করেন। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে যে বাংলাদেশে ১৮১৭ সালে কলেরা শুরু হয়েছিল তার প্রতিষেধক বেরোয় সেই বাংলাদেশেই, আশি বছর বাদে। হ্যাফকিনের সঙ্গে মুম্বাই শহরের সম্পর্কও মনে রাখার মতো, তবে তার কারণ ছিল প্লেগ।

উপনিবেশবাদ ও গুটিবসন্ত

বিশিষ্ট আমেরিকান ভৌগোলিকবিদ জ্যারেড ডায়মন্ড (Jared Diamond) ১৯৯৭ সালে একটি বই লেখেন ''Guns– Germs– and Steel- The Fates of Human Societies'' (Norton & Co.– New York)। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া ফেলে দেয় এবং সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই বেশকিছু নতুন গবেষণার দিক খুলে যায়। বইটির কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানবসভ্যতার অগ্রগতির গত ১১,০০০ বছরের ইতিহাস এবং তাকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশেই মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল বহু আগেই। অনুমান করা হয় আমেরিকায় মানুষ পৌঁছেছিল অন্তত ২০,০০০ বছর আগে (কিন্তু ৪০,০০০ বছরের আগে নয়), সম্ভবত তুষারযুগে সাইবেরিয়া থেকে বেরিংস্ট্রেট পায়ে হেঁটে পার হয়ে আলাস্কা হয়ে। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে অস্ট্রেলিয়ায় মানুষ পৌঁছেছিল ৬৫,০০০ বছর আগে, সম্ভবত দক্ষিণ ভারত হয়ে পূর্বমুখী এক ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠী নৌকা (catamaran) নিয়ে সমুদ্র পার হয়। কিন্তু সর্বত্রই মানুষ দীর্ঘকাল শিকার ও সংগ্রহ (hunting and gathering) করে বেঁচেছিল। দশ থেকে এগারো হাজার বছর আগে বর্তমান জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন ও ইসরায়েল অঞ্চলে মানুষ কৃষিকাজ ও পশুপালনে উত্তরণ ঘটায়। আমরা জানি, এই উত্তরণ ছাড়া উদ্বৃত্ত খাবার ও সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হতো না, এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ ছাড়া রাষ্ট্রগঠন, আমলা ও সৈন্য পোষা সম্ভব নয়। এইখান থেকেই কৃষিকাজ ও পশুপালনকে হাতিয়ার করে ইউরেশিয়া (এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপ) ভূখণ্ডে পূর্ব-পশ্চিমে মানব সভ্যতার প্রসার হয়। ডায়মন্ডের প্রশ্ন, এই প্রসার পূর্ব-পশ্চিমে হলো, উত্তর-দক্ষিণে কেন হলো না? সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে সভ্যতার অগ্রগতি সাম্প্রতিক ঘটনা। আর আমেরিকায় কৃষিকাজে উত্তরণ ঘটে আড়াই হাজার বছর আগে। আর অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ হওয়ার আগে কৃষির উন্নতি ছিল সামান্য। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে ১৫০০ বছর আগে কিছু কৃষিকাজ ও পশুপালনের প্রমাণ রয়েছে। মহাদেশগুলির মধ্যে কেন এই সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে ডায়মন্ড বলছেন যে শিকার থেকে পশু পালনে উত্তরণের একটি পূর্বশর্ত হলো সঠিক ধরনের পশু পাওয়া, যা ভৌগোলিক কারণেই সর্বত্র ছিল না। কতকগুলি কারণে মানুষ গরু, ভেড়া, ছাগল, শুয়োর ইত্যাদিকে গৃহপালিত করতে পেরেছে, কিন্তু ক্যাঙ্গারু বা রেন ডিয়ারকে করতে পারেনি। একটি কারণ হলো বিশেষ পশুর বিশেষ প্রজনন-চক্র ঘিরে পশুদের বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা। ফল মূল সংগ্রহ থেকে কৃষিকাজে উত্তরণপর্বে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শস্যের আবিষ্কার। শস্য দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, তাই শস্যের উৎপাদন যে গোষ্ঠী যত দ্রুত বাড়াতে পেরেছে তারা তত বড়ো রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' বইতে ও এস আর ডাঙ্গে 'From Primitive Communism to Slavery' বইতে বলছেন যে ভারতে আর্যরা কৃষিবিদ্যা নিয়ে আসে এবং এই কৃষিবিদ্যার ধারক ছিল ব্রাহ্মণ সমাজ, যদিও কৃষিকাজ তাদের করতে হয়নি। এই তত্ত্বটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা প্রশ্ন আছে, তবে উত্তরভারতের ক্ষেত্রে হয়তো খাটে। এর সঙ্গে হরপ্পা মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতাকেও (যা আর্য সভ্যতা নয়) মেলানোর দরকার আছে।

ডায়মন্ড আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের কথা বলেছেন, তাহলো জীবাণু বা germs; তাঁর মতে সভ্যতার ইতিহাস শুধু যুগান্তকারী আবিষ্কারের ইতিহাস নয়, এক মানবগোষ্ঠী দ্বারা আরেক মানবগোষ্ঠীকে দখল বা নিশ্চিহ্ন করারও ইতিহাস। বন্দুক ও ইস্পাত সেই শক্তিদম্ভের প্রতীক, এবং রোগবীজাণুও আর একটি অস্ত্র। হয়তো অচেতন ও অনিচ্ছুক অস্ত্র, তবু রোগবীজাণু সাহায্য করেছে সভ্যতার প্রসারে। পাঠক বুঝতে পারছেন মানুষের খাদ্যতালিকায় পশুপাখির সংখ্যা সর্বত্রই বেশ সীমিত, উপজাতি সমাজগুলিতে আরো সীমিত, তার একটা কারণ রোগভয়। পশুপালনের আদিপর্ব থেকে পশু থেকে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়িয়েছে বারবার।

তাই বলা যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাস অগ্রগতির পাশাপাশি রোগ ও অসুস্থতার ইতিহাস। বর্তমান করোনা ভাইরাস তাই কোনো ব্যতিক্রম নয়। ডায়মন্ডের বীজাণুতত্ত্বের বড়ো প্রমাণ গত কয়েকশো বছরের উপনিবেশ পত্তনের ইতিহাস। যেমন গুটিবসন্ত (smallpox)। ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস গুটিবসন্তের উৎপত্তি প্রাচীন মিশরে। হাজার বছরের পুরনো তিনটি মমির শরীরে বসন্তের জীবাণু পাওয়া গেছে। মিশর থেকেই সম্ভবত তিন হাজার বছর আগে ভারতে গুটিবসন্ত পৌঁছায় বণিকদের মাধ্যমে, সেখান থেকে চীনে। তারপর সুদূর অতীতে চীন ও ভারত থেকে সম্ভবত পরিব্রাজক বা বণিকদের মাধ্যমে পার্সিয়া ও গ্রীসে। তবে রোগটি মূল ইউরোপে ছড়ায় অনেক পরে, অষ্টম শতাব্দীতে, যখন উত্তর আফ্রিকা থেকে মুসলিম মুরশাসকরা স্পেনে আসে। গুটিবসন্ত স্পেনে তথা সমগ্র ইউরোপে প্রচুর মৃত্যু ঘটিয়েছিল। গুটিবসন্ত ছাড়াও, প্লেগ ও মিসলসে ইউরোপ ছারখার হয়েছিল। এর ফলে এই রোগগুলির বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের অনেক প্রতিরোধ ক্ষমতাও জন্মায়, সময়ের সাথে ধীরে ধীরে। বলা হয় ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ ও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গুটিবসন্তে ভুগেছিলেন। সমগ্র ইউরোপে তখন বছরে গড় হিসাবে চার লক্ষ মানুষ গুটিবসন্তে মারা যেতো।

কিন্তু গুটিবসন্তের ইতিহাসে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্ভাগ্য বোধহয় করুণতম। মুরশাসনের অবসানের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন যখন আমেরিকা আবিষ্কার করে, তখন তারা গুটিবসন্তসহ অনেকগুলি রোগ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কলম্বাস ১৪৯২ সালে ভারত ভেবে যেখানে হাজির হন, তা হলো বর্তমান বাহামা। শীঘ্র ইহা ইতি ও ডোমিনিকান রিপাবলিক দখল হয়। কয়েক বছর বাদে স্প্যানিশ সাম্রাজ্য বিস্তারিত হয় পুয়ের্তোরিকো (১৫০৮), জামাইকা (১৫০৯), এবং কিউবা (১৫১১) দখলের মধ্যে দিয়ে। এরপর ১৫১৭ সালে স্প্যানিশ সৈন্যরা মেক্সিকো পৌঁছায়। মেক্সিকোয় তখন ৩০০০ বছরের পুরনো আজটেক সভ্যতা, যার সাথে বহির্বিশ্বের কোনো যোগ ছিল না। স্পেন তাদের গুটিবসন্ত উপহার দেয়। আজটেক রাজবংশসহ জনসংখ্যার আর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গুটিবসন্তে।

এর পরে পরে আমেরিকায় আরো অনেক রোগ আসে, যেমন মিসলস ও ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া আসে আফ্রিকান ক্রীতদাসদের মাধ্যমে। আফ্রিকার অধিবাসী হিসাবে তাদের জন্মগত প্রতিরোধ ছিল। কিন্তু মধ্য আমেরিকার আজটেকদের এই রোগের সাথে পরিচয় ছিল না। মূলত গুটিবসন্তের আক্রমণ ও আতঙ্কের সাহায্যে

স্পেন শুধু মেক্সিকো ও পেরু নয়, আমেরিকার দক্ষিণ থেকে উত্তরপূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে কার্যত বিনা বাধায়। আমেরিকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা বসন্তের ভয়ে তাদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। একইভাবে ইউরোপীয়ান ব্যাধির প্রকোপে পেরু, ইকুয়েডর ও কলম্বিয়ায় ব্যাপ্ত ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

যুদ্ধ ও স্প্যানিশ ফ্লু

এবার আসা যাক একশো-দুই বছর আগের অতিমারির কথায়—স্প্যানিশ ফ্লু, যা ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সাল অবধি (দেড় বছর ধরে) গোটা বিশ্বকে শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল। এই ফ্লু ৫০ কোটি মানুষকে, অর্থাৎ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে আক্রান্ত করেছিল। আনুমানিক এক কোটি সত্তর লক্ষ থেকে পাঁচকোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতেই দেড় কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, চীনে সত্তর লক্ষ, আমেরিকায় পাঁচ লক্ষ।

এখানে মনে রাখা উচিত, নাম স্প্যানিশ ফ্লু হলেও এই ফ্লুর উৎপত্তি কিন্তু স্পেনে নয়। এর জন্ম আমেরিকার ক্যানসাস রাজ্যে। কিন্তু তখন ধরা পড়েনি। ক্যানসাস থেকে আমেরিকান সৈন্যরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ভাইরাস নিয়ে আসে ইউরোপে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ এই চার বছরব্যাপী যুদ্ধে সৈনিকরা খুবই মর্মান্তিক ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় যুদ্ধ করেছিল। সৈনিকরাই যুদ্ধশেষে এই রোগটি নিজ নিজ দেশে নিয়ে যায়। জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা ও ব্রিটেনে যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপ থাকায় এই রোগের খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয় না। অন্যদিকে স্পেন ছিল নিরপেক্ষ দেশ এবং যুদ্ধে অংশ নেয়নি। তাই সেখানে সংবাদপত্রের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না এবং সেখান থেকেই এই সংক্রমণের খবর প্রথম প্রকাশ পায়। তার থেকেই নাম হয় স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ভারতে ১৯১৮-র জুনমাসে স্প্যানিশ ফ্লু পৌঁছায় বম্বেতে, সম্ভবত যুদ্ধফেরত সৈনিকদের মাধ্যমে। সেখান থেকে বাকি ভারতে। কলকাতায় পৌঁছায় নভেম্বরে। তখনও লকডাউন ঘোষণা করা হয়, এবং ইউরোপের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাক-মুখ ঢেকে ঘুরতে বলা হয়। তৎকালীন এক স্বাস্থ্য-অধিকর্তা লিখছেন, "খিদিরপুর অঞ্চলে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। তার কারণ এখানে কুলি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি। এরা অজ্ঞ, দরিদ্র, এবং খুব নোংরা অবস্থার মধ্যে থাকে। কোনো কথা শুনতে চায় না (They are a difficult class to deal with)। বর্তমান সরকারি অফিসারদের চিন্তাভাবনা খুব একটা আলাদা কিছু নয়। যাই হোক, স্প্যানিশ ফ্লু-তে ভারতের পাঁচ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়, এবং ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথম জনসংখ্যার হ্রাস দেখা যায়। বাকি পৃথিবীর মতো ভারতেও স্প্যানিশ ফ্লুর আক্রমণ ও মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি হয় ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের মধ্যে। এর ফলে কৃষিকাজের ক্ষতি হয়, এবং সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়ে যায়। অচিরেই ঘটে যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

উপসংহার

মহামারি যেখান থেকেই শুরু হোকনা কেন, শেষ অবধি এটা গোটা বিশ্বের সমস্যা। উৎস নিয়ে দোষ চালাচালি অর্থহীন। একশো বছর আগে গোটা বিশ্ব এক হয়ে স্প্যানিশ ফ্লু-র মোকাবিলা করেনি, বরং একটা বিশ্বযুদ্ধ শেষ করে আর একটা বিশ্বযুদ্ধের দিকে পা বাড়িয়েছিল। স্প্যানিশ ফ্লু-র ভ্যাকসিন কখনো বেরোয়নি। হয়ত কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন বেরুবে এবং আমাদের দীর্ঘকাল এই ভাইরাসের সঙ্গে বসবাস করতে হবে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে বছর বছর ভ্যাকসিন দেওয়া এবং হার্ডইমিউনিটি (herd immunity) তৈরি করতে দীর্ঘকাল লেগে যাবে। মৃত্যুর সংখ্যা (এই মুহূর্তে প্রায় ১০ লক্ষ) ও হার দুটোই অতীতের অতিমারির তুলনায় অনেক মনে হলেও, বিশ্ব অর্থনীতির সংকোচন অন্তত পাঁচ শতাংশ হবে (অর্থাৎ ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার) তা নিশ্চিত, বাড়বে বৈ কমবে না। ভারতের জাতীয় আয় ১০ থেকে ১২ শতাংশ কমার আশংকা রয়েছে।

এসময় দরকার ছিল রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে দেশগুলির এক জায়গায় আসা এবং সম্মিলিতভাবে চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন বের করার চেষ্টা করা। কিন্তু সর্বত্রই উগ্র-জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যা রমরমা তা বর্তমান সংকটকে আরো জটিল করে তুলবে। বড়ো বড়ো দেশগুলি ভ্যাকসিন থেকে মুনাফা তোলার জন্যে নিজ নিজ পছন্দের দেশজ অথবা বহুজাতিক কোম্পানি ঠিক করে রেখেছে। স্পষ্টতই তাদের লক্ষ্য কে আগে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু আমরা জানি সবাই না উঠে দাঁড়ালে বিশ্ব-অর্থনীতি সচল হবে না। সুতরাং আগামী এক থেকে দুই বছর অর্থনৈতিক সংকট চলতে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

রাধারানী ক্লিনিক

মেমারি, পূর্ব বর্ধমান ।। ডা. দিলীপ ভট্টাচার্যের নার্সিং হোম ।। মেমারি থানার পাশে

ইউ.এস.জি. ইউনিট

প্রতি সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও রবিবার

ফোন : ৯৭৩৪৭৮৭২৭৭, ৮৩৮৯৯৬৫৭৭৬

Sl. No. 54

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 64

দেখ
কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

গতির প্রবাহ মানে না ককনো বন্ধন
ভেঙে ফেলে বিচার-বিহীন পথ
হেঁটে যায় দেখ মানবিক মুখ কত
তুলে ধরে তারা—
হাতুড়ির সাথে কাস্তেটা ঐ বাঁকা।

ভীরুরা পিছনে চিরদিন দেখ থাকে
দোলাচলে ভোগে কিছু-কিছু লোক আজো
এগিয়ে যাবার গিয়েছে তারাই আগে
হাতে হাতে দেখ—
হাতুড়ির সাথে কাস্তেটা ঐ বাঁকা।

শত্রুদের ছায়া সরে যায় দেখ বিশ্বে
বামেদের পথে ঝাণ্ডা উড়ছে মিছিলে
সুদিনের আশা জ্বলে ওঠে আজ তীব্র
দেখ—হাতুড়ির সাথে কাস্তেটা ঐ উর্ধ্বে।

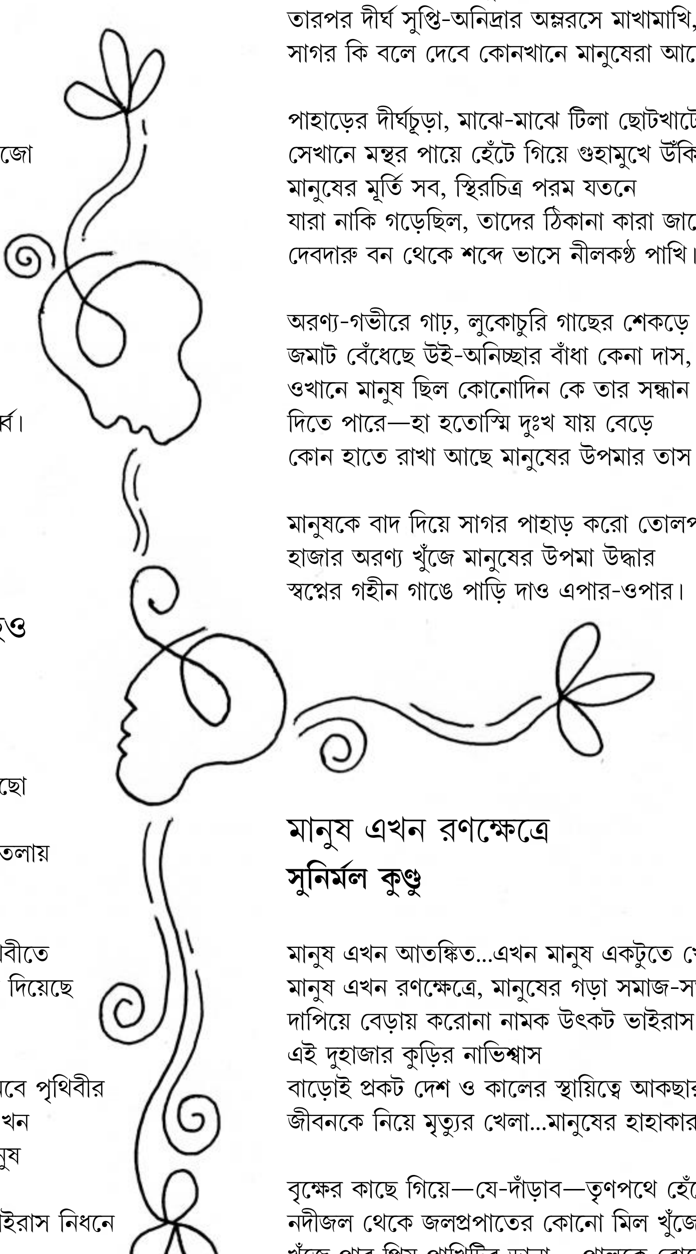

হে ধরিত্রী, তুমি শুচিস্নাতা হও
গিরীন্দ্রনাথ চাকী

হে ধরিত্রী, তুমি সর্বংসহা
তুমি মুখ বুজে কত অত্যাচার সহ্য করছো
দিন রাত।
তুমি দেখেছো কি—নিবেদিত পুষ্পের তলায়
কত ছত্রাকের ব্যভিচার
তুমি শুচি-স্নিগ্ধা মানসী
অদৃশ্য কীটাণু সংগ্রাম শুরু হয়েছে পৃথিবীতে
গ্লোবালাইজেশনে হাইব্রিডে মাথা-চাড়া দিয়েছে
ভাইরাসের দল
'করোনা' নেমেছে সন্তর্পণে ময়দানে
মানব প্রজাতিকে উচ্ছিন্ন করে দখল নেবে পৃথিবীর
পরমাণু যুদ্ধের দোরগোড়ায় করোনা এখন
যন্ত্রণার অভিঘাতে দিশেহারা হয়নি মানুষ
সে প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে
নিত্য নতুন উদ্ভাবন এগিয়ে চলেছে ভাইরাস নিধনে

লোভ-লালসা-প্রভুত্ব নয়—
মানুষ আত্ম-সংযমে ব্রতী হয়েছে
শুদ্ধিকরণ করছে ভেতরে বাইরে
স্বচ্ছতোয়া গঙ্গা-যমুনা আবার হবে বেগবতী
স্নানঘাটের পুরনো অশ্বত্থের পাতার রং-বদল
শুরু হয়েছে
নয়নতারার রং-সাদা জমিনে গাঢ় লাল জমছে।

মানুষের উপমা
সলিল ভট্টাচার্য

তুমি মানুষের উপমার খোঁজে এক একবার যাও সাগরের কাছে,
কখনো ছলাৎ শব্দে পাড়-ভাঙ্গার দৃশ্যে জেগে ওঠো।
জীবাশ্মের কারবারি তবু ফলিত-জ্যোতিষ চায় মনে মনে।
তারপর দীর্ঘ সুপ্তি-অনিদ্রার অম্লরসে মাখামাখি,
সাগর কি বলে দেবে কোনখানে মানুষেরা আছে?

পাহাড়ের দীর্ঘচূড়া, মাঝে-মাঝে টিলা ছোটখাটো
সেখানে মন্থর পায়ে হেঁটে গিয়ে গুহামুখে উঁকি—
মানুষের মূর্তি সব, স্থিরচিত্র পরম যতনে
যারা নাকি গড়েছিল, তাদের ঠিকানা কারা জানে?
দেবদারু বন থেকে শব্দে ভাসে নীলকণ্ঠ পাখি।

অরণ্য-গভীরে গাঢ়, লুকোচুরি গাছের শেকড়ে
জমাট বেঁধেছে উই-অনিচ্ছার বাঁধা কেনা দাস,
ওখানে মানুষ ছিল কোনোদিন কে তার সন্ধান
দিতে পারে—হা হতোস্মি দুঃখ যায় বেড়ে
কোন হাতে রাখা আছে মানুষের উপমার তাস?

মানুষকে বাদ দিয়ে সাগর পাহাড় করো তোলপাড়
হাজার অরণ্য খুঁজে মানুষের উপমা উদ্ধার
স্বপ্নের গহীন গাঙে পাড়ি দাও এপার-ওপার।

মানুষ এখন রণক্ষেত্রে
সুনির্মল কুণ্ডু

মানুষ এখন আতঙ্কিত...এখন মানুষ একটুতে খেপে যায়!
মানুষ এখন রণক্ষেত্রে, মানুষের গড়া সমাজ-সভ্যতায়
দাপিয়ে বেড়ায় করোনা নামক উৎকট ভাইরাস
এই দুহাজার কুড়ির নাভিশ্বাস
বাড়োই প্রকট দেশ ও কালের স্থায়িত্বে আকছার—
জীবনকে নিয়ে মৃত্যুর খেলা...মানুষের হাহাকার!

বৃক্ষের কাছে গিয়ে—যে-দাঁড়াব—তৃণপথে হেঁটে যাব—
নদীজল থেকে জলপ্রপাতের কোনো মিল খুঁজে পাব—
খুঁজে পাব প্রিয় পাখিটির ডানা.... পালকে রোদের তাপ—
এসব ভাবনা খুবই স্বাভাবিক মৌলিক নিষ্পাপ
হলেও কোথাও দেখি না হৃদয় খোলা আকাশের মতো;

করোনার কোপে তবে কি পৃথিবী শ্মশানেই পরিণত?

যদিও মানুষ আতঙ্কিত—রণক্ষেত্রে মানুষেরই অস্ত্রের
যুদ্ধজয়ের শপথ ধ্বনিত—যে-শপথে শুধু কথা মহাজীবনের।

যেতে হবে

বিশ্বনাথ কয়াল

যেতে হবে—সেকথা অজানা নয়,
অনেক গৃহকোণে খবর দেবার ছিল
কত ভাঙাগড়া বাকি আছে,
কোথাও মেঘের গর্জন নেই
দূর প্রান্তর থেকে বাতাসে উচ্ছ্বাস তুলে
জনপদে কল্লোল দেখি না।

তবে একা আমি যাব কেন, এই অসময়ে!

যেতে হবে—সেকথা অজানা নয়,
যেতে হবে সময়ের মাপে
পদচিহ্ন কিছু রয়ে যায় মুছে যায় এখানে ওখানে
অনেক অনেকের সাথে প্রতিবেশী এখনও দেয়নি বিদায়—

তবে কেন যেতে হবে একা—স্মরণে বিস্মরণে!

জীবন

অরবিন্দ সরকার

চারদিকে দাহসংগীতের সুরলহরী
যেন মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ত যোঝা
তবু এরই মধ্যে কিভাবে
হাসির খই ফোটাও
স্নিগ্ধতার দইয়ে নিরন্তর
স্নান করিয়ে দাও
আর তখনই নিবিড় ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ে উঠি।

সন্ধান

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

সময়-সুযোগের সম্রাট হলেও আমি
রামায়ণ, মহাভারত খনি-খননে
যাবো না। রত্ন-গর্ভ দুটি কুলীন সম্পদ
মানি তা। তবে তাতে অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ,
লঙ্কা পনেরো আনা, এক আনাও আছে
কি গুহক, একলব্য, কাঠবিড়ালী ও
জটায়ুর কথা? জাঁক, সাজ-সজ্জা, কূট
চক্রান্ত, সীতা, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ছাড়া
হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্যদের যন্ত্রণার বারমাস্যা?
তাইতো পড়বো 'মহেশ', 'পদ্মানদীর মাঝি'।
'গণদেবতা', 'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি।
খুঁজবো জনগণমন-রত্নকে এ সব খনিতে।

জুতোর ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিও বন্ধু

কুশল দে

জুতোর ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিও বন্ধু।
এখনও অনেক অনেক পথ বাকি
পারলে, জুতোর সোলটাও মেরামত করে নিও।
পথে পথে নানা কাঁটা, কাচের কুচি ছড়ানো আছে।
খানা-খন্দে ভরা অন্ধকার পথে জোনাকিদের নিও সাথে।
ওরাই তোমার জ্ঞানচক্ষুর জ্যোতিস্বরূপ।
জুতোর ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিও বন্ধু।

গনগনে রোদে,
ভরা বর্ষায় মাথাটা তোমার তালপাতার টোকায় ঢেকে নিও
হাতে রেখো পতাকায় মোড়া শক্তপোক্ত একখানা লাঠি।
চলার পথে জঙ্গল দেশের পথে ঘাটে, বিপদে আপদে
অনেক কাজে আসতে পারে পতাকায় মোড়া মুষ্টিবদ্ধ ঐ লাঠি।
তবুও, জুতোর ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিও বন্ধু।

জানি,
কী ভীষণ ইচ্ছাশক্তি তোমার
মানব-হিমালয়ে জীবনযুদ্ধ জয়ের পতাকা ওড়াতে চাও তুমি।
বারুদ মহালয়ে মানুষের কথা বলো দাবার ছকে।
এ কোনও কবচ তাবিজ নয়
তবুও বলছি আমি, আত্মিকতার মোড়কে
জুতোর ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিও বন্ধু!

অতলান্তিক

গৌতম সাহা

মানুষ কী পারেনা তাই ভাবছি
যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় নীল হয়ে
একেবারে কুটিল অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে
আবার ঘুরে দাঁড়ায় মানুষ
যতটা বিহ্বল ভাবো তাকে
সে তেমন নয়
অনেক কোলাহলেও সে নিয়তি বলে
মানেনা কাউকে
ঢেউয়ের মুদ্রায় সে তার শীর্ণ হাত
আকাশের দিকে তুলে ধরে
বিবর্ণ মুখ থেকেও ঝরে পড়ে
প্রেমের সমিধ
এভাবেই চর হারানো মানুষ
খুঁজে পায় আর্তনাদের অস্ত্র।

চিতুর কিরাত নই
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের এক একটি মুখের রেখায় পড়ে নিই সাংকেতিক ভাষা
মাগধী না শৌরসেনী খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা
সে ভাষার অর্থ বুঝে নিই
গোপন দুয়ার ঠেলে অন্দরমহলে ঢুকে যাই
সমস্ত রহস্য ভেদ করে
তুলে আনি লুকোনো সম্পদ।

এক একটি মানুষের এক একটি স্বপ্ন থাকে চরিত্র আলাদা

সব কিছু জানতে হলে মানুষকে দেখতে হয়
ভিতরে বাইরে তার রহস্যময়তা
অসংখ্য রেখাচিত্রে দারুণ অস্পষ্ট তাই
চুলচেরা বিশ্লেষণে নির্ভুল সমীক্ষা করি।
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে

মানুষকে জানাটা আজ একান্ত জরুরি

চতুর কিরাত নই
তবুও লক্ষ্মণরেখা পার হয়ে
অলংকৃত তীরে আমি বিদ্ধ করি আমার শিকার।

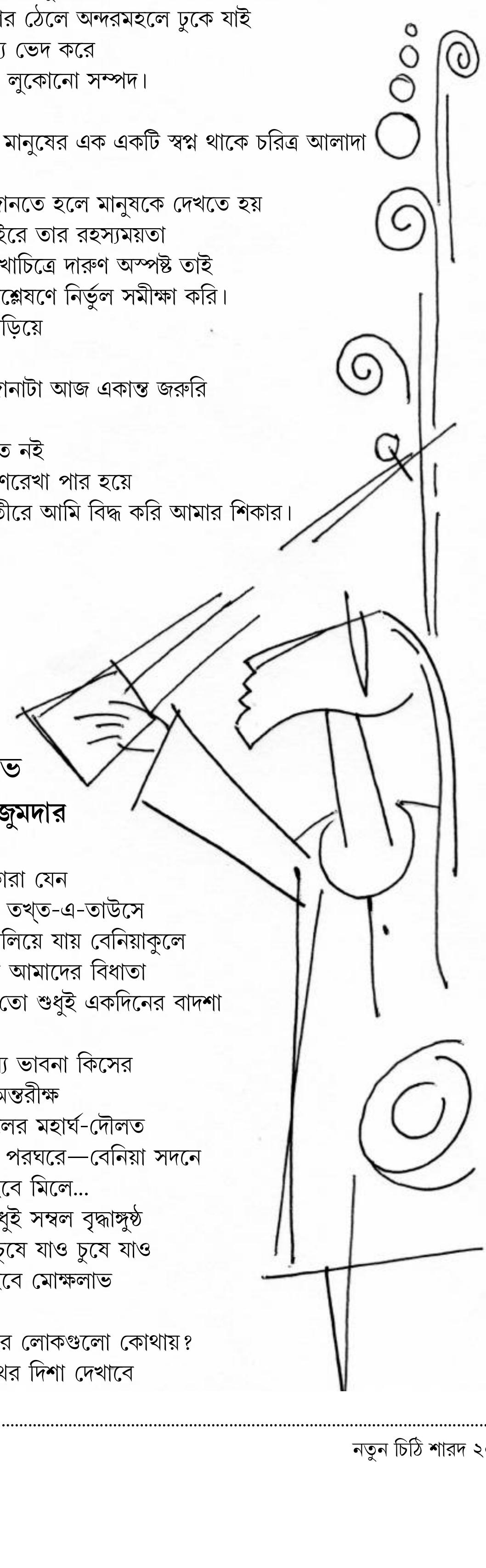

মোক্ষলাভ
অরুণ মজুমদার

ইন্দ্রপ্রস্থে কারা যেন
বসত করে তখ্‌ত-এ-তাউসে
খয়রাতি বিলিয়ে যায় বেনিয়াকুলে
তারাই তো আমাদের বিধাতা
জনগণেশ তো শুধুই একদিনের বাদশা

তাদের জন্য ভাবনা কিসের
জল স্থল অন্তরীক্ষ
মায় পাতালের মহার্ঘ-দৌলত
সবই যাবে পরঘরে—বেনিয়া সদনে
দেদার মচ্ছবে মিলে...
জনতার শুধুই সম্বল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
চুষে যাও চুষে যাও চুষে যাও
এভাবেই হবে মোক্ষলাভ

ফাটা পায়ের লোকগুলো কোথায়?
তারাই পথের দিশা দেখাবে

কপিলদেব
শ্যামলবরণ সাহা

সারা জীবন জুড়ে কত ক্যাচ উঠলো!
এখনো কত ক্যাচ উঠবে...

বাউণ্ডারি লাইনে মিড্‌অনের ক্যাচটা
না ফেলে লুফে নিলে
হয়তো এ ইনিংসে জিতে যেতাম—
একজন কবি নন্দন চত্বরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছেন।

ঠিক তখনই একজন ক্রিকেটার
সারা জীবন ক্রিকেট খেলে
বলে উঠলেন—
জীবনের চেয়ে ক্রিকেট বড় নয়!...

যুদ্ধশেষে দেখা হবে, কথা মুখোমুখি
দেবেশ ঠাকুর

আবার তো আমাদের কথা হবে এই যুদ্ধশেষে
আমাদের দেখা হবে জীর্ণ গাঁয়ে উনুনের আঁচে
আবার ধরবো হাত সব খুইয়ে, বাউলের বেশে
মেতে উঠবো ঝুমুরে, বোলানে, গম্ভীরার নাচে।

আবার আড্ডা হবে কালোদার চায়ের দোকানে
নেতাদের ভুল ধরব, তর্ক জুড়ব, চুমুকে তুফান
ভাদু হবে, টুসু হবে, নবান্ন এখানে ওখানে
যুদ্ধ শেষ। পুনর্বার শমীবৃক্ষে অস্ত্র ছুপান।

দেখা হলে জানা যাবে যুদ্ধকালে কে কোথায় ছিলে
নির্ভয়ে হাত ধরে হাঁটা যাবে অমৃতের পথে
নৈঃশব্দ্য যাপনকালে আত্মীয়তা তালা আর খিলে
মরতে মরতে বাঁচা যাবে, বাঁচতে বাঁচতে ফেরা কোনমতে।

আমাদের দেখা হবে সূর্যস্নাত মন্দারমণি
আমাদের দেখা হবে মৃত্যুস্তূপে ধানের চারায়
'ফাইট', বলবে খিদ্দা, জলে উড়বে কোনি
আতঙ্কের রাতশেষে দেখা হবে ভোরের তারায়।

গনগনে তাপ শেষে কথা হবে গানের দোঁহায়
একা গেয়েছি এ ক'মাস এইবার হবে ঐকতান
একান্তে কান্না পাবে গৃহস্থের কাঠের ধোঁয়ায়
ভালোবাসা খুলে দেবে নগরের সব ময়দান।

অষ্টাদশী চুমু দেবে যুদ্ধশেষে আঠেরোর গালে
'এযাত্রা বেঁচে গেলাম', আশি বছরের চুমু দয়িতার ঠোঁটে
তক্ষুনি পাখি গাইবে, ফুল ফুটবে, হাওয়া দেবে পালে
'জীবন অনেক বড়ো', ওরা বলবে, 'অসুখ তো ক'টা মাস মোটে'।

অনুভব

(কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম শতবর্ষ)

মলয় রায়

মাঠে মাঠে আমনে আউশে
মধ্যবিত্ত সর্বহারার
সময়ের ব্যাকরণ ছুঁয়ে
কলে কারখানায়
লড়াইয়ের বর্শা ছুঁড়ে

১৯২০ থেকে ২০২০।

মিছিলে পোস্টারে
বলিষ্ঠ ইশতেহারে
স্বজন হারানো রক্তাক্ত মাঠে
কমিউনিস্ট মূল্যবোধ
ঘরে ঘরে।

মাঠ ময়দান প্রান্তরে
ব্রিগেড থেকে ব্রিগেডে।
আতঙ্কে শিউরে উঠেছে ওরা
বার বার।
পা ঠিক রাখতে
লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে।
মাঠে মাঠে কারখানার গেটে
হামলা করেছে মস্তান বাহিনী।

মাথা নত করেনি মানুষ।
বিশ্বাসের নদীতে বান ডেকেছে।
পদভারে কেঁপেছে রাজপথ।
অজস্র কোটি অর্বুদের মহামিছিল।

শুধু একশো বছর নয়।
দু পাঁচশো হাজার বছর
চেতনার পিলসুজে তেল যুগিয়ে যাবে মানুষ।

দীর্ঘ এক 'মানববন্ধনে'।

স্নান করো

পঙ্কজ পাঠক

কথামালা দিয়ে সংঘ টেকে না
অনেক তো হল
মাটির টানে জেগে ওঠো

দ্যাখো দ্যাখো সাধকেরা
পুড়ে যাচ্ছে কেমন

ছাই উড়ে গেলে
আগুন তোমাকে ডাকবে
তুমি যজ্ঞ শুরুর আগে স্নান ক'রো

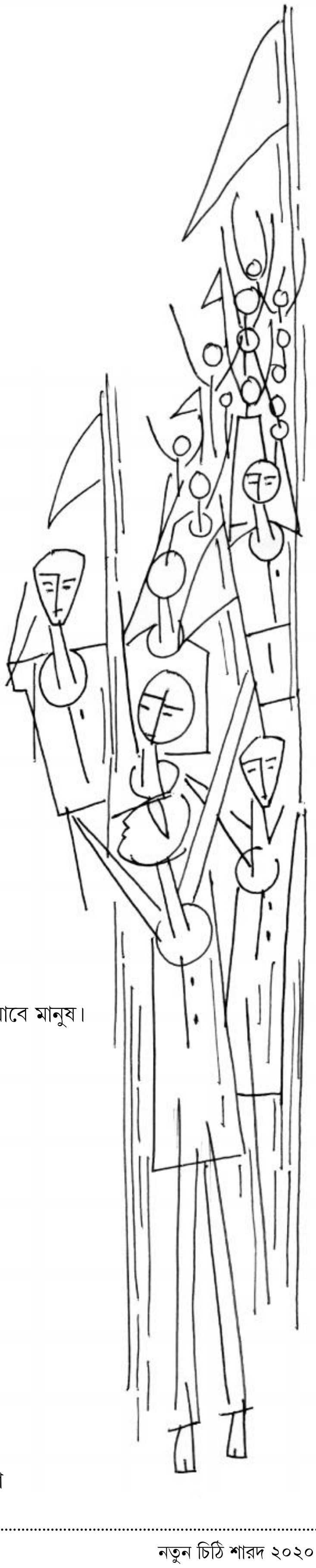

সেখ জয়নাল আবেদীনের ৩টি শায়েরী

১.
সি.এ.এ, এন. পি আর
এন. আরসি, কী জানতে চান?
করবে বাতিল ভারতবাসীর
পবিত্র এই সংবিধান।।

২.
নানা ফুলের একটি মালা
ভারত মাতার দুলছে গলে
ছিঁড়তে এলে পার পাবে না
আমরা থাকি মায়ের কোলে।।

৩.
স্বাধীন ভারত কোন সে পথে
চললে তবে থাকবে মহান
অনেক চিন্তা ভাবনা দিয়ে
আমাদের এই সংবিধান।।

অসুখ

মনামী ঘোষ

অসুখ। অসুখ। আকাশ বাতাস জুড়ে
হঠাৎ যেন সূর্য নিভে গেছে।
অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চকচকে লোভ লকলকে ভয়
হামলে পড়ে একের পরে একে।

অসুখ। অসুখ। আকাশ বাতাস জুড়ে
কাজ হারানো মানুষগুলো
ফিরতে চেয়ে ঘরে
রাস্তা জুড়ে খিদেয় মরে
ট্রেনের তলায় লরির চাকায়
পিষ্ট মানবতা।

অসুখ। অসুখ। আকাশ বাতাস জুড়ে
কালো মানুষ ফ্লয়েড মরে
সাদার হাতে
দোষ ছিল তার চামড়া রঙে!
চটচটে ক্লেদ অসুখী রোগ সাদা চামড়ার গায়ে

অসুখ। অসুখ। আকাশ বাতাস জুড়ে
শেষ সম্বল বিকিয়ে তাও মরণ পথে
মানবতার মরণ হলে জেগে ওঠে বীভৎসতা
এমন যত ঘৃণার চাদর সূর্য ঢাকে

অসুখ। অসুখ। আকাশ বাতাস জুড়ে
নেই নেই আর নেই-এর পাহাড়
জমতে থাকে অন্ধকারের আড়াল পেয়ে
অসুখ আরও জাঁকিয়ে বসে। আরও অসুখ।
অসুখ। অসুখ। আকাশ বাতাস জুড়ে

রাম-কৃষি-কথা
তন্ময় ভট্টাচার্য

এশিয়া মাইনর থেকে যাযাবর আর্যরা এসেছিলেন ভারতভূমিতে। আজকের মানচিত্রে নয়, সিন্ধুসভ্যতা-বিধৌত মাটিতে। উচ্চারণদোষে 'স' 'হ' হয়ে গেলে নাম বদলায়। লিপিহীন 'শ্রুতি' অধিকারী লিপি পায়। নদীমাতৃক সভ্যতার দেশে এসে যাযাবর জীবনও স্থায়িত্বের স্থিতি পায়। শিখে নেয় চাষবাস। শুরু করে নতুন আবাস। রাজধর্ম আবাস বিস্তার।

আমাদের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-পুরাণ-উপপুরাণের রোলকলের খাতায়, স্বর্গের পপুলেশনের যে হিসাব আছে, তাতে রামচন্দ্রের নাম নেই। অনার্য দস্যু রত্নাকর আর্যত্ব পেয়ে বাল্মীকি হলে যে মহাকাব্যের সূচনা, রাম সেখানে রাজা। দশরথ-পুত্র। দাশরথি রাম।

তীরধনুক হাতে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অভিযানে আর্যাবর্তের বিস্তারের রামই প্রধান করিগর। মূলনিবাসী অনার্যদের উচ্ছেদ করার যুদ্ধযাত্রার কাব্যিক রূপ পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে। যুগের বৈশিষ্ট্যের কারণেই রামকথা নানারূপে, নানাদেশে, নানাবর্ণে রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত। দিন যত এগিয়েছে, নব নব কলিকুল, অনুবাদকের দল, স্বীয় কল্পনার দান মিশিয়েছে তাতে। তারিয়ে তারিয়ে পড়া কাব্যসুধারস ছড়িয়েছে প্রাণে প্রাণে। বিশ্বাস জন্মেছে মনে—নরোত্তম এ পুরুষ, নরচন্দ্রিমা।

মূল পথ অনার্যমুক্ত। শম্বুক-তারকা-বালী নিহত। সূর্পনখা বিতাড়িত। প্রান্তদেশে চলে গেছে তারা। জঙ্গল তবুও স্থির, সুবিশাল বৃক্ষরাজি এখনও বিরাজমান। তাকে মুক্ত না করলে সুবিস্তৃত আর্যাবর্তে কৃষির বিকাশ সম্পূর্ণ হবে না। নতুন নায়ক চাই, স্বহস্তে কুঠার। ততদিনে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে তার কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার অজস্র বিস্তার। সমাজকে বাঁধা হয়ে গেছে নিয়মে, সংস্কার আর দেবোত্তর জীবনযাত্রায়। প্রণালীরা সরু-মোটা, লম্বা-বেঁটে, কালো-সাদা, সব মেনে নেওয়া যাবে, শর্ত একটাই। বাকি সব মেনে নেবে ব্রাহ্মণের আধিপত্যবাদ। লক্ষ্য স্থির। যুগ চায় নতুন নায়ক নাম। আমাদের মঞ্চে এসে আবির্ভূত হন পরশুরাম।

জমি পরিস্কার। প্রস্তুত ক্ষেত্রের মাঝে শুরু হোক কৃষির বিস্তার। প্রস্তুতির পথে সংঘাত যেমন ছিল, ছিল তো মিশ্রণও। সংশ্লেষণী ক্ষমতার জোরে, রাজশক্তি সাথে নিয়ে আর্যত্বের ক্রমশ বিকাশ। কৃষির দেবতা চাই, লাঙলের জাদুকর, অশেষ শক্তিমান। আমাদের দেবতার তালিকায় এবারে এলেন বলরাম।

প্রথম রামের স্ত্রী জন্ম নেয় লাঙলের ফালে। এ বিশ্বকে নিক্ষত্রিয়া করার গর্ব লেখা হয় পরশুরামের কপালে। ফসলে ভরাও মাঠ। জমির উর্বরতা বাড়ে বলরাম হালে।

আমাদের তিন রাম কৃষির প্রতীক। মন্দির বানাও তুমি, হোক পূজাপাঠ। ধূপগন্ধ, আরতিতে আলো বিচ্ছুরাক। টন টন খাদ্যশস্য হিমঘরে পচছে পচুক। তুমি রাজা— করে দাও তাকে এ্যালকোহলের কাঁচামাল। আসুক নতুন কৃষিবিল। পুঁজির হাঁ করা মুখ গিলে খাক সব। আমাদের বুভুক্ষার থালে লকডাউনের ধাক্কা, দিন-গুজরান কষ্টকর।

মন্দির তবুও থাক অজর অমর।

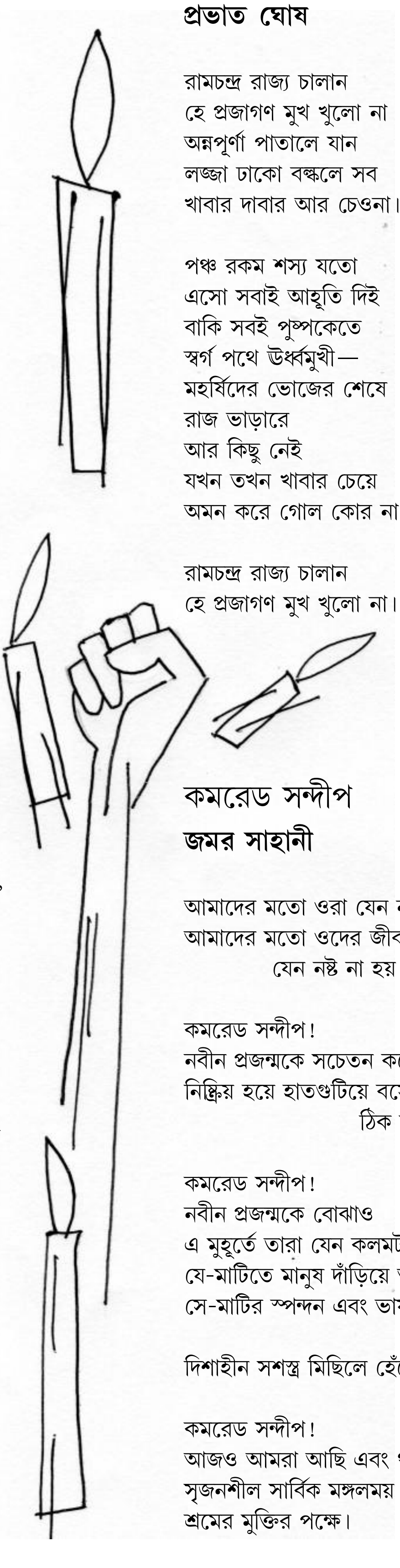

রাম রাজ্য
প্রভাত ঘোষ

রামচন্দ্র রাজ্য চালান
হে প্রজাগণ মুখ খুলো না
অন্নপূর্ণা পাতালে যান
লজ্জা ঢাকো বল্কলে সব
খাবার দাবার আর চেওনা।

পঞ্চ রকম শস্য যতো
এসো সবাই আহুতি দিই
বাকি সবই পুষ্পকেতে
স্বর্গ পথে ঊর্ধ্বমুখী—
মহর্ষিদের ভোজের শেষে
রাজ ভাড়ারে
আর কিছু নেই
যখন তখন খাবার চেয়ে
অমন করে গোল কোর না!

রামচন্দ্র রাজ্য চালান
হে প্রজাগণ মুখ খুলো না।

কমরেড সন্দীপ
জমর সাহানী

আমাদের মতো ওরা যেন না ঠকে
আমাদের মতো ওদের জীবন যৌবন আত্মত্যাগ
যেন নষ্ট না হয়

কমরেড সন্দীপ!
নবীন প্রজন্মকে সচেতন করো বোঝাও
নিষ্ক্রিয় হয়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকা
ঠিক নয়

কমরেড সন্দীপ!
নবীন প্রজন্মকে বোঝাও
এ মুহূর্তে তারা যেন কলমটাকেই আঁকড়ে ধরে
যে-মাটিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে
সে-মাটির স্পন্দন এবং ভাষা যেন বোঝে

দিশাহীন সশস্ত্র মিছিলে হেঁটে লাভ কি?

কমরেড সন্দীপ!
আজও আমরা আছি এবং থাকবো
সৃজনশীল সার্বিক মঙ্গলময় শ্রমের পক্ষে
শ্রমের মুক্তির পক্ষে।

ভারতবর্ষ
রসুল করিম

এই মুহূর্তে উচ্চরক্ততন্ত্রের চাপে জর্জরিত পৃথিবীর
তিনভাগ জল
তার সাথে যুক্ত হতে থাকে লতা, পাতা, ধুলো—যারা
শূদ্রের সন্তান
একমাত্র বন্যা-কবলিত অঞ্চলে ডুমুরের পাতায়
জেগে থাকি আমি
আর ভাঙনরোধে যাঁরা ইতিহাস গড়ে তারা লেনা নদীর
তীরে শুয়ে থাকে।

কাকের শোকবার্তায় ধর্মঘট ডাকে মরা মানুষ
কারা যেন ঘন্টা বাজিয়ে ধর্মঘট ভাঙে তবু
চারিদিকে নিস্তব্ধতা বজায় থাকে; বেয়নেট, রঞ্জনরশ্মি
ও পৌরাণিক নাটক, যা দেখে মুক্তি খোঁজে গ্রামীণ
লাজুক মেয়েটি।

এখান থেকেই দেশের যাবতীয় স্বরবৃত্তগুলো জড়ো
হতে থাকে
একটা দর্শনশাস্ত্র মৃতুমুখ থেকে জেগে উঠছে ক্রমশ

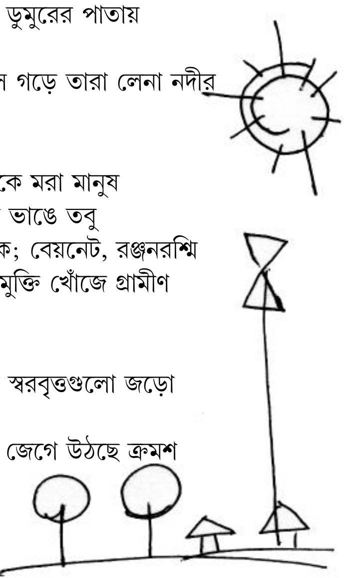

ভয় কেন?
মিনতি গোস্বামী

এখনো শরতে ফোটে পদ্ম, শিউলি কাশফুল
কেন ভাবি মাটির গল্প আগাগোড়া ভুল?
এখনো আছে নদী, চাঁদ, জোৎস্নার বালুচর
বালি দিয়ে গড়া নয় আমাদের ভেতর ঘর।

মাটির মানুষ মাঠে ফসল ফলায়
সব বিল ছিন্ন হয় তাদের চলায়
আমরা সবাই নুন-ভাতের কারবারি
এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব আগন্তুকের গাড়ি।

ভয় নয়, ভ্রম দেখে ভাঙে ভুল
আগাগোড়া যেদিকে বিদ্ধ করুক ত্রিশূলই ত্রিশূল
চিল, কাক, বুলবুলির দেশে আমরা আছি
আমাদের চেনা আছে আগন্তুক বেদের হাঁচি।

শপথ ঃ একুশ শতকে
বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

কুসুমে কাঁটায় হেঁটে সরণি
একুশ শতক আনে বিশ্ব
ভুলে যাব অতীতের বিচ্ছেদ
এঁকে নেব মিলনের দৃশ্য।

পৃথিবীটা আজ আর দূরে নয়
উঠোনে হেঁটেছে, যেন রোদ্দুর
রোদ্দুর মানে প্রাণবৈভব—
তাহলে মানুষই ত্রাণে ভরপুর।

উপনিবেশের দিন আর নেই
সে আশায় যারা ছোটে, ভ্রান্ত
বিত্তকলায় যারা গর্বী
তাদের চিত্তকলা ধ্বস্ত।

সন্ত্রাস যাহাদের মন্ত্র
নাশকতা ব্রত শিরোধার্য
মধ্যযুগীয় তারা বর্বরে
ধ্বংস তাদের অনিবার্য।

ক্ষমতার লোভে মহাদর্পে
চকিতে শানায় যারা যুদ্ধ
তারা কাপুরুষ, নরশত্রু
হৃদয় তাদের অবরুদ্ধ।

অলোতে ভেসেছে মহাবিশ্ব
আঁধারের আবাহন কেন আজ?
ইতিহাস বলে ঃ কালো থাকবেই,
নতুবা কীভাবে চিনি জাঁহাবাজ!

সূর্যের সন্ততি আমরা
আমাদের যুদ্ধটা অন্য
অশন, বসন, পাঠ গ্রহণের—
সবটাই মানুষের জন্য।

কুসুমে কাঁটায় হেঁটে সরণি
একুশ শতকে হাঁটে বিশ্ব—
জানা আছে, সত্যের হবে জয়
সমূহ অশুভ হবে নিঃস্ব।।

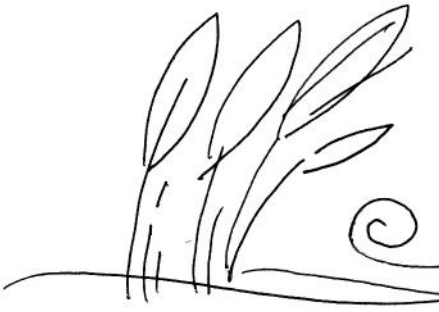

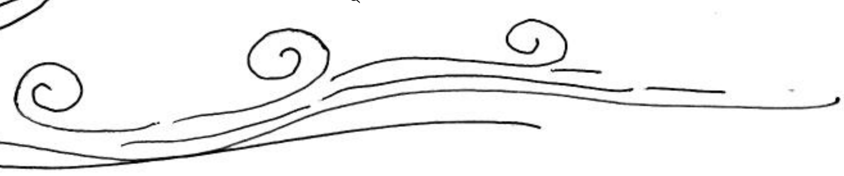

স্বপ্নকাতরতা

দেবাশিস প্রধান

যদি যাবে যাও, বাধা কখনো দেবো না।
তোমার দু'পায়ে বাঁধা লতাগুল্মের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস...

যাও, ফিরে আর তাকিয়ো না, জলসরা গ্রামে
দুধস্বর ধানের উৎস—এবছর হয়তো হবে না তাই—
করোনা-মারণ এতই প্রকট এই ছাপোষা সংসারে।
আজ ক'জোড়া চোখের স্বপ্নকাতরতা উশ্‌খুশ করছে।
স্পর্শসুখের কাতর সনেটগুচ্ছ দুলে দুলে কোমর দোলাবে না!
মায়ামেঘে আম-ফানে হিসহিসাচ্ছে দোমড়ানো মোচড়ানো কাশ
এই আমার কীটপতঙ্গের জীবন।

আবারও পেছন ফেরা? না দেখাই ভালো।
তারচেয়ে সামনের ঘাপঘোপ দেখেশুনে চলাই উচিত
ঔচিত্যবোধ স্থাপনা করো ঘরে ও বাহিরে।
ঘাটে ঘটে সিঁদুর চর্চিত আলো, অন্ধকার তোমাকে মানায়!
জোরে জোরে পা চালাও মেয়ে—ওপারের কচুবনে
ওঁৎ পেতে আছে সুতীব্র ক'জোড়া চোখ, হুলস্থূল বেধে যাবে,
মোহে মাৎসর্যে। এ সময়ে যাও সেই হাওয়া গ্রামে
অলাত প্রস্তাবে...

মুখোশটা খুলে রেখো

স্বপন পাঁজা

তুমি যতোবারই মুখোশ বদলেছো
আমরা কিন্তু ঠিকই চিনেছি,
মুখোশ বদলাতে বদলাতে
নিজেই ভুলেছো তোমার মুখ,
আমরা ভুলিনি।

তোমার মোহিনী মুখোশটা
এখন ঝরঝরে হয়ে গেছে,
মানুষ বেরিয়ে পড়েছে
গোলোকধাঁধা থেকে,
তাই ত্রাসকে লোকায়ত করে
যাদের কোলে উঠে পড়েছো,
কিম্বা এতোদিন যারা তোমাকে
মুখোশ যুগিয়েছে,..
তারা কিন্তু তোমাকে বাঁচাবে না।
তারা নিজেরাই বাঁচার জন্যে
হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করেছে
অন্য কোনো চাষজমি!

এবার তুমি তৈরি হও,
ফিউরার বাংকারে ঢোকার আগে
মুখোশটা খুলে রেখো।

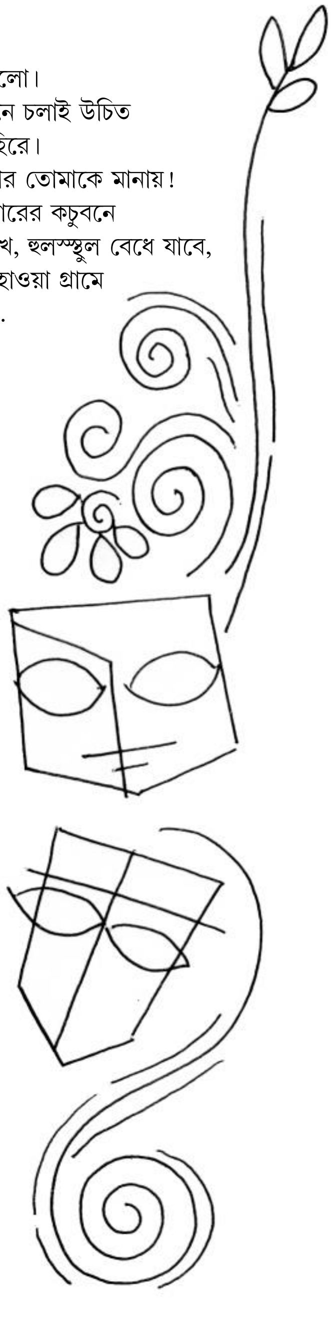

সমাজসেবী

(স্বপন ঘোষচৌধুরীর স্মরণে)

রীনা কুণ্ডু

কুড়ি সালটা যেন কেমন লাগছে,
মানুষ যোগাযোগহীন হয়ে পড়েছে,
দরজায় টোকা পড়লেই মনে হতো সে এসেছে....
তার আসার সময়ের কোনো ঠিক ছিল না
যখন ইচ্ছে হতো চলে আসতো
কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নিয়ে যেতো
উৎসাহ দিতো—
এক্ষুনি এটা লিখে দাও তো
বলতাম—তা হয়!
—হবে, ঠিক পারবে, আমার এক্ষুনি চাই
আমি এক্ষুনি প্রেসে যাবো।
শহরে, শহরের বাইরেও এইভাবেই যোগাযোগ রাখতেন।
এক কাপ চা দিলে যে হাসিটা হাসতেন
সেটা ভোলার নয়।
বড় দাদার মতো এমন মানুষ
পৃথিবীতে এখন দরকার।
আমার মতোই সকলে ভাবছে,
কণ্ঠস্বরটা আর শুনতে পাবো না
কিন্তু উনি আমাদের মধ্যেই রয়েছেন সৃজনে।

লীলা

অচিন মিত্র

হন্তারকের কাছে জাদুকাঠি আছে
ছুঁয়ে দিলে
কুয়াশা-আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে চাঁদ
কনক-আঁধার রেখে যায়

নাগরিক রাজপথ ফুরিয়ে গেলেও
এই লভিনু সঙ্গ তব
থামে না তো হাঁটা

সিগনালে লাল চোখ শেষ হয়ে আসে
পাথরের পথে এত কে লিখেছে মায়া
অশ্রু কি দেখা গেছে হৃদয়ের কণা?

হন্তারকের কাছে জাদুকাঠি আছে
ছুঁয়ে দিলে সাঁকো
নশ্বর
হঠাৎ কুসুম হয়ে যায়

দিঘল রানওয়ে জুড়ে সন্ধ্যার উপযোগী আবহ বিছানো
দূরে গিয়ে
দূরে চলে গিয়ে ফিরে এসেছে সুন্দর
জীবন ফিরিয়ে দিয়ে মৃগয়া খেলবে বলে আরো একবার

সবুজ স্বপ্ন ফিরিয়ে দাও
শুভজিৎ বোস

কবরের পাশে শুয়ে আছে শহর, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম
শুয়ে থাকা শহর ও ঘুমন্ত গ্রামের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে একদল মানুষ,
সকালের সাইরেন বেজে ওঠে মানুষের সুশ্রুত মিছিলে,..
ঘারে ললাটে এঁকে দিয়ে যায় দুপুর খসে পড়া আর্তনাদ।
বন্দী নালিশ গেঁথে দিয়ে যায় শহর ও গ্রামে শুকনো ফুলের অভিনন্দন,
অমেয়ক্ষণ শোকের মহড়াতে মেপে নিয়ে যায় প্রতি ইঞ্চি মাটি।
পৃথিবীর গায়ে আজ বিষ পিঁপড়ের বাসা,
মানুষ দেখলেই তারা ছুটে আসে কামড়াতে,
টাকার ব্যাগ কাছে পড়ে থাকলেই নীতি ভুলে যায় মানুষ।
হিংসার পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রতিদিন পরীক্ষা দিতে হয় কেন ভাই রাম ও রহিমকে?
রক্তে ঝরে শ্রাবণ, আষাঢ় কাব্য থেকে দেনা মিটিয়ে দেয় মানুষ,
জন্মে আজ কোনো বাহবা নেই! আছে মৃত্যুতে জোরালো হাততালি।
চাষি, মুটে, জেলে, কুমোর বাতাসে হেলান দেয় সময় বিদীর্ণ করে,
ভাঙা নদী বয়ে চলে বুকভরা স্রোতের অপেক্ষায়।
ফিরিয়ে দাও আমাদের সবুজ-স্বপ্ন, খোলস বদলানো মানুষ!
চাঁদের হাটে বিলিয়ে দাও অমলিন জ্যোৎস্না,
পৃথিবীটাকে স্বপ্নবিহীন অন্ধকারে এভাবে ঝুঝিয়ে রেখো না।

স্মৃতিভ্রম
অয়ন ঘোষ

বিপরীত জলে স্রোত গোলমেলে
আংটি গিলে মাছের বিপদ যত না
তার চেয়ে শত গুণ
মেছুরের
রাজসভা প্রস্তুত
বিধান শোনানো আছে সান্ত্রীদের কানে কানে
অভিনয় যথারীতি রাজসিক
স্মৃতি লোপ, সেতো ছুতো।
হরিণের নরম মাংস, নারীও কাছাকাছি
বিপদ দেখলে জল মাপে সবাই
তখন এক দলে
রাজা প্রজা সব
দ্বাপর বা কলি
হাত ধুয়ে ফেলতে
স্মৃতিভ্রমের জুড়ি নেই!

প্রিয় মানুষজনের প্রতি
দিলীপ সাঁতরা

মানুষ এনেছে ধর্ম যত ধর্ম আনেনি মানুষ কোনো
মানুষ করেছে আইন যত মানুষই মানবে জেনো
ধর্ম আইন সব মানুষের সৃষ্টি
মানুষ না মেনে করছে অনাসৃষ্টি
নিয়ম মানো ভ্যাকসিন তৈরির আগে বিপদ না এনো।

প্রতীক্ষা
সব্যসাচী বাগ

এইতো সেদিন—
কচি কচি হাত মুঠো ভরে রেখে
হেঁটে গেছো জনাকীর্ণ পথে

আলগোছে রক্তপিপাসু পতঙ্গ সরিয়ে
ঘুমন্ত কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে নিয়ে
এঁকেছো আদর চিহ্ন

প্রতিবার পৃথিবীর আবর্তনে
শরীরে নিয়েছো বর্ষবলয় জড়িয়ে
ক্রমশ শক্তমুঠি আলগা হয়ে
একদিন দূর স্রোতে ভেসে যায়—

আজ বড় অসহায়
একাকী দাঁড়িয়ে তীরে
অপেক্ষায় আছি
আবার তেমনি করে কখন কবে
এ হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যাবে

ইচ্ছে নদী
আমির উল হক

ইচ্ছে নদী—
কুলু কুলু মনের ভেতর
চলছিলো আর বাইছিলো দাড় আপন মনে,
একদিন এক হঠাল পাগল সেই নদীতে—
ভাসিয়ে দিলো
গুচ্ছখানেক কাগজ তরী।

কাগজ তরী ভেসেই চলে, ভেসেই চলে
ইচ্ছে নদীর সঙ্গে মনের কথা বলে,
আবার কখন উথালপাথাল জলের তোড়ে
কাগজ তরীর মনের কথা থমকে গেলে—
সেই নদীটাও হারিয়ে ফেলে কলকলি রব।

হঠাৎ পাগল সেই নদীতে হারিয়ে গেলে
ইচ্ছ নদী কুলুকুলু বয়েই চলে—
হঠাৎ পাগল—ইচ্ছে নদীর খুনসুটি আর
দেখবে না কেউ
পাগলপারা নদীর পাড়ে।

জাতীয়তাবাদ ও হিংসা

সুকৃতি ঘোষাল

আমরা এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি যখন জাতীয়তাবাদের উগ্রতা নিয়ে কথা বলতে গেলেই রে-রে করে তেড়ে আসবে ভক্তের দল, আর আই.টি সেল সত্যমিথ্যা গুলিয়ে দিয়ে রাতকে দিন করে ছাড়বে। তবু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা জরুরি—উত্তর না মিলুক, সেগুলো আলোচিত তো হোক, এই প্রত্যাশায়। দেশভক্তির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কী সেটা প্রথমেই বিবেচনা করা উচিত। দেশকে ভক্তি করলেই জাতীয়তাবাদের সমর্থক হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি কিন্তু কোনো বিশেষ প্রশ্নে, যেমন কাশ্মীর প্রশ্নে, ভারত রাষ্ট্রের গৃহীত নীতির সমর্থক না-ই হতে পারি। জাতীয়তাবাদ এই ভিন্নমতকে আড়চোখে দেখে এবং প্রায়শই বিঁধতে ছাড়ে না। জাতীয়তাবাদের মূল ভাবটি হল ‘my country–right or wrong’। ফলে জাতীয়তাবাদের একটা আধিপত্যকামী রূপ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, ‘my country’ বলতে কার দেশ বুঝব? যে বলছে তার না সমগ্র দেশবাসীর? জাতীয়তাবাদীরা দেশের যে সাংস্কৃতিক পরিচয়টা তুলে ধরতে চায় তা সবসময়ই একরৈখিক। এদেশের প্রেক্ষিতে, ‘শক হুন দল পাঠন মোগল’ মিলে যে ভারত, তার বহুত্ব লোপ পায়—সে আত্মপরিচয়ে হয়ে ওঠে হিন্দু। India for the Indians তখন হয়ে ওঠে India for the Hindus। যেহেতু এটা ব্যক্তিক আবেগ বা অনুভূতি নয়, ক্ষমতার সঙ্গে এর একটা সুস্পষ্ট যোগ আছে, তাই ক্ষমতালিপ্সুরা এই বোধটিকে মানুষের মনে গেঁথে দিতে চায়। মানুষকে ভিন্নভাবে ভাবতে দেওয়াই হয় না। অপপ্রচারের দাপটে মিথ্যাই সত্যরূপে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। কেউ রাষ্ট্রনীতির—তা কাশ্মীর, চিন, বাংলাদেশ যে প্রসঙ্গই হোক—সমালোচনা করলেই আমরা তার দেশপ্রেম নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠি।

এমনটাই তো হবার কথা। গান্ধীজিকে লেখা একটা পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘Power in all its forms is irrational’। অর্থাৎ ক্ষমতাবানের কাছে যুক্তিবাদী আচরণ প্রত্যাশা করে লাভ নেই। দাহ্যবস্তুর অকৃপণ যোগান হতে থাকলে স্ফুলিঙ্গ যেমন দাবানল হয়ে ওঠে, ক্ষমতার স্পর্শে দেশপ্রেম তেমনি আসুরিক শক্তিসঞ্চয় করে দানবীয় রূপ পায়। যে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ স্ফীত হয়, তা অনন্য আনুগত্য বা ‘exclusive loyalty’ দাবি করে। তাই অসহিষ্ণুতা এর ধমনীর প্রতি রক্তবিন্দুতে বাহিত হয়। দেশের মধ্যে যারা একটু স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়

নিয়ে বাঁচতে চায়, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী তাদের সহ্য করতে পারে না। এদেশে যেমন মুসলিম বা খ্রিস্টান ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে 'বহিরাগত' তকমা দেবার চেষ্টা করা হয়, তাদের দেশপ্রেম ততটা খাঁটি নয়—এমন একটা ধারণা নির্মাণের সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভাজিত হবার পর, ভারত নামক রাষ্ট্রটি ধর্ম, ভাষা, এথনিসিটি ইত্যাদি প্রশ্নে বহুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আজ ভিন্ন ইতিহাস রচনা করে সে আদর্শকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হচ্ছে। বিকল্প নির্মাণের কৌশলটি দ্বিমাত্রিক—একটি মাত্রা হল গৌরবান্বিত করা, অন্যটি কলঙ্কিত করা। ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক শর্তটিও না মেনে, তথ্য-প্রমাণের ধার না ধেরে এই জাতীয়তাবাদী ব্রিগেড তাই যে ঢাকটি অবিরাম বাজিয়ে চলে তার বোল হল—প্রাচীন ভারতের অর্থাৎ প্রাক্-ইসলামিক ভারতের সবই ভালো, মধ্যযুগে ইসলামপন্থীরা এসে ভারতের পবিত্র ধারাটি কলুষিত করে দিয়েছে—তারা শত্রু, যত অধঃপতন সবের জন্য দায়ী। একটা সুবিধাজনক অর্থাৎ জনমোহিনী রাজনৈতিক লাভের জন্য মিশ্র জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত উত্তরাধিকার যে ইতিহাস, তাতে বিন্দুমাত্র মতপার্থক্যকে বরাদস্ত করতে চায় না আধিপত্যকামীরা। অথচ ইতিহাস বলে বহুত্বের ভাবনা বিযুক্ত জাতীয়তাবাদ দেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ কী মারাত্মক হতে পারে গত শতকের নয়ের দশকে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ইত্যাদি সার্বভৌম রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ তার বড় প্রমাণ। এইসব দেশের পারস্পরিক কলহ ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ একথাই প্রমাণ করে যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে আখেরে মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না।

১৯৪৫-এর হিরোসিমা-নাগাসাকির পরও ১৯৪৭ আর ১৯৯৮-এ পোখরানে 'বুদ্ধ হেসেছে'। আমরা ভুলে গেছি রাসেলের সতর্কবাণী, যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়, এটা মানুষের যৌক্তিক বিচারবুদ্ধির পরাজয়। যে ভু-সীমা নিয়ে এত দর্প, এত দাপাদাপি তার কাঁটাতারের উল্টোদিকের মানুষটিও যে মানুষ, আমরা ভুলে যাই। যারা কথায় কথায় রামায়ণ-মহাভারত উদ্ধৃত করে জাতীয়তাবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চায়, শ্মশান হয়ে যাওয়া কুরুক্ষেত্রে মানব-মানবীর আক্ষেপ তাদের কানে পৌঁছায় না।

আসলে জাতীয়তাবাদ যে এক অর্ধসত্য তা বুঝতেই হবে। অর্ধসত্য এই কারণে যে আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিতে রেখে তাকে দেখতে না পারলে তা হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠতে বাধ্য। হিটলার যে জিগির তুলেছিলেন— 'People of the same blood should be in the same Reich'—তার নিধনভয়াল রূপটি পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে। আমরা কি তার পুনরাবৃত্তি চাইব? কখনো ভিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে, কখনা দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভিলেন সাজিয়ে নিজেরা কতটা জাতীয়তাবাদী তা প্রমাণে আমরা তৎপর হব? কিন্তু এটা তো মানতেই হবে সভ্যসমাজে হিংসা কখনো শেষ কথা বলে না। হিংসার উৎস বিদ্বেষ আর বিদ্বেষ জন্মায় বিভিন্নতাকে অস্বীকৃতি দেবার মানসিকতা থেকে। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, তবু পৃথিবী শান্ত হয়নি। ছয়ের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নয়ের দশকে গালফ যুদ্ধ, চলতি শতকের প্রথম দশকে আফগানিস্তান যুদ্ধ দেখেছে বিশ্ব। ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলার সময় ভাবা হয়েছিল গণবিধ্বংসী সমরাস্ত্র সম্ভার (WMD) বোধহয় বীভৎসতার মাত্রা বিষয়ে ভয় ধরিয়ে মানুষের সম্বিৎ ফেরাবে। হয়নি। ১৯৪৫-এর হিরোসিমা-নাগাসাকির পরও ১৯৪৭ আর ১৯৯৮-এ পোখরানে 'বুদ্ধ হেসেছে'। আমরা ভুলে গেছি রাসেলের সতর্কবাণী, যুদ্ধ কোনো স্থায়ী সমাধান নয়, এটা মানুষের যৌক্তিক বিচারবুদ্ধির পরাজয়। যে ভু-সীমা নিয়ে এত দর্প, এত দাপাদাপি, তার কাঁটাতারের উল্টোদিকের মানুষটিও যে মানুষ, আমরা ভুলে যাই। যারা কথায় কথায় রামায়ণ-মহাভারত উদ্ধৃত করে জাতীয়তাবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চায়, শ্মশান হয়ে যাওয়া কুরুক্ষেত্রে মানব-মানবীর আক্ষেপ তাদের কানে পৌঁছায় না। রাসেলের নামে চালু মহা মূল্যবান কথাটি আমরা মনে রাখতে চাই না—'War does not determine who is right but who is left'। অর্থাৎ যুদ্ধের হিংসায় কে ঠিক তা স্থির হয় না, সে হিংসার পর ক'জন টিকে রইল সেটাই তখন হিসেব করতে বসতে হয়। যারা হিংসার তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেছে তারা আমাদের বারবার সতর্ক করেছে যে যুদ্ধে কেউ জেতে না—'war has no winners'—কেন না অন্যের পরাজয়ে যে জিত তা সভ্যসমাজ অনুমোদন করে না। সভ্যসমাজ দ্বন্দ্বের অবসান দেখতে চায় 'win-win' সমাধানে—যে সমাধান কারুর কাছেই অগৌরবের নয়।

জাতীয়তাবাদী পেশি আস্ফালনে আমরা কি সেই সমাধানের ধারে-কাছেও আছি? দেশপ্রেমের নামে দেশবাসীকে বশ্যতা স্বীকার করানোকে যাঁরা পবিত্র কর্ম মনে করছেন, তাঁরা কি ভেবে দেখবেন না প্রেম ন্যায়বিচারের বিপরীতে গেলে তা আর প্রেম থাকে না, পাশবিকতায় পর্যবসিত হয়? জাতীয়তাবাদ তাই শুভ ভাবনা হিসাবে ততক্ষণই স্বীকার্য যতক্ষণ তা হিংসামুক্ত ও ক্ষমতালাভের কূটনীতিপ্রসূত নয়। কিন্তু হিংসাহীন নিখাদ জাতীয়তাবাদ যাচাই হবে কী ভাবে? যেহেতু এটি অর্থসত্য তাই আন্তর্জাতিকতাবাদ নামক অপর অর্ধসত্যের সঙ্গে মানানসই ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই তা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সেই ভারত যেখানে 'গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'। আমরা গান্ধীমূর্তিতে মালা দেব আর পরক্ষণেই গডসের মন্দির বানানোর কাজে হাত লাগাব। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করব অথচ যে ভাবনাটি তাঁর ঘোর অপছন্দের, তার চর্চা করে সমাজকে সংকটাপন্ন করে তুলব। যাঁরা এখনো সমাজের বিবেক, এই দুর্যোগে তাঁদের মুখ খুলতেই হবে। সমাজকে সচেতন করতে হবে যে জাতীয়তাবাদ আপাতদৃষ্টিতে এক আদরণীয় আবেগ। কিন্তু এটা বারুদ—সহজ-দাহ্য, বিস্ফোরণের অব্যর্থ উপাদান। কে, কীভাবে, কোন স্বার্থে একে ব্যবহার করছে তার ওপরই এর নিরীহতা নির্ভর করছে। চরিত্র না বুঝে হিংসার আগুনের কাছাকাছি জাতীয়তাবাদের বারুদকে আনলে সেই বিস্ফোরণে দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। দেশের চেয়ে দেশপ্রেম, যা কিনা জাতীয়তাবাদের জেনেটিক রূপ বলে ভাবা হয়, কখনো বড় হতে পারে না। দেশ মানে শুধু এক সীমায়িত ভূখণ্ড নয়, দেশবাসী, সহনাগরিক। তাই জাতীয়তাবাদী হতে গিয়ে আমরা যেন ভ্রাতৃঘাতী, ভগ্নীঘাতী নরপিশাচ না হয়ে উঠি—সেটা খেয়াল রাখতেই হবে।

বাংলার উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু-মূর্তি

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

প্রতিমাশিল্পের প্রস্তরভাস্কর্যে শিল্পীর শৈল্পিক সত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। মূর্তিভাস্কর্যে রূপদান কোনো শিল্পীর বা শিল্পীগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও শিল্পনৈপুণ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। মূর্তিশিল্প বা ভাস্কর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আঞ্চলিক শিল্প চেতনার স্ফূরণ। পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, হয়শীর্ষ, পঞ্চরাত্র ও অপরাপর শিল্পশাস্ত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের কলাকৌশল, মূর্তির বর্ণনা ও পরিমাপ-নির্দেশক বহু সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু দেবদেবীর প্রতিমা যে শিল্পধারার নিদর্শনেই নির্মিত হোক না কেন, সর্বভারতীয় ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে তাতে আঞ্চলিক রূপ-চেতনার বিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ দ্রাবিড় শিল্পধারার প্রতিমার সঙ্গে নাগর ও ওড়িশার ভাস্কর্য ও শিল্প নৈপুণ্যের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। তবে আদি-মধ্য যুগ পর্যন্ত প্রস্তর-নির্মিত দেবদেবীর প্রতিমা মার্গ ধর্মাশ্রিত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পচেতনার অঙ্গরূপে চিহ্নিত হলেও পরবর্তীকালে লোকায়ত শিল্পচেতনার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক ড. জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,[১] আনন্দ কুমার স্বামী, কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত, কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিমা শিল্পশাস্ত্রবিদগণ ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভাগ অনুসারে দেবদেবীর প্রতিমাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর। রাঢ়, উত্তরবঙ্গ ও বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত দেব-প্রতিমা অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়; তা বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত, পূজিত ও বাংলায় যত্রতত্র পরিত্যক্ত বিষ্ণুমূর্তিগুলি দেখলেই বোঝা যায়। সুদূর অতীতে রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে আবিষ্কৃত অপরাপর দেবপ্রতিমার মধ্যে বিষ্ণু প্রতিমার নিদর্শন সর্বাধিক।

মধ্য ও মধ্যাধুনিক যুগে বিষ্ণু বিগ্রহের পরিবর্তে শালগ্রাম শিলার উপাসনা অধিক প্রবর্তিত হলেও বিষ্ণুপ্রতিমা নির্মাণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রায় সার্ধশতবর্ষের অধিক কাল ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎখননের ফলে বহু বিষ্ণুপ্রতিমার অজস্র নিদর্শন আবিষ্কৃত, সংগৃহীত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বিষ্ণু-প্রতিমার নির্মাণকৌশল এবং বিচিত্র গঠননৈপুণ্যে প্রধানত পাল-সেন যুগের ভাস্কর্য শিল্পকে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাঢ় অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রস্তর-প্রতিমা দৃষ্টে মন্তব্য করা যায় যে, প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গদেশ তথা রাঢ় অঞ্চলে প্রস্তর-খোদিত দেবদেবীর প্রতিমা একান্তই বিরল। কুষাণশৈলীতে নির্মিত রাজশাহী জেলার নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুটি সূর্যমূর্তি এবং মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামের বিষ্ণুমূর্তির 'অঙ্গরচনা ও বিন্যাস, রেখা ও ডৌল, গতি ও গড়ন একই প্রকার। রচনার ও শিল্পদৃষ্টির আপেক্ষিক স্থূলতা সত্ত্বেও মথুরার কুষাণ ও শক (?) রাজাদের মর্মর প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে এইসব মূর্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, চন্দ্রকেতুগড়ে লাল পাথরে নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটি অনেকে অনুমান করেছেন যে মথুরা হতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

তমলুক ও চন্দ্রকেতুগড়ের মৃত্তিকা-ভাস্কর্য আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায় যে, ওই অঞ্চলে আবিষ্কৃত মূর্তি ও ফলকে শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের শিল্পশৈলীর ছাপ স্পষ্ট। বাণগড়ে প্রাপ্ত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত কিছু পোড়ামাটির ফলকে গুপ্ত-পূর্বযুগের মথুরাশৈলী তথা উত্তরভারতীয় শিল্পশৈলীর

লক্ষণ অত্যন্ত পরিস্ফুট। গুপ্ত যুগের শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথে এবং গুপ্ত-অধিকৃত বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত মূর্তিতে 'সুক্ষ্ম, মার্জিত, পেলব, ধ্যানকেন্দ্রিক, যোগগর্ভ প্রতিমাগুলিতে এক বিশেষ ধরনের শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়।'[৩]

গুপ্তোত্তর ও পাল আমলের প্রথমপর্বে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তরমূর্তি ও কারুকার্য-খচিত নিদর্শনগুলি হাজার বছরের অধিক ও প্রায়-অবলুপ্ত ভাস্কর্যশিল্পের সাক্ষ্য বহন করছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল ২৪ পরগণা জেলার বোড়ালের ক্ষুদ্র সরস্বতী মূর্তি, মেদিনীপুর জেলার রাজপাড়ায় আবিষ্কৃত কয়েকটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত চণ্ডী, মনসা, পার্শ্বনাথ ও বিষ্ণুমূর্তি, বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত অভিচার বিষ্ণু, জৈন তীর্থঙ্কর, বুদ্ধ, বরাহ ও নৃসিংহ অবতারের মূর্তি, মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি, মণিগ্রাম ও জলবাঁধার বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত প্রতিমা ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি, বীরভূম জেলায় প্রাপ্ত বজ্রতারা, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, খোদিত নিবেদন মন্দির, উমামহেশ্বর, মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি মূর্তিকে বাংলার ভাস্কর্যশিল্পের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করা যায়।

প্রস্তাবনায় আলোচিত হয়েছে যে, রাঢ়ে দেবদেবীগণের প্রতিমার মধ্যে সংখ্যাধিক্যে বিষ্ণুমূর্তির স্থান প্রথম। গ্রামীণ সংগ্রহালয়, আশুতোষ চিত্রশালা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারতীয় যাদুঘর, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ে প্রচুর সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি সংরক্ষিত আছে। এসকল মূর্তির গঠনশৈলী হতে অনুমান করা যায় যে, সুদীর্ঘকাল ধরে রাঢ় অঞ্চলে প্রস্তর ভাস্কর্যের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ও পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যমান ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার গ্রাম থেকে প্রাপ্ত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত চন্দ্রপুরুষের মূর্তিটির ডৌলে, গড়নে এবং রচনাবিন্যাসে গুপ্তশৈলীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তবে বালিপাথরে গড়া এই প্রতিমাটির গড়নে দেহ-ডৌলের সেই সূক্ষ্মতা ও ভাব-ব্যঞ্জনা ততটা ধরা পড়েনি।[৪]

বর্ধমান জেলার চৈতন্যপুর হতে সংগৃহীত ও ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আভিচারিক বিষ্ণুমূর্তিটি প্রতিমাশিল্পের এক বিরল নিদর্শন। কালো ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি দণ্ডায়মান মূর্তির গঠন আকৃতি ভীষণ রুক্ষ ধরনের। দেবপ্রতিমার মুখমণ্ডল অত্যন্ত কঠোর, দৈহিক গঠন লম্বা ধরনের, পুরু ঠোঁট এবং চোখ-দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মূর্তির কানে বড় দুটি মাকড়ি, হাতে মোটা বালা, গলায় ভারি হার ও মাথায় দীর্ঘ শিরস্ত্রাণ। কোমর ও উদরদেশ সরু, কিন্তু হাতের পেশী যেন ফুলে উঠেছে। পায়ের দিকে হাঁটুর সংযোজন-স্থল ঊর্ধ্বাংশের তুলনায় বিসদৃশ। দেব প্রতিমার দু'পাশে দুটি দণ্ডায়মান বিদ্যাধর পাদপ্রক্ষালণের জন্য জল ঢালছে। 'মূর্তিতত্ত্ববিদগণের মতে অভিচার কর্মের জন্য শ্মশান অথবা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নির্জন স্থানে কৃষ্ণতিথিতে অশুভ আর্দ্রা নক্ষত্র আকাশে অবস্থানকালীন সময়ে রাত্রিকালে এরূপ বিষ্ণুমূর্তির উপাসনা করার বিধি ছিল।'[৫]

বিংশ শতকের প্রথমভাগে গড়ুই (বর্ধমান), সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ) ও সোনারঙের (ঢাকা) বিষ্ণুমূর্তিগুলি আবিষ্কারের পর শিল্পরসিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সাগরদীঘি গ্রামে আরও দুটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল; তন্মধ্যে একটি মূর্তির পাদপীঠে স্থাপিত পদ্মের উপর উপবিষ্ট চার বাহু-সমন্বিত বিষ্ণু-বাসুদেব প্রকরণের অপূর্ব কমনীয়কান্তি বিষ্ণুপ্রতিমাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুই ঊর্ধবাহুতে শঙ্খ ও চক্র এবং নিম্নের বাম বাহুতে গদা ধৃত আছে (হাতটি একটি পদ্মের উপর সংস্থাপিত) ও দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা। মূর্তির পশ্চাৎভাগে খোদিত চালচিত্রটি ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় বিদ্যমান। দেবপ্রতিমায় কোনো পার্শ্বদেবতার মূর্তি খোদিত নেই। এই মূর্তি সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, এটি একটি নূতন শৈলীতে নির্মিত বিষ্ণুমূতি। দ্বিতীয় মূর্তিটি দণ্ডায়মান এবং চারবাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধৃত আছে। বিষ্ণুমূর্তির দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা এবং পশ্চাৎভাগের চালচিত্রটি প্রথমটির অনুরূপ। গিয়াসাবাদের (মুর্শিদাবাদ) বিষ্ণুপ্রতিমা দ্বাদশ বাহু সমন্বিত এবং গঠনশৈলীতে বলিষ্ঠভাব প্রস্ফুটিত আছে।[৬]

গড়ুই-এর (আসানসোল, বর্ধমান) বিষ্ণু প্রতিমাটিও পূর্ণাঙ্গ, যা পালযুগের শিল্পশৈলীর আদর্শস্থানীয় মূর্তি ছিল। মূর্তির দ্বাদশ বাহুতে বিভিন্ন আয়ুধ ধৃত, গলায় বনমালা নিম্নে হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং মস্তকে কিরীটভূষণের উপর বারোটি সর্পছত্র শোভিত অর্থাৎ বিষ্ণু-লোকেশ্বর মূর্তির একটি প্রাচীন প্রকরণ। এই দৃঢ়-দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ গঠনাকৃতির দেবপ্রতিমার দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আলোচ্য অনিন্দ্যসুন্দর বিষ্ণুপ্রতিমাটি ৩০/৩৫ বছর পূর্বে চুরি হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কারের ফলে ৬০০/৭০০ বছর পূর্বে নির্মিত পাথরের মন্দিরটিও পূর্বাবস্থায় নেই। বাংলাদেশের ''সোনারঙের বিষ্ণুপ্রতিমার অষ্টাদশ বাহু বিবিধ আয়ুধ সজ্জিত এবং লোকেশ্বর-বিষ্ণু প্রকরণের এই বিষ্ণুপ্রতিমার গঠনশৈলীতে প্রশান্ত ও ধ্যানগম্ভীর ভাব যেন প্রস্ফুটিত হয়েছে।''[৭]

অম্বিকানগরের (বাঁকুড়া জেলা) অনতিদূরে কাঁসাই-কুমারী জলাধারে নিমজ্জিত সারেংগড় বা সারণগড়া পুরাক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ও কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত ভগবান বিষ্ণুর হৃষীকেশ প্রকরণের অপরূপ মূর্তিটির নির্মাণকাল নবম শতকের বলে অনুমান করা হয়েছে। এই মূর্তির বিশষত্ব হল—''লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও সরস্বতী পৃথক পৃথক প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। মূর্তির মুখ্য হাতদুটি ভগ্ন হওয়ায় ধৃত আয়ুধ অজ্ঞাত। সমগ্র প্রভামণ্ডল উচ্চাঙ্গ নক্সা খোদিত। দেব-প্রতিমার কণ্ঠে হার, উপবীত।''[৮]

বর্ধমান জেলার সাঁচড়াগ্রামে প্রাপ্ত রক্তাভ বালিপাথরে তৈরি ক্ষুদ্রাকার বিষ্ণুমূর্তিটি সপ্তম শতকের বলে অনুমান করা হয়েছে। ৭ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একখণ্ড পাথরের উপর খোদিত প্রতিমার উপরের হাতদুটি স্পষ্ট হলেও নিচের হাতদুটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। এই গ্রামে প্রাপ্ত ও আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত অপর একটি বালিপাথরে নির্মিত নবম শতকের বিষ্ণুপ্রতিমার বিশেষত্ব হল—দেবমূর্তিটির বারো হাত এবং শিরোপরি আটটি ফণাযুক্ত সর্পছত্র শোভিত। মূর্তির উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩ ফুট। বনমালাটি হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বত এবং শিরোপরি কিরীট-মুকুট শোভিত। বিষ্ণুবিগ্রহের দু'পাশে মুকুট পরিহিত দুটি দেবমূর্তি দণ্ডায়মান এবং তার দু'পাশে হস্তির উপর উপবিষ্ট আরও দুটি দেবমূর্তি প্রস্তরফলকের শোভা বর্ধন করছে। কিন্তু হস্তিপৃষ্ঠে আরোহিত মূর্তিদুটির পরিচয় অজ্ঞাত। বিশেষজ্ঞগণ এই মূর্তিটিকে বিষ্ণুর লোকেশ্বর প্রকরণের মূর্তি বলে সনাক্ত করেছেন। বিষ্ণুপ্রতিমার বারো হাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও অভয় মুদ্রা ব্যতীত দু'জন যক্ষ, ষাঁড়, ইঁদুর, পাত্র ইত্যাদি ধৃত আছে।''[৯]

মেদিনীপুর জেলার পাত্রাগ্রামে প্রাপ্ত ও আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত বিষ্ণুপ্রতিমাটি নবম শতকের শিল্পকলার নিদর্শন বলে অনুমান করা হয়েছে। বালিপাথরে নির্মিত লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তির চারটি হাত এবং শিরোপরি সাতটি সর্পছত্র শোভিত। প্রভামণ্ডলের নক্সা অত্যন্ত উঁচু মানের। প্রতিমার দুপাশে দুটি অপ্সরা, যা সচরাচর দেখা যায় না। অনুরূপ অপর একটি বিষ্ণুমূর্তি মুর্শিদাবাদ জেলার মণিগ্রামে পাওয়া গেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। প্রত্নবিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে মূর্তিটি প্রকৃতই অনন্যসাধারণ।

মণিগ্রামের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিটিও মধ্য-পাল যুগের এক আশ্চর্য নিদর্শন। সমপাদক স্থানক ভঙ্গিতে দেবতা দণ্ডায়মান এবং তাঁর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী লালিত্যপূর্ণ আভঙ্গলীলায় প্রকাশমানা। অপরপক্ষে মূর্তির পশ্চাতে যেন ক্ষোদিত বিষ্ণুলোকের প্রতিচ্ছবি এক সূক্ষ্ম স্তম্ভের প্রাসাদ এবং সৌর প্রতীক গোলাকৃতি প্রভামণ্ডল। সমগ্র ভাস্কর্যটির পরিকল্পনায় এক সুস্নিগ্ধ ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতার পত্নীদ্বয়ের উদ্বেলিত ও সুষমামণ্ডিত দেহরেখা যেন তাঁদের নির্লিপ্ত ও প্রসন্ন ভাবটির পরিপ্রেক্ষিতে এক অপরূপ শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। পালযুগের অন্যান্য ভাস্কর্যের পশ্চাৎপটেও সাধারণত ক্ষোদিত হতে দেখা যায় স্বর্গীয় প্রাসাদচূড়ায় মেঘপুঞ্জে ও শূন্যলোকে কিন্নরকিন্নরী গন্ধর্বদম্পতি এবং অলৌকিক কীর্তিমুখে।[১০]

মুর্শিদাবাদ জেলার জলবাঁধায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির মস্তক ভগ্ন। এই ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি গুপ্তযুগের শেষার্ধের এক বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শন। দেবতার প্রশস্ত বক্ষ, পরিপুষ্ট স্কন্ধ ও হস্ত, প্রলম্বিত কটিবাসের সমান্তরাল ভাবে উৎকীর্ণ ভাঁজ এবং গোলাকৃতি মণির কণ্ঠহার খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্যশৈলীর সাক্ষ্য বহন করে। মূর্তির মস্তক ভগ্ন এবং বামপার্শ্বে ভূমির উপর স্থাপিত চক্রের বিলুপ্তপ্রায় ভগ্ন অংশ দেখা যায়। শিল্পশাস্ত্রসম্মভাবে দেবতার নাভিমণ্ডল গোমুখাকৃতি, প্রতীকধর্মী রেখাযুক্ত কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় এবং বলিষ্ঠ বাহু গজতুণ্ডাকৃতি অর্থাৎ হাতির শুঁড়ের ন্যায়। স্ফীত পদদ্বয় কদলীকাণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত বহন করে।" এই অনন্যসাধারণ বিষ্ণুমূর্তির শিল্পশৈলী পালযুগের আগামী তক্ষণ অভিরুচির পূর্বাভাস দান করে। জলবাঁধার দেবপ্রতিমা পূর্বভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের এক অনুপম সৃষ্টি।[১১]

সুন্দরবনে প্রাপ্ত ও আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত বিষ্ণুর বাসুদেব প্রকরণের দুটি মূর্তির প্রভামণ্ডলের উপর কীর্তিমুখ খোদিত আছে। দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর মূর্তিটি স্থাপিত। গলায় বনমালা এবং তিন হাতে (ডান দিকের মুখ্য হাত ভগ্ন) চক্র, গদা ও পদ্ম ধৃত আছে। দুটি মূর্তিই দ্বাদশ শতকের বলে অনুমান করা হয়েছে।[১২] বহুকাল পূর্বে হুগলি জেলার বৈঁচী গ্রামে ক্লোরাইট পাথরে খোদিত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা পাওয়া যায়, যা অনেকে একাদশ-দ্বাদশ শিল্পশৈলীর নিদর্শন বলে অনুমান করেছেন। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে আর.এন. মল্লিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহালয়ে একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এই বিষ্ণুমূর্তির মুখমণ্ডলের কমনীয়তা অপূর্ব; কিন্তু মূর্তিটি সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়নি।[১৩]

মুর্শিদাবাদ জেলার নাককাটি তলায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটি ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে, যা সাগরদীঘির প্রতিমার অনুরূপ। শিল্পনৈপুণ্যে উৎকৃষ্ট ও সুষমামণ্ডিত একটি বিষ্ণুমূর্তি সুন্দরবন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবান বিষ্ণু বাম হাত দিয়ে সালঙ্কারা লক্ষ্মীদেবীকে বেষ্টন করে আছেন। উপরের ডান হাতে গদা ধৃত আছে; কিন্তু নিচের দিকের হাতটি ভগ্ন। প্রভামণ্ডলের শীর্ষদেশে খোদিত কীর্তিমুখটিও ভগ্ন। সম্ভবত লক্ষ্মী-নারায়ণের একত্রে পূজার জন্য এরূপ মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। অনুরূপ একটি লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রতিমা বীরভূম জেলার ভদীশ্বরে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে সালঙ্কারা লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বাম উরুর উপর উপবিষ্ট। এরুয়ার গ্রামে (বর্ধমান) একটি ভগ্ন বিষ্ণু প্রতিমার নিম্নাংশ পাওয়া গেছে এবং উক্ত ভগ্ন প্রতিমার বামভাগের পাদপীঠে পদ্মের উপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা বীণাবাদনরতা সরস্বতী মূর্তিটি শিল্পনৈপুণ্যে অতুলনীয়। কুরুম্বা গ্রামে (বর্ধমান) একটি গাছতলার নীচে বালি পাথরের একটি বিষ্ণু বাসুদেব মূর্তি ছিল, তবে মূর্তিটির শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। ক্ষীরগ্রামে শ্রীযোগাদ্যা বাণীপীঠে রক্ষিত কালো পাথরের লোকেশ্বর প্রকরণের বিষ্ণুমূর্তিটি নিকটবর্তী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল।[১৪]

নদিয়া জেলার দিগনগরে কষ্টিপাথরের বাসুদেব প্রকরণের মূর্তির চার হাতে গদা, চক্র, শঙ্খ ও বরদা মুদ্রা। খোদিত অলঙ্কারসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রভামণ্ডলে দুটি উড্ডীয়মানা কিন্নরী ও সর্বোপরি কীর্তিমুখ। প্রতিমাটি দ্বাদশ শতকের বলে অনুমান করা হয়। খোদিত মূর্তিটির ভাস্কর্য উন্নতমানের হলেও বিষ্ণুমূর্তির পৃষ্ঠসংলগ্ন চালির নক্সা সাদামাটা।[১৫] সরডাঙ্গায় (বর্ধমান) প্রাপ্ত হরিদ্রাভ বালি পাথরের লোকেশ্বর বিষ্ণু প্রতিমাটি দশম শতকের বলে অনুমান করা হয়। দ্বাদশ ভুজবিশিষ্ট বিষ্ণুবিগ্রহের হস্তে বিবিধ প্রকারের আয়ূধ ধৃত আছে। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান প্রতিমার ভাস্কর্যে শিল্প-নৈপুণ্যের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। খোদাই কার্যও গভীর। এমন কি গলদেশের অলঙ্করণে নক্শার কাজ অত্যন্ত মনোরম এবং বনমালাটি হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত। শিরোভূষণের উপর নয়টি বিস্তৃত সর্পছত্র বিগ্রহটিকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে। আলোচ্য মূর্তিটি আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে।[১৬]

তারাপদ সাঁতরা কয়েকটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'বা' রিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের তৈরি আদিম ভাবাপন্ন মোট তিনটি বিষ্ণুপ্রতিমা পাওয়া গেছে মনোহরপুর (থানা দাঁতন) ও বড়িশা (থানা পিংলা) গ্রাম থেকে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে—দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বোড়াল, বাঁকুড়া জেলার পোখরনা ও হাওড়া জেলার হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ প্রাচীন শৈলীর বিষ্ণুপ্রতিমার ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া কালো কষ্টিপাথরে সুন্দরভাবে খোদিত কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে পাশকুঁড়া থানার গোপালনগর, তমলুকের জিষ্ণুহরি মন্দিরে রক্ষিত দুটি মূর্তি, ক্ষেপুত গ্রামে (থানা দাসপুর) ক্ষেপতেশ্বরী মন্দিরে পূজিত মূর্তি, গুড়বেড়িয়ায় (থানা সুতাহাটা) পূজিত তিনটি বিষ্ণুমূর্তি, পাচেটগড় (থানা পটাশপুর) রাজবাড়িতে রক্ষিত মূর্তি ও বৈচবেড়েগড়ে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭]

মন্তেশ্বর থানার সিজনা গ্রাম হতে সংগৃহীত এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় পদ্মের উপর দণ্ডায়মান চতুর্বাহু সমন্বিত বিষ্ণুপ্রতিমাটি পালযুগের শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন। বিশেষজ্ঞগণ মূর্তিটিকে একাদশ শতকের বলে অনুমান করেছেন। দেবপ্রতিমার খোদাইকার্য অত্যন্ত গভীর ও স্পষ্ট। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চার হাতে শোভিত এবং শিরোপরি কিরীট মুকুট সহ অলঙ্কারের সমারোহ মূর্তিটিকে মহিমাময় করে তুলেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ধ্যানগম্ভীর মূর্তিটিতে একটা স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করেছে। মূল বিগ্রহের দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা। প্রভামণ্ডলে সুন্দর সুন্দর নক্শা খোদিত আছে। চালচিত্রের দু'পাশে সিংহাকৃতির দুটি জন্তু এবং তদুপরি বাদ্যযন্ত্র হাতে দুজন দণ্ডায়মান বিদ্যাধর। প্রভামণ্ডলের শীর্ষদেশে কীর্তিমুখের দু'পাশে লতাবেষ্টনীর মাঝে দু'জন করে উড়ন্ত কিন্নর-কিন্নরী শোভা পাচ্ছে।[১৮]

হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অধীনস্থ নসীবপুরে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি পুষ্করিণী সংস্কারকালে ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং প্রায় ৮০ কিলোগ্রাম ওজনের কষ্টিপাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিষ্ণুপ্রতিমার ডান হাতের কনুই-এর নীচের অংশ ভাঙা। তবে প্রতিমার মুখ্য হাতদুটি স-নাল পদ্মের উপর ন্যস্ত। অপূর্ব কমনীয়কান্তি এই মূর্তিটিতে ধ্যানী বুদ্ধের আদলে ভগবান বিষ্ণু প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। গলায় চওড়া হার বা অলঙ্কার এবং বনমালা গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত। লক্ষ্মী ও সরস্বতী স্ব-স্ব ভঙ্গিমায় দু'পাশে দণ্ডয়মানা এবং পাদপীঠে দু'জন ভক্তের মূর্তি দু'পাশে উৎকীর্ণ আছে। চালচিত্র বা প্রভামণ্ডলে বিশেষ অলঙ্করণ নেই, কেবলমাত্র কীর্তিমুখের দু'পাশে দুটি বিদ্যাধর মূর্তি খোদিত আছে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ নোয়াপাড়ায় (উত্তর ২৪ পরগণা জেলা) একটি পুষ্করিণী সংস্কারকালে

২ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা ও প্রায় ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের কষ্টিপাথরে তৈরি একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এই প্রতিমার বিশেষত্ব হল এটি কীর্তিমুখ বিহীন এবং চালচিত্রে কোনো অলঙ্করণ নেই। মূর্তিটি ওই সময়ে হাবড়া থানায় জমা ছিল (আনন্দ বাজার পত্রিকা ৯ জুন, ১৯৯৬)। তারাপীঠে মন্দির চত্বর মধ্যে একটি ছোট মন্দিরে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের দুটি বিষ্ণুমূর্তি এখনও পূজিত হয়।[১৯]

মেদিনীপুর জেলার গুয়াবেড়িয়ায় মাধবানন্দজিউর মন্দিরটি আধুনিককালে নির্মিত হলেও মন্দিরের উপাসিত বিগ্রহগুলি প্রাচীন। এখানের তিনটি বিগ্রহই কষ্টিপাথরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি এবং স্থানীয়ভাবে সেগুলির নামকরণ হয়েছে মাধব, নীলমাধব ও সাগর মাধব। তিনটি মূর্তির মধ্যে সাগর মাধবের মূর্তির পশ্চাৎপটে বা-রিলিফে দশাবতারের মূর্তি খোদাই থাকায় সেটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়।[২০] দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর আট কিলোমিটার উত্তরে জামগড়ায় মেঝানবুড়ি থানে সংগৃহীত কয়েকটি মূর্তির মধ্যে ২০ সেন্টিমিটার x ১৪ সেন্টিমিটার আকারের একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। মূর্তির দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং পাদদেশে একটি গরুড় মূর্তি খোদিত আছে। বর্ধমানের দিগ্‌নগরের (থানা আউশগ্রাম) বাঁকুড়া রায়ের মন্দিরে ধর্মরাজের মূর্তির পাশে বিষ্ণুর বাসুদেব প্রকরণের একটি পাথরের মূর্তি পূজিত হচ্ছে। অনিন্দ্যসুন্দর এই চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রতিমাটি খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের শিল্পশৈলী বলে অনুমান করা হয়েছে।[২১]

কাটোয়া থানার চাণ্ডুলীগ্রামে পুষ্করিণী সংস্কার কালে একটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং গ্রামস্থ মোহিনীমোহন মিত্রের গৃহদেবতা শ্রীধর মন্দিরে রাখা আছে। কষ্টিপাথরের প্রতিমাটি উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট এবং প্রস্থ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির দু'পাশে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বিগ্রহের উপরের হাতে চক্র ও গদা এবং নীচের দুটি হাতে শঙ্খ ও পদ্ম ধৃত আছে। প্রভামণ্ডল সুন্দরভাবে খোদিত। বিগ্রহের গলায় হার এবং হাঁটু পর্যন্ত বনমালা প্রলম্বিত। প্রভামণ্ডলের উপরিভাগের কীর্তিমুখ সংস্থানে নৃসিংহমূর্তি খোদিত এবং দুপাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী মূর্তি খোদিত আছে। মূর্তিটি শেষ পালপর্বের বলে অনুমান করা হয়।[২২]

সম্প্রতিকালে বর্ধমান জেলার বিরুরি গ্রামে (থানা কেতুগ্রাম) একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় একটি অনিন্দ্যসুন্দর বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিমাটির চার হাতের উপরের হাতে চক্র ও গদা এবং নিচের হাতে পদ্ম ও শঙ্খ ধৃত আছে। চার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কালো পাথরে গভীরভাবে উৎকীর্ণ প্রতিমাটি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বলে অনুমান করা হয়। পাদপীঠের উপর প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং তার উপর সমপদস্থানিক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তির গলায় যজ্ঞোপবীত ও অলঙ্কার এবং বনমালাটি হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত। বিষ্ণু বিগ্রহের ডানভাগে লক্ষ্মীদেবী এবং বামে সরস্বতী দণ্ডায়মানা। পাদপীঠে ৩ জন ভক্ত সহ অন্যান্য চিত্র খোদিত আছে। প্রভামণ্ডলটি সুন্দরভাবে ভাস্কর্য-খোদিত এবং এর উপরিভাগে বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। ক্রমহ্রাসমান অর্ধবৃত্তাকারে কীর্তিমুখ উৎকীর্ণ আছে। অনুরূপভাবে ৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কালো পাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি কেতুগ্রাম থানার আমগড়িয়া গ্রামে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল। মূর্তিদুটি কেতুগ্রাম থানায় জমা ছিল।[২৩]

রাঢ় জনপদে অনন্তশয্যায় নারায়ণ প্রতিমার নিদর্শন অত্যন্ত বিরল। গোকুলনগর (জেলা বাঁকুড়া) থেকে সংগৃহীত ও আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনে সংরক্ষিত এরূপ একটি মূর্তি আছে। ওটি বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় নারায়ণ মূর্তির অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শন তো বটেই, আর সেই সঙ্গে বিস্ময়কর।

মৎস ও বায়ুপুরাণ মতে বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে দত্তাত্রেয় অবতারের মূর্তি অন্যতম। দেবাসুর সংগ্রামের সময় দত্তাত্রেয় অবতারের আবির্ভাবের কাহিনি বর্ণিত আছে। মৎসপুরাণ মতে—

'ত্রেতাযুগে তু প্রথমে দত্তাত্রেয়ো ভবুব হ।
নষ্টে ধর্মচতুর্থাংশে মার্কণ্ডেয় পুরঃসর।। ৮৭/২৪২

(অনুঃ ত্রেতা যুগের প্রথমে ধর্মধ্বংস হওয়ার উপক্রমে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হন। এই চতুর্থ অবতারে মার্কণ্ডেয় পুরোহিত ছিলেন।)

বায়ু পুরাণেও দত্তাত্রেয়কে (৯৮/৮৯) চতুর্থ অবতার বলা হয়েছে। বৈষ্ণবেরা তাঁদের ইষ্টদেবতার দত্তাত্রেয় রূপ কল্পনায় হরি-হর-পিতামহকে (ব্রহ্মা) একত্র সন্নিবেশিত করেছেন।[২৪] রাঢ় অঞ্চলে দত্তাত্রেয় মূর্তির নিদর্শন বিরল। প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে হুগলি জেলার কৈকালায় একটি দত্তাত্রেয় মূর্তি পাওয়া গেছে এবং সেটি আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। কালো পাথরে নির্মিত মূর্তিটি ২ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ভাস্কর্য নৈপুণ্য অত্যন্ত সুন্দর। সমপাদক স্থানক ভঙ্গিমায় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান বিগ্রহের দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা। প্রভামণ্ডলের উপরিভাগে শিব ও ব্রহ্মার ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি খোদিত আছে। বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তির চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধৃত আছে। গলায় হার ও পৈতা এবং বনমালা হাঁটুর নিম্নভাগে প্রলম্বিত। ক্রমহ্রাসমান চালচিত্রের উপরে কীর্তিমুখ শোভিত, যার দু'পাশে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। কালো প্রস্তরখণ্ডের উপর গভীরভাবে উৎকীর্ণ মূর্তিটি দ্বাদশ শতকের ভাস্কর্য বলে অনুমান করা হয়।

বিষ্ণুর বিভব বা অবতার মূর্তিগুলির মধ্যে পঞ্চম অবতার বামন ও ত্রিবিক্রম মূর্তি অন্যতম। বামন অবতারে বিরোচন পুত্র বলির নিকট আগমন ও দান প্রর্থনা করেন এবং ত্রিবিক্রম বিরাটরূপে সেই ভূমি অধিকার করেন। বায়ু পুরাণে আছে—

'য বামনো দিবং যঞ্চ পৃথিবীঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ত্রিভিঃ ক্রমৈবিশ্বমিদং জগদাক্রামত প্রভুঃ।। ৯৮/৭৮

হুগলি জেলার কাঁটাগেড়িয়া থেকে কষ্টিপাথরের ত্রিবিক্রম বিভবের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ প্রতিমাটিকে দশম শতকের বলে অনুমান করেছেন। প্রতিমাটির উচ্চতা ৮০ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৪২ সেন্টিমিটার। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং চার হাতে গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধৃত। মস্তকোপরি কিরীট মুকুট সজ্জিত। স্কন্ধে আলম্ব উপবীত এবং বনমালাটি হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত। পরিধানে আঁটোসাঁটো অলঙ্কৃত বস্ত্র এবং কোমরে সুদৃশ্য অলঙ্কৃত কোমরবন্ধ। দেব-প্রতিমার ডান ভাগে চামরহস্তে সালঙ্কারা লক্ষ্মীদেবী এবং বামে বীণা হস্তে দেবী সরস্বতী। এছাড়া লক্ষ্মী দেবীর ডানপাশে শঙ্খ পুরুষ এবং সরস্বতীর বামপাশে চন্দ্রপুরুষ দণ্ডায়মান।

একটি পঞ্চরথাকৃতি পাদপীঠে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর প্রতিমাটি দণ্ডায়মান। পাদপীঠের মধ্যভাগে লতা ও ফুলের অলঙ্করণ এবং ডান ও বাম উৎসর্গ ভঙ্গীতে যথাক্রমে জোড় হস্তে এক ভক্ত পক্ষীন্দ্র গরুড়ের অবস্থিতি। সমগ্র পৃষ্ঠপটটি সৌন্দর্যময় ভাস্কর্য-খোদিত। পৃষ্ঠপটের সর্বোপরিভাগে অলঙ্কৃত কীর্তিমুখ; যার দু'দিকে মালাহস্তে উড্ডীন বিদ্যাধরদ্বয় শোভিত আছে। পৃষ্ঠফলকের দু'পাশে উলম্বভাবে গজ সিংহের প্রতিকৃতি ও তাঁর উপরিভাগে কিন্নর-কিন্নরী মূর্তি খোদিত আছে।

শ্রীবিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বিভবের অপর একটি মূর্তি বারাসতে (উত্তর চব্বিশ পরগণা) আবিষ্কৃত হয়েছিল। পালযুগের অপরার্ধে নির্মিত এই দেবপ্রতিমাটি আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে।[২৫]

বাঁকুড়া জেলার রাজগ্রামে ধর্মতলার কাছে বামনাবতার প্রকরণের ত্রিবিক্রম ভঙ্গিমার শৈলীতে নির্মিত একটি মূর্তি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, গোকুলনগরের সন্নিহিত ফুলনগরেও অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটি বামনাবতারের মূর্তি ছিল; কিন্তু বর্তমানে উক্ত প্রতিমার কোনো সন্ধান জানা যায়নি।[২৬]

নৃসিংহ বা নরসিংহ শ্রীবিষ্ণুর দশাবতার বিভবের অন্যতম রূপ। এই প্রতিমা হল হিরণ্যকশিপু বধে নিরত সহিংস নরমূর্তি। অগ্নি পুরাণে (৪৯/৪) বর্ণিত আছে যে, নরসিংহ প্রতিমার মুখ বিকৃত, বাম ঊরুদেশে আহত দানব এবং নৃসিংহ অবতারে ওই দানবের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করছেন। প্রতিমার কণ্ঠ মালা ও দু'হাত গদা ও চক্র শোভিত এবং অপর দু'হাতের দ্বারা দানবের বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে।

প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরী হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে গোকর্ণ গ্রামে নৃসিংহ মন্দিরে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের একটি মূর্তি রক্ষিত আছে। কষ্টিপাথরে তৈরি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান দেব-প্রতিমার উচ্চতা ১০২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ৫১ সেন্টিমিটার। ষড়ভূজ প্রতিমাটির মুখমণ্ডল ক্রোধান্বিত ও ব্যাদিত। মূল বাহুদ্বয়ের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কেশ ও পদদ্বয় ধৃত আছে। নৃসিংহ দেবের বাম জানুর উপর শায়িত হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করছেন দু'হাতের দ্বারা এবং ঊর্ধ্বে উত্থিত অপর হাত দুটিকে দেখে উল্লাসের চিহ্ন বলে মনে হয়। ডান পায়ের কাছে জোড় হাতে ভক্ত প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান এবং বাম পায়ের দ্বারা সম্ভবত কোনো অসুরকে মর্দন করছেন। প্রভামণ্ডলে দেবদেবী বা ভক্তগণের মূর্তি খোদিত আছে। দেবপ্রতিমা কোণাকৃতি কিরীট, যজ্ঞোপবীত, বনমালা ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত। বিশেষজ্ঞগণ মূর্তিটিকে পালযুগের ভাস্কর্য বলে অনুমান করেছেন এবং জনশ্রুতি আছে যে, গোকর্ণের নিকটবর্তী বহরুল গ্রামে নৃসিংহ দীঘিতে পঙ্কোদ্ধারের সময় মূর্তিটি পাওয়া গেছে। পুরুলিয়া জেলার কুলসরা গ্রামে অনুরূপ একটি নৃসিংহ অবতারের মূর্তি অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে ছিল।[২৭]

নদিয়া জেলার দেপাড়া গ্রামে রক্ষিত নৃসিংহ মূর্তি স্থানে স্থানে ক্ষতবিক্ষত। মূল হস্তদ্বয়ের সাহায্যে হিরণ্যকশিপুর উদর-বিদীর্ণ দৃশ্য এবং উপরের দু'হাতে গদা ও চক্র ধৃত আছে। পদতলে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ পতিত। গলায় অলঙ্কার ও ক্ষয়প্রাপ্ত বনমালাটি হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত। জানা যায় যে, ভূ-প্রোথিত মূর্তিটি অসতর্কভাবে উদ্ধারের সময় অঙ্গহানি হয়েছিল। কিন্তু নদিয়া জেলারই গঙ্গাবাসে পূজিত মূর্তি অর্বাচীন কালের। তবে দেব-প্রতিমার চক্ষুদ্বয় ও মুখণ্ডলে দৃঢ় ব্যঞ্জনা প্রকটিত।[২৮]

অসাধারণ তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বীরভূম জেলার পাইকোরের নৃসিংহ প্রতিমাটি।[২৯] রোষকশায়িত নেত্রে কোলের উপর শায়িত দৈত্যরাজের উদর বিদীর্ণ করছেন ভগবান নৃসিংহদেব। পাদপীঠের উপর দৃঢ়ভাবে মূর্তিটি স্থাপিত এবং বাম পায়ের দ্বারা কোনো অসুরকে পদাঘাত করছেন। মূর্তির গঠনশৈলীতে বলিষ্ঠ ভাব ফুটে উঠেছে। পুরাণে নৃসিংহদেবের আটহাতের উল্লেখ থাকলেও পাইকোরের মূর্তিটিতে চার হাতের মধ্যে উপরের হাতদুটি ভগ্ন। সিংহের কেশর মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বে বৃত্তাকারে ন্যস্ত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকের শিল্পশৈলীর অনুকরণে নির্মিত এই মূর্তিটি সমকালীন প্রচলিত অলঙ্করণের দ্বারা সজ্জিত। পাদপীঠে সম্ভবত মূর্তি দাতা ও তাঁর স্ত্রীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। একটি স্তম্ভ হতে নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাবের দৃশ্যটি মূল মূর্তির বামপার্শ্বে খোদিত আছে। স্তম্ভগাত্রে অসুর হিরণ্যকশিপুকে পদাঘাত করতে দেখা যায়।[৩০]

অপরূপ শ্রীসম্পন্ন নৃসিংহ অবতারের একটি মূর্তি বাঁকুড়া জেলার রাজগ্রামের নিকট বাসুদেবপুরে দেখা যায়। এই প্রতিমার অসামান্য সৌন্দর্য যে-কোনো শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

সক্ষম। মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে বৈষ্ণব অস্থলে নৃসিংহ অবতারের একটি প্রস্তরখোদিত প্রতিমা রক্ষিত আছে। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে কাছারীডাঙ্গায় প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের নির্মিত তেজোদৃপ্ত নৃসিংহ মূর্তিটি নবম-দশম শতকের শিল্পশৈলীর নিদর্শন বলে অনেকে অনুমান করেছেন। এই প্রতিমাটির ডান পা ও হিরণ্যকশিপুর মূর্তির কিছু অংশ ভগ্ন। প্রায় দুই কুইন্টাল ওজনের মূর্তিটির উচ্চতা ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২ ফুট ১ ইঞ্চি। সমগ্র প্রভামণ্ডল নানালঙ্কারে শোভিত। পায়ের দুপাশে সশস্ত্র দুই দেবী দণ্ডায়মানা এবং উপরিভাগে দুই পুরুষ মূর্তি ও পদতলে প্রহ্লাদের চিত্র খোদিত আছে। তাছাড়া চালচিত্রের উপরিভাগে কীর্তিমুখ খোদিত আছে। এই মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৩১]

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সরিষাদহে একটি পুষ্করিণী সংস্কারকালে কালোপাথরে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের একটি প্রতিমা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং মূর্তিটি কলিকাতাস্থ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

পাদপীঠের উপর শায়িত দৈত্যের শরীরের উপরে পদযুগল ন্যস্ত করে বামজানুর উপর শায়িত হিরণ্যকশিপুর উদরবিদীর্ণ কর্মে দেবতার সম্মুখের হস্তদ্বয় রত। নৃসিংহদেবের পশ্চাতের হস্ত দুটিতে চক্র ও শঙ্খ ও দুইপাশে পদ্মহস্তে শ্রী ও বীণাহস্তে পুষ্টি দেবীদ্বয় দণ্ডায়মানা। দেবতার মস্তকের কিরণচ্ছটার ন্যায় কেশর ও মুকুট, পার্শ্বদেবীদ্বয়ের পদতলে ভীত ও করজোড়ে উপবিষ্ট দৈত্যগণ সমগ্র ভাস্কর্য কর্মটিকে এক সুসংহত রূপ দান করেছে।[৩২]

মানভূম জেলার (বর্তমান পুরুলিয়া) তেলকুপি একটি প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। প্রবাদ আছে যে এই স্থানে রাজা বিক্রমাদিত্য দুলমী অঞ্চল অধিকার করার পরে তৈলমর্দন করানোর জমি জায়গা বন্দোবস্ত করে দিলেন। তেলকুপিতে বহু মন্দির আছে—তন্মধ্যে লক্ষ্মী ও বিষ্ণু মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণুমন্দিরে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি আছে। মূর্তিটি চতুর্ভুজ এবং চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আয়ুধে শোভিত। তেলকুপীতে একটি চতুর্বাহু শোভিত নৃসিংহ অবতারের মূর্তির শোভামণ্ডল অতীব সুন্দর। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন নির্মাণের ফলে তেলকুপীর অধিকাংশ মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৩৩]

বিষ্ণুর বরাহ অবতারের একটি মূর্তি বাঁকুড়া জেলার গোকুলনগরে গোকুলচাঁদ মন্দিরের অনতিদূরে একটি প্রাচীন ভগ্নদশাগ্রস্ত মন্দিরের পাশে মাটিতে পোঁতা অবস্থায় আছে। সবুজ ক্লোরাইট পাথরে খোদিত এই তেজোদৃপ্ত ও অপূর্ব ভাস্কর্যের প্রতিমাটি নির্মিত হয়েছিল। এই মূর্তিটির হাত-পা ভাঙ্গা হলেও ভাস্কর্যটি উচ্চাঙ্গের এবং খোদাই করা অলঙ্করণ এখনও খুব সজীব। সম্ভবত ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি বরাহ অবতারের সেবাপূজার জন্য নির্মিত হয়েছিল। বরাহদেবের পদতলে উপবিষ্টি নারীমূর্তিটি পৃথিবী দেবীর বলে অনুমান করা যায়।[৩৪]

বর্ধমান জেলার কাইগ্রামের (থানা মন্তেশ্বর) বরাহমূর্তির ভঙ্গিমাও তেজোদৃপ্ত। প্রতিমার মুখমণ্ডল বরাহের এবং দেহ মনুষ্যাকৃতির। এই প্রতিমাটির চার হাতের মধ্যে দুটি হাত ভগ্ন এবং অবশিষ্ট হাত-দুটির ডান হাতে চন্দ্র এবং বাম হাতের দ্বারা তিনি বসুমতীকে উদ্ধার করছেন। গলদেশ হতে উরু পর্যন্ত লম্বমান বনমালা। শিরোপরি কিরীট মুকুট শোভিত। প্রভামণ্ডলটি সুন্দরভাবে খোদিত, যার উপরিভাগে দেবদম্পতির চিত্র দেখা যায়।[৩৫]

মুর্শিদাবাদ জেলার ঝিল্লিতে প্রাপ্ত বরাহ অবতারের মূর্তির ভাবে কিছুটা আড়ষ্টতা আছে। প্রতিমার গলায় বনমালা। উপরের দু'হাত চক্র ও গদা শোভিত এবং বামহস্তের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করছেন। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান দেব-প্রতিমার পায়ের নীচে অসহায়া নারী মূর্তিটিকে পৃথিবী দেবী বলে সনাক্ত করা হয়।

প্রয়াত প্রত্নবিদ তারাপদ সাঁতরা ক্ষেত্র-সমীক্ষার সময় মেদিনীপুর জেলায় চারটি বরাহ অবতারের মূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের একটি বরাহ অবতারের মূর্তি গড়বেতা থানার ময়তা গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই মূর্তিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। এছাড়া এগরা থানার কুঁদি, মোহনপুর থানার মোহনপুরে এবং গোপীবল্লভপুর অস্থলে একটি করে বরাহ প্রতিমার সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৬]

সতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লিখিত আছে ব্রহ্মা নিজেই সৃষ্টির জন্য কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করে ক্ষীরোদ সাগরের নীচে অবস্থানপূর্বক স্বীয় পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্বত ধারণ করেন। ভাস্কর্যে দশাবতারের মূর্তির মধ্যে আছে—কখনো কচ্ছপ আকৃতি আবার কখনো চার বাহু সমন্বিত বিষ্ণু এবং নীচের অংশ কচ্ছপাকৃতির। যমুনাদেবীর বাহন কূর্ম। জৈন তীর্থঙ্কর সুব্রতের লাঞ্ছন হল কূর্ম। রাঢ়ে কোনো কোনো স্থানে কূর্মমূর্তিতে ধর্মরাজের পূজা হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে ধর্মের বাহন কূর্ম।

রাঢ় অঞ্চলে প্রাপ্ত কূর্মমূর্তিগুলি বিষ্ণুর দশাবতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও ধর্মঠাকুরের পূজার অঙ্গরূপে বহু গ্রামে কূর্ম মূর্তির প্রচলন দেখা যায়। তবে এসব কূর্মমূর্তির ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। হাওড়া জেলার কলিকাতা গ্রামে ধর্মরাজের অষ্টচালা মন্দিরে ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি পূজিত হয়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে ৭x৭x২ ইঞ্চি মাপের কালো পাথরের শির খোদিত ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি আছে। এই মূর্তির পাদপীঠে প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। বাঁকুড়া জেলার বৈতল গ্রাম বাঁকুড়া রায়ের পূজার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রামস্থ একটি আটচালা মন্দিরে স্বাভাবিক আকৃতির দুটি কূর্মমূর্তি বাঁকুড়া রায় নামে উপাসিত।

বীরভূম জেলার মালাবেড়িয়ার (থানা সাইথিয়া) কূর্মদেব, খুজুটিপাড়ার (থানা নানুর) খুজুটেশ্বর, রাইপুরের (থানা সিউড়ি) বুড়ো ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি আছে। বর্ধমান জেলার রায় বামচন্দ্রপুরে (থানা ভাতাড়) চারটি কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুর বর্তমান। এছাড়া পাঁচড়া (থানা জামালপুর), কলাচাঁদতলা (থানা ভাতাড়), গলসী ও ভাল্কি (থানা আটনগ্রাম) গ্রামের ধর্মশিলাগুলি কূর্মাকৃতির। গ্রাম-সমীক্ষার সময় এসকল কূর্মমূর্তিগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বিষ্ণুর বিভব বা অবতার মূর্তির প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সঙ্কটকালে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ্ণু দশবার আবির্ভূত হন। দশটি মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ার কারণে বিভব বা অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। দশাবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ তিনটি না-মানুষ প্রাণীরূপে পূজিত। নৃসিংহ অবতার অংশত পশু ও মানুষের মূর্তির মিলিত রূপ। অবশিষ্ট ৬ টি অবতার মনুষ্যরূপী—যথা বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ ও কল্কি। পরবর্তীকালে বুদ্ধকে দশ-অবতারের মধ্যে গণ্য করা হলে কৃষ্ণের পরিবর্তে বুদ্ধ স্থানলাভ করেন। বিষ্ণুর বিভব মূর্তিগুলি পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি করা হলেও ভারতীয় মূর্তিশিল্পে একসঙ্গে দশটি অবতারের মূর্তি-সমন্বিত প্রস্তর ভাস্কর্য বিরল নয়। দশটি অবতার বা বিভব মূর্তি ব্যতীত কোনো কোনো প্রস্তর ভাস্কর্যে নর-নারায়ণ, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব ও ত্রিবিক্রম মূর্তি দেখা যায়। এছাড়া আভিচারিক বিষ্ণুমূর্তির আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

রাঢ় অঞ্চলে দশাবতার মূর্তির সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। ১৯৬৫-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জেলার শান্তিপুরে দশাবতার মূর্তি খোদিত একটি প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া গিয়েছিল। তবে খোদিত ভাস্কর্য ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভগ্ন হওয়ায় পূর্ণচিত্রটি বোঝা যায় না। প্রস্তরখণ্ডটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

হাওড়া জেলার তেলিহাটী গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপট্টে দশাবতারের চিত্র খোদিত আছে। বিষ্ণুপট্টটি চৌকো আকৃতির, কিন্তু উপরের কোণাদুটি ভগ্ন। মধ্যস্থলে অষ্টদল পদ্মকে বেষ্টন করে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি লক্ষিত হয়। বিষ্ণুপট্টের বিপরীত দিকে মধ্যস্থলে ভগবান বিষ্ণু উপবিষ্ট। প্রস্তর ভাস্কর্যটির চতুর্দিকে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও অন্যান্য চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই ভাস্কর্যটি একাদশ শতকে খোদিত বলে অনুমান করা হয়।

বিষ্ণুমূর্তির ন্যায় প্রতীক পূজার প্রচলন ছিল। রাঢ়ের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ মূর্তিপূজার পরিবর্তে প্রতীক পূজা করতেন। যার নিদর্শনস্বরূপ বিষ্ণুচক্র ও বিষ্ণুপট্টের সন্ধান পাওয়া যায়। হাওড়া জেলার তেলীহট্ট গ্রামে (থানা জগৎবল্লভপুর) দুষ্প্রাপ্য ধরনের পাথরে খোদিত একটি বিষ্ণুপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। চতুষ্কোণাকৃতি পাথরের উপর উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের কাজ অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। ওই প্রস্তরখণ্ডের কেন্দ্রভাগে খোদিত উপবেশনরত, শান্ত ও সমাহিত ক্ষুদ্রাকৃতি বিষ্ণুমূর্তি। পদতলে বাহন গড়ুর যেন প্রভুর আদেশে ওড়ার অপেক্ষায়

আছে। গরুড়ের পাখার উপর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মূল মূর্তির দুপাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় গঙ্গা ও যমুনা। যাঁদের পদতলে স্ব-স্ব বাহন মকর ও কূর্ম-এর অবস্থান। বিষ্ণুপট্টের বিপরীত ভাগে চক্রের মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং পদ্মের ১০টি পাপড়িতে দশবতারের মূর্তি খোদিত আছে। এই উচ্চাঙ্গ প্রস্তর ভাস্কর্যটিকে পালযুগের বলে অনুমান করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডাঙ্গা ও যদুপুরে উৎখননের সময় বিষ্ণুপূজার কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম প্রস্তর-নির্মিত শিলাটির চার পাশে গদা, শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও উপরিভাগে পদ্মযুগল উৎকীর্ণ আছে। এবং এই সঙ্গে 'ধ্যানয়েপদয়' উৎকীর্ণ আছে। উৎকীর্ণলিপি দৃষ্টে শিলাটিকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় শিলাটির এক দিকে শঙ্খ ও পদ্ম, বিপরীত দিকে গদা ও চক্র খোদিত আছে। তৃতীয় দিকে মৎস ও কূর্মের প্রতিকৃতি এবং চতুর্থ ভাগে 'ওঁ নম নারায়ণ' খোদিত আছে। যদুপুরেও এমনই আর একটি খোদিত প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার শালদা গ্রামে (থানা জয়পুর) আবিষ্কৃত ও বিষ্ণুপুরে যোগেশচন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত শঙ্খপুরুষের একটি মূর্তি আছে। বিষ্ণু দেবতার আয়ুধগুলিকে মনুষ্যাকার (personified) দেখানোর একটি প্রবণতা সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। শঙ্খপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম আয়ুধ শঙ্খর মনুষ্যরূপ। মূর্তিটির বিচিত্র গঠনভঙ্গিমা অভিনব। আভঙ্গভঙ্গিমার এই মূর্তিটিতে একটি লীলায়িত ছন্দময় গঠনশৈলী সুস্পষ্ট।

দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার সরিষাদহে পাল-সেন আমলের একটি বিষ্ণুচক্র আবিষ্কৃত হয়েছে। গোলাকার পাথরের চক্র-মধ্যে অপর একটি শিলমোহর সদৃশ গোলাকার পৃষ্ঠপটের উপর নৃত্যরত বিষ্ণুমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। বৃত্ত ও শিলমোহরের মধ্যে অবস্থিত গোলাকার বস্তুটি দ্বাদশটি চাকার দণ্ড বা স্পোক-এর দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ অপর একটি বিষ্ণুচক্র খাড়ি অঞ্চল হতে বহুকাল পূর্বে সংগৃহীত হয়েছিল এবং উক্ত বিষ্ণুমূর্তিটি আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে।

অতীতে বিষ্ণুমন্দিরের শীর্ষদেশে পাথর অথবা ধাতু-নির্মিত বিষ্ণুচক্র স্থাপন করার প্রথা ছিল। মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের কাছে 'বিদিশা' নামক প্রতিষ্ঠানে একটি চক্রের দুদিকে নৃত্যরত বিষ্ণুমূর্তি খোদিত চক্র মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপন করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে সংগ্রহশালায় স্থান লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষ্ণুমূর্তির পরিবর্তে প্রস্তর অথবা ধাতব চক্র নির্মাণ করে বিষ্ণুচক্র আরাধনার রীতি ছিল।

আলোকচিত্র : গিরিধিারী সরকার

তথ্যসূত্র :

১. The Development of Hindu Iconography – J. N. Banerjee, p. 395
২. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৭৭৫
৩. তদেব, পৃ. ৭৭৮
৪. তদেব, পৃ. ৭৭৭
৫. The Development of Hindu Iconography, p. 399 & 404 কৌশিকী, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৩
৬. Eastern Indian School of Medieval Sculprture– R. D. Banerjee, p. 125
৭. Ibid, p. 95
৮. History of Bengal, Vol.-1, p. 3
৯. Indian Archaeology–A Review, p. 73, PL. LXXXV
১০. তরুণের স্বপ্ন, ১৪শ সংখ্যা, পৃ. ১০৮
১১. তদেব, পৃ. ১০৬
১২. Indian Archaeology, 1964-65, P. 66, pl. LVII-A
১৩. Indian Archacology, 1972-73, P. 70, pl. LA
১৪. Eastern Indian School of Medieval Sculpture, P. 03, pl. XXIV
১৫. নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি—মোহিত রায়, পৃ. ৩৬-৩৭
১৬. Indian Archaeology, 1959-60, p. 78, pl. LXVI
১৭. ভুলুং পত্রিকা, ১৪০৪ সাল, পৃ. ১৭-১৮
১৮. Indian Archaeology, 1971-72, p. 88
১৯. বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি—দেবকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪৩
২০. পুরাকীর্তি সমীক্ষা, মেদিনীপুর—তারাপদ সাঁতরা, পৃ. ৫৯
২১. ব্যক্তিগত সমীক্ষা
২২. ব্যক্তিগত সমীক্ষা
২৩. আনন্দবাজার পত্রিকা—২১ এপ্রিল, ২০০৬
২৪. পঞ্চোপাসনা—জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪১
২৫. Indian Archaeology, 1953-54, p.33
২৬. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩-১১৪
২৭. পশ্চিবঙ্গের পুরাসম্পদ, মুর্শিদাবাদ—বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮১
২৮. নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃ. ৩৮-৩৯
২৯. Eastern Indian School of Med. Sculpture–pl. XVVI
৩০. বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, পৃ. ৫২
৩১. রাঢ় পুরাতত্ত্ব বার্তা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৩২. আদিগঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮৩
৩৩. A Tour Throngh the Bengal Provinces– J.D.Beglar, Vol. VIII, p. 170-177
৩৪. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃ. ৪৪
৩৫. বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃ. ৩০৩
৩৬. পুরাকীর্তি সমীক্ষা, মেদিনীপুর, পৃ. ১৩২-১৩৩

Happy Puja Greetings from

Paraj Trading Mini Rice Mill

Mfd. by : **MOHAN BHOG RICE**
G. T. Road (NH2), P.O. Paraj More, P.S. Galsi, Dist. Purba Burdwan-713403 (W.B.)
Sales : 9933390095, 9332298287, Tapas : 9434042269, Sabir : 9434003780, Salam : 9434008380

Sl. No. 11

With best wishes from

PARAMOUNT METAL INDUSTRIES

NH2 Fagupur, Burdwan, Purba Bardhaman

HOME AND COOKING UTENSILS MANUFACTURER

Sl. No. 23

With best wishes from

RADISTA

Sl. No. 21

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

অরূপ আরোগ্য নিকেতন

শুড়েকালনা, পূর্ববর্ধমান

Sl. No. 22

একুশ শতকে ভারতেতিহাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে

ড. রঙ্গনকান্তি জানা

বহু সময়ের দীর্ঘ পথে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বানর থেকে বনমানুষ এবং বনমানুষ থেকে আধুনিক মানুষ (হোমা স্যাপিয়েন্স)-এর সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যার সংস্কৃতি রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জীবাশ্ম ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা তত্ত্বে বানর জাতীয় প্রাণীর অবস্থা থেকে মানুষের আদিমতম অবস্থার পৃথকীকরণ ঘটেছিল প্রায় ষাট লক্ষ বছর আগে। আফ্রিকা মহাদেশে ইথিওপিয়ায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে মনে করা হয় চল্লিশ লক্ষ বছর আগে মানুষের আদিমতম পূর্বসূরি হাঁটতে শিখেছে দু'পায়ে ভর দিয়ে। নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিকরা মানব সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করলেও, পুরাতাত্ত্বিকদের মূল অনুসন্ধান অতীত সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করা। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন 'হোমো স্যাপিয়েন্স'-এর মস্তিষ্কের গঠন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। উন্নত হয়েছে মানুষের মন। উন্নতি হয়েছে বেঁচে থাকার পদ্ধতি-প্রকরণে।

'অতীত' এবং 'ইতিহাস' শব্দ-দুটির অর্থ এক নয়। অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী এক নির্দিষ্টি প্রক্রিয়ায় এবং বিশ্লেষণে ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাস হল সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যা। একক মানুষের দৈহিক উপস্থিতি সমাজে অবশ্যই আছে, তবে তার কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। মানুষ যখন সামাজিক হয় তখনই তার স্থান ইতিহাসে হতে পারে। ঐতিহাসিক গবেষণা যে তথ্যকে ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করে তা অতীতের অবশ্যই এবং তার সংখ্যাও অগুন্তি। ঐতিহাসিক-গবেষকের ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্যের চরিত্র-বদল ঘটে যায়। বিজ্ঞান ও ইতিহাস তথ্য-নির্ভর হলেও ঐতিহাসিক-গবেষকের কাছে কোনো বিশেষ তথ্যকে পরীক্ষা করার কোনো উপায় নেই। যে সুযোগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আছে। বরং প্রাপ্ত সব তথ্য সহযোগে কোনো এক বিশেষ কালপর্বের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্চার ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক গবেষক নির্মোহভাবে যুক্তির সাহায্যে কোনো বিশেষ কালপর্বের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্চার ব্যাখ্যায় উদ্যোগী হয়। তবে অতীতের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যায় কিছু মাত্রায় কল্পনা-প্রবণ ঐতিহাসিক-গবেষককে হতে হয়, কারণ তাঁর ভূমিকা দর্শকের। তথ্যের ভিত্তিতে না-দেখা অতীতের দৃশ্যকল্প নির্মাণ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তবে সাহিত্যিকের মতো নয়।

মানব সভ্যতা তৈরি হবার অনেকদিন আগে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। মানুষ সভ্যতা সৃষ্টির ঠিক কোন সময় থেকে সময়কে মাপছে বলা দুষ্কর। তাই 'অনুপল-পল-ঘন্টা'-র হিসাব মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় আধুনিক চিন্তার ফসল। ভারবর্ষের ক্ষেত্রে এই 'ইতিহাস' কথাটার সহজ ব্যুৎপত্তি

হল—'ইতি-হ-আস'। এই সূত্র ধরে বলা যায়—অতীতে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সেই না দেখা চিত্রটিকে আঁকতে বা বর্ণনা দিতে ঠিক কী কী প্রয়োজন। এর উত্তর অবশ্যই তথ্য, অবশ্যই পাথুরে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ। অতীতাশ্রয়ী সমাজবদ্ধ মানুষের ইতিহাস লেখবার জন্য প্রয়োজন তথ্যের। যে তথ্য মিলবে বিভিন্ন উপাদান থেকে। ঐতিহাসিক এবং গবেষককে নির্ভর করতে হয় তথ্য-উপাদানের ওপর। এই তথ্য উপাদানকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—নথি ও সাহিত্যগত তথ্য-উপাদান এবং পুরাতাত্ত্বিক তথ্য উপাদান। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তথ্য-উপাদানগুলি পাওয়া গেলেও, মূলত দুটি স্থানে আজ সুরক্ষিত এবং সঠিকভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় এদেরকে পাওয়া যায়—সংগ্রহশালা এবং লেখ্যাগার। প্রাচীন ভারতবর্ষে অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করার অনীহা, অতিরঞ্জন, দেশ ও কালের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব, লোককথার মিশেল, ইতিহাসচর্চাকে আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়, ঠিক যুক্তির পুষ্টি জোগাতে পারেনি। তাই তর্ক-বিতর্কের মাত্রা অনেক বেশি। মধ্যকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় সে মাত্রা অনেকাংশে কম। একথা ঠিক, মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল আছে মানুষের চেতনে অবচেতনে। আজ যে মানুষ যৌবনের দূত, কয়েক দশক পরে সেই মানুষ বার্ধক্যে ন্যুব্জ। তাহলে একই মানুষ তার জীবৎকালে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। একই মানুষ তার জীবদ্দশায় একাল ও সেকালের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করছে। তাই আজ ইতিহাস-এর গবেষক ও চিন্তাবিদ্‌দের কাছে 'ইতিহাস' কথাটির মূল অন্তর্নিহিত অর্থ হল—অতীতাশ্রয়ী ঘটনার আলোকে সেইকালের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্যার ব্যাখ্যা। যদিও আজকের ইতিহাস-চর্চায়—কী, কে, কেন, কোথায়, কখন্য, কেমন করে—এই ছয়টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কোনো হেরফের হয়নি। হবে না, বলাই বাহুল্য। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হতে পারে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এটা সুস্থ চিন্তার লক্ষণ।

''একদা এক দেশে এক বলবান রাজা ছিলেন'' কি ইতিহাস বলে গণ্য হতে পারে? এখন তো অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য মানুষের ইতিহাস। গল্পকথা ও অতিকথা ইতিহাসকে বিকৃতির পথে টেনে নিয়ে যায়। তথ্যনির্ভর ইতিহাস রচনাই একুশ শতকের গবেষক-ঐতিহাসিকদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়কালের কথা বাদ দিলে আমাদের এই ভারতবর্ষে নতুন করে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার সূচনা হল ঔপনিবেশিক শাসন সময়ে। এই বিশাল ভৌগোলিক ভূখণ্ডের প্রকৃত স্বরূপটি অনুধাবন করা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বিশেষভাবে অত্যাবশ্যক হয়েছিল। এই প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভূত হবার কারণ বোধ হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতিগত বিরাট পার্থক্য। তবে অনুসন্ধিৎসার পেছনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির এই উপমাহাদেশে অধিকার সম্প্রসারণের কুটিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। বিংশ শতকের গোড়ায় 'বঙ্গভঙ্গ'-এর ঔপনিবেশিক চেষ্টার ফলে উদ্ভূত আন্দোলনের প্রবল প্রবাহে স্বদেশকে জানার আগ্রহ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, বলাই বাহুল্য। এই সময় শুধুমাত্র ঐতিহাসিকরা নন, বহু শিক্ষিত বঙ্গবাসী দেশের অতীত গৌরব এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারণ হল পরাধীন জনমননে জাতীয়তাবোধের বীজকে প্রোথিত করা। যা শুধুমাত্র বাংলা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন রাষ্ট্র আজ সাতটি দশক পার করে আটের দশকে প্রবহমান। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চেতনায় আজকের ভারতবর্ষের পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অনুসন্ধানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে। সবরকম সাম্প্রদায়িকতার ও বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে এক ধর্মনিরপেক্ষ বাতাবরণ তৈরি করতে প্রবীণ ও নবীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের এক সদর্থক মনোভাবের বাতাবরণ তৈরি করা অবশ্যকর্তব্য। যা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে দেশের সঠিক উন্নয়নের স্বার্থে ক্রিয়াশীল থাকবে, কোনোভাবেই বিভেদকামী মনোভাবের বশবর্তী না হয়ে। সবার আগে প্রয়োজন স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইগুলির বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া, নতুন প্রজন্মের সামনে দেশ এবং দেশের মানসভ্যতার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্ন আঙ্গিকে উপস্থানে উদ্যোগী হওয়া।

'ইতিহাস' কথাটির মূল অন্তর্নিহিত অর্থ হল—অতীতাশ্রয়ী ঘটনার আলোকে সেইকালের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্যার ব্যাখ্যা। যদিও আজকের ইতিহাস-চর্চায়—কী, কে, কেন, কোথায়, কখন্য, কেমন করে—এই ছয়টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কোনো হেরফের হয়নি।

Happy Puja Greetings from

M/s. Satyam Rice Mill

নকল হইতে সাবধান ।। প্যাকেটের ভেতর লেবেল দেখে কিনুন

Paraj Station Road, Dist. Purba Burdwan, Contact : 9382793843

Sl. No. 20

ভোলানাথ চন্দের বর্ধমান দর্শন : ১৮৬০

সঞ্জীব চক্রবর্তী

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্য ভোলনাথ চন্দের দুই খণ্ডে প্রকাশিত বইটির নাম 'দ্য ট্রাভেলস অফ আ হিন্দু টু ভেরিয়াস পার্টস অফ বেঙ্গল অ্যান্ড আপার ইন্ডিয়া', প্রকাশের স্থান, লন্ডন। প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ। লেখক বইটি উৎসর্গ করেন তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া স্যর জন লেয়ার্ড মেয়ার লরেন্স-কে (১৮১১-৭৯)। সেকালের রীতি অনুসারে বাবু ভোলানাথ চন্দ তাঁর ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃসম ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এবং ব্রিটিশ শাসন যে ভারতের সুখ সমৃদ্ধি এনে দেবে সেই আশাও ব্যক্ত করেছেন।

বাবু ভোলনাথ চন্দের গ্রন্থের দীর্ঘ ও তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা লিখেছিলেন জেমস ট্যালবয়েজ হুইলার (১৮২৪-১৮৯৭)। তাঁর বাবা জেমস লুফট হুইলার ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী। পুত্র ট্যালবয়েজ ছিলেন একজন ব্রিটিশ আমলা এবং ঐতিহাসিক। তাঁর লেখা 'এ হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া' সেকালে বিশেষ আদৃত হয়। ইতিহাসের টানেই সম্ভবত তিনি ভোলনাথ চন্দের গ্রন্থের এক সুন্দর অন্তর্দৃষ্টি-সমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা লিখতে স্বীকৃত হন। ভূমিকায় স্বাক্ষরের তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬। ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাবু ভোলানাথ চন্দের ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্যাটারডে ইভনিং ইংলিশম্যান' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত স্থান পেত। লেখাগুলি পাঠক সমাজে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে, কারণ লেখক খাঁটি হিন্দু এবং হিন্দু মানসিকতাসম্পন্ন, কিন্তু ইংরাজি ভাষায় তাঁর দখল দেখে মনে হতো যেন তিনি হিন্দুর ছদ্মবেশী কোনো ইউরোপীয়। তাঁর লেখা কোনো ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর ঝাঁকি দর্শন নয়, বরং এক খাঁটি হিন্দু ভ্রমণকারীর বিবরণ যাঁর চোখে ভারতবর্ষের মানুষের আচার আচরণ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এমন জিনিস ধরা পড়েছে যা ইউরোপীয়দের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। এই গ্রন্থ হল প্রথম তাদের ভাষায় লেখা হিন্দুর চোখ দিয়ে দেখা ভারতবর্ষের ছবি। এই গ্রন্থ পাঠ করে তীর্থযাত্রায় গমন করলে পাঠক এমন একজন গাইড পাবেন যিনি অশিক্ষিত বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন, তিনি একজন ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক।

বাবু ভোলানাথ চন্দের লেখা ইউরোপীয়দের বৃত্তান্তের থেকে অনেক বেশি গভীর, এমনকি ষোড়শ শপ্তদশ শতকে যে পর্যটকেরা ভারতীয় সমাজ দেখেছেন, মানুষজনের সঙ্গে থেকেছেন, তাঁদের লেখার থেকেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অনেক গভীর। এত গভীরে প্রবেশের সাধ্য তাঁদের ছিল না।

বাবু ভোলানাথ চন্দ পুস্তক প্রকাশের সময় প্রায় চল্লিশবর্ষীয় ছিলেন। জন্মসূত্রে বাঙালি, কলকাতার বৈশ্য পরিবারের সন্তান। পারিবারিক সূত্র বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। হুইলার এরপর বিদেশি পাঠকদের সুবিধার্থে বৈশ্য কাদের বলে, কৃষ্ণ পরম্পরা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি মন্তব্য করেন যে অনেক ইংরাজি শিক্ষিতের মতো বাবু ভোলানাথ চন্দ একজন 'ডিইস্ট', যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-আচরণে আস্থা রাখেন না। পাঠান- মোগল আমলে মূর্তিপূজায় নানা বাধা ছিল, কিন্তু কোম্পানির আমলে কোনো প্রকার ধর্মাচরণে বাধা না দেবার নীতি অনুসরণ করা হয়। ১৮৫০ সাল নাগাদ কলকাতা শহরে পাঁচ হাজারের অধিক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের বছরে সেই সংখ্যা বিশেষ কমে আসে।

হুইলার মন্তব্য করেন যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে যেমন কুসংস্কার কমে আসছে, তেমনি তীর্থযাত্রার উৎসাহও বাড়ছে। রেলপথ চালু হওয়ার পর ধনী পরিবারের মহিলারাও তীর্থযাত্রা করছেন। বিশেষ

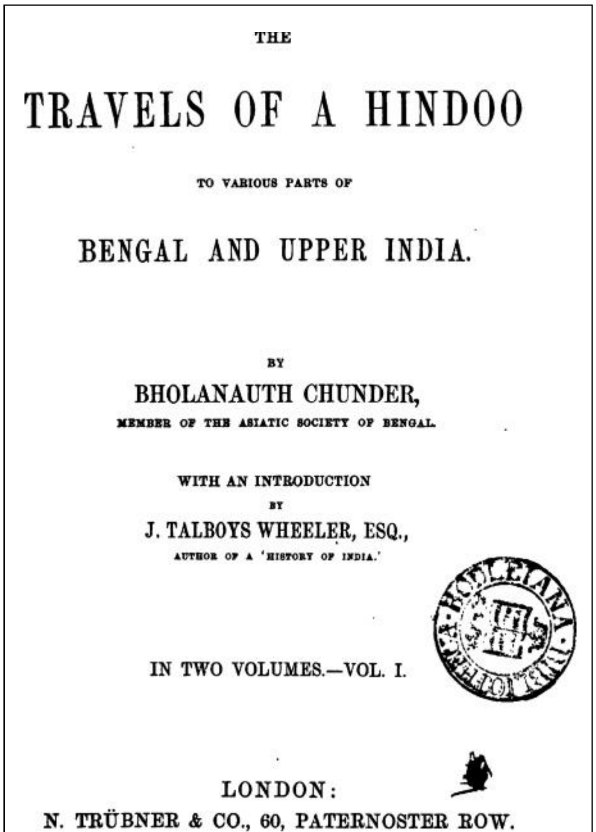

THE

TRAVELS OF A HINDOO

TO VARIOUS PARTS OF

BENGAL AND UPPER INDIA.

BY

BHOLANAUTH CHUNDER,

MEMBER OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

WITH AN INTRODUCTION

BY

J. TALBOYS WHEELER, ESQ.,

AUTHOR OF A 'HISTORY OF INDIA.'

IN TWO VOLUMES.—VOL. I.

LONDON:

N. TRÜBNER & CO., 60, PATERNOSTER ROW.

1869.

[All rights reserved.]

গন্তব্য হল গঙ্গাস্নানের জন্য বেনারস ও বৃন্দাবন। তীর্থমাহাত্ম্য সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা দেওয়াও এই গ্রন্থকারের একটা উদ্দেশ্য।

বাবু ভোলানাথ চন্দ তাঁর ইংরাজি ভাষায় দক্ষতার জন্য হিন্দু কলেজ ও তার কবি ও প্রাবন্ধিক প্রিন্সিপ্যাল ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের কাছে ঋণী। রিচার্ডসন দুই উঁচু ক্লাসে পাঠ দিতেন। যাঁরা হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করেছেন তাঁদের অনেকে ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে খ্যাত হন।

বাবু ভোলনাথ চন্দ তাঁর পিতামাতার সঙ্গে হুগলী নদীর তীরে পানিহাটি, খড়দা, মাহেশ প্রভৃতি স্থানের মেলা ও উৎসবে যোগ দিতেন। প্রথমে নৌকা ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। পরে রেলপথ চালু হলে শ্রীরামপুর চুঁচুড়াও আয়ত্তের মধ্যে আসে। সেকালে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বারাণসী বা বৃন্দাবনে যেতেন। তাঁদের অনেকেই আর ফিরে আসতেন না। অল্পবয়স্কদের ঘরছাড়া হতে নিষেধ করা হতো। বাবু ভোলানাথ চন্দের প্রিয় বিষয় ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইতিহাসে উল্লিখিত স্থানগুলি দেখার জন্যও আগ্রহ তাঁকে তাড়া করে ফিরতো। স্কুল ছাড়ার পর তাঁকে ব্যবসার খাতিরে ঘর ছেড়ে বাংলার কাছেপিঠে অনেক স্থানে যেতে হতো। প্রথম দীর্ঘ যাত্রা করেন ১৮৪৩ সালে ঢাকা অভিমুখে। ঢাকা ছিল মসলিনের জন্য বিখ্যাত—মন্তব্য করেন হুইলার। সেকালের রীতি মেনে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা শুরু করেন যুবক ভোলানাথ।

বর্তমান পুস্তকে বর্ণিত যাত্রাগুলি ১৮৪৩ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে ঘটেছিল। গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ই অত্যন্ত সুপাঠ্য। ১৮৬০ সাল বাবু ভোলনাথ চন্দ উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তখন রেলপথ ছিল হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত। রানিগঞ্জ থেকে তিনি সড়কপথে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। মাঝপথে সমস্ত বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করে যে বিবরণ লেখেন তা ছিল ইউরোপীয়দের কাছে অভিনব। ভারতীয়দের অনেক আপাত দুর্বোধ্য আচার আচরণ পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁদের কাছে। সারা ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা যথার্থ আলোয় ঝলমল করে ওঠে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে। এইভাবে হুইলার বাবু ভোলানাথ চন্দকে পরিচয় করেয়ে দিয়েছেন। কয়েক দশক পরে শিকাগো শহরে আমেরিকার শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে সনাতন ভারতবর্ষের ছবি স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরার কাজ করেছিলেন। বাবু ভোলানাথ চন্দকে তাঁরই এক পূর্বসূরি হিসেবে দেখলে বোধ হয় অতিকথন হবে না। ইউরোপীয়দের নিজের ভাষায় এক আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় এই প্রথম নিজেদের সংস্কৃতির কথা বলেছেন। তাঁকে আরো বেশি চেনা দরকার।

ভোলানাথ চন্দ ১৯ অক্টোবর ১৮৬০, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় হাওড়া স্টেশনে বর্ধমানগামী ট্রেনে চড়লেন। তিন ঘন্টা যাত্রার পর তিনি বর্ধমানে পৌঁছান। পরদিন ২০ অক্টোবর রানিগঞ্জের দিকে যাত্রা করেন। তিনি রানিগঞ্জ যাবার পথে একদিন বর্ধমানে ছিলেন। তাঁর বর্ধমান ছিল নূর-জাহান আর রামমোহনের সম্পর্কে রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন, কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনিকে যেন ক্ষেত্রসমীক্ষার নিরিখে যাচাই করে তার সম্পর্কে মূল্যায়ন করাই ছিল এই আগমনের উদ্দেশ্য। তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষা ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি থেকে স্থানীয় ইতিহাসচর্চাকারীদের আজও অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। তবে ১০৮ শিবমন্দির বা নবাবহাট সম্পর্কিত তথ্য তিনি লোকমুখে সংগ্রহ করে থাকতে পারেন, যার ফলে ভ্রান্তি ও খানিক অস্পষ্টতা এসে গেছে তাঁর বিবরণে, একথা অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমান রাজবাড়ি ও মহারাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটাই ইয়ং-বেঙ্গলসুলভ লঘু পরিহাসধর্মী, কিন্তু শোভনতার সীমা তিনি অতিক্রম করেননি।

এবার ভাবানুবাদ :

ভারতীয় গল্পের শেহরাজদির ঘোড়ার মতো একটা খুঁটো ঘোরানো মাত্র লোকোমোটিভের গতি বেড়ে যায়; গাড়ি চলছে তো চলছে ‘ঠিক ভাড়ার ঘোড়ার মত’।

মেমারি পার হলাম—সুন্দর গ্রাম, অনেক পাকা ইটের বাড়ি, চমৎকার হিন্দু নবরত্ন মন্দির। সুন্দর দেশ, প্রাণসঞ্চারী বায়ু, মাইলের পর মাইল চমৎকার কৃষি জমি, পরপর আসা গ্রাম, অসংখ্য দীঘি আর মাছ চাষের পুকুর। প্রচুর মানুষ। ভারতীয় সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল প্রচুর শিল্পনিদর্শন আর কুটিরশিল্প—সব মিলিয়ে যেন ভ্রমণকারীর কাছে স্পষ্ট ঘোষণা আসছে—সে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করছে। এ হল এমন একটা জেলা যার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, উর্বরতা, ঘন বসতি, সম্পদ, সভ্যতা, সারা বাংলায় সুখ্যাত। বর্ধমান, বিষ্ণুপুর এবং বীরভুম রাঢ়ভূমির তিন হিন্দু রাজত্ব বলে খ্যাত। একমাত্র বর্ধমানই টিঁকে আছে এবং সে অন্য দুটির থেকে অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করে। যদিও বর্ধমান অনেকবার দস্যুর কবলে পড়েছে, তবু এখানকার মানুষের উদ্যোগ, বুদ্ধি এবং জনসংখ্যার জোরে মাটি আবার সম্পদে ভরে গেছে। আমাদের দেশে আর কোথাও এমন প্রাচীন সম্পদ মজুত থাকেনি। এই সম্পদের জোরে বাংলার সকল জেলার মধ্যে বর্ধমান সর্বোচ্চ পরিমাণে রাজস্ব দিয়ে থাকে। বাঁকা তার ‘আকাবাঁকা সর্পিল গতিতে’ সেই ‘কলকল নদী’ ‘শ্যামল কুঞ্জ’, ‘ক্ষেত্রের বসন’ দান করে এই বিখ্যাত ভুমির সৌন্দর্য সম্পূর্ণ করেছে। আধ মাইল লম্বা গ্র্যান্ড রেলওয়ে ভায়া ডাক্ট হল এক স্থাপত্য-বিস্ময়। তাণ্ডবের জন্য কুখ্যাত নদীকে (দামোদর) বল্গার বন্ধনে বেঁধেছে এই ভায়া ডাক্ট। আমাদের দিনের যাত্রা প্রায় সাঙ্গ হল; সব দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ হয়েছে বর্ধমানের প্রতি। অল্পক্ষণের মধ্যেই চূড়া ও মন্দিরসমূহ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানাতে লাগলো। সেকেন্ডের কাঁটা তিন পাক ঘোরার আগেই আমরা বর্ধমানের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ভূমিতে পদার্পণ করলাম। সুন্দর ছয়মাসের যাত্রা ছয়দিনে সাঙ্গ করেছিল। আমরা তিনদিনের যাত্রা তিন ঘন্টায় সাঙ্গ করেছি। কবির কল্পনার গতিকে বিজ্ঞানের প্রমাণ পরাজিত করলো।

ভ্রমণকারীরা বর্ধমানের প্রতি সুবিচার করেননি। কাব্য বা সঙ্গীতে যা গাওয়া হয়েছে, বাস্তবের বর্ধমান তার থেকে অনেক বেশি মনোহর। প্রাচীন কুসুমপুর বলে কাব্যিক বর্ণনার প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। শহরে প্রবেশের হাঁটা-পথগুলির দুপাশে কুঞ্জবন, ফলের বাগিচা, বাগ, ফুলগাছের আধার এবং ভারতচন্দ্রের

বর্ধমান, মহাস্থান
চৌদিকেতে পুষ্পবন।

যেন আক্ষরিক অর্থে সত্য।

চারিদিকে দীঘি, কলসি কাঁখে রমণীর দল, যেন কবির ঘাটকে বাস্তব করে তুলেছে। আকাশে হালকা মেঘ, মেঘলা দিন, মৃদু বাতাস বইছে, সব মিলিয়ে মধুর দৃশ্যপট, মধুর স্মৃতি উদ্রেককারী। বাঁকার স্বচ্ছ জল বয়ে চলেছে শহরের মধ্য দিয়ে। নদীবক্ষে বালির চড়া। জলপরীরা না থাকলেও তার কাব্যিক মহিমা কমে না।

স্থানের মহিমায় কাব্যের জন্ম হয়। বর্ধমানে এসে আমরা বিদ্যা ও সুন্দরের যুগে ফিরে যাই। বর্তমান মহারাজের থেকেও মনকে বেশি আচ্ছন্ন করে পুরোনো বীরসিংহ। যে মানুষ তাদের রোমাঞ্চকর কাহিনি অনুভব করতে পারে না, যে নূরজাহানের এখানে অবস্থানকালের কথা কল্পনা করতে পারে না, যে স্থান কবিকঙ্কন ও রামমোহনের পূর্বপুরুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—সে এই স্থানের মহিমা বুঝবে কী করে? তার সম্পর্কে একটা কথাই মনে হয়—তার জন্মকালে নক্ষত্ররা তার ঘটে একটুও কল্পনাশক্তি ও উৎসাহ প্রদান করেনি।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকাহিনী হল গল্পকথার অবাস্তবতা ও

সত্যের মিশেল। লায়লা-মজনুর প্রেমের সঙ্গে মিশেছে এবেলার্ডের কঠিন বাস্তবতা। কিন্তু দুজনের সম্পর্কটাকে কেজো বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা আর কালিদাসের শকুন্তলা যেন দুই বিপরীত জগতের বাসিন্দা। গ্যেটে বলেছেন— 'তুমি কি এককথায় বসন্তের মঞ্জরী এবং শরতের ফল বর্ণনা করতে পারবে—যা সবকিছুকে মায়াময় করে আকর্ষণ করে, স্বর্গ ও মর্ত্যকে সমৃদ্ধ করে? আমি মনে করছি শকুন্তলা—আমার কাজ শেষ'।

নিষ্পাপ ছলচাতুরিহীন শকুন্তলা কত নিষ্কাম—আর তার পাশে বিদ্যার পার্থিবতা! কবির জানা উচিত ছিল যে নগ্নতার আবরণ হল বেশি কামোদ্দীপক। স্থূল বর্ণনার থেকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে কল্পনাশক্তি বেশি উদ্দীপিত হয়। তিনি বিদ্যাকে যেন এক আধুনিকা বঙ্গললনার মতো করে বসিয়েছেন, কিন্তু উচ্চ নীতি ও রুচিবোধসম্পন্ন রাজকন্যার মতো মর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনো যত্ন নেননি। তাঁর গল্পে আঙ্গুররসের যাবতীয় কামোদ্দীপক মাদকতা আছে এবং এর ফলে জনসাধারণ তাকে সাগ্রহে পান করে। কিন্তু যে বিষ পান করা হল তা অনতিবিলম্বেই বিবমিষার উদ্রেক করে। বাংলার শিক্ষিত সমাজ মনে করেন যে বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনিতে একবর্ণও সত্যতা নেই। কৃষ্ণনগরের রাজার অনুরোধে এই কাহিনি রচিত হয় যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ধমানের রাজপরিবারে রোমান্টিকতাপূর্ণ ছুঁচোবাজি নিক্ষেপ করা যায়। কিন্তু ভেরোনার অধিবাসীরা জুলিয়েটের গল্পের বাস্তবতা যাচাই করেনি, ঠিক যেমন বর্ধমানবাসী বিদ্যার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকে এবং দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গে মলমের মতো প্রলেপ লাগায়। ভেরোনার অধিবাসীরা একটা কনভেন্টের লাগোয়া বুনো আগাছায় ভরা পরিত্যক্ত বাগানে জুলিয়েটের সমাধি দেখায়। তেমনি বর্ধমানের লোকজনও বিদ্যার বাড়ি দেখায়, তার প্রিয় পুষ্করিণী দেখায়। বিদ্যার বাড়ি বিদ্যাপোতাই সর্বাগ্রে কাহিনীর অবাস্তবতা প্রামাণ করে। সেখানে খানিক ভাঙ্গাচোরা ইমারতের চিহ্ন পড়ে আছে। খুবই সন্দেহজনক, তবে যথেষ্ট প্রাচীন। কাছেই একটা সুড়ঙ্গের আভাস দেখা যায়। এটাই নাকি সেই পাতালের পথ যার মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশী সুন্দর রাজকন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করতো। আরেকটু এগিয়ে মাটিতে খানিক গহ্বরের মতো দেখা যাচ্ছে। সেটাই নাকি বিখ্যাত সুড়ঙ্গের মুখ। জায়গাটা পলিতে বুজে গেছে। আর যেখানে রাজকন্যা থাকতেন, চলাফেরা করতেন, নিজেকে উপলব্ধি করেছেন, সেখানে এখন ধান চাষ হয়। সুড়ঙ্গের অপর মুখের হদিস নেই। ভারতীয় লম্পটদের দুঃখের কারণ ঘটিয়ে দেখা যাচ্ছে হীরার কুটিরের চিহ্নমাত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভারতচন্দ্রের কাহিনির সবথেকে দুর্বল জায়গা হল এই পাতালপথ। আজকের সংশয়বাদের যুগে এটি একটি অবাস্তব ঘটনা বলে বিবেচিত হবে এবং পাঠক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠবেন, 'ওরে ছুছুন্দর, আরেকটু তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়তে পারিস না!'

জনশ্রুতি অনুয়ায়ী না হয় সুন্দরের সুড়ঙ্গের স্থান নির্দিষ্ট করা গেল, বিশ্বাসও করা গেল যে তিনশো বছর আগে তার অস্তিত্ব ছিল। সে সময়ে রাজা মানসিংহ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে বর্ধমানে এসেছিলেন এবং সুরঙ্গ পরিদর্শন করেছিলেন। রাণীগঞ্জের খনির প্রযুক্তি, ইলোরা এবং এলিফ্যান্টা গুহার উদাহরণ হয়তো প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে যাবতীয় সংশয় দূর করবে। কিন্তু সুড়ঙ্গ নির্মাণ আজ সহজ হলেও সেকালে অসম্ভব কর্ম ছিল বলে বিবেচিত হবে, অবশ্য যদি না আমরা প্রেমিকদের অভিযানকে অলৌকিক কর্ম বলে মনে করি। সুন্দর যেভাবে রাজকন্যার সঙ্গে গোপন অভিসার চালাতো তা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাছে কবিকল্পনা বলে মনে হবে, বাস্তবতা নয়।

তারপর আমরা মান-সরোবর দেখলাম। এখানে রাজকন্যা স্নান সারতেন। একদা সেটা নিশ্চয়ই চমৎকার দীঘি ছিল, কিন্তু বর্তমানে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দ্বারা বিভক্ত একটা অগভীর জলাভূমি ছাড়া আর কিছু নয়। জলের উপর সুন্দর ইন্ডিয়ান লিলি ফুটে আছে। এক অংশে ফুলের বর্ণ সাদা, অপর অংশে বেগুনি। ভারি সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। মৌমাছিরা ফুলের উপর উড়ে উড়ে তাদের গান গাইছে। শালুক আর মৌমাছি মিলে স্থানটির স্মৃতি উদ্রেক করছে। কিন্তু বিদ্যাপোতা থেকে মান-সরোবরের দূরত্ব এক মাইলের বেশি। যদি না বীরসিংহের প্রাসাদ এ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তবে দীঘির পরিচয় নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। বরং মান-সরোবরের সঙ্গে মানসিংহের সম্পর্ক বেশি। এটিকে মানসিংহের শাসনকালের জনহিতকর কাজ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় প্রমাণ হল মশান। এখানে সুন্দরকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য আনা হয়। এখানে একই নামযুক্ত কালীর অবস্থান। তাঁর বেদীর সামনে রাজপুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এখন সেই কালীর নাম দুর্লভা ঠাকরুণ। তাঁর মন্দির এই নামে পরিচিত। খোলা নির্জন মাঠের মাঝে মন্দির। লোকজন প্রায় আসেই না। এখানে ভূতপ্রেতদের আনাগোনা চলে আর কবির বর্ণনাকে সমর্থন করে। কালীমূর্তিটি ক্ষুদ্রকায়, একটি শিলাপট্টে খোদাই করা। মূর্তির নিচের অংশে একটি প্রাচীন অবলুপ্ত ভাষার লিপি আছে। তার থেকে প্রমাণ হয় যে মূর্তিটি আধুনিক কালের কোনো জালিয়াতি নয়। অন্তত বীরসিংহের রাজত্বকালের বলে একটা কাহিনি তৈরি করা যাচ্ছে। তিনি সেই দেবী যিনি রাজার পূজা গ্রহণ করেছেন, বিদ্যার পূজা গ্রহণ করেছেন এবং সুন্দরের প্রার্থনা শুনেছেন। তাই যদি হবে তাহলে তাঁর নিজেরই এই চরিত্রগুলি এবং বর্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদীদের মাঝখানে আম্পায়ারের কাজ করা উচিত।

ভারতচন্দ্রের কাহিনীর সত্যতা অথবা কাল্পনিকতা সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না— 'উভয় পক্ষেই অনেক কিছু বলা যেতে পারে'। কিন্তু বিবাদ এড়াবার জন্য ধরে নেওয়া যাক বিদ্যা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তার সময়কাল অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্দিষ্ট করা যাক। এ হল এমন একটা যুগ যখন চোল সম্রাটেরা দক্ষিণ ভারতে প্রবলপ্রতাপ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরম বা বর্তমান কাঞ্জিভরম। সুন্দর এখান থেকে আসেন। সে সময়ে করমণ্ডল উপকূল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যে যথেষ্ট আদানপ্রদান চলতো। পেরিপ্লাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বড় বড় সমুদ্রপোত বঙ্গোপসাগর পার হয়ে গঙ্গার মোহনায় আসতো। অশোকের যুগে উপসাগর থেকে সিংহল যেতে লাগতো সাত দিন, যেমনটি আধুনিক মেল স্টিমারগুলি করে থাকে। সুন্দর কোনো একটি ক্লিপার ভেসেলে এসে থাকতে পারে—তার আসার গতিবেগ দেখে অন্তত একটা তথ্য সত্য বলে মনে হয়। বীরসিংহ গঙ্গা-বংশীয় রাজাদের কোনো জ্ঞাতি হয়ে থাকতে পারেন। পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুপুরের রাজারাও তাদের রাজবংশেকে হাজার বছরের প্রাচীন বলে দাবি করেন।

প্রাচীন বর্ধমানের বর্তমান নাম নবাবহাট। এখানে প্রাচীন হিন্দু রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন। এখানে মুসলমান শাসকেরাও শাসন করেছেন। এখানে রাজা মান সিংহ এবং টোডরমল ছাউনি ফেলেন। এখানে মুকুন্দরামের আবাস ছিল। এখানে আজিম-উস-শান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এইখানে ইংরাজরা সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কালিকাটা ক্রয়ের অর্থ হস্তান্তর করে। সেকালের প্রায় কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই।

শের আফ্‌কান খেলোয়াড়দের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত নাম। এক মস্ত বাঘকে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে তিনি মোগল ইতিহাসে নাম তোলেন।

এই কৃতিত্ব গর্ডন ক্যানিংহামকেও ম্লান করে দেবে। জন্মস্থান তুর্কমেনিয়া থেকে বহুদূরে তিনি এখানে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। 'নান বাট দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ দা ফেয়ার'—কবির এই উক্তি শের অফ্‌কান ছাড়া অন্যত্র কোথাও এমনভাবে উদাহরণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর অসমান্য বীরত্ব পুরস্কৃত হয় যখন তিনি সেকালের এক অসমান্য সুন্দরীর পাণি গ্রহণ করেন—তিনি ভবিষ্যতের নূরজাহান।

পুরানো বর্ধমানের শিবালয়ে ১০৮টি মন্দির আছে। তারা দুটি অ্যাম্ফিথিয়েটারের অনুরূপ একটির মধ্যে আর একটি চক্রে বিন্যস্ত। পুরানো রাজবাড়ি এখানে অবস্থিত। লোকশ্রুতি আছে যে এখানে প্রচুর ধনসম্পদ প্রোথিত আছে। তাদের সঠিক স্থান নির্ণয় হয়নি। পূর্বতন এক রাজা গুপ্তধনের খোঁজে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন। কিন্তু মাটি থেকে কেবল বোলতা, ভীমরুল আর সাপখোপ বেরিয়ে আসে। ফলে হেরোডটাসের 'স্বর্ণ পিপীলিকা' আর মনুর 'হেমকার'-দের(?) গল্পের নতুন সংস্কারণ তৈরি হয়। বাংলায় গুপ্তধনের সন্ধানে খনন কার্য ক্যালিফোর্ণিয়ার খননের থেকে কম ভয়ংকর নয়। রাজার জীবন ভিন্ন অন্য কিছু ধনরক্ষক যক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারতো না। গুপ্তধনের অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এত বিপদ ঘনিয়ে আসে যে আর এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বীরসিংহের বংশ কয়েক প্রজন্ম আগে লোপ পেয়েছে। বর্তমান রাজবংশ হল লাহোর থেকে আগত এক বণিক পরিবার। যদিও বর্তমান রাজবংশের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা নেই, তবু তারা ভারতচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রুপে বহুকাল ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। রাজ্যের মধ্যে বহু বৎসর কোনো উৎসবে এই কাহিনির উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ ছিল।

মহারাজ হলেন বর্ধমানে সর্বেসর্বা। তিনি বাংলার প্রাচীনতম এবং ধনীতম জমিদার। তিনি ছোটখাট রাজার মতো ঠাটবাট বজায় রাখেন। তাঁর আবাস এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। অট্টালিকা অপূর্বভাবে সাজানো আছে আয়না আর ঝাড়বাতি দিয়ে। তাঁর গ্রীষ্মাবাসও রাজকীয় ভাবে সজ্জিত। তাঁর ভাণ্ডার ভরা অনেক সোনা ও রূপার পিণ্ড, আলমারি ভরা শাল, ব্রোকেড আর রত্নখচিত অলংকার। তাঁর বার্থডে বল ও ব্যাঙ্কোয়েটে সেগুলো রাজার মতো প্রদর্শন করা হয়। হিজ হাইনেসের আস্তাবলে অনেক ঘোড়া, হাতিশালে অনেক হাতি আছে। তাঁর বিরাট গোশালা আর পাখিঘর আছে। বর্তমান রাজার ব্যসন হল স্থাপত্য ও উদ্যান রচনা করা। সে সব বাড়াবাড়ির চাহিদা মেটাতে কোষাগারে চাপ পড়ে। তাঁর নিযুক্ত আর্কিটেক্টরা সারা বছর ধরে ভাঙে আর গড়ে, পুনর্নির্মাণ করে। আপহোলস্টাররা আসবাবে গদী লাগায় আর লাগায়। গায়কেরা তাদের গানে নতুন নতুন সুর যোগ করে আর যোগ করে। মনু-কথিত ক্ষত্রিয়েরা আজ ম্যামথের মতো লুপ্ত প্রাণী। আর বাংলার এখানে সেই লুপ্ত প্রজাতির বংশ রক্ষা হয়ে চলেছে বর্ধমানের অজস্র সম্পদের মালিকের মাধ্যমে।

শহরের অর্ধেক হল দীঘি। সব থেকে বড়টি হল এক কৃত্রিম হ্রদসম কৃষ্ণসায়র। দুই স্ত্রীলোক একবার সাঁতরে সেই সায়র পার হয়—ভালোবাসা বা সম্পদ কোনটার জন্যই নয়, মাত্র এক সের মিষ্টান্নের জন্য বাজি ধরে। তারা সেই সেকালের লিয়াণ্ডারের সামনে গন্টলেট ছুঁড়ে ফেলতে পারে। দীঘির উঁচু উঁচু পাড় দুর্গের প্রাকারের মতো দেখায়—আরো এই কারণে যে তাদের মাথায় দুটো কামান বসানো আছে। অবশ্য তারা ওল্ড ইংলিশ বর্ণমালার মতো অচল হয়ে গেছে।

সন্ধ্যাবেলায় দিলখুশা বাগে গমন—চমৎকার হাত-পা ছড়ানোর মতো লাউঞ্জ। এখানে প্রধান আকর্ষণ হল পশুশালা। হিন্দুরা মনে করে সিংহ হল বনের রাজা। এখানে একজোড়া সিংহ দেখে সে বিশ্বাস টলে গেল। এক ব্রাহ্মণ্য পশুশালায় দেখেছি তাদের সঙ্গীহীন করে রাখা হয়েছে। অতএব তার সন্তান নেই। সে এই সৃষ্টিতে একক প্রাণী। কিন্তু এখানে একটার জায়গায় দুটি প্রাণী। একটি পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী। দুই থেকে তারা বহুতে পরিণত হয়েছে। ছানাপোনার সংখ্যা প্রায় হাফ ডজন। পুরাণমতে সিংহ এক অদৃশ্য প্রাণী। কিন্তু এখানে বুড়ো ভদ্রলোক এক মহা অভিজাত ব্যক্তি। তিনি কেবল নরগণকে দেখাই দেন তা নয়, তাঁর রাজকীয় মেজাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে তিনি দর্শকমণ্ডলীর প্রতি মূত্রত্যাগ করে বাধিত করে থাকেন।

দুই পশুকে একত্রে রেখে তাদের ভাব ভালোবাসা চব্বিশ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করা হয় ঠিক সেই ওরিয়েণ্টাল কিং-দের মতো —প্রাসাদের বন্দী জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনা এই আর কি। কোনো দেবী তাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে কোনো শাক্তের নয়নকে পবিত্র করেন না। এগুলো পুরোহিতদের ভ্রান্ত মতবাদের বাস্তব বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদেশিভাবাপন্ন সিংহ দুর্গার বিদেশি উৎসকে নির্দেশ করে—দুর্গা মিশরীয় কেন-এর পরিবর্তিত রূপ। প্রাচীন ইন্দো-ইজিপ্টীয় আদান-প্রদানের যুগে পৌরাণিক মূর্তিতে গৃহীত হয় বৌদ্ধদের প্রভাব আটকাবার উদ্দেশ্যে।

মহারাজের অর্ধেক আয় দেবালয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যয় হয়ে যায়। দেবালয় হল মূর্তিপূজার স্থান। তার মাধ্যমে দরিদ্রসেবা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে তিনি বাংলার হিন্দুদের বার্ষিক আয়ের এক দশমাংশ নয়ছয় করে থাকেন। কিন্তু দেশের লোক আরো বড় জনহিতের ধারণা পোষণ করছে। হিন্দুদের মধ্যে লোকহিতের মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এতদিন যে সম্পদ কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক চাহিদা মেটাবার কাজে ব্যবহৃত হতো, তা স্কুল কলেজ নির্মাণের কাজেও ব্যয় হচ্ছে এবং ব্যয়িত অর্থ উন্নত মানসিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। একটা দিন আসবে যখন দেবমূর্তি দেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং নিষ্ক্রিয় দেবসেবা ট্রাস্টগুলি আইন-প্রণেতাদের কাছে এক প্রহেলিকার মতো মনে হবে।

Happy Puja Greetings from

Magra Brick Field & Co.

Vill. Denha Magra, P.O. Ghosh, Dist. Purba Bardhaman

Phone : (0342) 2250639

Sl. No. 53

ক্লান্তিহীন আমরা সব আলোর শিশুরা

সলিল আচার্য

সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। সময়টা ক্রমশ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েই চলেছে। সাধারণ মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। রুটি-রুজিতে টান পড়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চাপের সাথে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত হিন্দুত্বের আদর্শের পশ্চাৎপদতার আস্ফালন, যা বিস্ফোরক চেহারায় আবির্ভূত। মানুষ আক্রান্ত। মানুষ বিভ্রান্ত। শাসকের অবিচারে পেটে যখন আগুন জ্বলছে তখন মানষের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ধর্মের নামে নিধন-যজ্ঞের উপাচার। সব কিছুই লালিত হচ্ছে 'হিন্দু-হিন্দী-হিন্দুস্থান' এই মর্মবস্তুকে ভিত্তি করেই। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের 'হিন্দুয়ানি' আর.এস.এস-এর দ্বারা পরিচালিত 'হিন্দুত্বের-দর্শন' এক নয়। ওটা দাঙ্গা তৈরির দর্শন। ওটা সাম্রাজ্যবাদের পথকে নিজেদের পথ করে নেবার দর্শন। ওটা এমন এক দর্শন যার জন্ম হিটলার, মুসোলিনির দেশের মাটিতে। ধ্বংসের বীজ এসেছে সেখান থেকে। এই ধ্বংস হচ্ছে ভারতের ঐতিহ্যকে, এই ধ্বংস হচ্ছে ভারতের পরম্পরাকে। এখানে রামমোহনের ভারতবর্ষ নেই। এখানে বিদ্যাসাগর অচ্ছুৎ। এখানে রবীন্দ্রনাথ বসত করেন না। এখানে চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ, লালন ফকিররা অনুপস্থিত। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সরকার নিজস্ব ভাবনার হিন্দুত্বের বিস্তার ঘটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত জুড়ে মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়ে ভাবাদর্শের বৈতরণী পার হবার মারণক্রিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়ে চলেছে বিভিন্ন বিভঙ্গে। মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছেন। করোনা চিকিৎসক দরকার নেই—দরকার রাম মন্দিরের।

গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট আমাদের ঘিরে ধরেছে। কৃষকের জীবনে, শিল্পের শ্রমিকদের জীবনে, মধ্যবিত্তের জীবনে, গরিব মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ছায়াপাত ঘটে চলেছে সেই সংকটের। বাড়ছে তারও তীব্রতা। একদিকে নয়া-উদারনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাব, তার সাথে মিলেছে দেশ-চালকদের অর্থাৎ শাসক শ্রেণির প্রতিনিধিদের গতিবিধি। যা ওদের রাজনৈতিক ভিত্তি অর্থাৎ বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা। আর্থিক দিক থেকে এই সময়ে ব্যাপকভাবে উপকৃতের নাম বেশ কিছু দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থা। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিতে মন্থরতার বিকাশ, টাকার দাম কমে যাওয়া যা কিনা সর্বকালীন রেকর্ড ছুঁয়েছে। বেকারত্ব, ক্লোজার বৃদ্ধি, বাণিজ্য ঘাটতির ব্যাপকতা, অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি সবই অর্থনৈতিক সংকটের ফলেই ঘনীভূত চেহারা পেয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন যখন অনেক কম ছিল তখনো মূল্যবৃদ্ধি আজকের মতো বিপদসীমা লঙ্ঘনের দিকে ছুটতো না। আজ বিপদ অনেক বেশি গভীর। সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের মৃত্যু পরোয়ানা তৈরিতেই ব্যস্ত কেন্দ্রের মানুষমারা সরকার।

আজকের সময়ে, অতিমারির কঠিন সময়ে দেখা যাচ্ছে একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি কৃষি ও কৃষক-মারা আইন, সম্পূর্ণ অসহনীয় পদ্ধতিতে, তারপর দ্রুততার সাথে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর প্রদানে পূর্ণতা পেল। লঙ্ঘিত হল সমস্ত নিয়মকানুন—খানিকটা বেশ হিটলারি ভাবনার আলোকে। বিরোধীদের আনা সংশোধনী উপেক্ষিত।

আজকের সময়ে, অতিমারির কঠিন সময়ে দেখা যাচ্ছে একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি কৃষি ও কৃষক-মারা আইন, সম্পূর্ণ অসহনীয় পদ্ধতিতে, তারপর দ্রুততার সাথে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর প্রদানে পূর্ণতা পেল। লঙ্ঘিত হল সমস্ত নিয়মকানুন—খানিকটা বেশ হিটলারি ভাবনার আলোকে। বিরোধীদের আনা সংশোধনী উপেক্ষিত। ভোটাভুটি না করেই রাজ্যসভায় কৃষিপণ্য বাণিজ্য এবং কৃষি ফসলের দামের সুরক্ষার অজুহাতে ধ্বনিভোটে পাশ করানো হয় বিল। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ কালো দিন হয়েই কুখ্যাতি অর্জন করলো। প্রশ্ন উঠেছে দেশজোড়া লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে—এতো জবরদস্তি এবং তড়িঘড়ি করে কেন এমন 'মারণ বিল' পাশ করতে হল?—রিলায়েন্স, আদানি, আই.টি.সি. কার্গিল, মনস্যান্টো ইত্যাদি দেশি-বিদেশি কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থে! এই ইস্যুতে কোনো প্রকাশ্য সাংবাদিক বৈঠক করার সাহস দেখাতে পারেননি 'মন কি বাত' বলনেওয়ালারা। প্রতিবাদের প্রান্ত ছুঁয়ে জনমানস তেতে উঠছে, বোঝা যাচ্ছে। ৮৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে চিবিয়ে খাবে ওরা আর শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি, গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকবেন, তা অসম্ভব। ফলে সুতীব্র সংগ্রাম অনিবার্য।

আলোচ্য সময়ে বৃদ্ধি নয়, ক্ষয় বাড়ছে প্রবল বেগে অর্থনীতিতে। ক্ষয় ২৪ শতাংশ। করোনার ধাক্কায় নেমেছে, নামবে আরও, সেই আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট মহলে বিদ্যমান। মানুষ আক্রান্ত। কিন্তু দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউসগুলো অসীম উৎসাহে লুটপাটের মারফৎ বৃদ্ধি করে নিয়েছে সম্পদ এবং বৃদ্ধির জন্য (পরবর্তী সময়ে) প্রস্তুতিতে কোনো খাদ নেই। আম্বানি, আদানিদের সম্পদ বেড়েছে এই সময়ে রেকর্ড পরিমাণে। আমাদের জাতীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী দেশের অর্থনীতির ২৪ শতাংশ নেমে গেছে 'ঈশ্বরের মহিমায়'। আম্বানি

এখন এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি। তাতে বন্ধুবৎসল প্রধানমন্ত্রীর মহত্ব বর্ণনা করা যেতেই পারে, যার নিয়ন্ত্রক আর এস এস। সেই ব্যক্তিটি বিশ্বের ধনীতমদের মধ্যে চার নম্বর ব্যক্তি! কাদের কীভাবে বিকাশ লাভ ঘটছে?—আসুন না একটু উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হই।

কৃষকসমাজের জীবন, চাষবাস, ঘর-গেরস্থালি ইত্যাদি সবেতেই ব্যাপক পরিমাণে হতাশাব্যঞ্জক চালচিত্র। শ্রমিক শ্রেণিও ভয়ানক আক্রমণের শিকার। শ্রমিক-কৃষক-খেটেখাওয়া মানুষের কাছে সরকারের সাম্প্রতিক প্রকাশ্য হানাদারি নিঃসন্দেহে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা ভিন্ন কিছু নয়।

পরিবেশ পরিস্থিতি যেভাবে যেদিকে ছুটছে সেই সময়ে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষার লড়াই-এ দেশপ্রেমিক-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন- সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও না লড়তে পারলে শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্নে সংকট দূর হবে না। আমরা জানি, কৃষিপ্রধান কোনো দেশে কৃষি-অর্থনীতি সংকটের আবর্তে চলে গেলে, গোটা দেশের অর্থনীতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী হয়ে যায়। এ দেশে এখন তাই হচ্ছে। খাদ্য-সংকট বাড়বে। অভাব বাড়বে। ক্রয়ক্ষমতা কমছে। বেকারির যন্ত্রণায় যুবমন অস্থির। অস্থিরতা গোটা সমাজের বুকে দগদগে ঘা সৃষ্টি করছে। উন্নয়নশীল দেশে বিপদ অনেক বেশি ঘনীভূত। সমীক্ষা চলছে বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার উদ্যোগে, তার থেকে সামনে উঠে আসা পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রবণতার দিকগুলি। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের তথ্য জানাচ্ছে—অতিরিক্তভাবে ২.৬৫ মিলিয়ন বেশি মানুষের খাদ্যাভাবের সীমানায় প্রবেশের ফলে সংকটকে তীব্র করার প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে শ্রম ও পুঁজির যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, সেই পর্বও শ্রমদায়ী মানুষের উপর আর্থিক-মানসিক-সামাজিক চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। এটা বাড়বে আরও। তথ্য বলছে—অতিমারির অর্থ পৃথিবীর ৩৩০ কোটি শ্রমশক্তির প্রায় ৮১ শতাংশ অর্থাৎ ২৭০ কোটি খেটেখাওয়া মানুষের কাজ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। সংখ্যা আরও বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান। এরপর ব্যয় সংকোচের প্রাবল্যে সংকটের গভীরতা বাড়বে, তেমন বাস্তবতা এগিয়ে আসছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরতদের সংকট গগনস্পর্শী হতে বাধ্য। কাজ, ভাতা, সামাজিক সুরক্ষা সবেতেই, আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির ছোবল বিপদজনক হয়ে যে উঠেছে তা প্রতিদিন তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হচ্ছে। ঐক্যের বন্ধন নিয়ে জোরদার সংগ্রাম মহল্লায় মহল্লায় ছড়িয়ে দিতে দিতেই অতিমারি–উত্তর পৃথিবীতে আমাদের গতিবিধি, উপস্থিতি, অবস্থান চালিয়ে যেতে বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প হয় না। ঐক্যের বন্ধনই অন্যতম শর্ত আসন্ন লড়াই-এর।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন হাঁসফাঁস অবস্থা তখন সব কিছু থেকে ভুলিয়ে রাখতে ধর্মের মোহজাল এগিয়ে আসছে। ধর্মান্ধতার আঁধার একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষ মারছে। হত্যা করছে গোরক্ষার নামে, কোথাও ধর্ম রক্ষার নামে। ইহলোকে বাঁচার পথ বন্ধ, কাজেই মৃত্যুর পরের যে জীবন সেই পরলোকের শান্তির পথ প্রশস্ত করতে চায় কেন্দ্রের আর.এস.এস-এর মনুবাদী-ভাববাদী মোদী সরকার। ‘তৃণমূলী আর বিজেপি এক ও অভিন্ন’। পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে—‘ওরা একে অপরের পরিপূরক, অন্য কিছু নয়’। আবার আর.এস.এস-এর নিয়ন্ত্রক, পরিচালক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন ভারততীর্থের কথা, তখন সব বেমানান হয়ে যায় ধর্ম-উন্মাদদের করাল থাবায়। তৈরি হয় প্রতিবাদী মানুষের চলার পথে কাঁটা বিছানোর প্রবল খেলা। সম্প্রীতির আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দ্বারা সমাজকে কলুষিত করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রে সমস্ত সুস্থ ভাবনার মানুষকে খতম করে চলেছে গো-মাতার উপযুক্ত সন্তানেরা। সেখানে হিন্দু-অহিন্দু বলে কথা নেই। পরিকল্পিতভাবে এই ‘মারণক্রিয়া’ সংগঠিত হয়েই চলেছে রাজ্যে-রাজ্যে। কালবুর্গি, পানসারে, গৌরী লঙ্কেশ, ভেমুলারা প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতেই হবে ফ্যাসিস্টধর্মী আর.এস.এস-এর সংঘ পরিবারকে। কারণ ‘জন্ম দাগ’ হয়ে আছে হিটলার-মুসোলিনিরা। কাজেই ধ্বংসাত্মক পথই এদের পথ। ‘মনুবাদ’ হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। মুখে বড়ো বড়ো কথা যতই থাকুক না কেন, দুর্নীতিতেও হাত পাকিয়েছে এই সময়ে এঁরা। ক্রমশ হাওয়া গরম হচ্ছে। প্রকাশ পাচ্ছে সামরিক সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে বেনিয়ম। এই রাজ্যেও জন্মষ্টমী, হনুমান জয়ন্তী, বিজয়া দশমী ইত্যাদি পালনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার শেষ নেই। সংখ্যালঘু মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতির জন্য প্রয়াস না থাকলে কি হবে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তদের জন্য সরকারি পয়সা বন্টন চলছেই। আবার ক্লাবে কোটি কোটি টাকার স্রোতে ধর্মাবিষ্ট করার নাকি অন্য কিছু ভাবনাকে লালন করার কৌশল ঘোষিত হয়েছে, মানুষ তা পরখ করতে চাইছেন।

২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আর.এস.এস-এর ‘কমিউনিস্ট আতঙ্কবাদ’ প্রকাশ অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন তৃণমূল নেত্রী এবং দেশপ্রেমিক হিসাবে ওদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ভাষণে। দেশপ্রেমিক হিসাবে ওরাও শংসাপত্র দিয়ে তাঁকে ‘সাক্ষাৎ দুর্গা’ বলেন। আজ যা হচ্ছে তা সবই সাজানো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। চলছে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। কথা হচ্ছে—ধর্ম যার যার দেশ সবার।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এক লেখায় উদ্ধৃত করেন ৪নং ইস্তেহারটি। সেটিতে একটু নজর দেওয়া যেতে পারে—

বাটোয়া সে লেকে নরোদা তক্
বাপুনগর সে লেকে কালুপুর তক্
২৯ মার্চ কো এক নাদ হোগা
রামনাম লেকে হামলা করেঙ্গে
বাবরি কো জৈসে ধ্বংস কিয়া থা
বাস্তো কো (মুশলীমদের) হম মাত করেঙ্গে
দরিয়াপুর কো নাশ করেঙ্গে
চুনচুনকে তুমে হাম মারেঙ্গে
হিন্দুস্থানি কা ইয়ে বচন হ্যায়
রঘকুলরীত সদা চলি আই
প্রাণ যায়, পর বচন না যায়।।
—এক হিন্দুস্থানি

তাই আজকের সময়ে এসে দেশপ্রেমী সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এমন বিষধর হিন্দুস্থানিদের জন্য বড়ো আসন পেতে দেওয়া সাজে না। একেবারে আদর্শগতভাবেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জমিতে দাঁড়িয়ে বলে দিতে হবে—ওসব এখানে চলবে না। আমরা রবীন্দ্রপন্থী, আমরা ভারততীর্থ পন্থী, আমরা সম্প্রীতি-সংহতিপন্থী, কাজেই মানুষকে সতর্ক করে সাথে নিয়েই এগোবো সামনের দিকে। না, কখনোই অন্ধকারে পেছন দিকে পা বাড়াবো না। তাই আলোর সাথে মিলবো বলে সমুখ পানে ছুটবো। হিন্দুরাষ্ট্রের কোনো গল্প এখানে চলবে না। এটা ভারতবর্ষ। এখানে সংবিধান যার মান্যতা দেয় না, তাতে আমরা নেই। যারা ওসব করে অস্থিরতা তৈরি করতে

চায় তাদের যে-কোনো মুল্যে জনবিচ্ছিন্ন করাটাই এখনকার অন্যতম অগ্রাধিকার। শোষিত মানুষকে ওরা বিভাজিত করতে চায়—তা রুখতেই হবে। আর.এস.এস.-এর তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকার সাহেব বলেছিলেন—অহিন্দুদের হিন্দু ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে... তাদের অবশ্যই হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতে হবে, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা কিছুতেই (তারা) পোষণ করতে পারবে না এবং তারা হিন্দু জাতির কাছে সম্পূর্ণ অবনত হয়েই এ দেশে থাকতে পারে।... গোটা ফরমানটিকেই এ দেশের সংবিধান মান্যতা দেয় না। কাজেই ঐক্যের বন্ধন, সম্প্রীতির বন্ধন, সংহতির বন্ধনটাই আসল সত্য। ওসব তত্ত্বকথার কোনো মূল্য নেই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কাছে। তবে যেভাবে বিপদ বাড়ছে তাতে করে আমাদের করণীয় থেকেই যায় যা যুক্তিনিষ্ঠ, যা বস্তুনিষ্ঠও বটে। চলার পথটাই হোক আলোকের/ অনেক হয়েছে—লজ্জা ও কলঙ্ক আর নয়। এ লজ্জা ভারতীয় সভ্যতার লজ্জা। এ লজ্জা ভারতীয় সংস্কৃতির লজ্জা। লজ্জার শেষ নেই।

আমরা কি ভাববো না—যৌবনে বহু হিন্দুবাড়ির বিয়েতে নহবত বাজিয়েছেন বিখ্যাত সেই মানুষটি যাঁকে গোটা দুনিয়া জানেন, তিনি ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ। উস্তাদ আলি আকবর খাঁ-র, আমজাদ আলির সরোদ, তাঁর পুত্রদের বাদন থামিয়ে দিতে হবে তবলা শিল্পী জাকির হোসেনের শিল্পকর্ম, গাইবেন না উস্তাদ রসিদ খাঁ। বড়ে গোলাম আলি অচ্ছুৎ? উস্তাদ আল্লারাখা প্রমুখের জন্য গর্বের শেষ নেই আমাদের। ফৈয়াজ খাঁ-রা হিন্দু নন কাজেই বর্জনীয়—কীভাবে মানবেন? আজও যে-কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বা মন্দিরে-মন্দিরে প্রতিনিয়ত বাদন বন্ধ করে দিতে হবে? না, তেমন ভারতবর্ষ আমাদের দেশ নয়। ভারতবর্ষে এই সাংস্কৃতিক আবেশ কেনো দিনই কেউই যাতে ছুঁতে না পারে, তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ বা সুস্থ ভাবনার মানুষকে অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে হবে। এটা আজকের এবং কালকের জন্যও আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জই বটে।

এ সংগ্রামে মার্কসবাদী নন এমন মানুষেরাও আছেন এবং থাকবেন। এঁরা অনেকেই অগ্রদূত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবা ফুলে, আম্বেদকর—এমন অনেক পূর্বসূরী পথিকৃৎ আছেন যাঁদের চলার পথ আমাদের পথ দেখায় আজও। আছেন অসংখ্য সমাজকর্মী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষা জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কর্মী—তাঁদের অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। সামনে আরও কঠিন সময় আসছে, আসুন তৈরি হই, আর গেয়ে উঠি 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও...'। মানুষ বুঝতে পারছেন জীবনের অভিজ্ঞতায় যে ওঁরা যত বেশি দিন তখতে থাকবেন দেশের এবং দেশের মানুষের বিপদ তত বেশি হবে। কারণ উগ্র জাত্যভিমান ও ধর্মান্ধতা দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটাকেই বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। সামাজিক অস্থিরতায় বোঝা যায় তার রূপ। বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মান্ধতার এই কৌশল, মৌলবাদের এই কৌশল গ্রহণ করেছিল। ইয়োরোপের শিক্ষা আজও আমাদের প্রশিক্ষিত করুক।

একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়—১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আর.এস.এস ১৯৬৮ সালে গণভিত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' তৈরি করে। মনুবাদীরা শ্লোগান তোলে 'দুনিয়ার হিন্দু এক হও'। জন্মলগ্ন থেকেই ওরা তিনটি শত্রুকে চিহ্নিত করে কাজ করে চলেছে—(১) মুসলমান, (২) খ্রিস্টান (৩) কমিউনিস্ট পার্টি। এদের নেতা শিবরাম শঙ্কর আপ্তে ১৯৬৮ সালের ২ নভেম্বর 'অর্গানাইজার' পত্রিকায় 'কেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এ লেখেন, ''আমি যদি বলি ইহুদী ধর্মাবলম্বী ও আরব জাতিগুলিই প্রথম মানুষকে দু-ভাগে ভাগ করে দেয়। খ্রিস্টান ধর্মের ঘোষিত উদ্দেশ্যই হলো খ্রিস্টান রাষ্ট্র, মুসলিমরাও চায় মুসলিম রাজত্ব। এই দুটো গোঁড়া এবং পরিচিত ধর্ম ছাড়াও আরেকটা ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—তার নাম 'কমিউনিজম'।'' নিজেদের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন ওভাবে। তিন শত্রু চিনতে পেরেছেন। অতএব গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা সামাজিক ন্যায়ের জন্য আদর্শের টান, সংগ্রামই আজকের অগ্রাধিকার। আজকের অগ্রাধিকার নয়া-উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যে সংগ্রামে থাকতে হবে মতাদর্শ। সংগ্রামের জন্য শক্তিশালী বিকল্প তৈরি করতে হবে। চাই আরও মানুষ। অনেক মানুষ। কারণ আমরা জানি মানুষই আসল শক্তি। বিকল্পের জন্য চাই অবিরাম সংগ্রাম। কাজেই ঐক্যের শক্তির বিকাশে চাই সামগ্রিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ।

মননের জগতেও প্রতিনিয়ত চলছে হানাদারি। উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-সত্য, স্বাভাবিক, নব্য-স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক নানা শব্দবন্ধে সময়কে ধরার কাজ চলছে। ওরা ওদের কাজ করছে। আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে। তার মধ্যেও ঐক্যের বন্ধনকে, সম্প্রীতির আয়ুধকে শক্ত হাতে ধরে, মতাদর্শের আলোক-শিখায় চলার পথকে আলোকিত করে করেই আমরা বাস্তববাদীরা এগোতে চাই সামনের কঠিন পথ হেঁটে হেঁটে। তাই শুভ বোধের কেতন উড়িয়ে বলতে পারি, একমাত্র আমরাই—

এখন তোমার চোখে নীল ঘোড়া ছুটিয়ে
ক্লান্তিহীন আমরা সব আলোর শিশুরা
সর্বজয়ী সম্ভারের উজ্জ্বল আয়ুর প্রান্তে
জেগে আছি
হে পিতা
প্রমিথিউস। —জিয়াদ আলি

অতএব মানুষের ভেতরটায় আগুনের পরশমনি ছোঁয়াব বিপুল কর্মযজ্ঞে সবারই নিমন্ত্রণ। যাঁরা চান মানুষ হয়ে মানুষই হতে, তাঁরা এও জানেন আবর্তনের ছন্দে আবার কাটবে বিকার, জাগবে সুর। আমাদের প্রত্যয় ঘোষণা করে, 'জীবনের গানে তূর্য জয় করে যন্ত্রণা অপার'।

উৎস সংকেত

১. বেদ, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব—সম্পাদনা শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত
২. সাভারকার ও হিন্দুত্ব—এ জি নুরানী
৩. আর.এস.এস. ও বর্তমান ভারত—গৌতম রায়
৪. মুজফ্‌ফর আহমদ : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—সম্পাদনা মাজাহারুল ইসলাম
৫. রাম জন্মভূমি ববিরি মসজিদ বিতর্ক : অযোধ্যার রায়। সম্পাদনা—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. তিন প্রসঙ্গ—শ্যামল চক্রবর্তী
৭. গুজরাট দিচ্ছে ডাক— সম্পাদনা—অশোক দাশগুপ্ত
৮. নির্বাচিত রচনা সংকলন —অনিল বিশ্বাস
৯. গণশক্তি
১০. দেশহিতৈষী
১১. শ্রমিক আন্দোলন ও যুবশক্তি
১২. মার্কসবাদী পথ

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

ঘনশ্যামপুর বগপুর এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি. নং : ৩৫ কে.টি. :: তাং ১৯৬১
ঘনশ্যামপুর, বগপুর, পূর্ব বর্ধমান, দূরভাষ : (০৩৪২) ২৭১১০৯৮

আমাদের পরিষেবা সমূহ

(১) কম্পিউটারাইজ্ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমানত লেনদেন, (২) স্বল্প সুদে কৃষিঋণ প্রদান, (৩) স্বল্প সুদে মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান, (৪) ন্যূনতম করে জলসেচ প্রদান, (৫) উন্নত মানের ধান ও আলুবীজ সরবরাহ, (৬) সকল প্রকার রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিক্রয়, (৭) স্বল্প সুদে এস.এইচ.জি. গঠন ও মহিলাদের উন্নয়ন, (৮) 'ভারত' গ্যাসের সুবিধা কেন্দ্র, (৯) মাইক্রো ATM-এর মাধ্যমে টাকার লেনদেন, (১০). দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র, (১১) স্বল্প ভাড়ায় কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ (Customer Hiring Centre)।

সম্পাদক	সভাপতি	ম্যানেজার-ইন-চার্জ
অম্রিত পাল	**নিমাই ঘোষ**	**প্রবীরকুমার মণ্ডল**

Sl. No. 31

জয়তু সমবায়

মণ্ডলগ্রাম এস.কে.ইউ.এস. লি.

মণ্ডলগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

আমাদের পরিষেবা সমূহ

KCC ঋণদাদন, DMA Project-এর মাধ্যমে BCCB Ltd. টাকা জমা ও তোলা মাধ্যমে ঋণ দান।

ধন্যবাদান্তে—
সমর চৌধুরী

Sl. No. 78

With best compliments from

Anupam Chatterjee

Bankura

Sl. No. 4

With best compliments from

A Well Wisher

Sl. No. 30

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের পর্যালোচনা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস আমাদের শিকড়। মানবসভ্যতার ইতিহাসের একনিষ্ঠ অনুসরণ করতে পারলে সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং মানবসমাজও প্রকৃত অর্থে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে।

ইতিহাসকে অস্বীকার করার অর্থ গাছের শিকড় উৎপাটন করা। মানুষের আদিম পূর্বপুরুষ গাছে বাস করতো। দু'পেয়ে জীবে রূপান্তরিত হয়ে তারা চাষ-আবাদ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে শুরু করলো। পাথর, লোহা, আগুন, চাকা প্রভৃতি উপকরণ তাদের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। মুদ্রার ব্যবহার কৃষিপণ্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালো। মানবিক সম্পর্ককে ভেঙে গুঁড়িয়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা হয়ে দাঁড়ালো ক্ষমতার অন্যতম স্তম্ভ এবং পুঁজির প্রাথমিক রূপ। তার হাত ধরে এল রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র। ক্রীতদাস, কৃষিশ্রমিক চরম শোষণের শিকার হয়ে পড়ল। এই চূড়ান্ত অমানবিক দমন-পীড়ন একদিকে যেমন কৃষি-উদ্বৃত্ত হিসাবে মুদ্রাকে কল-কারখানায় বিনিয়োগের কাজে লাগিয়ে, খনিজ সম্পদ আহরণের কাজে লাগিয়ে আরো মুদ্রা কুক্ষিগত করতে লাগলো, তেমন শ্রমজীবী মানুষকে বিভাজিত করলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে। যেমন কৃষিশ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, খনি-শ্রমিক। অপরদিকে বিভাজন অসাম্য সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে ততোধিক তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আরম্ভ করলো।

শাসকশ্রেণি সেই সমাজ বিস্তার করতে চাইল, দেশে দেশে, যেখানে পুঁজির পর্বত-প্রমাণ ইমারত তৈরি হয়। সমাজের নিয়ন্ত্রণ আরো বেশি পুঁজি-নির্ভর হতে লাগলো। পুঁজি সমাজ-বিকাশের নামে শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করতে থাকলো।

অপরদিকে সব মানুষ সমান, নিজ পরিশ্রমের বিনিময়-মূল্য সে নিজেই নির্ধারণ করবে, তার বেঁচে থাকার অধিকার তার নিজের হাতে থাকবে প্রভৃতি স্বনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে মাথাচাড়া দিলো সাম্যবাদ।

সুতরাং পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ পরস্পর-বিরোধী এবং দ্বন্দ্বমূলক অবস্থিতি হিসেবে যে চিহ্নিত হল তা ঐতিহাসিক।

কে বেশি ভালো রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে, কে মানুষের সপক্ষে থাকবে এই প্রশ্নেই শুরু পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই।

পুঁজিবাদী দর্শন পুঁজিকে কেন্দ্রীভূত করে, মানুষে মানুষে বিভেদ ক্রমশ তীব্রভাবে গড়ে তোলে। একদল মানুষ পুঁজির ক্ষমতায় শাসক হয়ে ওঠে, অপরদিকে ক্রমশ পুঁজিহীন শোষিত মানুষ প্রান্তিক হতে হতে প্রাণহীন প্রান্তরে যাত্রা করে।

সাম্যবাদী দর্শন মনে করে এই পৃথিবীর যাবতীয় উপকরণ যা মানুষ জীবনধারণের জন্য আহরণ করে, সেইসব উপকরণের উপর সব মানুষের সমান অধিকার। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে শ্রেণিহীন সমাজে রূপান্তরিত করাই হয়ে দাঁড়ায় সাম্যবাদের মূল লক্ষ্য।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ''দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল সেটাকে পরিবর্তন করা।'' লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) মাত্র ৫৪ বছরের জীবনে মার্কসীয় 'প্র্যাক্সিস' ধারণার ভিত্তিতে এক আপাদমস্তক বিপ্লবীর আদর্শ উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে (নতুন ক্যালেণ্ডার) স্বৈরাচারী শোষক জারের লৌহশৃঙ্খল চুর্ণ-বিচূর্ণ করে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে কৃষিশ্রমিক, খনি-শ্রমিক, কল-কারখানার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যে বিজয়-মিছিল রচনা করল তা (এমনকি জারের সেনানীরাও সেই আন্দোলনের কুণ্ঠাহীন অংশগ্রহণের মাধ্যমে) জারকে চূড়ান্ত দুর্বল করে, জারতন্ত্র ধ্বংস করে সাম্যবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলো।

ভৌগোলিক রাশিয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত প্রদেশের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হল।

পুঁজিবাদ এই প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হলো। সাম্যবাদ-সমাজবাদ এই প্রথম পুঁজিবাদকে নস্যাৎ করে উন্নত বিকল্পের সন্ধান পৌঁছে দিলো বিশ্বের অগণিত দেশের বুভুক্ষু মানুষের কাছে। সাম্যবাদের আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে, শোষিত মানুষ 'জীয়ন-কাঠি' হাতে পেয়ে দেশে দেশে মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭)-পরবর্তী বিশ্বে পুঁজিবাদের একচেটিয়া আধিপত্যে বিপুল আঘাত হানলো। দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করলো। আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার আন্দোলনগুলি শক্তিশালী হতে শুরু করলো। সাম্রাজ্যবাদ (পুঁজিবাদকে পরিপুষ্ট করাই যার একমাত্র ভূমিকা) কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করলো।

রাশিয়ার উদাহরণ সামনে রেখে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধলো দেশে দেশে। ফরাসি পার্লামেন্টে বিরোধী শক্তি

বামদিকে বসতো। সেইথেকে শাসক-বিরোধী পক্ষকে ‘বামপন্থী’ অভিধায় চিহ্নিত করা হতে লাগলো।

পুঁজিবাদীরা এমনকি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফলগুলিকেও মুষ্টিমেয় বিত্তশালীদের ভোগ্যবস্তু হিসাবে কুক্ষিগত করাকেই প্রাধান্য দিতো। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল বন্টন করে তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করার পথে কখনোই হাঁটেনি শাসকেরা।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে মরিয়া হয়ে চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারক ও বাহক একমাত্র শক্তি হিসাবে প্রকটিত হওয়াকে প্রাধান্য দিলো। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলিকে প্রচণ্ডভাবে অবদমিত করেই চললো। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ভিয়েতনাম দখল করার লক্ষ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সূচনা করল। বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র রূপকার সত্যজিৎ রায়ের ১৯৭০ সালের নির্মিত ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবিটির প্রথম দিকের সেই বিখ্যাত ‘ইন্টারভিউ’ দৃশ্যটির কথা সবিনয়ে স্মরণ করতে চাই। সিদ্ধার্থ (ধৃতিমান) অগণিত যুবক কর্মপ্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে একাই কোম্পানির তিন-তিনজন ক্ষমতাধর প্রতিনিধির কর্তাব্যক্তির মুখোমুখি। প্রশ্ন এলো ঃ ‘‘গত দশকের (অর্থাৎ ৬০-এর দশকের) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি?’’ সিদ্ধার্থ জবাব দিলেন, ’ ‘‘ভিয়েতনামের যুদ্ধ।’’ আবার প্রশ্ন এল ঠাণ্ডা গলায়—‘‘মানুষের চাঁদে পা রাখার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা?’’ সিদ্ধার্থ আন্তরিক আবেগের সাথে সুগঠিত যুক্তি সাজিয়ে বলেন, ‘‘চন্দ্রাবতরণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রত্যাশিত একটি ঘটনা, আজ না হোক কাল সেটা হতোই। কিন্তু ভিয়েতনামের গুরুত্ব অন্য মাত্রার। কারণ একটি ছোট্ট গরিব দেশের মানুষ কী ভাবে মহাশক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে, কী অসীম সাহস আর প্রত্যয় নিয়ে লড়তে পারে এমন অসম লড়াই।’’ —‘‘তুমি কি কমিউনিস্ট?’’ সিদ্ধার্থ হেসে জবাব দেন— ‘‘ভিয়েতনামের মূল্য বোঝার জন্য কমিউনিস্ট হওয়ার দরকার হয় না।’’

যুগে যুগে সংবেদনশীল, যুক্তিবাদী মানুষদের ‘কমিউনিস্ট’ ছাপ মেরে দেওয়া—পুঁজিবাদের প্রতিনিধিদের এ এক পুরানো কৌশল। কমিউনিস্ট মানে ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত, সুতরাং তাদের ‘কোয়ার‍্যান্টাইন’ করতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে হবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হল ১৯৯১ সালে। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের প্রায় ৭৪ বছর পরে সংগঠন, তত্ত্ব ও নীতির বিভিন্ন প্রায়োগিক ভুলে। পুঁজিবাদ মানুষকে খেপানোর কাজ নিরন্তরভাবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে করেই গেছে, এ-ও এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

সোভিয়িত রাশিয়া সাম্যবাদের সূতিকাগৃহ হিসাবে যতদিন অধিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পুঁজিবাদের অগ্রগতির মুখে লাগাম টানা ছিলো। সমগ্র বিশ্ব ‘ঠাণ্ডাযুদ্ধের কাল’ প্রত্যক্ষ করেছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনের ফলে ‘ভারসাম্য’ নষ্ট হয়ে গেল, এটা আক্ষেপের বিষয় এবং ঐতিহাসিক সত্য।

বিংশ শতক সমাজবাদের, মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের, শ্রেণি-শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের অবসানের, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার শপথের কাল। এই শতকেই পুঁজিবাদ ক্রমশ অপসৃয়মান হয়েছে।

‘‘পুঁজিবাদ আপনসৃষ্ট দ্বন্দ্বে, দেশে দেশে নিজেদের স্বার্থের সংঘাতে ক্রমশই জড়িয়ে পড়বে। সমগ্র পুঁজিবাদীরা কখনোই একত্রিত হতে পারবে না। নিজেদের ভ্রান্ত নীতির ফলে ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর সংকটের জলে নিমজ্জিত হবে।’’ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় এই পূর্বাভাষ ছিলোই।

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র—যে নামেই ডাকো না কেন, তা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রের উন্নততর বিকল্পের স্থান কোনোদিনই নিতে পারেনি, এটা তো প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য।

পাঠক স্মরণ করতে পারেন, যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ‘নিও লিবারাল’ তথা ‘নয়া উদারনৈতিক ধনতন্ত্র’ প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি ‘দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ’ নামে একটি বাক্যবন্ধর ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই চলেছিলেন। সংক্ষেপে ‘টিনা’ (TINA)। তিনি ইতিহাস-বিস্মৃত হয়েছিলেন ইচ্ছে করেই।

‘‘বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।’’ ২০০ বছরের শাসনে ইংরেজ ভারতের সম্পদ লুন্ঠন করেছিল, অবর্ণনীয় অত্যাচারের মাধ্যমে কৃষি-শ্রমিককে ‘নীলচাষে’ বাধ্য করেছিল, ‘কোহিনূর’ লুন্ঠন করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল। ফকল্যাণ্ড, হংকং প্রভৃতি শতশত উপনিবেশ রচনা করে, লুণ্ঠিত সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তারা ধনতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হতে চেয়েছিল। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে যে সত্য প্রকাশিত হয়, তা হল প্রতিটি উপনিবেশে তারা পরাস্ত এবং অপসারিত।

১৯২০ সালে কিছু প্রগতিশীল মানুষ একত্রিত হয়ে মানুষের ঐক্য রচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ প্রতিষ্ঠা করেন। নীতি-আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরা সমাজ বদলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে কমিউনিজম বা সমাজবাদ চর্চার ১০০ বছর পূর্তির সময় এই ২০২০ সালে আমরা কী দেখছি?

জাতপাতের লড়াই, ভূস্বামীদের অত্যাচারী শাসন, রাষ্ট্রের মিলিটারি-পুলিশের দমন-পীড়নমূলক আচরণ এবং ক্রমাগত কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী অপপ্রচার ভারতের অনেক রাজ্যেই সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৭ সালে কেরলে কমিউনিস্ট সরকারকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল—এই ঘটনাও ঐতিহাসিক।

সোভিয়েত রাশিয়া মহাকাশ গবেষণার কাজে ভ্রান্তভাবে আমেরিকার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং যে সমস্ত প্রায়োগিক ভুলের খেসারতে সোভিয়েতের পতন, এটি তার অন্যতম। এটাও ঐতিহাসিক।

সোভিয়েত পতনের সাথে সাথে ধনতান্ত্রিক শিবিরে উদ্বাহু নৃত্য শুরু হয়ে যাবে এটাই স্বভাবিক। ধনতন্ত্রের সমর্থক, বিরোধী আছে। সমাজতন্ত্রের সমর্থক, বিরোধী আছে। সুতরাং এই দ্বান্দ্বিক বিপরীত মেরুর অবস্থান ঐতিহাসিক।

পূর্বাভাষে ধনতন্ত্রের সংকটের ক্রমশ ঘনায়মান ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, তা আজ ভারতবর্ষে চূড়ান্ত বাস্তব। অর্থনীতির (কোভিড-পূর্ব এবং পরবর্তী) চোরাবালিতে শাসক নিমজ্জিত, ভুল রূপায়ণে।

স্বভাবিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ায়, মানুষ প্রত্যাঘাত করবেই। নিউটনের তৃতীয় সূত্র বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এতদিন প্রযোজ্য ছিল। এবার তা প্রযুক্ত হবে সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায়—‘‘শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও।’’

উনিশ শতক : স্ত্রী-শিক্ষায় নারীকণ্ঠ

কল্যাণী ভট্টাচার্য

আজকের যুগে মেয়েরা শিক্ষাজগতের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। সমস্ত পেশায়, সমস্ত কাজেই, তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অতি সম্প্রতি সামরিক বাহিনীতেও তাদের স্থান স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের এই সর্বত্র উপস্থিতি তো একদিনে অথবা কোনো একক মানুষের চেষ্টায় হয়নি। বহু নর-নারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই এটা সম্ভব হয়েছে। অতীতের পৃথিবী থেকে আমরা জানতে চাইছি আমাদের পূর্বসূরিদের কথা; আমাদের শিক্ষার আলো পাওয়া, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে যাওয়া যাদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে, তাদের কথা। কিন্তু এই জানা খুব একটা সহজ নয়। তাঁরা অনেকেই হারিয়ে গেছেন, তবু যাঁদের লেখা পাওয়া যায়, সেই সব লেখার মধ্যেই রয়েছে তাদের সময়, স্বদেশ ও সমাজ। সে যুগের মেয়েরা স্ত্রী-শিক্ষাকে কী চোখে দেখতেন, কেমন করে তাঁরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলেছেন, তাঁদের মনের ভাবনাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন—সে সম্পর্কে আগ্রহ থেকেই এই লেখার সৃষ্টি।

মনে পড়ে, বিদ্যাসাগরের সেই বিখ্যাত উক্তিটি : ''হা অবলাগণ তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।'' অথবা রামমোহনের কথা, বিয়ের সময় পুরুষেরা স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে স্বীকার করে, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশুর চেয়েও অধম ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। বাস্তবিক পক্ষে সেই সময়ে মেয়েদের অবস্থা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। সেকালে মেয়েদের বিয়ে হতো বালিকা বয়সে। পিতৃগৃহে পুতুল খেলতে খেলতেই পতিগৃহে যাত্রা। বিয়ে কী বুঝবার আগেই বিয়ে হয়ে যাওয়া। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখছেন, তাঁর শ্বাশুড়ি অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের পত্নী সারদাদেবী বিয়ের সময় ছিলেন ছয় বছরের মেয়ে, আর জ্ঞানদানন্দিনীর বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী থেকেও জানতে পারি—''সকল লোকেই বলিত যে সকলেরই বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছুই জানিতাম না।'' তারপর যখন তাঁর সত্যিই বিয়ে হয়ে গেল তখনকার মনের অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ''যখন দুর্গোৎসব বা শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায় সেই সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা, মা, মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক এই প্রকার হইয়াছিল।'' আবার বৃদ্ধ বয়সে অতীতের সেদিনের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন, ''এখনও কখনো মনে পড়ে সেই দিন/ পিঞ্জরেতে পাখি বন্দী, জলে বন্দী মীন।'' বিয়ের পরে তো সংসারের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দেওয়া। তাছাড়া লোকবিশ্বাস ছিল মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়। লেখাপড়া জানা মেয়েদের সন্তান হয় না, তাদের চরিত্র হয় কলুষিত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, ''সে সময়েও দেশের মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি আমার মা কি লিখছেন, না পড়ছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেগুলো সব ঢেকে ফেললেন পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি।'' অথবা ''আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-নিকেশ চিঠিপত্র—তবু কিরকম করে টের পেয়ে পাড়ার লোকে তাঁর নিন্দা করত।''

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকলেও মধ্যযুগে স্ত্রী-শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছিল। বৈষ্ণব পরিবারে এবং অভিজাত পরিবারে, মুষ্টিমেয় মেয়েদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা কিছুটা প্রচলিত থাকলেও দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই ছিল অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইংরাজেরা এদেশে আসার পর ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ সমাজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন এই অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করে মেয়েদের শিক্ষিত করতে না পারলে সমাজের উন্নতি নেই। এই ভাবনার থেকেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সতীদাহ রোধ, বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ হওয়া। ইংরেজি-শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই আর অর্ধাঙ্গিনীকে জড়পুতুলের মতো দেখতে চাইলেন না। তাঁরা নিজেরাই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিজেদের পত্নীকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন।

নারীশিক্ষা নিয়ে সমাজে তিন শ্রেণির মানুষ ভেবেছেন। একদল বুদ্ধিজীবী, যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মতো মানুষ, যাঁরা মেয়েদের অন্ধ কারাগার থেকে বের করে আনতে চাইলেন। আর একদল মানুষ, যেমন রাধাকান্ত দেবের মতো মানুষেরা, যাঁরা সমস্ত রকম সংস্কার দূর করতে না চাইলেও, স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন; আর একদল মানুষ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা করতেন।

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর মেয়েদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরজা খুলে গেল। সাধারণভাবে এই যখন মেয়েদের অবস্থা তখন তাদের কাছ থেকে ভাবনামূলক রচনা আশা করা যায় না। তবু কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের প্রথম যুগে শিক্ষালাভ করে মুষ্টিমেয় মহিলারা মেয়েদের জীবনের অন্তহীন দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন, বুঝেছিলেন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। মনে রাখতে হবে এই সব মহিলারা অধিকাংশই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জন্মেছেন, কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ড শতাব্দী জুড়েই বিস্তৃত রয়েছে।

উনিশ শতকের পাঁচ-এর দশক থেকেই মেয়েদের লেখা বেরোতে শুরু করলো। এইসব মহিলাদের লেখার মধ্যে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে—কৃষ্ণকামিনী দাসী, কৈলাসবাসিনী দেবী, বামাসুন্দরী, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী এবং আরও অনেক মহিলা তাঁদের মতামতকে ব্যক্ত

করেছেন।

কৃষ্ণকামিনীর জন্ম হয়েছিল সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হুগলি জেলায়, স্বামীর নাম শশীভূষণ। শশীভূষণ ছিলেন শিক্ষিত। তিনিও কয়েকখানা বই লিখেছিলেন। কৃষ্ণকামিনী তাঁর বই লেখার ব্যাপারে তাঁর স্বামীর সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন : ‘‘এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা-হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।’’

কৃষ্ণকামিনী ছিলেন নারী-শিক্ষা সচেতন। তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘‘...আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোকমাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে। তাহা হইলেই এদেশের গৌরবের আর পরিসীমা থাকিবেক না।’’ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই কৃষ্ণকামিনী নিজের পরিবার থেকে শিক্ষা পেয়েছেন।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ‘চিত্তবিলাসিনী’ নামে গদ্যে-পদ্যে লেখা তাঁর একটি বই বেরিয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশিত হয়েছে দুটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। যার সার কথা হল—

বিদ্যাহীন হলে নাহি বুদ্ধি থাকে ঘটে।
ধর্মাধর্ম বিবেচনা কিছু নাহি ঘটে।।
বিদ্যাবতী গুণবতী নারী যদি হয়।
অনিষ্ট সাধনে তার মন নাহি লয়।।
অতএব স্ত্রীগণেরে বিদ্যা শিখাইলে।
সন্দেহ নাহিক তায় শুভ ফল ফলে।।

যে যুগের লোকবিশ্বাস ছিল মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়, সেই সময়ে একজন মহিলার এই সাহসী উক্তি নিঃসংশয়ে বিস্ময়কর। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের চরিত্রহানি হয়, এই বিশ্বাসও কৃষ্ণকামিনী মেনে চলেননি। তাঁকে আমরা বলতে শুনি :

বিনা দোষে দোষ দেওয়া অতি অনুচিত
অনিষ্টের সৃষ্টি কর্তা, পুরুষ নিশ্চিত।

পুরুষশাসিত সমাজের মধ্যে বাস করে, সেই সমাজের আচরণবিধি মেনে নিয়েও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা বলে পুরুষের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করতে পেরেছেন। সেকালে নারীশিক্ষা নিয়ে ভাবনার মূলে ছিল, শিক্ষিত নারী সংসারকে ভালো রাখবে। সন্তান পালনেও শিক্ষিত নারীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সংসারের জন্য নয়, নিজের বাঁচার জন্যও যে বিদ্যাশিক্ষা প্রয়োজন, তিনি সেদিকেও নজর দিয়েছিলেন। বালবিধবার যদি আর বিয়ে না হয়, লেখাপড়া করলেও তার মনের জ্বালা অনেকটা জুড়োবে। কুলীনকন্যা, বালবিধবা সকলের সম্পর্কেই তাঁর একই কথা—‘‘ভাল হয় যদি কিছু শিখ লেখাপড়া।’’ সে যুগে মেয়েদের লেখাপড়া সংসারকে সুখী করবার জন্য। কৃষ্ণকুমারী দেখালেন, শুধু সংসারের জন্য নয়, নিজের বাঁচার জন্যও লেখাপড়া শেখা প্রয়োজন।

কৃষ্ণকামিনী স্ত্রীশিক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু কী প্রণালীতে তাদের শিক্ষিত করা হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। আর একটি বিষয়েও তিনি গতানুগতিক। কোনো অবস্থাতেই তিনি নারীর সতীত্বের অমর্যাদাকে সমর্থন করেননি। এখানেই তিনি প্রথাগত—‘‘পতি যদি মন্দ হয়—কিবা ক্ষতি তায় / আপনার ধর্ম তুমি রাখোনা বজায়।’’ এখানেই কৃষ্ণকামিনীর চিন্তার সীমাবদ্ধতা।

স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে বাঙালি সমাজ যখন উত্তাল, সে সময়ে যে সমস্ত মহিলারা লেখালেখি করেছিলেন বামাসুন্দরী দেবী তাঁদের একজন। তিনি জন্মেছিলেন পাবনা জেলায়। বামাসুন্দরী দেবী নিজেই বলেছেন, তিনি স্বজনের কাছে লেখাপড়া করেছেন। এই স্বজন নিশ্চয়ই তাঁর স্বামী হরিশচন্দ্র শর্মা। সমকালীন নারীসমস্যা নিয়ে বামাসুন্দরীও কৃষ্ণকামিনীর মতো ভেবেছেন। তিনি বিধবা বিয়ের পক্ষে ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য নিজের অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন স্কুল-শিক্ষিকা। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝেছিলেন। তখনকার দিনে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা টাকা উপার্জন করছেন, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছেন—এ এক বিরল ব্যতিক্রম। ১৮৬১ সালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বই ‘‘কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে’’। ১৮৬১ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়। বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম প্রবন্ধের বই। বেগম রোকেয়ার অনেক আগে বামাসুন্দরীর ভাবনার মধ্যে রোকেয়ার ভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বামাসুন্দরীর ব্যক্তিসত্তা দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি সত্তা বিশ্বাস করে মেয়েদের মুক্তির জন্য পুরুষের কাছে আবেদন করা বৃথা—‘‘তুমি কি জাননা যাহার নিকট বিলাপ করিতেছ, তিনি এই হতভাগা দেশের পুরুষ জাতি।’’ তিনি আরও বলেছিলেন, ‘‘পুরুষেরা মেয়েদের দুঃখে সত্যিকারের দুঃখিত নয়। তাহারা দুঃখিত হইবেন কেন? তাহাদের চাকরানীর কাজ, রসুয়ের কাজ অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা আমাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা কেন করিবেন?’’ যে বামাসুন্দরী বলেন, ‘‘বিদ্যাহীন সম অসাড়’’ সেই বামাসুন্দরীকেই বলতে শুনি, ‘‘স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা করাইলে দেশের বিবিধ উপকার হইতে পারে।’’ যেমন, তারা ভালভাবে ঘরের কাজ করতে পারবে, সন্তান মানুষ করতে পারবে, পরিজনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারবে।

তিনি পাতিব্রত্যের গুণগান করেছেন। তিনি বলেছিলেন, স্বামী ভাল হোক, মন্দ হোক, স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুরক্ত থাকতে হবে। এদেশের মেয়েদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, ‘‘তোমরা স্ব স্ব গৃহকার্যাবকাশে বিদ্যানুশীলন কর, তবেই স্বামীসেবার যে পরম সুখ তাহা অবশ্য জানিবে।’’

যে যুগে মেয়েদের মধ্যে একটা সার্বজনীন নিরক্ষরতা চলছে, সে যুগেও এক-একজন ব্যতিক্রমীর দেখা মেলে, তাঁদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কৈলাসবাসিনী তাদেরই একজন। কৈলাসবাসিনীর জীবনের তথ্য খুব একটা পাওয়া যায় না। ১৮৩৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। বারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্বামীর নাম দুর্গাচরণ গুপ্ত। দুর্গাচরণ স্ত্রীকে শুধু লেখাপড়াই শেখাননি, ধর্মের নামে যে কুসংস্কার চলছে, সে সম্পর্কেও অবহিত করালেন। কৈলাসবাসিনীর লেখা প্রথম বইয়ের নাম ‘হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা’। বইয়ের নাম দেখেই বোঝা যায়, তাঁর আলোচ্য বিষয়ের কথা। কৈলাসবাসিনী দেখেছেন, ছেলে জন্মালে শঙ্খধ্বনি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করা হয়। মেয়ে জন্মালে মা-বাপ দুঃখসাগরে ডুবে যান। কৈলাসবাসিনীর প্রশ্ন ‘‘হায়! কতদিনে এই ঘৃণিত দেশাচার একেবারে দূরীভূত হইবে।’’ প্রথম বইটি প্রকাশিত হবার দুবছর পরে তিনি আর একটি বই লিখলেন, বইটির নাম হল ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’। হিন্দু মেয়েদের দুরবস্থার প্রধান কারণ যে শিক্ষার অভাব তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। নানা বিষয়ে তিনি এই বইয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দু মেয়েদের কেন শিক্ষা দেওয়া হয় না, স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে সমাজে পুরুষ ও মেয়েদের মনোভাব কেমন, কেন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, স্ত্রীশিক্ষার ফলে কী লাভ হবে—এসব কিছু সম্পর্কেই তিনি আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতকে স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত বইগুলির মধ্যে কৈলাসবাসিনীর বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে

বাদ-প্রতিবাদের মেয়ে হয়েও স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে বই লেখা এক সাহসী পদক্ষেপ। স্ত্রী-শিক্ষাকে তিনি কী চোখে দেখতেন এই বইটি পড়লে তা বোঝা যায়। হিন্দু সমাজে কেন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয় না, অশিক্ষার কুফল কী, স্ত্রী -শিক্ষা সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর মত, শিক্ষার সুফল, কেন স্ত্রী-শিক্ষা দেওয়া হবে—তাঁর এই বইটিতে তিনি এসব আলোচনা করেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তিনি মেয়েদের শিক্ষার কথা বললেও স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি লিখছেন : ''এ কাল পর্যন্ত কোন দেশীয় কামিনীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, তবে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কি প্রকারে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে?'' তিনি বিশ্বাস করতেন, ''নারীগণের স্বাধীনতা ঈশ্বরাভিপ্রেত।'' প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তাঁর বিরূপতা ছিল। বিশেষত পুরুষ শিক্ষকের কাছে কখনোই বালিকাগণকে পাঠার্থে প্রেরণ করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি।

এইখানেই কৈলাসবাসিনীর প্রথার প্রতি আনুগত্য, ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণ। এসব সত্ত্বেও তিনি মেয়েদের সামাজিক হীনাবস্থা বুঝেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মেয়ে-পুরুষের সামাজিক সম্মান যেন এক হয়। মেয়েরা খালি পরিচারিকার মতো সাংসারিক কাজ করবে তা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। মেয়েরা শিক্ষিত হোক, সম্মানিত হোক, তাই তিনি চেয়েছিলেন।

সে যুগের আরও একজন লেখিকার কথা মনে পড়ে। তিনি হলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী। তাঁর জন্ম ১৮৩৪ সালে, যে যুগে মুসলমানদের মধ্যেও বাংলাভাষার চর্চা ছিল না বললেই চলে। সেই যুগে জন্মে ফয়জুন্নেসা শুধু লেখাপড়াই শেখেননি, বাংলা ভাষার চর্চাও করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''আমি বাল্যাবস্থায় বয়স্যাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্না থাকিয়াও যথাসময়ে শিক্ষক সন্নিধানে অধ্যয়নাদি সম্পন্ন করিতাম।'' তাঁর শিক্ষকের নাম তাজউদ্দীন মিঞা। ফয়জুন্নিসা এই গুরুকে বন্দনা করেছেন :

গুরুর চরণদ্বয় বন্দি অতঃপরে
যাঁহার প্রসাদে দীপ জ্বলয়ে অন্তরে
অন্ধকারে দীপ্তিময় করে যেই জন
সে পদ সেবিতে মন সুস্থ সর্বক্ষণ।

ফয়জুন্নিসা স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে কোনো লেখালেখি না করলেও স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করে। তিনি যখন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন কলকাতার বুকেও মুসলমান মেয়েদের জন্যে কোনো স্কুল ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন জীবনের পথ চলতে শিক্ষা মেয়েদের কতখানি সাহায্য করে।

যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা ছাড়াও অনেকে আছেন, যাঁরা মেয়েদের জীবন-যন্ত্রণার কথা ভেবেছেন, সেখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন। প্রবন্ধের ছোট্ট পরিসরের মধ্যে তাঁদের অনেকের কথাই অনুক্ত রইল। ধীরে ধীরে সমাজজীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। রাসসুন্দরী দেবীকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, কামিনী সেন—তাঁদের সময় শিক্ষালাভ অনেক সহজ হয়েছে। যদিও তাঁদেরও উচ্চশিক্ষা লাভের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এইসব মেয়েরা স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও শিক্ষাদানের বিষয় সম্পর্কে কিছু বলেননি। বেগম রোকেয়ার কথা তো এখানে বাদই দিলাম, উনিশ শতকে জন্মালেও তাঁর কর্মকাণ্ড বিংশ শতাব্দীতেও বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধের শেষে এসে আরও একজনের কথা বলবো—তিনি হলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। যশোর জেলার অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় এবং নিস্তারিণী দেবীর কন্যা জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরবাড়িতে বধূ হয়ে আসেন মাত্র সাত বছর বয়সে। চিন্তায়, চেতনায়, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল জ্ঞানদানন্দিনীর কাছেই আমরা প্রথম শুনলাম, ''এখন কি একবার দেখা উচিৎ নহে, যে কি প্রকার শিক্ষা দিলে সর্বতোভাবে হিতকারী হইতে পারে।'' তিনি দেখেছেন যে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য জমি প্রস্তুত হয়েছে, এখন দরকার সেই জমিতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুত করা। তিনি বলছেন, ''গৃহের পারিপাট্য, পরিচ্ছদাদির অবস্থা, সাধ্যানুসারে গৃহস্থিত সকলের সুখবর্ধন, পীড়িতদিগের সেবা, আহারীয় দ্রব্য নির্ণয় প্রস্তুত এবং সন্তান-পালন এই তিনটি কাজে আমাদের আধুনিক সামাজিক অবস্থায় উত্তমরূপে শিক্ষা ভিন্ন কোনো মতেই সুখসম্পন্ন হইতে পারে না। একারণেই মেয়েদের এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করা উচিত। বিশেষতঃ পীড়িতদের সেবা এবং আহার্য প্রস্তুত এবং সন্তান-পালন এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। কোন ছেলের পক্ষে কী বিদ্যা উপযোগী তাহা মাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রতি মাতা সুশিক্ষিতা হইলেই দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইবে।'' তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে এইসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করা মেয়েদের প্রাথমিক কর্তব্য। এইগুলি শেখার পরে নিজেদের আনন্দের জন্য অন্য কিছু শিখতে পারবেন। জ্ঞানদানন্দিনীর মতো আধুনিকতার প্রবর্তক একজন মহিলার এই ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণকে মেনে নিতে কষ্ট হয়।

উনিশ শতকে নারী-শিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগে শিক্ষালাভ করে মুষ্টিমেয় মহিলারা তাঁদের মনোভাবকে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে তাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব এইসব রচনায় ধরা পড়েছে। নারী-শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করলেও নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা নীরব। কিন্তু কেন? আসলে এইসব মেয়েরা সংসার ও সমাজ জীবনে যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন, সেই পিতৃতান্ত্রিক ভাবনার বাইরে তাঁরা বেরোতে পারেননি। বেরনো সম্ভবও ছিল না। পাশ্চাত্যের মেরী ওলস্টোন ক্রাফটের মতো ভাবনা তাঁরা পাবেন কোথায়? ছোট থেকে তাঁরা শিখে এসেছেন, ''সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে''। সংসারকে সুখী করবার জন্য, উত্তর-পুরুষকে তৈরি করবার জন্য মেয়েদের শিক্ষা। তবু তো এরই মধ্যে, বিধবার জীবনযন্ত্রণাকে তাঁরা অনুভব করেছেন। কুলীনকন্যার সারা জীবনের একাকীত্বের যন্ত্রণাকে ভুলে থাকায় শিক্ষা সাহায্য করে বলেছেন। বইয়ের জগতের মধ্যে ডুবে গিয়ে এইসব দুঃখী মেয়েরা জাগতিক জীবন-যন্ত্রণাকে ভুলতে পারেন; সারাজীবনের একাকীত্ব হোক, জাগতিক দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।

উনিশ শতকের প্রথম প্রত্যুষে যখন শিক্ষার আলো মেয়েদের কাছে এসে সবে পৌঁছেছে, তখন হয়তো এই সব মেয়েদের লেখার মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে; তবুও তাঁদের ভাবনার স্বচ্ছতা আমাদের বিস্মিত করে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) সম্পাদনা, স্বপন বসু; উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ ১৪২১

২) গোলাম মুরশিদ, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমি ঢাকা, নভেম্বর ২০০০

৩) প্রথম আলোর চরণধ্বনি, চিত্ররেখা গুপ্ত, উর্বী প্রকাশন, ২০০৯

৪) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বাংলা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

With best compliments from

TIRUPATI
REFRIGERATION PVT. LTD.

Kalera, Jamalpur, Purba Bardhaman

Sl. No. 56

With best compliments from

M/s. Bengal
Construction & Co.

T.C. ROAD (CHAUL PATTY)
P.O. TARAKESWAR, DIST. HOOGHLY
PIN : 712410

Sl. No. 57

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

চণ্ডীমাতা হিমঘর

গ্রাম ও পোঃ আঝাপুর, থানা : জামালপুর,
জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০১

এখানে খুবই যত্ন সহকারে আলু সংরক্ষণ করা হয়।
চাষিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

Sl. No. 58

With best compliments from

M/s. Sayed Md Toky

Potato Commission Agent &
General Order Supplier
Vendor & Grawer of Chip
Grade Potato of Pepsico

BLBULITALA, KHALISHPUR, BURDWAN

Sl. No. 33

গ্রন্থন

তপোময় ঘোষ

প্রস্তাবটা শুনে বুকুন বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, তবে কতগুলো শর্ত আছে। দাদু বললেন, কীরকম? নাতি বলল, তোমাকে আমি দৈনিক এক ঘন্টা সময় দেবো। অবশ্য যতদিন লকডাউন আছে ততদিন। দ্বিতীয় শর্ত হলো, নিয়মিত এক ঘন্টা। সে সকাল বিকাল সন্ধ্যা যখন তোমার সুবিধা। কিন্তু তারপরে আর জ্বালাতন করা চলবে না। আগেও না, পরেও না। প্রভাসবাবু বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। এবার নাতনি টুকুনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কীভাবে হেল্প করবি? ফোনের স্ক্রিন থেকে নজর না সরিয়েই সে বলল, আমি তো তোমাকে সাহায্য করার জন্য বাড়ি আসিনি। তবে বুড়ো মানুষ বলছো, কবে মরে যাবে তখন আফশোস হবে, তাই রাজি হতে বাধ্য হচ্ছি। সেটা হলো কাল থেকে আগামী সাত দিন। এর মধ্যে যদি সাহায্য করতে পারি।

—রাতদিন সাতদিন নাকি! বুকুনের বিস্ময়।

—না, রাতদিন সাতদিন নয়। পরের সপ্তাহে যে আমার অন্য অ্যাসাইনমেন্ট আছে, সেটা তুই ভাল করেই জানিস।

প্রভাসবাবু বললেন, ঠিক আছে আমি তাতেই রাজি। কাজটা শুরু হোক। বড় ভালো কাজ হবে রে খোকা-খুকি! ভবিষ্যতে এর মূল্য পাবি। আমি তো আর থাকবো না। তোরাই এর ডিভিডেন্ড তুলবি ।

ব্যাপারটা হল বাহাত্তরের বুড়ো প্রভাসরঞ্জন পালের শখ হয়েছে, 'করোনা মহামারি' নিয়ে একখানা গ্রন্থ রচনার। কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা তার নিজের একশোভাগ আর অবশিষ্ট নেই। কারণ হাজারটা রোগে তিনি কাবু। তার প্রথমটা হলো চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া। বাত, ডায়াবেটিস ইত্যাদি না হয় ছেড়ে দেওয়া হল।

কিন্তু তিনি বরাবর পড়াশোনা করা মানুষ। পড়েন, লেখেনও। কিন্তু এখন আর নিজে পারেন না। সুহিত নামে একটি ছেলে এসে ওনাকে পড়ে শোনায় ও লেখার থাকলে লিখে দেয়। কিন্তু করোনা ভীতির লকডাউন-এর জন্য ছেলেটি আসতে পারছে না। সুতরাং প্রভাসবাবু এখন প্রায় অসহায়। যদিও তাঁর বাড়ি এখন গমগম করছে। নাতি-নাতনি পুত্র-পুত্রবধূ সবাই এখন বাড়িতে। বলতে গেলে, প্রভাসবাবুর পক্ষে এটা বেশ সুসময়। আবার দুঃসময়ও বটে! কারণ করোনাভাইরাস নিজেও তো এক মহামারীর স্রষ্টা। প্রতিদিন পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষকে সংক্রমিত করে মেরে ফেলছে। শুধু তার কেন, সারা পৃথিবীর চরম চরমতম দুঃসময় এখন।

আর সুসময় অন্য অর্থে যে, এই করোনাকাল তাঁর কাছে লিখবার একটি বিষয়ও বটে। এত বড় এক মহামারী, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তাক লাগিয়ে দিয়ে দেশে দেশে দেশে মড়ক শুরু করেছে। গত একশো বছরে এমন বিপদ তো পৃথিবীতে আসেনি। লেখা দরকার। এই কালবেলা প্রভাসবাবুকে লেখার একটি ভালো বিষয় উপহার দিয়েছে শুধু নয়, তার প্রবাসী নাতি-নাতনিদেরকেও পাশে এনে

দিয়েছে। এ বিষয়ে তারা সাহায্য করতে রাজিও তো হয়ে গেল।

এ সবই তো তাঁর পক্ষে সুসময়। তিনি জীবিতকালে এক ইতিহাসের সাক্ষী থেকে যাচ্ছেন। ভাবলেই শিহরণ!

এই সময় টুকুন আর এক সুসংবাদ দিল যে, তার আর এক নাতনি, মানে মেয়ের মেয়ে নূপুর ফোনে জানিয়েছে যে, দাদুর পরিকল্পনাটা খুবই ভালো। সে তাই স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে রাজি। যে সংবাদ তথ্য-পরিসংখ্যান তাদের কাছে দাদু চাইছে তা সে যতটা পারে জুগিয়ে দেবে। তবে অবশ্যই শুধুমাত্র সেলিব্রিটিদের। এক প্রিন্ট মিডিয়া হাউসের সাপ্তাহিক বিনোদন পাতায় সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে, সে এ কাজটা এ সময়ে করতে পারবে। টুকুন উচ্ছ্বসিত হয়ে দাদুকে জানালো, এই দেখো দাদু, তোমার তোমার আর এক নাতনি! এইতো নূপুর! অযাচিতভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো! সত্যি দাদু, একেই বলে মহৎ কাজে নামলে সঙ্গীসাথী-র অভাব হয় না!

—বটে বাপু, কথাটা সত্যি!

বুকুন বলল, দাদু অফারটা লুফে নাও। মনে করো না সেলিব্রিটি মানে শুধু টলিপাড়ার অভিনেতা অভিনেত্রী আর ময়দানের খেলোয়াড়। সেলিব্রিটি মানে, তোমাদের লেখক-শিল্পীরাও। তাদের তথ্যও তোমার বইকে সমৃদ্ধ করবে।

—ভারাক্রান্তও করতে পারে। ফুট কাটলেন স্বয়ং প্রভাসবাবু। বইটা যখন মোটা হবে ভারিও হবে। একেই তো সবাই ভারাক্রান্ত বলে। তা হোক না, এখন তো বইয়ের পৃষ্ঠার উল্লেখ করে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

—বেশ রে ! আগে শুরু করি । তোরা একটু তেড়ে-ফুঁড়ে পড়তে শুরু কর। অনলাইনে দৈনিক কাগজগুলো পড়, ইনফরমেশনগুলো আমাকে দে। আর টিভি চ্যানেলগুলো দেখ। আমাকে জানাতে থাক।

পরের দিন থেকে প্রভাসবাবুর নাতি-নাতনিরা যথারীতি কাজ শুরু করে দিলো। টিভি দেখছিলই। তার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। এ-চ্যানেল ও-চ্যানেল করতে করতে যেখানে যত তথ্য পাওয়া যেতে থাকলো, তার ক্লিপিং জোগাড়, ইউটিউব থেকে তা ডাউনলোড করা— সব শুরু হলো।

ওদিকে টেলিফোনে সুহিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সে জানাল, তার আসা এই মুহূর্তে অসম্ভব। তবে যদি প্রভাসবাবু থানার পারমিশন জোগাড় করতে পারেন তো, সে বাইসাইকেলে যাতায়াত করতে পারবে। প্রভাসবাবুর আগের দিন বজায় থাকলে, থানার পারমিশন কেন, খোদ ডি.এম-এর পারমিশনও নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এখন যে পারবেন না, তা সুহিতকে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং শহিদের চ্যাপ্টার ক্লোজড। অন্য পথ খুঁজতে হবে।

বুকুন বলল, দৈনিক কত মৃত্যু ঘটেছে কত আক্রান্ত হচ্ছে, সে হিসাবটা তো লাগবে না কি! করোনাগ্রাফ তো একটা হবে। টুকুন বলল—আরে, সেসব তথ্য তো সরকারি আর্কাইভে থেকেই যাবে। তার জন্য দাদুর দামি বইয়ের পৃষ্ঠা নষ্ট করতে হবে কেন? দাদু অন্য কিছু লিখবে। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞের মতামত আর কি! বুঝলি?

—বুঝলাম। কিন্তু ওই সব তথ্য না ঘাটলে উনি বিশ্লেষণটা করবেন কীভাবে শুনি ?

দাদু নাতি-নাতনীদের ইত্যাকার আলোচনার মধ্যেই ওদের ডাইনিং টেবিলে ফুলকো লুচি আর কুমড়োর ছোঁকা এনে দিলেন প্রভাসবাবুর বৌমা। বাবা, ছেলে-মেয়েদের পাশে এসে বসলেন অমলও। এখন এ বাড়িতে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সবই একসঙ্গে এই ডাইনিং টেবিলেই হচ্ছে। এ এক আলাদা এনজয়মেন্ট ! অনেকদিন পর এ সুযোগ পেয়ে সুলতাও নানান আয়োজনে তৃপ্ত করছেন সবার রসনা। হলোই বা লকডাউন! ঠিক জুটিয়ে নিচ্ছেন রান্নাবান্নার উপকরণ।

ছেড়া লুচির অভ্যন্তরে কুমড়ো আর আলুর ঘাট পুরতে পুরতে অমল বললেন—বাবার পরিকল্পনাটা নিঃসন্দেহে ভালো, কিন্তু দুঃখ একটাই।

—সবাই উৎকর্ণ হলে সে বললো, বাবা পারবে না, তোরা কিছুই করতে পারবি না। কেউ না চিনুক আমি তো দু জনকেই চিনি! কোনো সিরিয়াস কাজ আজও পর্যন্ত করেছিস তোরা? বাবার যেমন কাজ নেই, তোদের ভরসায় কাজে নামছেন!

—দেখো বাবা, ওইভাবে ছোট করো না । আগে দেখ কী করি । নাতি-নাতনিরা তাদের বাবাকে সমঝে দিলেন।

প্রভাসবাবুর পাতে আরো এক খানা লুচি দিতে দিতে বৌমা বললেন, বাবা আমাকে কিন্তু কোনো দায়িত্ব দিলেন না। অথচ সারাবছর আমি আপনার পড়াশোনা বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা করি। কিরকম? ভূগোলের প্রশ্ন এই যে, সুহিত এখানে আসে, তোর দাদুকে জিজ্ঞেস কর, তার আদর আপ্যায়ন কীভাবে করি! সেটা বুঝি পরোক্ষে দাদুর পড়াশোনার ব্যবস্থা করা নয় ?

—এই দেখেছো, সুহিতের খোঁজখবর তো বেশ কদিন নেওয়া হয়নি !

—শুধু সুহিত কেন, মনিদি, ভোলাদা, রমেনকাকু, কারও খবর কেউ রেখেছেন আপনারা?

এবার টুকুন বলল, তা বটে! মণিমাসি আমাদের জন্য কত কিছুই করতো সারাদিন। বেচারা এখন কী করছে, কী খাচ্ছে, কিছুই জানলাম না! আমরা কিন্তু হেব্বি স্বার্থপর। ভোলাকাকু আর রমেনদাই বা কি কম করেন আমাদের জন্য? কিছু খারাপ হয়ে গেলে টুক করে নিঃশব্দে সারিয়ে দিয়ে যান। আমাদের পারিবারিক মেকানিক রমেন রায়। বেচারা গরিব, কোথায় কী করছে কে জানে!

—আমি জানি, সুলতা বললেন। —আমি অন্তত দিনে একবার মণিদির সঙ্গে আর সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন ভোলাদা আর রমেন কাকুকে ফোন করি। বুঝলেন মশাইরা?

—কেমন আছে গো ওরা সব? টুকুনের ব্যাকুল প্রশ্ন।

—আমি ওদের ফোন নাম্বার দিচ্ছি, তোরাই ফোন করে জেনে নে। দেখ তারা শত দুঃখের মধ্যেও কত খুশি হয় !

বুকুন বলল, ঠিক বলেছ। কই দাও তো, মা, দু'চার জন মেহনতি মানুষের সঙ্গে কথা বলি। প্রথমেই মণিমাসি ।

ও সত্যিই প্রথমেই কত খুশি হলো। তারপর এই তিন সপ্তাহের লকডাউনের কর্মহীনতা। তার দুর্দশা। কোথায় ? সত্যি! ওদের দুই ভাই-বোনের মন খারাপ হয়ে গেল। ভোলাদার মতো রিক্সাওয়ালা, রোজগার আজ একুশ দিন বন্ধ। সত্যিই কী করছে গো ওরা? ভাবলে তো আর মন ভালো থাকে না প্রভাসবাবুর।

করোনা মহামারির ওপর বই লেখার কাজ চলছে। প্রচুর তথ্য জোগাড় হচ্ছে চারদিক থেকে। এদিন টিফিনের সময় বৌমার হাউস ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে বলা কথাগুলো তাকে নতুন একটা ভাবনা এনে দিয়েছে। শুধু বাইরের পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা নয়, একেবারে নিজের গৃহপরিবেশের শ্রমিকদের দুর্দশার সন্ধান রাখতে হবে বৈকি। মণিদিকে আজ কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দু'কেজি চাল, পাঁচশো গ্রাম ডাল, দু'কেজি আলু, পাঁচশো পেঁয়াজ, নুন আর দুশো গ্রাম তেলের বোতল দিয়েছে।

সুলতা বলল, যাক বেচারির দুদিন চলবে। ভোলাদাও নিশ্চয়ই পাবে। মুশকিলে পড়বে সুহিতরা। বেচারা যে কী করছে!

সুহিতের কথা উঠতেই প্রভাসবাবু নিজেই উতলা হয়ে উঠলেন। দুদিন আগে তাঁর কাছে একটা ফোন এসেছিল যে!

সুহিতের ফোনের কথা মনে পড়তেই প্রভাসবাবু বেশ উদ্বিগ্ন হলেন। ছেলেটার খোঁজ নেওয়া দরকার। যতই হোক তার সাহায্যেই এতদিন তার পড়াশোনা বজায় থেকেছে।

তিনি উতলা হতেই নাতি-নাতনিরাও যেন আগ্রহী হয়ে উঠলো। তেড়ে-ফুঁড়ে চলতে লাগল সুহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে পাওয়া গেল সুহিতের কণ্ঠস্বর। খুশি হলেন প্রভাসবাবু। ফোনের সেটটা নিয়ে কথা বললেন—সুহিত, কেমন আছো? কোথায় আছো?

ও প্রান্ত থেকে উত্তর এলো, ওই আছি জেঠু। কোনো রকমে বেঁচে আছি ।

—কী করছো?

—একটা কমিউনিটি কিচেনের কাজে যুক্ত আছি।

—তাহলে ওখানেই—

—হ্যাঁ জেঠু খাওয়াটা পাই।

— তা বেশ। স্বস্তি পেলাম। থাকো ওখানেই থাকো।

—আর কদিন চলবে জেঠু! চেয়ে চিন্তে এনে এরা চালাচ্ছে। আমি শুধু একটু সাহায্য করি। বেশিদিন চলবে না।

—যে কদিন চলে চালাও। করো করো ভালো কাজ গো, করো।

—ভাবছিলাম, একদিন আপনার কাছে যাবো।

—এসো।

—দৈনিক ২৫০ থেকে ৩০০ লোকের লাঞ্চ প্যাকেট তৈরি হয় । খুব গরিব, কাজ-হারা মানুষরা বিনামূল্যে এসে নিয়ে যায়। যদি দুদিনের খরচটা দেন।

ফোনটা লাউড করেছিল, তাই বাড়ির সবাই সুহিতের কথা শুনতে আগ্রহী ছিল।

এবার তাদের সবার মুখ চাওয়া-চাওয়িয়র পালা। প্রভাসবাবু করুণ দৃষ্টিতে সবার পানে চাইলেন। যেন এক সম্মান বাঁচানোর আর্তি। না, কারো কোন ভাবান্তর ঘটল না। শুধু সুলতা বললেন, দেন আমাকে। সপাটে ফোনটা নিয়ে জোরে জোরে বললেন—কবে আসছো বলো। দুদিনের না পারলেও একদিনের খরচ আমি দেব। একটু আগে জানিয়ে এসো।

ফোনটা কেটে প্রভাসবাবুর বৌমা আবার বললেন, কটমট করে আমার দিকে তাকানোর কিছু নেই। আমার বাবার দেওয়া গয়নাগুলো এখনো আছে। দরকারে বেচে দেবো। তোদের সংসারের টাকা লাগবে না। তোরা করোনার উপর বই লিখে রাখ। আমি ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখি। বেঁচে থাকলে এসে পড়বে।

With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021

CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 40

With best wishes from

M/S. S.K. TRADING CONCERN

C/o. SHYAMAL CHATTERJEE

All Kinds of Pipe, Filter, Tubewell Materials,
Spare Parts and General Order Supplier

37, R.B. Chatterjee Road, Lakurdi, Purba Bardhaman
Contacts : 8972191834, 9832295629

Sl. No. 25

With best compliments of

RENUKA FURNITURE & SAW MILL

Prop. **ANIL KUMAR DALUI**
Amtala, Golapbag, More, Saraitikar Road, Burdwan-713104
Office : 0342-2657605, Anil Dalui : 9434133134, Abhijit : 9932494929, Subhajit : 9732297222
website : www.renukaa.in

Sl. No. 66

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

হিন্দুস্থান মার্বেল

এম. এস. চৌধুরী

রাজস্থানের উন্নত মানের মার্বেলস্, টাইলস্, গ্রানাইটস্ পাইকারি ও খুচরো সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
কেশবগঞ্জ চটি, জি.টি. রোড, (মসজিদতলা), বর্ধমান। যোগাযোগ : ৯৩৩৩৪১০৮৬, ৯০০২৪৪৭৮৭

Sl. No. 65

ভাঙনকাল

কাকলি ঘোষ

সুশোভন বারান্দায় বসে এক কাপ চা নিয়ে সকালের খবরের কাগজটা খোলে। চায়ে চুমুক দিতেই মুখটা বিস্বাদ হয়ে ওঠে। অনিতা চায়ে চিনি দেয়নি। সুশোভন বারান্দা থেকে চেঁচায়—অনিতা, চায়ে চিনি দাওনি তো। অনিতা চিনির কৌটো নিয়ে ছুটে আসে। চেঁচে চুঁচে এক চামচ চিনিও পায় না। অসহায় গলায় বলে—চিনি শেষ হয়ে গেছে গো।

—এর মধ্যে পাঁচ কেজি চিনি শেষ। দিনে তো দু'কাপের বেশি চা দাওনা। এত চিনি যায় কোথায়?

—আমি খাই। বলে, দুপদাপ পা ফেলে অনিতা রান্নাঘরে চলে যায়।

দু'বছর হল অবসর নিয়েছে সুশোভন। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করত। যা বেতন পেত তাতে সংসারটা মোটামুটি চলে যেত। তবে পুত্র অজস্র ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হবার পর প্রতিমাসে অনেকগুলো টাকা লাগত। মাইনের প্রায় অর্ধেক টাকা চলে যেত। বাকি সামাল দিত টিউশনির টাকা। অনিতাও প্রচুর কষ্ট করেছে। এখনও করছে। অবসর নেবার পর ভেবেছিল অবসর-জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটবে। তা আর হল কোথায়? কত টাকাই বা পেনশন পায়? নুন আনতে পান্তা ফুরানোর গল্প করতে করতে সংসারটা চালাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে একমাত্র ছেলে অজস্রকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছে। বড়ো স্বপ্ন ছিল ছেলেটা চাকরি পেলে সংসারটার হাল ফিরবে। কিন্তু আজ এক বছর হল ছেলেটা পাশ করে বসে আছে। কোথাও চাকরি পায়নি। দিন দিন কেমন বারমুখো হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। বাড়ির কোনো কাজে হাত লাগায় না। অসুস্থ শরীরে সুশোভনকেই বাজার হাট করতে হয়। ছেলেটা কেবল খাওয়া আর শোয়ার সময় বাড়িতে আসে। সংসারের হাল দিন দিন খারাপ হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে তাতে পেনশনের ওই কটা টাকায় সংসার চালানো দায়। ভাবছে আবার বাড়িতে টিউশন করবে। কিন্তু হাঁপানিটা একদম কাবু করে দিয়েছে। কাগজটা ভাঁজ করে ভাবে এক কাপ চা খেলে হতো। তারপরই মনে পড়ে যায় চিনি নেই। সুশোভন ভাবে দিনদিন সংসারের যা হাল হচ্ছে, অজস্রর সঙ্গে কথা বলা দরকার। এরকম গা এলিয়ে ঘুরে বেড়ানো আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ক'টা বাজে— পৌনে ন'টা। ঘুম থেকে উঠেছে কি? আজকেই কথা বলবে বলে মনে মনে ঠিক করে সুশোভন। অনিতাকে ডাকে। রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় অনিতা।

—এদিকে এসো, কথা আছে।

হাতের কাজ ফেলে অনিতা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আসে।

—কী বলছো?

—শোনো, পিকলু উঠলে ওকে বোলো আমার ঘরে একবার আসতে। কথা আছে।

—ঠিক আছে।

—আর হ্যাঁ, আর এক কাপ চিনি ছাড়া চা-ই না হয় খাওয়াও।

মৃদু হেসে অনিতা বলে—দিচ্ছি।

দ্বিতীয় খেপের চা শেষ করতে না করতেই অজস্র আসে—বাবা, আমাকে ডেকেছো?

হ্যাঁ, বোসো। তোমার সাথে কথা আছে। দেখ পিকলু, সংসারের যা হাল তোমাকে কিছু একটা করতে হবে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিলাম। একবছর হলো বসে আছো। একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলে না।

—চাকরির চেষ্টা কি আমি করিনি ভেবেছো? সরকারি কোনো নিয়োগ নেই।

বেসরকারি সংস্থাতেও চেষ্টা করেছি। কিন্তু অন্য রাজ্যে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে খাবই বা কী, আর সংসারেই বা দেব কী? টিউশন তো করছি। এবার এগারো ক্লাসের দুটো ছেলে পড়াচ্ছি। হাজার চারেক টাকা ঘরে আসবে।

—তুমি তো সংসারে হাজার দু'এক টাকার বেশি দাও না। ওতে কী হয়? তবুও আমার পেনশনের কটা টাকা আছে তাই বাঁচোয়া। তাও আবার অর্ধেক আমার ওষুধ কিনতে চলে যায়। তোমার মায়ের অসম্ভব কৃতিত্ব যে তিনি এইভাবে সংসারটাকে টেনে যাচ্ছেন।

—আমি যা দিই, তার থেকে বেশি দিতে পারব না। আমার অনেক খরচ আছে।

—দেখ, তোমাকে অনেক আশা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছি। তুমি সে আশা পূরণ করতে পারনি।

—বাবা, দোষটা আমার নয়। দেশে শিল্প কোথায় যে চাকরি হবে? তুমি বরং কিছু টাকা দাও আমি কম্পিউটার সেন্টার খুলি।

—কী হবে কম্পিউটার সেন্টার খুলে? ব্যাঙের ছাতার মতো সব কম্পিউটার সেন্টার খুলছে। ক'জন ছাত্র-ছাত্রী পাবে?

—তবুও তো চেষ্টা করতে হবে।

—তোমার চেষ্টার পিছনে আমার শেষ সম্বল তো আমি হারাতে দিতে পারি না। দেখো অন্য চেষ্টা করো।

একরাশ ক্ষোভ নিয়ে অজস্র চলে আসে। চাকরি চাকরি। এই একবছর ধরে কম চেষ্টা করেছে চাকরির! চাকরি হলে তো সেও বেঁচে যায়। মৌ কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে তার জন্য। ওর বাড়িতেও বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। বেচারি কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। কতদিন পারবে তা জানে না অজস্র। একদিন হয়তো অন্য কারো সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলে যাবে। তার জীবনটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো হয়ে গেছে। কোনো দিকেই কোনো ঢেউ নেই। কোনো আলোড়ন নেই। কোনো আশা নেই। এভাবে কতদিন চলবে? মা চা-টাও তো এখনও দিল না।

—মা, চা দেবে না কি?

অনিতা রান্নাঘরে চিনির শিশি হাতড়ে বেড়ায়। —একটা ছোট শিশিতে একটু চিনি রেখেছিলাম গেল কোথায়? ওর বাবা তো চিনি ছাড়া চা তবু খেয়ে নেবে। কিন্তু পিকলু তো চিনি ছাড়া চা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যাক্‌, এই যে পেয়েছি। বাঁচা গেল।

—যাচ্ছি। চা নিয়ে অনিতা ছেলের ঘরে আসে, দেখে পিকলু জামাকাপড় পরছে।

—চাল জলখাবার না খেয়ে কোথায় যাচ্ছিস? অনিতা বলে।

—আমি বেরোচ্ছি। তোমাকে আর চা জলখাবার দিতে হবে না।

—এই তো চা-টা খা। আমি তরকারিটা হলেই জলখাবারটা দিয়ে দিচ্ছি।

—রোজ রোজ তোমার ওই রুটি-তরকারি আমার আর ভালো লাগে না। চায়ের কাপ নিয়ে এক নিঃশ্বাসে চা-টা শেষ করে পিকলু কাপটা নামিয়ে বেরিয়ে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিতা। ভাবে, কাকে সামলাবো? সংসারটা দিন দিন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। উনি যে-কটা টাকা পেনশন পান, দু'জনের সারা মাসের ওষুধ কিনে যা বাঁচে তাতে করে কোনোরকমে ঠেলে-গুঁজে সংসার চালানো। এভাবে কতদিন চলবে? পিকলুটাও কিছু পেল না। টিউশন করে হাজার দুই টাকা দেয় সংসারে। আজকাল তাতে কী হয়? বেশি কিছু বলতে পারে না। জোয়ান ছেলে। ওরও তো কিছু খরচ খরচা আছে। এই যাঃ, তরকারিটা বোধ হয় ধরে গেল। অনিতা রান্নাঘরে ছোটে। সাড়ে নটা বেজে গেল। বাসনটা কেবল মাজা হয়েছে। এখনও ঘর মোছা, কাপড় কাচা বাকি। তারপর রান্না আছে। আর পারে না অনিতা। তারও তো বয়স হচ্ছে। কতদিকে সামলাবে সে? মাঝে মাঝে বড়ো ক্লান্ত লাগে অনিতার। বিয়ে হয়ে এসে অবধি যৌথ সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে জীবন গেল। তারপর আলাদা বাড়িটা করে উঠে এসে তবুও একটু সচ্ছলতার মুখ দেখল। তারপর ছেলে আস্তে আস্তে বড় হলো। ছেলেকে কষ্ট করে পড়াল। কাজের লোক রাখেনি কোনোদিন। সব কাজ নিজে করত। যদি কিছু সাশ্রয় হয় সংসারের। কিন্তু তার কষ্টের বোধহয় শেষ নেই। এক বছর হল ছেলেটা পাশ করে বসে আছে। মৌ-ই বা কতদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। এম.এ. পাশ করে যাবার পর ওর বাড়িতেও তো বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে। মৌ বি.এড-ও করল। কিন্তু এস.এস.সি-র পরীক্ষা আর হচ্ছে কোথায়? সব জায়গায় নিয়োগ বন্ধ। পাশ করা ছেলে-মেয়েগুলো চাকরি পাচ্ছে না, আর সরকারি দপ্তরে বুড়ো-হাবড়া লোকগুলোকে অবসরের পর চুক্তি নিয়োগ করে মোটা টাকা দিয়ে পুষছে। কাগজ খুললেই দেশ জুড়ে এক হতাশার বাতাবরণ চোখে পড়ে। আগে কাগজ পড়া, বই পড়ার কত নেশা ছিল অনিতার। এখন আর কিছুই ভালো লাগে না। কোনোরকমে দিনগুলো কেবল পার করা।

দুই.

পিকলু কোনোদিন ভাবতেই পারেনি মৌ চলে যাবে তার জীবন থেকে। মৌ-এর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, সামনের মাসে ওর বিয়ে। বর আমেরিকায় থাকে। সাইন্টিস্ট। মৌ চলে যাবে এক নিশ্চিত জীবনের ছত্রছায়ায়, এপারে পড়ে থাকবে পিকলু একা। হতাশায় ক্ষত-বিক্ষত একজন মানুষ, একে কি ভালোবাসা বলে? মৌ একবারও ভাবলো না তার কথা। নিজের সুনিশ্চিত জীবনের কথাই শুধু ভাবলো। তার জীবনের কথা মনেও পড়ল না মৌ-এর। সেও এবার নিজের মতো করে বাঁচবে। যা ইচ্ছে হবে তাই করবে। সে আর কারোর কথা ভাববে না। জীবনটাকে সে তার ইচ্ছামতো কাটাবে। তার আর কোনো বন্ধন নেই। সে মুক্ত। বাইরে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা রাত ঘন হয়ে আসছে, বাবা মা বোধ হয় ঘুমিয়ে গেছেন। নিঝুম বাড়িটা ওর ভেতরের যন্ত্রণাটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। খাটের তলা থেকে মদের বোতলটা বার করে পিকলু। ঢক-ঢক করে ঢেলে নেয় গলায়। ভেতরটা জ্বলে যায়, জ্বলনটা ভুলতে চাওয়ার যন্ত্রণাটা থেকে বেশি কিনা বুঝতে পারে না পিকলু। মেঝের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে পিকলু।

অনিতা তিন চার বার ডেকে গেছে। একটা ঘোরের মধ্যে ছিল পিকলু। কোনো রকমে চোখ খুলে দেখে—দশটা। এত ঘুমিয়েছে সে। ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু মাথাটা এতো ভারি লাগে, ও উঠতে পারে না। অনিতা এসে দরজা থেকে তাড়া দেন—পিকলু ওঠ। শরীর খারাপ নাকি?

পিকলুর সাড়া দিতে ইচ্ছে করে না। কোনোরকমে বলে—উঠছি।

পিকলু উঠে বাথরুমে চলে যায়। সকালের চা নিয়ে জানালার ধারে এসে বসে। জানালার সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছটা লালে লাল। ফুলে ফুলে ভরা গাছটা দেখে ও ভাবে যদি তার জীবনটাও ওই গাছটার মতো ফুলন্ত হতো। চা শেষ করে গায়ে জামাটা চড়িয়ে ও বেরিয়ে পড়ে। অনিতা রান্নাঘর থেকে বলে—জলখাবার খেলি না, বেরিয়ে যাচ্ছিস?

—এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। চলে আসব একটু পরে।

পিকলু বেরিয়ে যায়।

রান্না সেরে অনিতা পিকলুর ঘরে

ঢোকে। ইস্ ঘরটার কী হাল করেছে। ছন্নছাড়া একেবারে। অনিতা ঘর গোছাতে শুরু করে। পায়ে খালি মদের বোতলটা ঠেকে। —এ কী? পিকলু মদ খাওয়া ধরেছে? শেষ পর্যন্ত ও এত হতাশায় ডুবে গেছে। এত অধঃপতন। কী জবাব দেব ওর বাবাকে? না না, কিছু একটা করতে হবে। অনিতা ভাবে সমুর সাথে কথা বলতে হবে। ও সমুকে ফোন করে বিকেলে আসতে বলে।

সমু পাড়ারই ছেলে। পিকলুর ছোটবেলার বন্ধু। অনাদিবাবুরও ওই একটাই ছেলে। আর একটি মেয়ে আছে। অনাদিবাবু সরকারি চাকরি থেকে এবছরই অবসর নিয়েছেন। পিকলুর মতো সমুও পড়াশুনা শেষ করে চাকরির উমেদারি করে ক্লান্ত। ফিজিক্সে এম.এস.সি করে এখন টিউশনি করে হাতখরচা চালাচ্ছে। সাড়ে ছয়টা নাগাদ সমু আসে।

—কাকিমা, বলো কী বলছিলে?

—তোকে কী ভাবে বলি সমু? তুই পিকলুর ব্যাপারে কিছু জানিস?

—কেন, পিকলু কী করেছে?

— কী করে বলি তোকে? পিকলু, পিকলু মদ খাওয়া ধরেছে। আজ সকালে ওর ঘর গোছাতে গিয়ে মদের বোতল পেয়েছি।

—কাকিমা, এরকমই একটা কিছু ভেবেছিলাম আমি। পিকলু প্রচণ্ড ফ্রাসট্রেটেড। মৌ-এর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এটা ও মেনে নিতে পারছে না। তার ওপর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একবছর বসে আছে। কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে ও একদম ভেঙে পড়েছে কাকিমা।

—বাড়িতে তো কোনো কথাই বলে না। তুই ওকে একটু বোঝা সমু।

—তুমি চিন্তা কোরো না কাকিমা। আমি দেখছি কী করতে পারি।

—কোনদিকে চিন্তা করব বল? ক'দিন ধরে তোর কাকুর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।

—কেন কাকুর কী হয়েছে?

—ক'দিন ধরে জ্বর, কাশি। কাশিটা কিছুতেই কমছে না।

—ডাক্তার দেখিয়েছো?

—ডাক্তারের কাছে যেতেই চাইছে না। আমার কথা তো শোনে না। আর পিকলু তো বাড়ির কোনো ব্যাপারেই থাকে না।

—ঠিক আছে। আমি কাকুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। কালকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেব। তুমি অতো ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সমু চলে যায়। একরাশ চিন্তা ভিড় করে আসে অনিতার মনে। কী হবে? পিকলুটা এরকম করছে। ওর বাবাও অসুস্থ। এত চাপ। ও একা কী করে সামাল দেবে? একটা সুনিশ্চিত শান্ত জীবন চেয়েছিল অনিতা। ভেবেছিল শেষ বয়সটা সব কর্তব্য সেরে একটু হাত পা ছড়িয়ে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু কী হলো? তার সংসারটা ছারখার হয়ে গেল। সেদিন মালবিকা ফোন করেছিল। কলেজের বন্ধু। পুরনো কথা অনেক বলল। তার মধ্যে টুক করে নিজের ছেলের কথাটা বলে নিল। ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পেয়েছে। পিকলু চাকরি পায়নি শুনে অনেক সান্ত্বনা দিল। অনিতা জানে ওসব মুখেই। আসলে মনে মনে খুশি হয়েছে। একটা আত্মতৃপ্তি উপভোগ করেছে।

পরদিন সমুই সুশোভনকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আসে। ডাক্তার সাসপেক্ট করছে লাং ক্যানসার। সমু ভাবে কী করে কাকিমা, পিকলুকে বলবে। পিকলুদের বাড়ি এসে দেখে পিকলু বাড়ি ফিরেছে। সমু কাকিমা আর পিকলুকে ডেকে বলে—পিকলু, ডাক্তার সাসপেস্ট করছেন কাকুর লাং ক্যানসার। ডাক্তারবাবু কতকগুলো টেস্ট দিয়েছেন। ওগুলো করাতে হবে। তোর কাছে টাকা আছে? না আমি দেব?

পিকলুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ক্যানসার, কোথা থেকে বাবার ট্রিটমেন্ট করাবে। বাবার পেনশন আর টিউশনের টাকায় কি সম্ভব? অনিতা কাঁদতে থাকে।

সমু বলে—ভেবো না কাকিমা। আমি আছি, দেখোই না কী হয়। আশা কখনো ছাড়তে নেই। কাকুর সামনে কিছু আলোচনা করো না। আমি সন্ধেবেলায় আসব, কাকু তখন টিভি দেখবেন। তোমাদের সঙ্গে তখন কথা বলব।

সমু চলে যায়, অনিতা কাঁদতে থাকে। পিকলু বলে—এখনই এতো ভেঙে পোড়ো না মা, দেখই না কী হয়?

সন্ধেবেলায় সমু টিউশনি সেরে আসে। পিকলু বাড়িতেই ছিল। ছাত্র-দুটোর সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ। দুদিন তাই ছুটি নিয়েছে।

অনিতা বলে—সমু, তোর কাকু রিটায়ারমেন্টের পর যা পেয়েছিল তার সুদ আর পেনশনের কটা টাকায় আমাদের চলছে। কী করে চিকিৎসার খরচ জোটাব ভাবছি। পিকলু তো দুটো টিউশন করে, তাতে সংসারের একটু আধটু যা সাহায্য হয়।

—কাকিমা, আমাদের এই মফস্সল শহরে তো কাজের সুযোগ কম। তাও আমি একটা শোরুমে কাজ পেয়েছি। সুপারভাইজারের, সাত হাজার টাকা স্যালারি। কিন্তু না পাওয়ার থেকে এটা ভালো। তোমাদের আগে বলিনি। ওখানে কথা বলেছি, আপাতত সেলস্ বয় হিসেবে পিকলু ঢুকুক। তারপর ওরা অন্য ভালো সুযোগ পেলে ওকে নিয়ে নেবে।

অনিতা ভাবে, শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সেলস্ বয়, অত খরচ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়িয়েছে, সে আজ সেলস্ বয়? লোকে কী বলবে? সামান্য কটা টাকার জন্য ছেলের ভবিষ্যত নষ্ট করছে। না না, তার চেয়ে যা গয়না আছে সব বেচে দেব। ফিক্সড্ ডিপোজিটগুলো ভেঙে দেবে।

—সমু, আমি তো ভাবতেই পারছি না, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পিকলু দোকানে কাজ করবে? অনিতা বলে।

—ওভাবে ভেবো না কাকিমা। দেখছো না দিন দিন জব অপরচুনিটি কমে যাচ্ছে। সরকারি কোনো চাকরি নেই। রেল, স্বাস্থ্য, টেলিকম সব বেসরকারিকরণ করছে। একদিকে নতুন রিক্রুটমেন্ট বন্ধ। অন্যদিকে ছাঁটাই। মধ্যবিত্তের সেই নিশ্চয়তার জীবন আর নেই কাকিমা। পড়াশুনা, ভালো রেজাল্ট, পড়াশুনার পর একটা ভালো চাকরি—এই সাইকেলটা এখন ভুলে যাও কাকিমা। এখন আর চাকরি কথাটা নেই। এখন একটা কাজ। একটা কাজ যেমন তেমন করে জুটিয়ে নাও, ব্যাস। বাঁচা না, এখন কেবল টিকে থাকার চেষ্টা।

অনিতা ভাবে, এ কোন ভাঙনকাল এলো। কত যত্নে টাকা পয়সা খরচ করে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে আজ তাদের কোথাও চাকরি নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে কিছু নেই। এক অসীম শূন্যতা। মধ্যবিত্তের নিশ্চিন্ত জীবন থেকে তারা একে একে ছিটকে পড়ছে। পিকলু যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করল তখন আত্মীয়স্বজন সবাই বলল— ''অনিতা, তোমার আর চিন্তা নেই। এবার গাড়ি বাড়ি সব হবে।'' কোথায় কী? মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী, এক হতাশাগ্রস্ত ছেলেকে নিয়ে জীবনের গাড়িটাকে চালাতে হবে। আমরা ক্রমশ শূন্যের দিকে চলেছি। চারিদিকে নেই নেই। তবুও তার মধ্যে যা খড়কুটো পাওয়া যাবে তাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে হবে। বাঁচার লড়াইটা জারি রাখলে হয়তো আগামী কোনো দিন এই ভাঙনকালের অবসান হবে।

সমস্ত দর্শকবন্ধুদের জানাই
শারদ শুভেচ্ছা জানাই

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
মফস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিনেমা হল

উর্বশী সিনেমা

ধাত্রীগ্রাম রেলগেট, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 36

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

পরিতৃপ্তিই শেষ কথা

ফ্রেন্ডস ক্যাটারার্স

ছোলার মাঠ, ধাত্রীগ্রাম, কালনা, পূর্ব বর্ধমান
মোঃ ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

প্রোঃ সুজিত দে

Sl. No. 35

With best compliments from

Road Way & Root Co-op. Lobour Contract & Construction Society Ltd.

Pearynagar, Dhatrigram, Kalna
Purba Bardhaman

Reg. No. : Bardhaman Range-2, Katwa-3K-1986

Sl. No. 34

With best wishes from

Surajit Ghosh

Sl. No. 2

কম্প্রোমাইজ

অনিল মাইতি

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারটা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। বৌমা প্রতিমা তখনও কাজ থেকে বাড়ি ফেরেনি। মাটির দাওয়ায় একটি চটে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তাই ভাবছে মথুর দাস। তার স্ত্রী সাবিত্রী একটি বাটিতে চাট্টি মুড়ি আর একটি নামে লাল-চা তার সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'নাও খেয়ে নাও।' মথুর তখনও ভাবছে। সাবিত্রী আবার বলে— 'কী হলো, খেয়ে নাও। আচ্ছা অত ভেবে কী হবে বলতো, যা ভাবার, যা করার তা তো তপন, রবীন আর লিয়াকৎই ভাবছে, করছে।' মথুর বলে, ' না বড় বউ, আমি ও কথা ভাবিনি। ভাবছি বৌমা এখনো বাড়ি ফিরলো না তাই—'। কথা শেষ হবার আগেই পুকুরে হাত-পা ধুয়ে শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে এসে উঠোন থেকেই প্রতিমা বলে, 'আমি এসে গেছি বাবা'। 'আয় মা, এতক্ষণ তোর কথাই ভাবছিলাম। যা মা, জামা-কাপাড় ছেড়ে কিছু খেয়ে নে।' প্রতিমা ঘরে যায়। মথুর মুড়ির বাটিতে হাত দেয়।

মথুর দাস। বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই। বহু লড়াই আন্দোলনের সাক্ষী ও অংশীদার সে। মথুর চায়ের গ্লাসে সবে মাত্র চুমুক দিয়েছে, তখন প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মথুরের সামনে একটি পাঁচশো টাকার নোট ধরে বলে, 'নাও বাবা, এটা ধরো।' মথুর কিছুটা অবাকই হলো, বললো, 'কোথায় পেলি মা?' 'আমি যখন বাড়ি আসছিলাম, তখন মাস্টারমশাই বিনোদবাবু আমাকে দিলেন, তোমাকে দেবার জন্যে।' —বলে প্রতিমা। মথুর টাকাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'টাকাটা তোর কাছেই রাখ মা। তবে খুব সাবধান, ওর থেকে একটা টাকাও যেন খরচ করিবি না। ও টাকা তুলে দিতে হবে তপনদের হাতে। এখন টাকার বড় দরকার মা।' —'তাই হবে বাবা', বলে আবার ঘরে গেল প্রতিমা।

মথুর সাবিত্রীকে বলে, 'জানো বড় বউ, বিনোদদা সারা জীবন আমাদের দিকেই থেকে গেলেন। যখন আমাদের কোনো লড়াই-আন্দোলন হয়েছে তখনই আমাদের পাশে থেকেছেন। আমাদের হয়ে কথা বলেছন। সাধ্যমতো টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কোনোদিন মত বদল করেননি। রাশভারি, অল্প কথার সহজ সরল বড় ভালো মানুষ উনি।' এই মুহূর্তে বিনোদবাবুকে ঘিরে মথুরের অনেক কথা যেন মনে পড়ছিল।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। সন্ধ্যার পর তাই অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধেছে। মথুর দাওয়ায় বসে। জ্বলছে একটা টিমটিমে আলো। সেই আবছা আলোয় মথুর দেখলো, তার খিড়কির দরজা দিয়ে গুটি-গুটি পায়ে কে যেন আসছে। মুখটা তার ঢাকা। শঙ্কিত হলো সে। দাওয়ার ধারে গিয়ে উঁচু গলায় সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কে, কে তুমি?' আগন্তুক মথুরের কাছে এসে মুখঢাকা রুমলাটা সরিয়ে বলে, 'আঃ, আস্তে আস্তে।' আশ্চর্য হলো মথুর। সে বললো, 'অ, শেখরবাবু! বসুন, বসুন। ওগো, শেখরবাবুকে একটা বসার আসন দাও।'

শেখর বলেন, 'আঃ, বলছি না আস্তে। তাছাড়া আমি বসবো না, এখুনি চলে যাব। শুধু জানতে এলাম—'

—বলুন, কী জানতে চান?

—জানতে এলাম, কেমন আছো সবাই?

—কেন, ভালোইতো আছি। গনা, চঞ্চল আর অমিত টাকা-কড়ির ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করলো, তাতে খুন হলো অমিত। আর তার

দায় চাপালো আমাদের উপর। তারই জেরে আমাদের পাড়ায় চালালো হামলা। ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল সব। পঞ্চাশটা মতো বাড়ি পোড়ালো। বাবুলাল আর কোরবানের মেয়ের উপর অত্যাচার করলো। বিনা দোষে বাবুলাল, কোরবান হামিদ, কেষ্ট আর আমার মানিককে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। বুড়োবয়সে মার খেলাম আমি আর বাবুলালের বাবা কানাই মুর্মু। বেশ ভালোই তো আছি বলুন?

শেখর আমতা-আমতা করে বলেন, 'না-মানে; এ সবই তো জানি দাদা।'

—'সব জেনেও আজ ছ'মাস পরে খোঁজ নিতে এলেন?' প্রশ্ন মথুরের।

এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে বোধহয় ভেবে আসেননি শেখরবাবু। তাই একটা ঢোঁক গিলে তিনি বলেন, 'আসলে কি জানো, আমার মেয়েটার জন্য'—

—কী হয়েছে আপনার মেয়ের?

—না এমনিতে কিছু হয়নি, ওকে তো কলেজ যেতে হয়, পথে যদি শয়তানরা—

এগিয়ে এলো প্রতিমা। সে বললো, 'শুনুন কাকু, আমাদের পাড়ার দুটো মেয়ে আর একটা ছেলের সঙ্গে আমার ছেলে চয়ন এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।'

—সে তো জানি।

—না, সবটা আপনি জানেন না। শুনুন তাহলে। গণ্ডগোলের পর ভয়ে ওরা ইস্কুল যাচ্ছিল না। আমরা মায়েরা ঠিক করলাম, আমরাই আমাদের ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে দিয়ে আসব, নিয়ে আসব। তাই করলাম। যাবার সময় আত্মরক্ষার জন্যে কোমরে গুঁজে নিলাম একটা করে ছোট কাঠারি। শয়তানরা আমাদের দেখে দু'একটা কথা বললো। আমরা কান দিলাম না। তিন-চারদিন দিয়ে-আসা নিয়ে-আসার পর এখন ওরা নিজেরাই যাচ্ছে। যাচ্ছে পাড়ার অন্যসব ছেলে-মেয়েরাও।

—সবই ঠিক। তবে কি জানো বৌমা, আমাদের গ্রামের মধ্যবিত্তরা বড়ই স্বার্থপর এবং বেইমান।

তীব্র প্রতিবাদ জানালো মথুর। সে বললো, 'আপনি ঠিক বললেন না শেখরবাবু।'

—তার মানে?

—আপনি কি জানেন, আমাদের এই মামলা চালাতে গাঁয়ের মধ্যবিত্ত বন্ধুরা প্রায় পনেরো হাজার টাকা সাহায্য করেছেন।

চমকে ওঠেন শেখরবাবু। বলেন, 'বলো কী?'

—হ্যাঁ, একবর্ণও মিথ্যে বলিনি, পারলে খোঁজ নেবেন।

শেখরবাবু একটা শুকনো কাশি কাশলেন।

সাবিত্রী বললো, 'একটু জল খাবেন?'

শেখরবাবু বলেন, ' না না তেমন কিছু নয়। আসলে ক'দিন থেকে গলাটা—'

মথুর প্রশ্ন করে, 'আপনার কি মনে পড়ে, শেখরবাবু, আমার এই দরাজ উঠোনে আপনি কত মিটিং করেছেন। কত দেশ-বিদেশের লড়াই-আন্দোলনের গল্প বলেছেন, আমাদের সবাইকে একজোট থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, আর আজ আপনি—'

শেখরবাবু মনে মনে ভাবেন, এবার কী উত্তর দেবেন তিনি। তিনি আরও ভাবেন, এখানে না এলেই বোধহয় ভালো হতো।

—'কী হলো শেখরবাবু চুপ করে গেলেন কেন?' প্রশ্ন মথুরের।

—না না চুপ করবো কেন, সবই তো মনে আছে।

—আর একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে?

—করো।

—এই গণ্ডগোলের পর গাঁয়ের মধ্যবিত্ত সমর্থক বন্ধুরা যখন বাড়িতে থাকতে পারছিল না, তপন, রবীন, ওপাড়ার লিয়াকৎ যখন বাড়িছাড়া, গ্রামছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে, তখন আপনি থাকলেন কী করে?

এ তো বড়ো কঠিন প্রশ্ন। কী উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'ওই যে বললাম, মেয়েটার নিরাপত্তার কথা ভেবে একটু কম্প্রোমাইজ করে থাকতে হয়েছে।'

—কী করে?

—কম্প্রোমাইজ করে।

—তার মানে?

শেখরবাবু কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বারে বারে তাই শুকনো কাশি কাশছিলেন।

প্রতিমা বলে, 'মনে হয় ওদের সাথে একটু মিলেমিশে থাকা, তাই তো কাকু?

শেখরবাবু নিরুত্তর। মথুর বলে, 'বেশ, বেশ, আপনি নিরাপদেই থাকুন। আপনার কোনো ক্ষতি হোক আমরা চাই না।'

শেখরবাবু ভাবেন আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। হয়তো আরও কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তাকে। তাই একটু পিছিয়ে এলেন তিনি। কী যেন ভাবলেন, পরে নিজের পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে মথুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নাও দাদা, এটা ধরো।'

—কী, প্রশ্ন মথুরের।

—টাকা।

—টাকা! কী হবে?

—রাখো, তোমার সংসারে কাজে লাগবে।

—এভাবে কোনো টাকা নেবার অধিকার তো আমার নেই। তাছাড়া আমার সংসারে তো কোনো অভাব নেই। মানিককে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই বৌমা সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে। যা কোনোদিন করেনি, আজ তাই করছে। অপরের জমিতে জন-মজুর খেটে সবার মুখে তুলে দিচ্ছে দু'মুঠো ভাত। আর কী চাই আমার!

—না মানে—

—না দাদা, ও টাকা আমি নিতে পারবো না।

—তোমার জন্য না নাও, মামলা খরচের জন্য নাও।

—তার ব্যবস্থা তো তপন, রবীন আর লিয়াকৎই করছে। যদি দিতেই চান ওদের কাছেই পাঠিয়ে দেন।

—তুমি না হয় পাঠিয়ে দিও।

—আজ ছ'মাস তাদের খবর জানি না, কোথায় পাঠাবো আমি?

শেখরবাবু বুঝলেন, এ বড় শক্ত ঠাঁই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তোমরা আমায় পর করে দিচ্ছো মথুরদা?'

এগিয়ে এসে প্রতিমা বললো, 'আমরা পর করবো কেন কাকু, পর তো আপনিই করে দিয়েছেন।'

শেখরবাবু আর কোনো কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেই পথ দিয়েই দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। প্রতিমা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো।

কোনো কিছুরই খবর পাচ্ছে না মথুর। অনেকেই তার কাছে খবর নিতে আসছে। কিছুই বলতে পারছে না সে। চিন্তাটা তার বেড়েই যাচ্ছে। এরই মাঝে এক সন্ধ্যায় এলো লিয়াকৎ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মথুর। সাবিত্রী সবার জায়গা পেতে দিল। লিয়াকৎ বসে জানালো, একটা জরুরি খবর দিতেই সে এসেছে। মথুর খুব আগ্রহ নিয়ে বললো, 'বল বাবা বল।' লিয়াকৎ বলে, 'আমাদের জেলার কোর্টে জামিন না হওয়ায় হাইকোর্ট থেকে সবার জামিনের জন্য

উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে তপনদা পাঁচদিন কলকাতায় বসে। আজ বিকালে ফোন করে জানালো, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, দু'একদিনের মধ্যেই কেস হাইকোর্টে উঠবে। তাঁর আশা এবার সবার জামিন হয়ে যাবে।'

খবরটা ভালো হলেও চিন্তা বেড়ে গেল মথুরের। সে বললো, 'হাইকোর্ট! সে-তো অনেক টাকার দরকার। তোরা এত টাকা কোথায় পাবি বাবা?'

—ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না জেঠু, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—তাই বললে কি হয় বাবা, তোরা ছেলেমানুষরা কোথায় পাবি—

—বলছি, আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। একেই আপনার শরীর খারাপ। ভেবে ভেবে শরীরটা আরও খারাপ করবেন না। শুধু আপনি ঠিক থাকুন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি খবরটা সবাইকে দিয়ে দেবেন।

লিয়াকৎ উঠে পড়লো।

—'দুটি কিছু খেয়ে যাবি না বাবা।' বললো সাবিত্রী।

—না বড়মা, আমার বেশি সময় নেওয়া যাবে না। রবীনদা আমার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকবে। আমি যাই—

—'একটু দাঁড়ান' বলে প্রতিমা ঘরে গেল। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বিনোদবাবুর দেওয়া পাঁচশো টাকা লিয়াকতের হাতে তুলে দিল। বিস্ময়ে লিয়াকৎ তাকালো প্রতিমার মুখের দিকে। মথুর বললো, 'পরে বলবো।' লিয়াকৎ চলে গেল।

সে রাতে মথুর ঘুমোতে পারছিল না। তার শুধু একটাই চিন্তা, এত টাকা ছেলেগুলো পাবে কোথায়! পরদিন বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু চা খেয়ে অশক্ত শরীর নিয়েই সে বেরিয়ে গেল পাড়ায়। খবরটা সকলকে জানালো। তারপর তিন-চার দিন পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে কিছু টাকা সংগ্রহ করলো। টাকা তো সংগ্রহ করলো, কিন্তু পাঠাবে কী ভাবে! মনে মনে সে ভাবে, নিশ্চয় একদিন লিয়াকৎ আসবে। তার হাতেই তুলে দেবে।

কেটে গেল আট-দশ দিন। কোনো খবর পাচ্ছে না মথুর। লিয়াকতের আশায় দিন গোনে সে। দিন গোনে নতুন কিছু খবরের আশায়। এরই মাঝে এক সন্ধ্যায় এসে হাজির তপন, রবীন আর লিয়াকৎ। তাদের সঙ্গে প্রায় জনা পঁচিশ-ত্রিশ পাড়ারই যুবক। মথুর প্রথম ঘাবড়ে গেল। তারপর তপনদের দেখে নেমে এলো দাওয়া থেকে। নেমে এলো সাবিত্রী ও প্রতিমা। তপন মথুরের গায়ে হাত দিয়ে বলে 'কেমন আছো দাদা?'

—আমার কথা ছাড়ো, বলো, তোমারা কেমন আছো?' বললো মথুর।

—'খুব ভালো আছি দাদা।' উত্তর তপনের।

মধুর ওদের তিনজনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'ভালো থাকো ভাই, খুব ভালো থাকো। অনেকদিন বেঁচে থাকো তোমরা।'

—'বাঁচার মন্ত্র তো তোমাদের কাছ থেকেই শিখেছি দাদা।' বললো তপন।

মথুর বলে, 'আমার সারা জীবনে যা শিখেছি, তার দশগুণ শিখলাম তোমাদের কাছে এই ছ'মাসে।'

তপনরা যেন লজ্জা পেল। তারপর প্রতিমাকে দেখে তপন বলে, 'তোমাদের সাহসের সব কথা আমরা শুনেছি বৌমা।'

প্রতিমা শেখরবাবুর প্রসঙ্গ তুলতেই তপন বলে, 'সব শুনেছি, বাকিটা আমার কাছ থেকে শোনো। আমরা জেনেছি, উনি জমিজমা এমনকি বাবার তৈরি বাড়িটাও বিক্রির জন্য খদ্দের দেখছেন। অজুহাত মেয়ের লেখাপড়ার জন্য শহরে যাবেন। এর জন্যই বোধহয় কম্প্রোমাইজ।'

তপন যখন প্রতিমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন মথুর একবার ঘরে যায়। এখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তপনের সামনে ধরলো এক গোছা টাকা। তপন অবাক হলো। মধুর বললো, 'ধরো এগুলো। আড়াই হাজারের কিছু বেশি আছে।

—'কোথায় পেলে এত টাকা?' তপনের প্রশ্ন।

মথুর বলে, 'পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে তুলেছি।' তপন মনে মনে বললো, 'তোমার তুলনা বোধহয় তুমিই'। তারপর তপন জানালো—লিয়াকৎকে দেওয়া পাঁচশো টাকাও সে পেয়েছে।

এবার তপন বললো, যে জন্য এসেছি সেই সুখবরটা তোমাদের শোনাই।' সবই বলে উঠলো 'বলুন, বলুন।' তপন বললো, 'আজ হাইকোর্ট থেকে ওদের সবার জামিন হয়ে গেছে।' হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠলো সারা উঠোন। উঠোনে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। তপন আরও বললো, 'আগামী কাল ওরা ফিরবে। ওদের নিয়ে বিকালে আমরা মিছিল করবো।' সকলে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ।' ভিড়ের ভিতর থেকে গোপাল বললো, 'কাল আমরা কেউ কাজে যাবো না। সব মেয়ে-পুরুষ মিছিলে যোগ দেবো।' সকলেই সম্মতি জানালো।

তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো গ্রামেরই এক খেতমজুর যুবক শংকর। তাকে দেখে সবাই সন্দেহ প্রকাশ করলো। সে সোজা তপনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন জিজ্ঞাসা করলো, 'কিছু বলবে?' শংকর তপনের দুটো হাত ধরে হাউমাউ করে কেঁদে বললো—'আমায় ক্ষেমা কর দাদা, আমি খুব অন্যায় করেচি ওই গনা, চঞ্চল আর ওদের দলবলের সাথে মিশে। ওদের কথায় চলে। যার জন্য গাঁয়ের সব গরিব মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমি বুঝতে পারি সবাই আমাকে ঘেন্না করে। এমনকি আমার বউ-ছেলেও আমাকে ভালো চোখে দেখে না। আমি আর কোনোদিন ওদের সঙ্গে মিশবো না। আমি সবার সামনে কথা দিচ্ছি।'

এগিয়ে এলো গোবিন্দ, সে বললো, 'তোকে আমরা বিশ্বাস করি না। আজ একথা বলছিস, আর কাল যখন ওরা তোকে দশটা টাকা দেবে, এক গেলাস মদ দেবে, অমনি সব ভুলে যাবি।' চিৎকার করে শংকর বললো, 'না... আর কোনোদিন হবে না।' 'তার কী প্রমাণ?' প্রশ্ন করলো গোবিন্দ। শংকর বললো, 'প্রমাণ দেবো কালকে। কাল যখন মিছিল হবে, তার সামনে থাকবো আমি। থাকবো শক্ত হাতে ঝাণ্ডা ধরে।' সবাই বলে উঠলো, 'দেখাই যাবে কালকে।' তপন সবার উদ্দেশ্যে বললো, 'কাল সকাল থেকেই মিছিলের প্রস্তুতি নেবে। আর হ্যাঁ, ওদের গলায় মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানাবো আমরা।' পাড়ার মেয়ে বউ যারা এসেছিল, তারা বললো, 'আমরা সবাই ফুল তুলে মালা গাঁথবো। তারপর পরিয়ে দেব ওদের গলায়।' সবাই বলে উঠলো, 'সাবাস সাবাস।'

মথুর এই মুহূর্তে ভুলে গেছে তার বয়সটা। চেতনায় সে যেন এখন পঁচিশ বছরের যুবক। শিরদাঁড়া সোজা করে শক্ত মুঠি উপরের দিকে ছুঁড়ে সে বললো, 'না, আমরা হারবো না, জয় আমাদের হবেই'। সবাই বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলো— 'না, আমরা হারবো না, জয় আমাদের হবেই'। এই বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি আর পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না, পৌঁছে গেল সারা গ্রামে। জানিনা এই আওয়াজ শেখরবাবুর কানে পৌঁছেছিল কিনা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। পূর্ণ চাঁদের রুপোলি কিরণ পড়েছে প্রত্যয়দীপ্ত সমবেত মানুষের উপর। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সবার চোখ মুখ। তখনো আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে 'না, আমরা হারবো না, জয় আমাদের হবেই...।'

With best compliments from

Akalabya Construction Syndicate

Sl. No. 3

With best wishes from

Sanjib Ghosh

Sl. No. 1

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

শ্রীপল্লী নার্শারি

প্রোঃ পরেশ মিত্র

সকল প্রকার ফুল, ফল ও বৃক্ষজাতীয় চারা পাওয়া যায়।
বিঃদ্রঃ বাগান তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

সগড়াই বাজার, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 6

With best wishes from

S.M. ENTERPRISE

C/o. SAILEN SARKAR
Govt. Civil, Mechanical Contractor &
General Order Supplier

Barsul Unmayani, Purba Bardhaman-713124
Mob. 9434181502, 8250755699
e-mail : smenterpris068@gmail.com

Sl. No. 9

গ্রামসী টু গ্রান্ড-মা

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী

"আর বলবেন না, জ্বলে গেল, একটুও শান্তি পাব না? শুধুই এটা হল না ওটা হল না, এই লোকটা খারাপ করছে ওই লোকটা খারাপ করছে, এই কমরেডের চলন বলন ঠিক নাই ওই কমরেডের হাবভাব কেমন যেন? শান্তিতে যে একটু কাজ করব তার যো আছে? সংগঠনের কাজ করতে করতে মানসিক শান্তির বারোটা বেজে গিয়েছে। আগে মিটিং হলে পাড়ার ড্রেন হল না, রাস্তা হল না, প্রাইমারি ইস্কুল করতে হবে, রেশন কার্ড করার ব্যাপারে আরো জোর দিতে হবে। কিছু ছেলেকে কাজ দেবার কথা দিতে পারছি না, প্রাইমারি ইস্কুলে মাস্টারি দাও নম্বরের ভিত্তিতে, কত কথা বলত। এখন সরকার নাই সবাই জেনে গিয়েছে, এখন আর চাকরি, মাস্টারি, ড্রেন, আটচালা, রাস্তা এসব বলে লাভ নেই। কিন্তু কিছু তো বলতে হবে। তাই এখন শুধু ওমুক ওমুক করেছে আর তোমুক তোমুক করেছে এই হল শুধু কথা—জীবনটা জ্বলে গেল। সরকারে থাকলে এক জ্বালা, আর না থাকলে আরেক জ্বালা—মহা মুশকিল। কী করে যে সব সামলাব বুঝতেই পারছি না। আরে আমিও তো মানুষ। আমারও তো মেন্টল পিস বলে একটা কথা আছে, সেটা কেউ ভাববে না! এক জায়গাতে জড়ো হলে শুধুই একই কথা!"—মিটিং-এ কথা শুরু করার আগে বলরাম রিপোর্টিং করার প্রথমেই এই কথা কটা দিয়ে শুরু করল।

মদনচাঁদ এক মনে এক কোণে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ওর কথাগুলো শুনছিল। মদনচাঁদ অনেক পুরনো দিনের কমরেড, বহু ঘটনার সাক্ষী। বলরামের কথাগুলো শুনছিল আর বিড়ি ফুঁকতে ফাঁকতে মিটি-মিটি হাসছিল। ওদিকে নজর পড়ে যাওয়াতে বলরামের পিত্তি জ্বলে উঠল। খেঁকিয়ে উঠে বলল—আর ঐ দ্যাখ বুড়ো ভাম, আমার নাকাল অবস্থা দেখে কেমন ফিক ফিক করে হাসছে আর বিড়ি মারছে! সব জানে, সব ব্যাটাকে চেনে, মালগুলো অফিসে এসে যখন এসব নিয়ে গুজুর ফুসুর করবে, চুপ চাপ বসে বসে শুনবে আর আস্কারা দেবে। এত পুরনো কমরেড, একটু ধমকে বললেই সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা না করে চুপচাপ বসে বসে ওদের কথাগুলো গিলবে আর আমি এলেই বলবে— "এই 'বল' এরা কী বলছে কথাগুলো শুনে দ্যাখ, ভালো মতো যদি কিছু করতে পারিস তো কর।" করতে পারিস তো কর। কী করব, ওদের মন কিসে যে শান্ত হবে, জানিনা বাপু। আমার হয়েছে যত জ্বলন। আমি আর পারছি না, ঐ মদন কাকাকেই বলো ওইসব দেখুক আমাকে রেহাই দাও।"।

সব শুনে মদন নিভে যাওয়া বিড়িটাকে আরেকবার ধরিয়ে নিয়ে ভালো করে নড়ে চড়ে বসল। কিছু বলতে গিয়েও কথা গিলে ফেলল। পার্টির সেক্রেটারি মহাদেব মদনের দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলতে চাইছিলে—তা বলেই ফেল তার পর না হয় মিটিংটা শুরু করব?" মদন বলে "না-না মিটিংটা শুরু কর তারপর বলা যাবে।" সব মিটিং-এ মদন সভাপতি হয়, কাজেই আর বলতে হল না। মদন শুরু করে, "কমরেড আজকের সভা শুরু করছি। সম্পাদক রিপোর্টিং শুরু করুক।" সম্পাদক মিটিং শুরু করে সামনের দিনে কী কী কাজ করতে হবে এবং আজ পর্যন্ত কী কী হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করল। এবার সবার একে একে বলার পালা। মদন প্রথমেই বলরামকে উদ্দেশ্যে করে বলল "বলো, তুমি প্রথমে বলো।"

এমনিতেই বলরাম মদনের উপরে বোমকে আছে, তার পর ওকেই প্রথমে বলতে বলায় আরো রেগে বলল, "কী বলব? তোমাকে বলা আর পাথরকে বলা একই ব্যাপার। আমি আর কিছু বলব না। যা বলার আগেই বলে দিয়েছি। তুমি যদি একটুও সাহায্য না করো আমার পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।" আজ মদনের উপর বলরাম খুব খেপে আছে বুঝতে পেরে মহাদেব এবার মদনের দিকে তাকিয়ে বলল "তা তোমার উপরেই তো 'বলো' রাগ ঝাড়ছে, তুমি কিছু বলো, না হলে তো আজকের মিটিং এর বারোটা বেজে যাবে।" এমনিতে মদনচাঁদকে সবাই খুব মান্য গণ্য করে। এখানের পার্টিটা সেই কবে থেকে নিজের হাতে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে। এই সভাতে যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে মদন নিজে হাতে ধরে নিয়ে এসেছে। এরা যখন পার্টিতে আসে কতই বা এদের বয়স ছিল, ১৮ কি ২০। সব মুখ কটার দিকে একবার তাকিয়ে নেয় মদন। কী বলবে বুঝতে পারছে না? মাঝে মাঝে নিজেকে অপদার্থ মনে হয়, দোষ দিতে ইচ্ছে করে। কাদের নিয়ে এল? এদের তো অনেক দিন আসা হল, এরা কেন নতুনদের আনতে এত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সেটা মদনের মাথাতে কিছুতেই ঢোকে না। এরা অল্পতেই উতলা হয়ে পড়ে। অল্পতেই এত দিশেহারা হলে চলে? কমিউনিস্ট পার্টিতে ১০০ মিটার দৌড়ের কোনো জায়গা নেই। এখানে হাজার হাজার মিটার দৌড়ের ব্যাপার। লম্বা রেসের ঘোড়া না হলে কমিউনিস্ট পার্টি করা কঠিন। এত অল্পতেই দম ফুরিয়ে আসে সি করে? তবে কি এদের যা শিখিয়েছে তা কি ভুল? না-না, তা কী করে হবে—নিজের মনকেই সান্ত্বনা দেয় মদন।

ছেলেগুলো তো ঠিকই আছে। ঠিক যদি না থাকবে তাহলে লোকগুলো ওদের কাছে কেন আসে? কেন বিরক্ত করে? কেন পার্টির ভালোমন্দ কাজের জন্য ওদের কাছে এসে মান-অভিমান করে? এসব ভাবতে ভাবতে দু-চারটে কড়া কথা বলার

ইচ্ছে থাকলেও নিজেকে সামলে নিয়ে মদন মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে শুরু করে ‘‘আচ্ছা মহাদেব, তুমি আর তোমরা সবাই নিশ্চয়ই আমাদের পার্টিকে একটা শক্তি বলে মনে করো? এই ‘বলো’ তুইও নিশ্চয়ই সেটিই মনে করিস? তাই তো?’’ সবাই মদনের কথায় সায় দেয়। শুধু বলরামের তখনো রাগ কমেনি। মদনের কথার উত্তরে বলে, অবশ্যই তা তো বটেই তোমার মতো একটা কমরেড থাকতে আমাদের শক্তি কেমন করে কমবে? তুমি তো পাথরের মতো বসে বসে সব দেখতে শুনবে আর হজম করবে। ওদের একটু জোরে ধমক চমক দিলেই তো সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। করছো তা?’’ মনে মনে বিড়বিড় করে বলে ‘‘পার্টি একটা শক্তি-না হাতি’’! বলরামের কথার রেশ ধরে মদন আবার বলতে শুরু করে। ‘‘হ্যাঁ সত্যিই বটে! কিন্তু তোরা এটা বুঝেও বুঝিস না। মরুক গে যা বোঝার বুঝবি। তবুও এটা তোরা সবাই জানিস যে পার্টি একটা শক্তি। আর শক্তির একটা নিজস্ব উত্তাপ থাকে তাও তোরা অবশ্যই জানিস। আর এটাও জানিস উত্তাপের কাছে থাকলে সব সময়ই উত্তাপের একটা দহন থাকে।’’ সবাই হাঁ করে মদনের কথাগুলো শুনছিল আর মনে মনে ভাবছিল মদন চাঁদ তো ঠিকই বলছে। খানিক দম নিয়ে মদন আবার শুরু করে ‘‘এই দহনের জ্বালা কিন্তু সবাই টের পায় না—একমাত্র টের পায় যারা এই শক্তির নিকটে থাকে তারাই। এই জ্বালা থেকে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র এই উত্তাপের উৎস থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়া....’’ মদনের কথা শেষ হয়নি এর মধ্যেই বলরাম বলে উঠল, ‘‘ও তাহলে তুমি আমাকে পার্টি ছেড়ে দিয়ে দূরে চলে যেতে বলছো এই তো?’’ ‘‘আহা তা কেন বলব, বলছি কমিউনিস্ট পার্টি আর এই দহন অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছো ততক্ষণ তোমার মধ্যে এই দহনের জ্বালা থাকবেই থাকবে।

‘‘এটিই হল ডাইলেক্টিস। এই যে বলরাম মিটিং-এ এত সব কথা বলল তার মানে ওর মধ্যে এই জ্বালা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আবার বলরাম ফুট কেটে চলেছেই, আর সে জন্যই তো এত কথা বলছি।’’ এবার সবাই রে রে করে উঠে বলে ‘‘এই বলো ‘‘মদনদা কি বলছে ভালো করে শোন তার পর যদি কিছু বলার থাকে বলবি, মাঝে মাঝে ফুট কাটার কি দরকার?’’ বলরাম এবার চুপ করে। মদন আবার বলতে শুরু করে ‘‘ঠিকই তো ও যেভাবে আমাদের পার্টিকে তৈরি করতে চাইছে সে ভাবে পারছে না আর সে জন্যই ওর এই জ্বালা আর আর এই জ্বালা মেটাবার জন্যই এত কথা বলল—আমি মনে করি সঠিক কথা বলছে। কিন্তু আরো ধৈর্য্য ধরতে হবে। তুমি প্রজাপতির জন্ম দিতে চেষ্টা করছো আর প্রজাপতি তো শুয়োপোকা থেকেই জন্ম লাভ করে। তা হলে প্রজাপতি তো তোমার ইচ্ছে তে হবে না! প্রজাপতির জন্য প্রথমে শুয়োপোকার চাষ করতে হবে। তুমি শুয়োপোকার চাষ শুরু করেছো আর বলছো শুয়োপোকার লোমে তোমার শরীর জ্বালা করছে? এ কেমন কথা?’’ একটা যুৎসই জবাব বলরামের মুখে চলে এসেছিল বলে ফেলে আর কি! কন্তু হঠাৎই মদনের কপালের ডান পাশে একটা গভীর ক্ষত দেখে বেরোনো কথাগুলো কেমন যেন আটকে গেল—ঠিকই তো! মানুষটা তো অন্যায় কিছু বলেনি। কমিউনিস্ট পার্টি করতে গিয়ে জোতদারদের গুলিতে নিহত নিজের শহিদ সন্তানকে কোলে করে মাঝ মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসা কি কম যন্ত্রণার ব্যাপার! বলরামের মনে পড়ে গ্রামের বড়দের কাছে শোনা অনেক কথা! মদনের এখন না হয় খানিকটা ভাত কাপড়ের অভাব দূর হয়েছে, কিন্তু এই এলাকায় জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম আওয়াজ তোলে মদনই। ভাগচাষি উচ্ছেদ ছিল তখন জল-ভাত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাগচাষি জমিতে হাল দেবার জন্য মালিকের বাড়িতে বলদ লাঙল জুড়তে এসে শুনত ‘হদ্যবা তোকে আর আমাদের জমি চাষ করতে হবে না এ বছর থেকে আমরা ছিদামকে বলে রেখেছি ওই চাষ করবে—তুই যা। হদ্যবার কিছুই করার ছিল না, মুখ ফুটে প্রতিবাদ করবে তাও না। প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে বোবা কান্না বুকে চেপে ফিরে আসতে হয়েছিল হদ্যবাকে। পাড়ার জামতলায় বসে কয়েকজনকে নিয়ে তখন কিছু আলোচনা করছিল মদন। হদ্যবাকে মনমরা হয়ে ফিরে যেতে দেখে মদনই প্রশ্ন করেছিল ‘‘কি রে হদ্যবা কোথায় চললি?’’ মুখটা ছোট করে হদ্যবা বলেছিল—কোথায় আবার, গিয়েছিলাম চাটুজ্যে বাড়ি, হাল বলদ বার করতে দুদিন তো কালবৈশাখীতে। বেশ জল হল, ভাবলাম, জমিগুলোতে ভালোই বতর হয়েছে, জমিগুলোতে একটা করে চাষ করে দিই—এখন যদি এক চাষ করে রাখি তাহলে পরে অনেক সুবিধা হবে, সেটা তো তুমি জান।’’ আষাঢ় মাসে চাষের আগে জমিতে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে যদি একটা চাষ দিয়ে রাখা হয় তাহলে পরে ভালোই হয় এটা জানে মদন।

সাধারণত এদিকে প্রায় সবাই জ্যৈষ্ঠ থেকে চাষে নেমে পড়ে, আষাঢ় পর্যন্ত জমিতে তিন বার হাল দিয়ে জমিতে ধান চাষের উপযুক্ত করে তোলে চাষিরা। মদন বলেছিল, ‘‘সে তো জানি, তো হাল বলদ কই মাঠে গেলি না। আবার তো কাঠফাটা রোদে জমির বতর চলে যাবে?’’—‘‘আর বতর! দীর্ঘশ্বাস ফেলে হদ্যবা বলেছিল ‘‘গিয়েছিলাম তো হাল বলদ বার করতে, কিন্তু কি হবে? বড় চ্যাটুজ্যে জবাব দিয়ে দিল, আমাকে আর চাষ করতে দিবে না। অন্য ভাগিদারের সাথে কথা হয়ে গিয়েছে, ঐ এবার থেকে চাষ করবে। কোথায় যাব বলতো? কি খাওয়াব ছেলে-পুলোগুলোকে—কি যে হবে ভাবতে পারছি না গো’’? মদন তৎক্ষণাৎ বলেছিল হদ্যবাকে ‘‘জবাব দিলেই হল, মগের মুকুল নাকি জবাব দিয়ে দিলে? দেশে আইন কানুন নাই? চল তো যাই, বড় চাটুজ্যে কি করে তোকে জবাব দেয় দেখছি।’’ সাথের লোকজন বলে ‘‘থাক অনেকটা বেলা হয়ে গেল আজ এখন যেতে হবে ন। বিকেলে আমরা সবাই বসে তার পর ঠিক করব।’’ সেই মতো বিকেলের বৈঠকে ঠিক হয় হদ্যবাকে কোনো রকমেই চাটুজ্যেদের জমিতে ভাগ চাষের অধিকার থেকে উচ্ছেদ করা মানা হবে না। দরকারে সর্বত্র আবেদন নিবেদন করা হবে। তাতেও কাজ না হলে তখন লড়াইয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। সে ভাবাতেই বিডিও এসডিও, থানা, জমির মালিক এবং গ্রামের অধ্যক্ষকে দরখাস্তের মুশাবিদা করে সব চিঠি পোস্ট অফিসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। সবই হয়েছিল, কিন্তু কোথায় যেন কি সব বাধা আছে! এত চিঠি চাপাটির পর কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উল্টে পুলিশি হয়রানি বৃদ্ধি হয়। শেষে ঐ জমিতে হদ্যবাকে জোর করে চাষ করানোর সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে মদনচাঁদ লোকজন নিয়ে হদ্যবার জন্য মাঠে গিয়েছিল। হদ্যবাকে দিয়ে হাল বহিয়ে চাষের বন্দোবস্ত করে ফিরে আসার সময়ের ঘটনা। পাশের গ্রামের হাই স্কুলে পড়ত, ওর দুই ছেলে। একটি ক্লাস ইলেভেনে পড়ত আর একটি নাইনে পড়ত। তারা অন্য ছেলেদের সাথে স্কুল ছুটির পর ঐ চাটুজ্যেদের জমির পাশের রাস্তা দিয়েই—অন্য সব ছেলেদের সাথেই গ্রামে ফিরে আসছিল। এদিকে পরাজয়ের গ্লানিতে চাটুজ্যে বাড়ির মেজ চাটুজ্যে মাঠে

বন্দুক নিয়ে এলোপাথারি গুলি চালাতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় নিরস্ত্র জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়লেও মদনচাঁদের বড় ছেলেটি মেজে চাটুজ্যের গুলিতে রাস্তার ধারে লুটিয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে মদনচাঁদ আর স্থির থাকতে পারেনি আহত সন্তানকে উদ্ধার করতে দৌড়ে চলে গিয়েছিল ছেলের কাছে। কোলে তুলে নিয়েছিল নিজের আহত সন্তানকে। কিন্তু তাকে উদ্ধার করে আনার সুযোগ দেয়নি মেজ চাটুজ্যে আর তার দলবল। উল্টে সাথে আসা গুণ্ডাদের নিয়ে মদনচাঁদকেও প্রচণ্ড মারধোর করে বাপ বেটা দুজনেই মরে গিয়েছে ভেবে ওদের দুজনকে টেনে কাদা জমিতে ফেলে দিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল। পরে গ্রামের লোকেরা বাপ-বেটা দুজনকে উদ্ধার করে আনলেও ছেলেটা তখন আর জ্যান্ত ছিল না। আর মদনচাঁদকে মারাত্মক আহত অবস্থায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন পর মদনচাঁদ ফিরে আসে কিন্তু জোতদারের আঘাতের চিহ্ন তার কপালে চির দিনের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

এই চিহ্নের দিকে তাকিয়েই নিজের মনের কথা মনেই রেখে দেয় বলরাম। মনে মনে ভাবে ছিঃ ছিঃ ছিঃ কাকে কি বলতে যাচ্ছিলাম? মদনচাঁদের থেকে কমিউনিস্ট পার্টি করার যন্ত্রণা কে আর ভালো বুঝবে? ঠিকই তো প্রজাপতির উড়ান দেখতে গিয়ে শুয়োপোকার রোঁয়ার জ্বালা মদনচাঁদের থেকে কি কেউ ভালো বুঝবে। যে লোকটাকে ভাগচাষির অধিকার আদায়ের জন্য লড়তে গিয়ে নিজের সন্তানের লাশ মাঠের ধার থেকে তুলে আনতে হয়, তাকে কি নতুন করে কোনো ত্যাগের কথা স্মরণ করাতে হয়? মহা মূর্খের কাজ করতে যাচ্ছিল বলরাম। নিজেকে সামলে নেয় বলরাম। বলে ‘‘কাকা তুমি ঠিকই বলেছো অনেক সময় আমরা খুবই অধৈর্য হয়ে নানা অকথা কুকথা বলে ফেলছি, কিছু মনে করো না কাকা। কিন্তু কি করবো বলো কিভাবে এগোবো সেটা ধরতে না পেরেই হতাশা থেকে এসব কথা বার হয়ে যাচ্ছে।’’ মদন ওর কথাগুলো শুনে বুঝতে পারল বলরাম এতক্ষণ চেঁচামেচি করার জন্য অনুতপ্ত। বলল ‘‘ঠিক আছে, অত আর বলতে হবে না, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই হল। আসলে আমরা সবাই পথ খোঁজার চেষ্টা করছি। এ এক অজানা অপরিচিত পথ। নানা ভাবে এগুতে হচ্ছে এ পথে, সমস্যা, হতাশা, রাগ ক্ষোভ, বিক্ষোভ সবই থাকবে, কিন্তু পথচলা থামালে চলবে না—আমাদের চলতেই হবে। সে যাই হোক, এবার তোমরা সব কে কেমন কাজ করেছো তার ফিরিস্তিগুলো দাও তো বাপু। নে বলরাম তুই শুরু কর।’’

বলরাম শুরু করে—‘‘শুরু মানে ঐ নতুন ক্যাডার আনতে পারছি না, চেষ্টা তো করছি কিন্তু দু-দিন আসছে তো চার দিন পাত্তা নেই, ছেলে ধরার মতো খুঁজে ধরে নিয়ে আসতে হচ্ছে, ভালোই কাজ করছে, করতে করতে আবার উধাও। আবার ধরে আনা এই করছি। সংগঠনের কোনো মিটিং তাও যে খুব জোরদার করতে পারছি না।’’ খানিক থেকে আবার বলতে শুরু করে আবার, ‘‘আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আগে আমাদের বয়স্ক কমরেডদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো এরা নতুনদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছে, এখন বয়স্ক কমরেডরাই বলছেন নতুনদের নিয়ে এসো ওরা ভুল করলে করুক, কিন্তু নতুনদের আনতে হবে। নতুনদের আনতে গিয়ে এখন দেখছি উল্টো বিপদ হচ্ছে, তা হল, এখন যারা মাঝবয়সী দেখছি তাদের অনেকেই নতুনদের আসতে সব থেকে বেশি বাধা দিচ্ছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ওরা এলে এদের সম্মান দায়-দায়িত্ব সব চলে যাবে। এরা সব সময়ই নতুনদের খুঁত ধরছে। এ এক আজব ব্যাপার। কি করে যে এই সমস্যার সমাধান করব বুঝে উঠতে পারছি না’’? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে বলরাম সেক্রেটারি মহাদেবের দিকে তাকিয়ে খানিক থেমে যেন ইশারায় ওর মতামতের অপেক্ষা করতে থাকে। মহাদেব এর কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। মহাদেবকে উদ্ধার করতে আবার মদনচাঁদকে এগিয়ে আসতে হয়।

মদনচাঁদ বলে ‘‘দ্যাখ এসব সমস্যা থাকবেই যখন সরকারে ছিলাম না তখন এক সমস্যা ছিল, যখন সরকারে এলাম তখন আরেক সমস্যা হল। আর এখন যখন থেকে চলে গেলাম নতুন করে এই সমস্যা দেখা দিল। —দেবেই। এসব নতুন কিছু নয়, সবটাই একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে চলছে। তোমার ভাবনার সাথে চলবে না। তোমার চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের সরকারে না থাকা, সরকারে থাকা এবং সরকার থেকে চলে যাওয়ার বাস্তব সম্পর্কগুলো। আর এখন যারা পার্টিতে আছে বলে কয়েকজনের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল এরা অনেকে সরকারে থাকা এবং সরকার থেকে চলে যাওয়ার পর পার্টিতে এসেছে। কাজেই এদের বিচার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এই দুই ধরনের অবস্থানকে কেন্দ্র করে। আবার এখন যারা আসতে চাইছে তাদের বিচার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সরকারে না থাকা অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা। কাজেই এখন পার্টিতে তিন ধরনের লোক আমাদের পার্টি বিরাজ করছেন। একদল যারা পার্টিতে আসার সময় পার্টি সরকারে ছিল না, পরে পার্টি সরকারে আসে। আর এখন তো পার্টি সরকারে নেই। আরেক দল যারা পার্টি সরকারে থাকার সময় পার্টিতে এসেছিল কিন্তু এখন আর পার্টি সরকারে নাই। এছাড়া আরও একদল আছে যারা এখন পার্টিতে এসে গিয়েছে বা আসতে চাইছে তারা। এরা পার্টি সরকারে না থাকার সময় আসছে। কাজেই এই তিন ধরনের লোকের মধ্যে তিন রকমের বিরোধ থাকবেই। কিন্তু আমরা যারা পার্টিতে আছি তাদের এই তিন ধরনের বিরোধের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতেই হবে। আর এর জন্যই তো পার্টি। পার্টির কাজই হল সবটা একসাথে সংহত করে কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা নেতারা নিজেদের মধ্যে বসে সবটা মিটিয়ে নিতে পারছি না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সভাগুলো করছি না। ফলে সব কিছু বোঝাবুঝির জায়গাতে থাকছে না। এই কাজটা বাপু মহাদেব তোমাকে করতে হবে। এরকম ভাবে অগোছালো ভাবে কমিটির মিটিং করলে হবে না। সমস্যা নজরে পড়লেই তোমাকে সভা ডাকতে হবে।’’ সবাই ঘাড় নেড়ে এ কথার সমর্থন জানালে মহাদেব বলে ‘‘ঠিকই আছে মদনদা ঠিকই বলেছেন, এবার থেকে সেভাবেই কাজ করা হবে। তবে এটা ঠিক আমাদের মধ্যে এক দল কমরেড তৈরি হয়েছেন যারা খুব প্রবীণ বা নবীনও নন। তাদের একটা ভালো অংশ কিন্তু এখন আবার নবীন কমরেডদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এবং নেতৃত্বে তুলে আনার ক্ষেত্রে বড়ো ঢিলেমি করছেন—এ বিষয়ে এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে যে সব কমরেডরা চলেছেন তাদেরও বাস্তবতা বুঝতে হবে। এরাও বছর কুড়ি পরে প্রবীণ হবেন আর তখন দেখবেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাল ধরার কেউ নেই, তখন কিন্তু হাহুতাশ করলে চলবে না। অবশ্য ততদিনে বিপ্লব বা অন্য কিছু পরিবর্তন হয়ে গেলে আলাদা কথা।’’

মহাদেবের পাশেই বসে ছিল অনন্ত। হাই ইস্কুলের মাস্টার বেশ যুক্তি দিয়ে মেপে কথা বলতে অভ্যস্ত। বছর দুয়েক পার্টিতে এসেছে। বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা নিয়ে আসা, পড়া-লেখা সবের

মধ্যেই থাকে—ছোট থেকে এলাকায় ভালো ছেলে সজ্জন পরিবারের সন্তান বলেই ওকে সবাই জেনে। আজকে বসে বসে মদনচাঁদের সাথে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে তত্ত্বের আকারে সাজিয়ে সভার মধ্যে রেখে দিলেন। কোনো দিনও মদনচাঁদের পড়ালেখার দৌড় সাহস করে জানতে ইচ্ছে প্রকাশ করেনি অনন্ত। অনন্তর ধারণা এই পার্টি কমিটির মধ্যে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত। আর কামিটির সবাই সেটা মনেও করে। এ জন্য বিভিন্ন সাধারণ সভা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সবাই ওরই নাম প্রস্তাব করে। অনন্ত এ কাজটা ভালোই করে। প্রকাশ না করলেও এটা নিয়ে ওর খানিকটা অহং ভাবও আছে। কিন্তু ওর মনের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রশ্নে একা প্রশ্নবোধক চিহ্ন কাজ করে। তা হল পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা থাকা যেমন খুবই প্রয়োজন তেমনি তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ধরনের গণতান্ত্রিক ভাবে আলোচনা দরকার তার মনে হয় কিছু ঘাটতি আছে। যেমন, সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার আগে বিষয়টি তো আলোচনার স্তরে থাকে অর্থাৎ বৈঠকখানায়। অর্থাৎ তখনো বিষয়টি আলোচিত হয়ে বৈঠকখানা থেকে ঘরের অন্দর মহলে ঢোকেনি। কিন্তু যে বিষয়টি যখন বৈঠকখানায় থাকে তখনও তাকে নিয়ে আলোচনা করতেও কেমন যেমন দ্বিধা! নেতা প্রস্তাব করেছেন তাহলে ঠিকই আছে—কিন্তু করা হোক, এরকম ভাব! কিন্তু যিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, তিনি আর সংখ্যাধিক্য দেখে মুখই খুললেন না—মিনি-মিনে গলায় নিমরাজি হয়ে সবার সাথে হাত তোলেন। এখানেই অনন্তর প্রশ্ন—আচ্ছা মানুষ রাজি না হয়েও কেন হাত তোলেন? যদি না তোলেন? জোরের সাথে যুক্তি দিয়ে যদি কথা বলেন? তাহলে কি তার সবার সামনে হেয় হবার সম্ভাবনা থাকে? না এটা মানসিক হীনমন্যতা? ওকে আবার দু-চার কথা শুনতে হবে? আমার বলে তো কিছুই হবে না, যা হবার তা তো ঠিকই হয়ে আছে, কি দরকার এসব বিতর্কে যাবার? —এই মানসিকতা? আর এ ধরনের মানসিকতা কেন হয় সেটাও বুঝতে পারে না অনন্ত।

কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেও যে এই মানসিকতার শিকার হয়ে পড়ছে সেটা অস্বীকার করতে পারছে কই? অনন্তর মনে হয় কমরেডদের এই ধরনের মানসিকতা কাটাতে পারে পার্টির সেই কমিটির যে বা যারা নেতা তারাই। তারা যদি কমরেডদের মধ্যে এই অভয়বাণীর সৃষ্টি করতে পারেন যে অহেতুক বিতর্কের জন্য বা বিরোধিতার জন্য বিতর্ক নয় কিন্তু আপনারা মন খুলে আলোচনা করুন। একমত না হলে বার বার সহমতের জন্য আলোচনা করুন, নিতান্তই অনন্যোপায় হলে অবশ্যই ভোট করতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা পালিত হবে। কিন্তু বিজয়ী আর বিজেতার মধ্যে যেন কোনো দ্বেষ না থাকে সেই মানসিকতা নেতৃত্বের মধ্যে আবশ্যিক গুণ হিসেবে থাকা দরকার। এটা মনে হয় থাকছে না, আর এই কারণেই পার্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে ফেলছে। এটা দূর করার জন্যও ইস্যু-টু-ইস্যু আলোচনা বা সভা করা দরকার। অনন্ত এই সব ভেবে চিন্তে মদনচাঁদের কথার রেশ ধরে বলল ‘‘মদনদা ঠিকই বলেছেন, আসলে পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলাটাও নেতৃত্বের কর্তব্য। প্রয়োজনমাফিক সভাগুলো এই প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমরা যদি সময়ের প্রয়োজন সভাগুলো আরো সময় মতো করতে পারি, মনে হয় এসব সমস্যা কেটে যাবে। আর তুমি তো জান মহাদেব আধুনিক যুগে এখন কত লেখা সামনে আসছে, তাতে পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নিয়েও অনেক গবেষণাধর্মী লেখা পত্র বার হচ্ছে। আমরা অনেকেই এসব খোঁজ খবর রাখছি না। এখন তো গণতন্ত্র নিয়ে গ্রামসী, ফুকো, লুকাচ, নতুন করে চর্চার মধ্যে চলে এসেছে।’’ মহাদেব চোখ টিপে অনন্তকে নিষেধ করে এসব নিয়ে আর আলোচনাকে গভীর করে না তুলতে কারণ এই কমিটির মিটিংয়ে যারা উপস্থিত থাকেন তারা মার্কস, মাও-সে-তুং, লেনিন, স্তালিন এবং হোচিমিন সম্বন্ধে যতটা পরিচিত গ্রামসী, ফুকো, লুকাচ, এদের নিয়ে তারা বিন্দু বিসর্গ প্রায় কিছুই জানেন না, উল্টে বাকিরা বিরক্ত হবেন। তাই যাতে এই আলোচনাতে ঢুকে সবটা মাঠে না মারা যায় সে কারণেই বলল ‘‘থাক এসব আলোচনা আর এত উচ্চ মার্গের আলোচনাতে কি দরকার মোট কথা পার্টিকে গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালনা করলেই আমরা অনেক সময় সমস্যার সমাধানের রাস্তা পেয়ে যাব।’’ আবার বিতর্ক শুরু করে অনন্ত ‘‘প্রশ্ন তো সেখানেই, আমরা তা করছি কি? যাকেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সে বা তারা কয়েকজন একটা আধিপত্যবাদী মানসিকতা নিয়ে সংগঠনের কাজ শুরু করছে—কিন্তু প্রশ্ন তো প্রকৃত গণতন্ত্রর আর সংগঠনের মধ্যে? গণতন্ত্র অবহেলিত হলেই নানা সমস্যা দেখা দেবে। অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের কথা বলা আর নিজেদের কাজের গণতান্ত্রিক ধারা প্রয়োগ করে কাজ করা, দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। আর এসব নিয়ে আলোচনার সুযোগ কই? এটা না থাকার জন্যই তো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কেবলমাত্র কথার কথাতে পরিণত হয়েছে, সেতো আর তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না।’’

এসব কথাবার্তা শুনতে শুনতে উপস্থিত বাকি আরো তিন জন কমরেড হাই তুলতে শুরু করে দিয়েছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না—শুধু ভাবতে থাকে ‘‘এরা কি শুরু করল? সবাই মিলে মিটিং করব মন খুলে কথা বলব তার পর যা হবে সেটা সবাই মিলে করব—নিজের মতো তাতে থাকুক আর না থাকুক—এটাই তো এত দিন শিখে এসেছে। এতো দেখছি নতুন নতুন কথার মোড়কে সব গোলমাল করে দেবার ব্যবস্থা!’’ বিরক্ত হয়ে এদেরই একজন চরণ বাগ্দি বলে উঠল ‘‘দ্যাখ বাপু, সারা দিনে মাঠে হাল বয়ে আমার জান কয়লা হয়ে গিয়েছে আজ মিটিং এসেছিলাম যাতে গতবারের মতো ধান আমাদেরকে দালালদের কাছে বিক্রি করতে না হয়, ঠিকঠাক দাম পাই তার জন্য। একটা আন্দোলনের কর্মসূচি নেবার কথা বলতে। সেটা আগে ঠিক করতো! একদিন সবাই ব্লক অফিসে চল ওখানে হৈ-হল্লা করলে যদি কিছু হয় সেরকম একটা রাস্তা খুঁজে বার কর। তারপর না হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা লাগু করার জন্য কি কি দুর্বলতা আছ আমরা সবাই মিলে একসাথে খুঁজে বার করব। এখন এ বছর যে ভাবে বৃষ্টি বাদল হচ্ছে তাতে অন্য কোনো অঘটন না ঘটলে আমাদের ধানের ফলন ভালোই হবে বলে মনে হচ্ছে। এবার সমস্যা হবে ধান বিক্রি করা নিয়ে। একটা উপায় বার করতো?’’ আলোচনান্তে ঠিক হল সমনের মঙ্গলবার একটা ভালো মতন জমায়েত করে যাতে সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে কাছাকাছি কোনো এলাকা থেকে এবার ধান কেনার ব্যবস্থা করে তার জন্য আর সরকার থেকে এবার গম এবং তৈল বীজ বিনামূল্যে চাষিদের সরবরাহ করার জন্য বিডিও অফিসে একটা ডেপুটেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সবটা শুনে অনন্ত বলল ‘‘আমি কিন্তু থাকতে পারব না আমার ইস্কুল আছে আর ইস্কুল কামাই করে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।’’ মহাদেব

ওকে ওই দিনটি ছুটি নিয়ে থাকতে বললেও রাজি হল না, বলল—“এবছর হাতে মাত্র কয়েকটা ছুটি বকেয়া আছে সামনে, মাঘ মাসে ছেলেটার পৈতে, ছুটি শেষ হলে তখন অসুবিধা হবে”। কি আর করা যাবে? ও যখন যেতেই রাজি নয় তখন আর জোর করে কি হবে? তাই আর কথা না বাড়িয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ বলে ঘোষণা করল মদনচাঁদ।

মিটিং শেষ! সবাই যে যার মতো করে সাথেই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল। সভা শেষ হলেও মদনচাঁদ, চরণ বাগদী, আর সবে পার্টিতে আসা কলেজ পড়ুয়া—সুমন্ত তখনো বসে আছে। বাকিদের চলে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মদনচাঁদ। মনে অজস্র চিন্তা ভিড় করে আসে। সবাই যে মিটিং শেষে দু-দণ্ড বসে কথা বলবে তা নয়। মিটিং শেষ তো বসে থাকাও শেষ! একটু বসে নিজেরা নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতেও ভুলে গিয়েছে। বাড়িতে যেন কোনো মহা মূল্যবান সম্পদ ফেলে এসেছে না গেলে সব চলে যাবে অতএব এখানে বসে থাকার কি দরকার চলো যে যার বাড়ি যত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে ততই ভালো। মদনচাঁদ ভাবে এরা কেন পরস্পরের সাথে এত বিচ্ছিন্ন? কেন কমরেডদের সাথে খানিক বসে মন খুলে কথা বলতে পারে না? এদের ব্যবহার আচরণ সবটাই কেন এত আনুষ্ঠানিক? নিজেদের মধ্যে খোলামেলা সম্পর্কটি ছিল তা কেন হারিয়ে যাচ্ছে? ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনেই বলে উঠল মদনচাঁদ “যাও বাবা যাও, ঘরে সাত রাজার ধন মানিক রাখা আছে —না গেলে লুটপাট হয়ে যাবে, যাও বাবা তাড়াতাড়ি যাও”।—“বিড়বিড় করে কি বলছো গো মদনদা”! মদন উত্তর দেয়, কি আর বলব ভাই। কেমন করে সব পাল্টে যাচ্ছে তাই দেখছি, নিজের ভাবনাগুলো কেমন ওলোট পালট হয়ে যাচ্ছে।” এবার চরণও ওঠার তোরজোড় করতে করতে মহাদেবকে বলল “তা ভাই সামনের মঙ্গলবার ব্লক অফিসে যেতে গেলে তো কিছু লেখালেখি করতে হবে, বিডিওকে একটা কিছু লিখে দিতে হবে। আমি তো মুখ্য মানুষ অত লেখালেখি হবে না, তুমি তাহলে একটা কাগজ রেডি করে রেখো! আর কিছু কাগজের পোস্টার লিখতে হবে। অনন্ত মাস্টার তো ভালোই লেখে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কেমন সুন্দর পোস্টার লিখে সবাই মিলে কি সুন্দর সেজে-গুজে বার হয়েছিল দেখেছিলে? ভাবলাম ওকেই বলি কটা পোস্টার লিখে দিতে। তা ওই তো বলল যে ইস্কুলে ছুটি নিয়ে থাকতে পারবে না—কি হবে ওকে বলে?” ওর কথায় সায় দেয় মদনচাঁদ।

মহাদেবকে ব্লক অফিসে যেতে গেলে কি কি করা দরকার তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে বলে—“এগুলো তুই সব জানিস তবুও বলে রাখলাম, আর প্রচারের দিকটা কাল থেকে পাড়ার ছেলে-ছোকরাগুলোকে বলে ঘুরে ঘুরে করতে হবে—দরকারে সুমন্ত খানিকটা সাহায্য করবে। তবে মূল যারা চাষ-বাস করে তাদের ভালো করে ডেকে নিয়ে যেতে হবে। সব চাষিদের একদিন সন্ধ্যাবেলা ডাকার ব্যবস্থা চরণকে করতে হবে।” এর পর এটা ওটা নানা কথা শুরু হয় নিজেদের মধ্যে। সুমন্তর দিকে তাকিয়ে মদনচাঁদ বলে, “হ্যাঁরে ওই অনন্ত অনেকগুলো দার্শনিকদের নামটাম বলছিল আমরা তো ওসব নামটাম শুনিনি, আমাদের কাছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন, মাও-সে-তুং, লিউশাও চি, হোচিমিন—এই পর্যন্ত দৌড়, তা এরা কোন দেশে বিপ্লব করেছে? আর এদের কিই বা লেখা আছে, তুই জানিস? তোরা তো কলেজে পড়েছিস, অনেক অনেক নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আলোচনা করছিস—এইসব দার্শনিকদের মূল কথা কি বলতো? আসলে ওই অনন্ত মাস্টারকে আর তোদের সবার সামনে লজ্জাতে এদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না—তুই জানিস কিছু?” মহাদেবের দিকেও তাকিয়ে মদনচাঁদ যেন জানতে চাইছে ওরও এ বিষয়ে কিছু জানা আছে কিনা সেকথা? মহাদেব আর সুমন্ত দুজনেই ঘাড় নাড়িয়ে এ বিষয়ে নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে। তবে সুমন্ত বলে “এ অনেক ব্যাপার দাদু। আমাদের ছেলেদের মধ্যে আজকাল গ্রামসী, ফুকো এদের নিয়ে চর্চা একটা বিশাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি ভাবতে পারবে না নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত অংশের মধ্যে এর দারুন প্রভাব! কিভাবে জনগণের গণতন্ত্রকে আরো বেশি করে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রসারিত করা যায় তা নিয়ে এদের অবদান অসামান্য। শুধু তাই নয়, এই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে গেল, তার জন্য কি ধরনের মেকানিজম দায়ী, এসব নিয়ে অনেক আগেই নাকি গ্রামসী আভাস দিয়েছেন। পার্টির মধ্যে বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতার অপার শক্তির ব্যাখ্যা আছে গ্রামসীর লেখাতে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে কেমন করে আরো গণতান্ত্রিক করা যায় তা নিয়েও গামসীর লেখা আছে। আমরা অত সব এখন বুঝতে পারছি না তবে এরা মার্কসবাদের প্রায়োগিক দিক থেকে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রসারিত গণতন্ত্রর ব্যবস্থা এবং জনগণের বৌদ্ধিক এবং জাগতিক উন্নয়নের জন্য তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দুরন্ত সব লেখাপত্র লিখেছেন। ১৯৯০-এর পর থেকে ওদের লেখাপত্র নিয়ে আরো ভালোভাবে আলোচনার দুয়ার খুলে গিয়েছে”। অবাক হয়ে সুমন্তর কথাগুলো শুনছিল মদনচাঁদ। এবার ওঠার পালা। সুমন্তকে বলল “আমার বাপু অত পড়াশুনা নাই। সময় থাকলে তোর কাছে একদিন বসে ওদের লেখাপত্তর নিয়ে কাছে কিছু জানব।” সুমন্ত রাজি হয়ে ঘাড় নেড়ে বলে—ঠিক আছে, একদিন আপনার সাথে এসব নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। তবে এদের সম্বন্ধে আরেক জনের কাছে আপনি আরো বেশি ভালো ভাবে জানতে পারবেন, তিনি হলেন আপনার পুত্রবধূ, আপনার ছোট ছেলে স্বপনদার স্ত্রী। সে তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা আর গ্রামসি নিয়ে কিছু দিন আগে আমাদের ইউনিভার্সিটির সেমিনারে ওর আলোচনা এবং লেখাটি ভীষণভাবে সমাদৃত এবং সম্মানিত হয়েছে।

মদনচাঁদের ছোট ছেলে আর ওর স্ত্রী দুজনেই একটা নামি কলেজে অধ্যাপনা করে কিন্তু এবিয়ে যে ছোট বৌমায়ের যে আলাদা জগৎ আছে সেটা মদনচাঁদ জানত না। অবাক হয়ে বলল “তাই নাকি, তাহলে তো ভালোই হল, ওর কাছেই খানিকটা জেনে নেব”। সুমন্ত বলে “সেটাই ভালো, আমি আর কি জানি? ওই সামান্য যেটুকু শুনেছি আর কিছু কিছু পড়ছি ওই। এর মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বিষয়, রাষ্ট্র সম্বন্ধে ওর ভাবনা, ওয়ার্কিং ক্লাস শব্দ ব্যবহার না করে সাব অলটার্ন শব্দের প্রয়োগ করে অনেক কিছু লিখেছেন। আর রাষ্ট্র ক্ষমতার বিষয়ে হেজিমনি বলে একটা নতুন ধারণা নিয়ে এসেছেন—বিষয়টি কিন্তু দারুন ইন্টারেস্টিং”। অবাক হয়ে মদনচাঁদ বলে “তাই নাকি? তাহলে তো খানিকটা জানতে হয়—তবে আর বইপত্র পড়ে জানবই বা কখন আর কিই বা প্রয়োগ করব? আমাদের জীবনের চাকা এখন আমাদের জীবনের চাকা ঢালের দিকে নামতে শুরু করেছে—তোদের অনেক দিন কাজ করতে হবে সংগঠন করতে হবে। তোদের এসব জানতে বুঝতে হবে, না হলে যুগের

তালের সঙ্গে পিছিয়ে পড়তে হবে।" এবার মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে বলে "এই মহাদেব এখন বেশ ভালো ভাবে শ্রমিক ইউনিয়ন করছে। তোদের এখন এসব বইপত্র পড়া জানা বোঝা দরকার। এক এমন যুগে আমরা চলে এসেছি যেখানে যা কিছু পুরাতন, তাকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সনাতন সত্য বলেও কথা আছে? সে সব অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই—কিন্তু সত্য সম্বন্ধেও ধারণাগুলোকে সব কেমন যেন পাল্টে দেবার প্রবণতা শুরু হয়েছে। এ এক সর্বনাশা ধ্বংসাত্মক প্রবণতা। দেখ, যদি তোরা কিছু করতে পারিস? তবে এটাও ঠিক, শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্ব চিরকালীন, এই দ্বন্দ্বকে লঘু করে দেখানোর যে কোনো প্রবণতা মার্কসবাদের মুলগত ধারণার প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা। এই ধারণার বিরুদ্ধে যেকোনো মতবাদ আমাদের মিলিত ইচ্ছার বিরুদ্ধের ধারণা। একে কোনো মতেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এটাই আমরা ছোট থেকে শিখে এসেছি।" সুমন্ত সবটা শুনে বলে "ঠিকই বলেছো দাদু, কিন্তু ডাইলেটিক্যালি মার্কসবাদও একটা জায়গাতে থেমে থাকতে পারে না। মার্কস এঙ্গেলসের সব লেখা আমাদের সামনে চলে এসেছে—এমনটাও নয়। এখনো এদের অনেক অনেক নতুন নতুন লেখাপত্র পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের নানা চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে। এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকে এদের লেখাপত্র, তার ব্যাখ্যাও নানাভাবে নানা জন নানাভাবে করে চলেছেন। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য সবটা আমাদের সামনে আসেনি। মার্কসবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লেনিন, স্তালিন, মাও, হোচিমিনদের ব্যাখ্যার বাইরেও যে-সব ব্যাখ্যা আছে তার দুয়ারে বিংশ শতকের নয়ের দশকের আগে থেকে কেন যে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তা আমাদের মতো অনেকেরই বোধগম্য নয়। নয় এর দশকের পর একটু একটু করে খুলতে শুরু করেছে, অনেক বিষয় সামনে আসছে। আর এখন মনে হচ্ছে। সত্যিই তো, যদি এভাবে মার্কসবাদকে সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো প্রয়োগ করতো, তা হলে মনে হয় এভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পতন হতো না। আমাদের দেশেও এমন অবস্থা থাকতো না—সাম্রাজ্যবাদও এত আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগোতে পারত না।" মার্কসবাদ প্রয়োগের ভেতরেই কোথাও গোলমাল।"

মদনচাঁদ কি আর উত্তর দেবে? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে "ঠিক আছে, নাতি সাহেব, অনেক আলোচনা হল, বেশ কিছু জানলাম, এবার ওঠা যাক। পরে একদিন তোমার কাছে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মার্কসবাদী ভাবনা নিয়ে তোমরা নতুন প্রজন্মের কমরেডেরা কি ভাবছো শোনা যাবে। তুমি আরো ভালো ভাবে পড়াশোনা করে সবটা বোঝার চেষ্টা কর। আমার মতো পুরনো মানুষরা সবটা বিনা বাক্যব্যায়ে মানতে পারে না। হাজারো প্রশ্ন থাকে, অধৈর্য না হয়ে যা পারবে তার জবাব দিতে হবে কিন্তু"। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় সুমন্ত। কথায় কথায় সন্ধ্যা নেমে পড়ে। ওরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে-যার বাড়ির রাস্তা ধরে। মদনচাঁদকে খানিকটা এগিয়ে দিতে আসে সুমন্ত আর মহাদেব। পথ চলতে চলতে মহাদেব বলে "দাদা একটা জিনিস কিন্তু আমাদের পাটিতে ভালো হচ্ছে তা হল এই সব নতুন নতুন ছেলে ছোকরারা আমাদের পার্টিতে আসার ফলে আমরাও অনক কিছু নতুন নতুন জিনিস জানতে বুঝতে পারছি—সেই আদ্দিকালের ধারণার বাইরেও যে নতুন নতুন ধারণা মার্কসবাদী ভাবনার বিকাশের জন্য কাজ করছে, আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না। অন্ততপক্ষে সে দিক থেকে আমরা বেশ কিছু ভাবনার খোরাক পাচ্ছি। এসব এক বাক্যে ফেলে দেবার নয়।" মদনচাঁদও সমর্থন জানায় মহাদেবকে, বলে—"ঠিকই তো—জানার বোঝার শেষ নাই আর কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের তো নাইই।"

কথায় কথায় ওরা ততক্ষণে মদনচাঁদের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। সবাইকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে মদনচাঁদ। বাড়ি ঢুকে প্রথমই ক্ষ্যান্তামনির কাছে একটু রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মুখঝামটা শুনতে হয় মদনচাঁদকে। তারপর আজ লেভির টাকাটা নিয়ে টেবিলে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল ওটা ওখানেই আছে পার্টির টাকা সময়মতো জমা হল না সেটা নিয়েও দু-চার কথা ক্ষ্যান্তামনি শুনিয়ে দিল মদনচাঁদকে। বুড়ো ভাম, টাকা পয়সা পার্টিতে জমা করতে ভুলে গেলে তার তো মাথা কাজ করছে না বলে ধরে নিতে হবে। "কমিউনিস্ট পার্টি কেজো মাথার পার্টি—অকেজো মাথা নিয়ে কাজ হয় না" সে কথা বারবার মদনচাঁদকে মনে পড়িয়ে দিতে ছাড়ে না। মদনচাঁদও ক্ষ্যান্তামনিকে এসব বকবক করার সময় কিছু বলে না। আসলে এত বছর হয়ে গেলেও নিজের প্রথম সন্তানের ওই নারকীয় মৃত্যু এখনো ভুলতে পারেনি ক্ষ্যান্তামনি। সেটা ভালোই বোঝে মদনচাঁদ আর সে জন্যই ওর মুখের ওপর অনেক দিনই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। নিজের সন্তানকে বলি দিয়েও স্বামীকে তার পরেও পার্টিরে কাজ ছেড়ে দিয়ে গোটা ঘর সংসার সামলে ছোট ছেলেটিকে মানুষ করা, শিক্ষিত করা, এসব কম কথা নয়। বাড়ির সবটাই তো দেখে ক্ষ্যান্তামণি। তবুও মাঝে মাঝে কমরেডেরা টিপন্নী কাটে "মদনচাঁদ বড় নেতা হলে কি হবে ওর বউটাকে মাঝে সাঝে দু-চারটে মিছিল মিটিং ছাড়া নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো পার্টির কর্মসূচিতে দেখেছে? নিজে বৌটাকে যে বার করা, পার্টির কাজ করানো, তা কিন্তু করবে না"। সব জানে মদনচাঁদ ইচ্ছে হয় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে—আবার ভাবে কি হবে? ওরা বলছে বলুক। বাড়িতেও আজ ক্ষ্যান্তামনির গজগজানিকে কেয়ার না করে পা পা ধুয়ে খাবার টেবিলে সবাই মিলে খেতে বসল।

খেতে বসে মদনচাঁদ ছোট বৌমা মিলিকে জিজ্ঞেস করল "আচ্ছা মিলি, তোমার ঐ গ্রামসীর আধিপত্য বিষয়টি কি? একটু অবাকই হল মিলি। সাধারণত শ্বশুরমশাই ওর সাথে আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেন না। আজ হঠাৎ করে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় একটু অবাক হয়েই পাল্টা জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের আলোচনায় আজকাল গ্রামসীর হেজিমনি মানে আধিপত্য নিয়েও আলোচনা হচ্ছে? দারুণ ব্যাপার তো! মিলি আর মদনচাঁদের কথার দিকে কোনা ধ্যান না দিলেও গ্রামের হেনিমুনীর নাম শুনে একটু নড়েচড়ে বসে, আধ-খাওয়া রুটিটা তাড়াতাড়ি গিলে, ওদের কথার মাঝে ঢুকে রেগে মেগে সামনে ছেলে-বৌ আছে তবুও সব ভুলে ক্ষ্যান্তামণি বলল "ও তাই আজ বুড়ো মিনসের ফিরতে রাত হল? এখন পার্টির মিটিং-এ গ্রামের হেনিমুনীরও আলোচনা? তা তো হবেই। ও মাগীর অমন আঁটুনি মার্কা শরীর দেখে খুব সখ জেগেছে?" অপ্রস্তুত হয়ে মিলি আর মদনচাঁদ ক্ষ্যান্তামনিকে থামাকে চেষ্টা করে। কে থামে? ক্ষ্যান্তামনি রাগ থামেনি বলেই চলেছে "মাগীর দেমাক কত? করিস তো বাড়ি বাড়ি পোঙ্কার শাক বিক্রি, যা দাম বলবি তাতেই নিতে হবে, কম করতে বললে, বলবে নিতে হয় নাও, না নিতে হয় দাম কমাব না যাও, বলে মুখ বেঁকিয়ে চলে যাবে। উপায় না থাকলে বাধ্য হয়ে নিতে হয়—কাল সকালে আসুক বিক্রি করতে, দেখাব মজা"। ব্যাপারটা ঘোরালো

হয়ে যচ্ছে বুঝে মদনচাঁদ বলল ‘‘আঃ তুমি ভুল বুঝছো। কথাটা হল গ্রামসী আর হেজিমনি ওটা তোমার গ্রামের হেনিমুনি নয়’’। কে কার কথা শোনে? ক্ষ্যান্তামনির ঐ এক গোঁ, বলে, ‘‘এখন কথা ঘোরালে কি হবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ম্যাগো লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে? এই বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ’’? খাওয়ার থালা ছেড়ে উঠে পড়ে ক্ষ্যান্তামনি। বেগতিক দেখে সবাই মিলে জোর করে ওকে আবার খেতে বসায়। এবার মিলি বলে, মা, আপনি ভুল বুঝেছেন। এটা গ্রামের হেনিমুনী পিসির ব্যাপার নয়। এটা মার্কসবাদের পড়াশুনার বিষয়। এই যে আপনি রাগ করে উঠে গেলেন, আমরা আপনাকে ভালোবাসি বলে ধরে বসালাম, এটা হল আপনার হেজিমনি বা আধিপত্য। আর ঐ গ্রামের হেনিমুনি দাম কমাবে না বলে বিক্রি না করে চলে যায়, তখন কেউ খুব দরকার হলে বাধ্য হয়ে ওর কাছে জিনিস কেনে, আবার কেউ কেনে না, কেউ তো দরকারেও কেনে না, এটা হল আরেক ধরনের আধিপত্য বা হেজিমনি। আপনি কোনটা পছন্দ করবেন আপনারটা না ওরটা?’’ —ক্ষান্তামনি বলে ‘‘ম্যা গো ও মাগীরটা কে পছন্দ করবে? ওকে কেউ ভালোবাসে? আমাকে সবাই ভালোবাসে, তোরা কত ভালোবাসিস। আমারটা থাকবে।’’

মিলি বলে ‘‘ঠিক বলেছেন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আপনার মতো হেজিমনি বা আধিপত্য থাকা দরকার—যাতে ক্ষমতা থাকলেও ভয় আতঙ্ক থাকবে না—থাকবে ভালোবাসা। এটা না থাকলেই যত গণ্ডগোল। এখন এই হেজিমিনি বা আধিপত্যকে নানা ভাগে ভাগ করে দেখাতে চেয়েছেন গ্রামসী, উনি দেখিয়েছেন এই আধিপত্য কিভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সর্বত্র সব ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় বজায় থাকে। কমিউনিস্ট পার্টিতে বা সরকারের মধ্যেও থাকে—কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যবহার হতে হবে মানবিক ও ভালোবাসার। এ কথাই গ্রামসী বলেছেন।’’ আর বলতে হল না মদনচাঁদের কাছে গ্রামসীর আধিপত্যের বিষটি মোটা দাগে পরিষ্কার হল। কিন্তু মদনচাঁদের মনে একটা প্রশ্ন থেকে গেল, তা হল, ক্ষমতা আর আধিপত্যকে একই ভাবে ব্যাখা করার একটা চেষ্টা চেষ্টা শুরু হবে যদিও দুটো একই বিষয় নয়—ক্ষমতা দখল করতে হয়; আর আধিপত্য কায়েম করতে হয়। কোনো জিনিস কায়েম করতে গেলে কায়েমকারী এবং যার উপরে তা কায়েম করা হচ্ছে সেখানে একটা সম্মতি দরকার—যার প্রয়োজন ক্ষমতার ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু এসব নিয়ে আর তর্কে যাবার ইচ্ছে হল না। মদনচাঁদের ইচ্ছে না হলেও ক্ষ্যান্তামনি থামবে কেন সে বলে উঠল ‘‘কিন্তু সরকারের এই ভালোবাসা না থাকলে কি হবে? আমার ছেলেকে যখন গুলি করে মারে, তখন তো আমি তাকে পাল্টাবোই—ভালোবাসা দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়?’’ গরিব মানুষকে লড়াইয়ের জন্য যারা মারে। তাদের খতম করার জন্য এই লোকটা কি বলেছে সেটা বল’’? এবার মিলি বলে উনি তো জেলখানার মধ্যে বসে লিখেছিলেন সে জন্য অনেক কথা স্পষ্ট করে না বলে কিছু কিছু নতুন ধরনের শব্দের বাক্যের মাধ্যমে লিখেছেন। সরাসরি লিখলে ওর এসব লেখা বাইরে আসত? সব নষ্ট করে দিত। এই জন্যই একটু কায়দা করে লিখেছেন’’? ক্ষ্যান্তামনি কি বুঝল কে জানে বলল ‘‘ও একমাত্র তোমার মতো মানুষদের জন্যই তাহলে লিখেছে? সাধারণ কম জানা মানুষের তাহলে তো বাপের সাধ্য হবে না ওর কথা বুঝতে?’’ —মিলি ঢোক গিলে বলে তা নয়, তবে সবাই যাতে বুঝতে পারেন। তার জন্য বুদ্ধিজীবী সমাজের দায়িত্বের কথা তিনি বলেছেন।’’

মিলি এবার মদনচাঁদকে বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করে সেখানে অরগ্যানিক ইনঅরগ্যানিক বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে নানা কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করে। পার্টির সব কর্মী নেতাদের কেন অরগ্যানিক বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করার দায়িত্ব পার্টিকে নিতে হবে এসব আলোচনা চলতে থাকে। ক্ষ্যান্তামনি হাঁ করে ওদের কথা শুনতে শুনতে বলে বলে ‘‘তাহলে যে বুদ্ধিজীবীরা মানে যারা মানুষকে বুদ্ধির খেলাতে বুঝদার করে গড়ে তোলে তাদের কোনো ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ভরসাতে কমিউনিস্ট পার্টি করা যাবে না। যারা ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ভরসাতে পার্টি করবে তারা সব বড় লোকদের সেবা করে তাই তো’’? মিলি বলে ঠিক বলেছেন। উৎসাহী হয়ে হয়ে ক্ষ্যান্তামনি বলে বসে ‘‘তাহলে বুদ্ধিজীবীদের ভিতর যদি আরমান বুদ্ধিজীবী আর আন আরমান বুদ্ধিজীবী থাকে? কথাটা সংশোধন করে মদনচাঁদ বলে ‘আরমান —আর আন-আরমান নয়, অরগ্যানিক আর ইন-অরগ্যানিক’ মাঝে বাধা পেয়ে রেগে ক্ষ্যান্তামনি বলে ‘ওই হল, একই ব্যাপার তাহলে তো পার্টির ভিতরেও আরমান আর আন-আরমান পার্টি মেম্বারও আছে?’’ কথাটা শুনে থ হয়ে যায় মিলি! সত্যিই তো! এটা তো ভাবেনি? মদনচাঁদ ক্ষ্যান্তামনির কথাটা ফেলে দিতে পারে না। এমনটা তো হামেশাই হয়ে থাকে। মদনচাঁদ ক্ষ্যান্তামনিকে সমর্থন করে বলে ‘‘তা এ নিয়ে কি তোমাদের গ্রামসী কিছু বলেছে নাকি?’’ কোনো যুৎসই জবাব ছিল না মিলির কাছে বলে ‘‘দেখতে হবে। — তবে বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন গ্রামসী। এটাও এখন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।’’ আবার ক্ষ্যান্তামণি ফুট কাটে ‘‘বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ সেটা আবার কি? যে বুদ্ধির কাজ করে সেই বুদ্ধিজীবী? সব মানুষই কোনো না কোনা বুদ্ধির কাজ করে। সবাইকে তার নিজ নিজ কাজের বিকাশ ঘটাতে বুদ্ধির কাজ করতে হয়’’। মিলি উত্তর দেয় ‘‘ঠিক বলেছেন মা, কিন্তু গ্রামসী এমন বুদ্ধিজীবীর বিকাশের কথা বলেননি। সেই হিসাবে আপনার ছেলেও তো ডিমের অমলেট আর ভাত রান্না করতে পারে, আপনি কি তাকে রাঁধুনি বলবেন?’’ ক্ষ্যান্তামণি বলে ‘‘দূর ওর রান্না মুখে দেওয়া যায়? ও কি করে রাঁধুনি হবে—ওকে রাঁধুনিই বলা যাবে না।’’ এই উত্তরের জন্যেই যে অপেক্ষা করছিল মিলি। বলল—‘‘আসলে কি জানেন গ্রামসীও ঠিক সেই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে বলতে চেয়েছেন যাঁরা তাদের কাজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ও সাধারণ জনসমাজকে গড়ে তুলতে পারবেন। এদের কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা গ্রামসী আলোচনা করেছেন। এরা কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকারকে জনগণের কল্যাণে আরো বেশি করে পরিচালিত করতে পারেন, সে কথাই বলেছেন।

এছাড়াও সর্বহারার প্রসঙ্গে তিনি ‘সাবঅলর্টান’ গোদা বাংলাতে ‘অধস্তন’ বলে একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন। উনি সাবঅলটার্ন বলতে যারা নিম্নস্তরের মানুষ শুধুমাত্র কায়িক শ্রমের এবং অল্প হলেও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে জীবনধারণ করেন, এমন লোকেদের কথা বলেছেন। এরাই সমাজের মূল চালিকাশক্তি। সে কথাও বলেছেন। এদের সংগঠিত করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে। এছাড়া প্রকৃত শিক্ষা, শহর এবং গ্রামে বুদ্ধিজীবীদের

অবস্থান, আবার রাষ্ট্র নিয়েও গ্রামসী অনেক কথা বলেছেন।

যেমন বলতে চেয়েছিলেন, কমিউনিস্টদের 'রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল' আর 'রাষ্ট্র যন্ত্র দখল' এক কথা নয়। 'রাষ্ট্রযন্ত্র' তার নিজস্ব পরিসরে তার "আভিজাত্যপূর্ণ বলদর্পী মানে রিপ্রেসিভ চেহারা নিয়ে নিজের নিজের সীমানায় শাসকের সাথে অদ্ভুতভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারলেও সে তার বলদর্পী চেহারা কখনাই বিসর্জন দেয় না। ভুল হয় এখানেই যখন কমিউনিস্টরা নিজের চরিত্র বিসর্জন দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রযন্ত্রর সাথে মিলিয়ে নেয়, আর তখনই কমিউনিস্টরা জনগণের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কত বড় চেতনার সংমিশ্রণ ঘটলে এরকমটা ভাবা সম্ভব সেটা একবার ভাবুন!" ক্ষ্যান্তামনি ফুট কাটে "এটা সবাই জানে—তা নাহলে একটা ভালো লোক সরকারে গিয়ে চোর হয় কি করে?" মদনচাঁদ বলে ওঠে "এই তো তুমি আমার থেকে গ্রামসী অনেক ভালো ভাবে বুঝতে পারছো—নাও মিলি তুমি বলে যাও। মিলি শুরু করে "এ জন্যই আমাদের সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে। সত্যকে গ্রামসী রাশ্যানাল ট্রুথস, ফ্যাকচুয়াল ট্রুথস ম্যাথামেটিক্যাল ট্রুথস, সাইন্টিফিক ট্রুথস, ফিলোজফিক্যাল ট্রুথস এবং হাইপোথিটিকাল ট্রুথস এই কয় ভাগে ভাগ করেছেন। এসব আরো গভীর আলোচনার বিষয়। এক দিনে তো আলোচনা সম্ভব নয়। আর গ্রামসীকে জানতে হলে ভলো করে পড়তে হবে"। মদনচাঁদও মিলির কথাকে সমর্থন করে বলে ঠিকই বলেছো "এসব বিষয় কি আর শুনে শুনে শেখা যায়—বিশাল দার্শনিক ব্যাখ্যার বিষয়। পরে আবার আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ক্ষ্যান্তামুনি এত সহজে থামবার পাত্র নয়। তার বিদ্যের দৌড় সামান্য হলেও ট্রুথ মানে সত্য এটা সে জানে, প্রশ্ন করে "আচ্ছা বৌমা সত্য তো সব সময়ই সত্য—তা সত্যের এত ভাগ করার কি দরকার? সব কিছুকে এত জটিল করে তোলার কি দরকার ছিল? সত্যের কি কোনো বিকল্প আছে? লোকটা আচ্ছা পেঁচালো তো!" কিছুক্ষণ থমকে থেকে মিলি বলে "সত্যেরও নানা ধরন থাকে সেটা বুঝতে না পারলে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ সঠিক ভাবে হয় না। এই সেই দাঁড়ি পাল্লার ওজন দাঁড়ি আর কাঁটা ওয়ালা ওজন দাঁড়ির মতো ব্যাপার"। ক্ষ্যান্তামনির উত্তর মনঃপূত না হলেও চুপচাপ শুনে গেল। মনে মনে ভাবে—আমার ছেলেটা মরে গেলে সেটাও একটা ধরন? এ কি ধরনের জটিল লোক রে বাবা।

এদিকে কথা বলতে বলতে খাওয়ার টেবিলে অনেকটা সময় গড়িয়ে যাওয়াতে মদনচাঁদ এবার আলোচনায় ইতি টেনে বলে, ঠিক আছে আজকে তোমার কাছে সামান্য যা বুঝলাম তাতে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি একজন যথার্থ গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি কি করে গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে কেমন করে গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হতে পারে এসব নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তার কথা যা বলেছেন এখনকার সময়ে সেগুলো আমাদের দেখা দরকার এই তো?" 'ঠিক ঠিক' মিলি উত্তর দেয়। আলোচনা সাঙ্গ করে এবার বিশ্রামের পালা। সারা দিন অনেক পরিশ্রম হয়েছে। মদনচাঁও শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দেয়। ক্ষ্যান্তামনির কিন্তু কাজের অন্ত নেই। এখনো সে শোবার ঘরে খুট-খাট করে কি সব কাজ করে চলেছে। আওয়াজে ঘুমে ব্যাঘাত হওয়াতে বিরক্ত হয়ে মদনচাঁদ বলে "কি করছো? সারা দিন কাজ করে শখ মেটেনি? এখনো কাজ? সব বন্ধ করোতো। ঘুমোতে দাও তো"! কাজ বন্ধ করে শোবার আগে দেওয়ালে টাঙানো লেনিনের ছবির দিকে নজর পড়ে ক্ষ্যান্তামনির। কিছুক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে মদনচাঁদকে বলে "এই শুনছো ওই লোকটার একটা ছবি তো আমাদের এখানে টাঙাতে পার"? কেন লোকটার—প্রশ্ন করে মদনচাঁদ। ক্ষ্যান্তামনির নামটা মুখে উচ্চারণ না হওয়াতে বলে কোন লোকটা আবার ঐ লোকটা"? এবার বুঝতে পারে গ্রামসীর ছবির কথা বলছে ক্ষ্যান্তামনি। মদনচাঁদ বলে "ও গ্রামসীর কথা বলছো"? ঘাড় নামে ক্ষ্যান্তামনি। "কেন রাখব বলোতো? প্রশ্ন করে মদনচাঁদ। "উনি যা বলেছেন বা লিখেছেন লেনিনের লেখার বা বলার বাইরে নতুন কিছু আছে? এধরনের অনেক কথা লেনিনের লেখার মধ্যে আছে। শুধু কতকগুলো নামের আর শব্দের পরিবর্তন মাত্র। আসলে সব লেখা জেলখানার মধ্যে লেখা। তখন জেলখানাতে বসে সব কথা সরাসরি লেখা যেত না, সে জন্য অনেক কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখেছেন। লিখেছেন তো লিখেছেন। তবে লেনিনবাদকে বাদ দিয়ে নতুন কিছুই নাই। বেশি বেশি করে লেনিনবাদকে আঁকড়ে ধরতে পারলেই সব লড়াই সম্ভব। কেন তুমিও তো লড়ছো? আমিও তো লড়ছি—এই বিশ্বে বহু মানুষ লেনিনবাদকেই ভরসা করেই লড়ছে। আর গ্রামসী সেও থাকুক। দরকারে তাকেও নেড়ে-চেড়ে দেখব। কিন্তু মনে রাখবে মার্কসবাদ-লেনিবাদে সর্বহারার মতবাদ। এর উপরে এখনো কোনো শ্রেষ্ঠ মতবাদ প্রতিষ্ঠা হয়নি।" ক্ষ্যান্তামনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে কি জানি বাপু—আমি এত সব বড় বড় কথা কিছুই বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি আমাদের লড়াইটা খুব কঠিন গো খুব কঠিন।" মদনচাঁদ বলে খোকার মা, তুমি একটু বুঝলেই যথেষ্ট। দেখ যেদিন থেকে আমাদের খোকা শহিদের মর্যাদা পেয়েছে, সেদিন থেকেই এই এলাকার আর আশে পাশের সবাই এখনা তোমাকে খোকার মা বলেই ডাকে। এখনো এখানের ছেলে-মেয়েরা তোমাকে কি করে কি হয়েছে জানিনা, সবাই মা বলেই ডাকে। শত্রুও তোমার মানে মাথা নিচু করে চলে—এতে আমাদের পার্টি আজও কত মর্যাদার আসনে এখানে প্রতিষ্ঠিত তা তোমার থেকে কে বেশি জানে বলোতো খোকার মা"? মদনচাঁদ লক্ষ করে ব্যথাতুর খোকার মা ক্ষ্যান্তামনির নিষ্পাপ চোখ দুটো তখন জলে টলটল করছে। মদনচাঁদ কাছে ডেকে নেয় ক্ষ্যান্তিমুনিকে।

বুকে বেদনার পাথর চাপা দিয়েও মুছিয়ে দেয় ক্ষ্যান্তামনির চোখ দুটো। হঠাৎ বিছানায় রাখা ক্ষ্যান্তামনির ফোনটা বেজে ওঠে। এত রাত্রে কে আবার ফোন করল? বিরক্ত হয়ে ক্ষ্যান্তামনির ফোনটা নিয়ে স্ক্রিনে কুদ্দুসের নামটা দেখে মদনচাঁদ বলল "নাও তোমার ব্যাটা ফোন করেছে"। কুদ্দুস ওর বড় ছেলের বন্ধু ছিল, যখন মুখ থেকে কথা ফোটেনি তখন থেকেই ওর মায়ের সাথে এ বাড়িতে আসতো। কথা বলতে শেখার পর ক্ষ্যান্তামনিকে 'মাম মা' করে ডাকত। এখনো এত বয়স হলেও ও আর 'মাম মা' ডাক ছাড়তে পারেনি। ক্ষ্যান্তামনি ছোঁ মেরে ফোনটা নিয়ে জিজ্ঞেস করে 'কুদ্দুস বল বেটা—আমাদের সালমা কেমন আছে? আজই তো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, কেমন আছে?" ও পার থেকে কুদ্দুস বলল, "মাম মা, তুমি দিদা হয়েছো—আমাদের সালমার মেয়ে হয়েছে, মা-মেয়ে ভালোই আছে।" ক্ষ্যান্তামনি তখন বলে চলেছে "দারুণ খবর তুই কাল সকালেই এখানে চলে আয়, নাতনি সাহেবাকে দেখে আসব"। ফোন রেখে দেয় ক্ষ্যান্তামনি খুশিতে ঝলমলে মুখে বলে "জানো আমাদের সালমা মা হয়েছে, কাল সকলে হাসপাতাল যাব নাতনি সাহেবাকে

দেখতে, তুমি যাবে?" 'যাব' —বলেই মদনচাঁদ ঘুমাতে চেষ্টা করে। এখন ক্ষ্যান্তামনির অনেক কাজ আবার খুট খাট আলমারি খুলে এক জোড়া ছোট্ট কানের দুল বার করে আবার জাগিয়ে তুলল মদনচাঁদকে। "দেখ তো এটা দিয়ে নতুন নাতনি সাহেবার মুখ দেখব—ভালো হবে তো?"—"খুব ভালো হবে" বলেই আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে মদনচাঁদ। কিন্তু তার কি যো আছে। এবার একটা চেয়ার নিয়ে দেওয়ালে টাঙানো লেনিনের ছবিটা নামিয়ে টেবিলের উপর রাখে। তার পাশে আবার মদনচাঁদের লেখা একটা কবিতা ভালো করে লিখিয়ে বাঁধিয়ে রাখা ছিল। সেটাও নামিয়ে লেনিনের পাশে ভালো করে মুছে রাখে। শুয়ে শুয়ে সব দেখছে মদনচাঁদ। বলে "ওগুলো আবার নামালে কেন?" —ক্ষ্যান্তামনি উত্তর দেয় আগামী কাল তো ২২ এপ্রিল। বিকেলে পাড়াতে লেনিনের জন্মদিন পালন করতে হবে তো—বলেই কবিতাটা আওড়াতে থাকে—

লেনিন তোমার প্রিয় বন্ধু।
লেলিন তোমাকে খুব ভালোবাসেন।
না—না একথা অমি বলিনি
তুমিই বলেছ ইনিয়ে বিনিয়ে—
কথা-কথায়।
লেনিন আমারও বন্ধু
অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু
তবে লেনিন একদিন
কথায় কথায় আমায় বললেন
"ওহে, আমি তোমার প্রিয় বন্ধু ঠিকই—
কিন্তু কখনোই এটা ধরে নেবে না—
আমাকে দেখিয়ে তুমি কোনো ভুল করলেও
বারবার সবেতেই তোমার ছাড়!
তোমার সবচেয়ে বড় সমালোচক কিন্তু
তখন হব আমিই"।
তার পর লেনিন কি করলেন জান?
সে এক অবাক ব্যাপার!
হো হো করে হেসে উঠলেন
সে এক দিল খোলা অনাবিল হাসি।

মদনচাঁদ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ক্ষ্যান্তামনির আঁখি পানে!

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মেসার্স কুমার ব্রাদার্স

অনুপমা বস্ত্রালয়

অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান

PEPSICO VENDOR

সুলতানপুর বাজার, কালনা, পূর্ব বর্ধমান
Mob, 9732249017, 9732331853

Sl. No. 32

With Best Compliments of

M/s SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur

Sl. No. 74

সকলকে
শারদ
শুভেচ্ছা
জানাই

পরিচ্ছন্নতাই
পবিত্রতা

Sl. No. 7

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জয়া ব্রেড কো

এখানে উৎকৃষ্ট মানের কেক, পাউরুটি,
লেড়ুয়া, টোস্ট পাওয়া যায়।

প্রোঃ বিমলেন্দু কোনার

বিঃদ্রঃ এখানে জন্মদিনের কেক পাওয়া যায়।

বলগোনা স্টেশন রোড, পূর্ব বর্ধমান,
মোবাইল : ৯৭৩২৩৬৯৫৩৪

Sl. No. 16

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কুবাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কুবাজপুর, থানা : ভাতাড়, পূর্ব বর্ধমান
যোগাযোগ : ৮৯৬৭০৭৯৬৫৬
রেজি. নং : ৩৪১২ তাং : ২০.০৮.১৯৬৯

আমাদের পরিষেবাসমূহ
১. ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ২. কৃষকদের মধ্যে স্বল্প সুদে কে.সি.সি. খাতে ঋণ দাদন, ৩. বিভিন্ন কোম্পানির রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়।

সমিতির পক্ষে
শাহজামাল মণ্ডল

Sl. No. 15

জন্মশতবর্ষে 'ডার্ক লেডি অফ ডি এন এ'

ড. অরবিন্দ দাশ

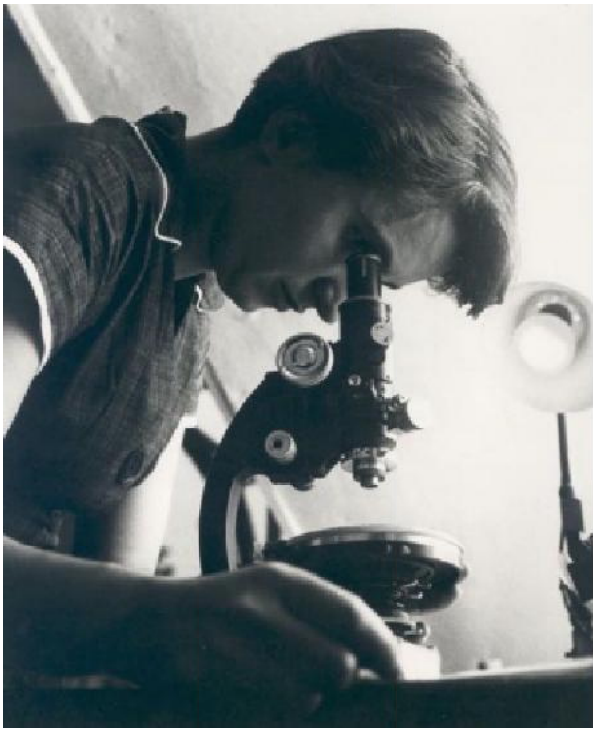

কে এই লেডি?

গত শতাব্দীতে বিশ্ববাসী অসংখ্য চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করেছে। জীববিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার জীবনের রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ডি এন এ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) অণুর গঠন। আমরা জানি ডি এন এ একটি নিউক্লিক অ্যাসিড যা জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জিনগত নির্দেশ প্রদান করে। জীবকোষে ডিএনএ-র প্রধান কাজ দীর্ঘকালের জন্য তথ্য সংরক্ষণ। ১৯৫৩ সালের ২৫ এপ্রিল জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিকের ডিএনএ অণুর গঠন আবিষ্কার সংক্রান্ত গবেষণা প্রকাশিত হয় 'নেচার' জার্নালে। মাত্র ন'বছরেই নোবেল পুরস্কার আসে ওই পেপারের সুবাদে। কিন্তু ডিএনএ গঠনের পরীক্ষামূলক প্রমাণের প্রথম কৃতিত্ব যাঁর তাঁকে অন্ধকারে রাখা হয়। তিনি রোজ়ালিণ্ড এলজ়ি ফ্রাঙ্কলিন। রোজ়ালিণ্ডের এক জীবনীকার ব্রেণ্ডা ম্যাডক্স এই বিদগ্ধ বিজ্ঞানীকে অভিহিত করেছেন 'ডার্ক লেডি অফ ডিএনএ' রূপে। পরবর্তীকালে তিনি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস ও আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) এবং পোলিও ভাইরাসের উপর গবেষণা করেন। বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র ৩৭ বছরে তাঁর মৃত্যু তাঁকে দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত করে।

একেবারে স্বতন্ত্র

২৫ জুলাই ২০২০। ইংল্যান্ডের নাটিংহিলে অত্যন্ত সচ্ছল ও প্রভাবশালী ইহুদি পরিবারে রোজ়ালিণ্ড এলজ়ি ফ্রাঙ্কলিন জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় রোজ়ালিণ্ডের ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা ও মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নিজের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি অধিকাংশ সময়ে অঙ্ক কষেই কাটাতেন ও মজা পেতেন। গোঁড়া ইহুদি পরিবারে জন্ম হলেও রোজ়ালিণ্ড নাস্তিক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কেউ ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন—কী করে জানলে তিনি পুরুষ, মহিলা নন? তিনি অন্যান্য ইহুদি মেয়েদের মতো মস্তকাবরণী ব্যবহার করতেন না। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তিনি ঠিক করেন ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হবেন। সেইমতো তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর বাবা মেয়েকে কো-এড কলেজে ভর্তির ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হন এবং কলেজের ফি দিতে অস্বীকার করেন। তখন রোজ়ালিণ্ডের একান্ত অনুরোধে মা ও মাসিমার মধ্যস্থতায় ঠিক হয় তিনি নিউহ্যাম কলেজে পড়বেন। ১৮৭১ সালে স্থাপিত নিউহ্যাম কলেজেও মহিলাদের ভর্তির ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। রোজ়ালিণ্ড নিউহ্যাম কলেজে যান ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর বাবা-মাকে অকপটে জানাচ্ছেন—এখানে যে যথেচ্ছ যৌনাচার চলছে তাতে আমি অভ্যস্ত নই। রসায়ন নিয়ে পড়াশুনা করে ১৯৪১-এ অনার্স ডিগ্রি পান। এরপর ওখান থেকে এম.এ পাঠ শেষ করলেও যেহেতু মহিলাদের ডিগ্রি দেওয়া তখনো চালু হয়নি, তাই তাঁকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় অনুমোদিত ডিগ্রি পেতে। প্রসঙ্গত বলা যায় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে মহিলা প্রবেশের অনুমতি মেলে আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯২০ সালে।

যাহোক, কলেজে পড়ার সময় তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর অঙ্কশাস্ত্রের উপর কোর্স করতে পছন্দ করতেন; কারণ তাতে তিনি অধ্যাপকদের সঙ্গে বিতর্ক করার সুযোগ পাবেন। তিনি তর্কের ব্যাপারে রূঢ় ছিলেন না, পরন্তু যুক্তির দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর এই অভ্যাস পরবর্তীকালে তাঁকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন করে। মহিলা হওয়ায় তাঁর এই আচরণ কর্মক্ষেত্রের অন্যান্যরা বিশেষত পুরুষসমাজ সহজভাবে নিতে পারেনি। তাঁর দ্বন্দ্বপ্রিয়তা তাঁকে অস্থির করে তোলে; তাঁর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কর্মস্থল যদি-বা তাঁকে তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েছে, চতুর্থ-পর্যায়ে তাঁর জীবন করুণ ইতিহাসের সাক্ষী।

রোজ়ালিণ্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়লার সচ্ছিদ্রতার উপর গবেষণা করে ১৯৪৫ সালে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৪৬-এ প্যারিসে যান ক্রিস্টালোগ্রাফি বা কেলাসবিদ্যা আয়ত্ত করতে। তিনি এখানে এক্স রে ডিফ্রাকশন (ব্যবর্তন)-এর উপর যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাই নিয়ে পরবর্তীকালে জীবনের রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত হন। প্যারিসে থাকার সময়ে অ্যাড্রিইন উইল নামে এক ফরাসি গবেষকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, যিনি আবার বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মেরি কুরির ছাত্র। রোজ়ালিণ্ডের জীবনে উইলের প্রভাব অনেক।

কিংস কলেজে

১৯৫১সালের জানুয়ারিতে রোজ়ালিণ্ড কিংস কলেজ লন্ডনে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটরূপে গবেষণা শুরু করেন বায়োফিজিক্স বিভাগের প্রধান জন র্যান্ডেলের অধীনে। বিষয় ছিল এক্স-রে ডিফ্রাকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে ডি এন এ তন্তুর গঠন। এখানকার বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে ডি এন এ-র গঠন নিয়ে উচ্চমানের গবেষণায় রত। সুতরাং রোজ়ালিণ্ডের মতো এক্স-রে গবেষণায় অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর যোগদানে ডিএনএ গবেষণা এক নতুন মাত্রা পেল। সমস্যা শুরু হলো কিংস কলেজের তৎকালীন প্রচলিত ভেদাভেদ রীতি নিয়ে। ১৯৫১ সালে লন্ডনের এই নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের সমদৃষ্টিতে দেখার ব্যাপারে সমস্যা ছিল। পুরুষ বিজ্ঞানীদের জন্য দ্বি-প্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা ছিল কলেজ ভবনেরই আরামদায়ক বিশাল ডাইনিং হলে। কিন্তু মহিলা বিজ্ঞানীদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তাঁদের লাঞ্চ করতে হতো কলেজ থেকে দূরে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথেই।

আরো বড়ো সমস্যা হলো রোজ়ালিণ্ডের সহকর্মী মৌরিস উইলকিন্সকে নিয়ে—যিনি ডিএনএ নিয়েই কর্মরত। রোজ়ালিণ্ড তাঁর চিন্তাভাবনা, আলোচনাতে অত্যন্ত চৌখস। কিন্তু উইলকিন্স ছিলেন একেবারে উল্টো, কোনো আলোচনায় না গিয়ে একেবারে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করতেন। উল্লেখ্য রোজ়ালিণ্ডের একটা অভ্যাস ছিল তিনি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন। কিছুটা অধৈর্যভাবেই শ্রোতার কাছ থেকে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করতেন। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে অধিকাংশ শ্রোতাই নার্ভাস হয়ে পড়তেন। যাহোক, রোজ়ালিণ্ড ও উইলকিন্স যৌথ অধীনে যিনি পিএইচডি-র কাজ করেছেন এমন বিজ্ঞানী রেমন্ড গসলিং-এর কথায়—আপনি যদি বিশ্বাস করেন আপনি কী বলছেন, আর রোজ়ালিণ্ড যদি বোঝেন আপনি সঠিক নন তবে আপনার সঙ্গে তাঁর জোরালো তর্ক হবে। এমন পরিস্থিতিতে উইলকিন্স একেবারে মৌনী থাকতেন, তিনি নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টাই করতেন না। সুতরাং একসঙ্গে কাজ করার পরিবেশ অচিরেই অন্তর্হিত হয়। যাহোক, এইসময় রোজ়ালিণ্ড তাঁর ছাত্র গসলিং-এর সাথে সেই যুগান্তকারী গবেষণা করেন। তাঁরা ডিএনএ-র দু-প্রকারের গঠন দেখাতে সমর্থ হন; যেমন, শুষ্ক বা 'এ' গঠন এবং আর্দ্র বা 'বি' গঠন। প্রসঙ্গত, ডিএনএ-বি গঠনের এক্স-রে ডিফ্রাকশন ছবিটিই 'ফটোগ্রাফ ৫১'। এই ছবিটি পাওয়া গিয়েছিল ডিএনএ নমুনার উপর ১০০ ঘন্টা ধরে এক্স-রে আপতিত করে। এই ছবিটি দিয়েই ডিএনএ-র সঠিক গঠনের পরীক্ষামূলক প্রমাণ, ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার, রোজ়ালিণ্ডকে বঞ্চিত করা—এ সবই আজ ইতিহাস।

জে ডি বার্নালের সান্নিধ্য

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির নামজাদা বিজ্ঞানী এবং আণবিক জীববিদ্যায় এক্স-রে কিস্টালোগ্রাফির প্রয়োগ বিষয়ে পথপ্রদর্শক জন ডেসমন্ড বার্ণাল ছিলেন কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয়

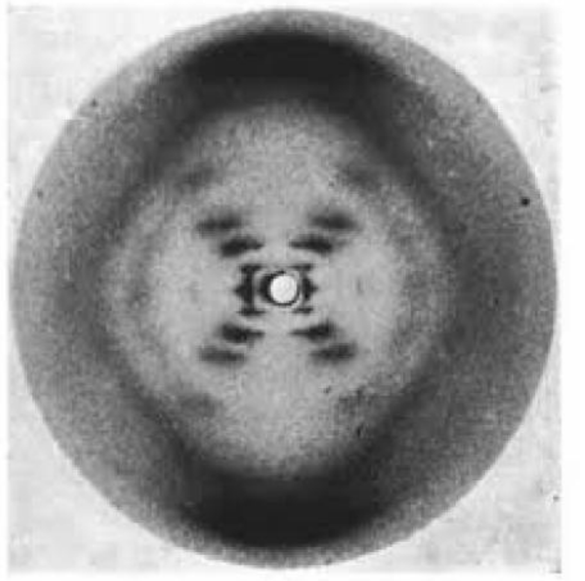

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তির অন্যতম প্রবক্তা। তিনি যে বছর স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার পান সেই ১৯৫৩ সালেই রোজ়ালিণ্ড কিংস কলেজ ছেড়ে বার্কবেক কলেজে যোগ দেন। সেখানে তখন অধিকর্তা হিসেবে পান জে ডি বার্ণালকে। রোজ়ালিণ্ড যখন কিংস কলেজ ত্যাগ করেন তাঁর উপর অন্যতম শর্ত ছিল তিনি ডিএনএ-র উপর কোনো গবেষণা করতে পারবেন না। বিশেষ প্রতিভার অধিকারী এই বিজ্ঞানী এখানে ট্যোব্যাকো মোসায়িক ভাইরাস ও আরএনএ গঠনের উপর গবেষণা শুরু করেন। সহকারী গবেষক হিসেবে পান অ্যারন ক্লুগকে। এখানে পাঁচ বছরে ১৭টি অতি উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, যা স্ট্রাকচারাল ভাইরোলজির মূল ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়। এছাড়া আর যে গবেষণা রোজ়ালিণ্ডকে অমর করে রেখেছে তা হল পোলিও ভাইরাস সংক্রান্ত। বিশাল পরিমাণ অনুদান নিয়ে এই গবেষণা শুরু করলেও তাঁর শরীর তাঁকে সহযোগিতা করছিল না এবং শেষে অকালমৃত্যু। তাঁর আরব্ধ কাজ পরবর্তীকালে ক্লুগই টেনে নিয়ে যান এবং ১৯৮২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। রোজ়ালিণ্ডের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ ক্লুগের উক্তি এরকম—রোজ়ালিণ্ড বিশ্বাস করতেন গবেষকদের চালাকির দ্বারা সহজে গবেষণাপত্র প্রকাশ না করে সমস্যার গভীরে গিয়ে দীর্ঘসময় ধরে তার সমাধান করা উচিত। ১৯৫৮ সালে রোজ়ালিণ্ডের মৃত্যুর পর বার্ণাল বলেন—বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ছিলেন একেবারে স্বতন্ত্র; যা তিনি করেছেন তা অতি স্বচ্ছ ও নিখুঁতভাবে। এ পর্যন্ত যেসব এক্স-রে ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে তাঁর ছবিগুলি সবচেয়ে সুন্দর। ছবির এই বিশেষত্ব এসেছে অতি সাবধানতার কারণে।

কেন তবে অসম্মান?

কিংস কলেজে অতি সাবধানতা আর অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও নীতিবোধে অটল রোজ়ালিণ্ডের সাথে তাঁর সহকর্মী উইলকিন্সের যে সংঘাত হয় তার জন্য রোজ়ালিণ্ডকে অনেক মূল্য দিতে হয়। মনে রাখা দরকার ডিএনএ নিয়ে রোজ়ালিণ্ড ও উইলকিন্স যখন কিংস কলেজে পরীক্ষামূলক গবেষণা করছেন, জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিএনএ মডেলের উপর কাজ করছেন। ১৯৫৩-র জানুয়ারিতে উইলকিন্স রোজ়ালিণ্ডের অজ্ঞাতে তাঁরই তোলা ৫১ নং ফটোগ্রাফিটি ওয়াটসনের হাতে তুলে দেন।

পরবর্তীকালে জানা যায় ছবিটি দেখে ওয়াটসন বলে ওঠেন—আমার চোয়াল খুলে আসছে, আর নাড়ির গতি দ্রুততর হচ্ছে। ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ওয়াটাসন ও ক্রিক বুঝতে পারেন তাঁরা জীবনের রহস্য খুঁজে পেয়েছেন; ৭ মার্চ তাঁরা ডিএনএ-বি-এর গঠন মডেল সম্পূর্ণ করেন। ওয়াটসন-ক্রিক রোজ়ালিণ্ড-এর তোলা ৫১ নং ছবির উপর নির্ভর করেই ডিএনএ-র পেঁচালো গঠন সম্পর্কে গবেষণাপত্র তৈরি করে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশের জন্য পাঠান। ১৯৫৩ সালের ২৫ এপ্রিল ডিএনএ অণুর গঠন আবিষ্কার সংক্রান্ত গবেষণা ছেপেছিল 'নেচার', সঙ্গে ডিএনএ-র যুগ্ম-পেঁচালো গঠনের হাতে-আঁকা ছবি। মাত্র ন'বছরেই নোবেল পুরস্কার আসে ওই গবেষণাপত্রের সুবাদে। অথচ ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে রোজ়ালিণ্ড কিংস কলেজের সেমিনারে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি ডিএনএ-র পেঁচালো গঠনের কথা উল্লেখ করেন। সঙ্গত কারণেই পরবর্তীকালের অনেক বইয়ে ওয়াটসন-ক্রিক-এর বিরুদ্ধে রোজ়ালিণ্ডের গবেষণার ফলাফল হরণ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ সেই ওয়াটসন রোজ়ালিণ্ডের মৃত্যুর ১০ বছর পর তাঁর 'দ্য ডাবল হেলিক্স' বইয়ে কুৎসিত মন্তব্য করেন। রোজ়ালিণ্ডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে ওয়াটসনের তাৎক্ষণিক অনুভূতি ছিল এরকম—আমি ভাবছি যে যদি চশমা খুলে ফেলে এবং তার চুলটাকে ঠিকঠাক রাখে তবে তাকে কেমন লাগত! ওয়াটসনের মতে রোজ়ালিণ্ড কদাকার—তাঁর ফ্যাশান নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন এবং তাঁকে 'রোজী' নামে অভিহিত করেছেন। প্রসঙ্গত রোজ়ালিণ্ড কখনোই পছন্দ করতেন না তাঁকে কেউ 'রোজী' নামে ডাকুক। ওয়াটসন বলেন (তিনি) একজন কলহপ্রিয় স্ত্রীলোক, যিনি তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁকে তাঁর জায়গায় পাঠিয়ে দাও।

ওয়াটসনের উক্তি এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে ফ্রাঙ্কলিন পরিবার বলেন—ওয়াটসন-বর্ণিত রোজ়ালিণ্ডকে মনে রাখার চেয়ে ইতিহাস যেন তাকে ভুলে যায়! এহ বাহ্য, একটা খুব সত্য কথাও ওয়াটসন বলেছিলেন—উইলকিন্স ও রোজ়ালিণ্ডকে ডিএনএ-র উপর কাজের জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া যেত। তবে 'দ্য ডাবল হেলিক্স'-এ কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যেও ঐতিহাসিকরা রূপালি রেখার সন্ধান পেয়েছেন। বইটি প্রকাশিত হলে অনেকেই উৎসাহী হয়ে পড়েন ডিএনএ গঠন আবিষ্কারের নেপথ্যে ঠিক কী ঘটেছিল। পরবর্তীকালে রোজ়ালিণ্ডের অবদান সম্পর্কে সত্য ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। সন্দেহ নেই ওয়াটসন হল সেই ব্যক্তিত্ব যিনি স্বল্পায়ু ও সুমেধার অধিকারীকে অত্যন্ত হীনচোখে দেখেছেন। ভাগ্যের পরিহাস, দীর্ঘায়ু হবার কারণে ওয়াটসনকে দেখতে হয়েছে কীভাবে মরনের পরে রোজ়ালিণ্ড অফুরান সম্মানের অধিকারী হন। আর ওয়াটসনের শেষ জীবন ছিল ট্রাজেডিপূর্ণ। কালক্রমে তাঁর অসংলগ্নতা প্রকট হয়। তিনি এমন মত ব্যক্ত করেন যে জীন প্রযুক্তি দ্বারা বোকা এবং অসুন্দর মানুষদের নিশ্চিহ্ন করা উচিত। তাঁর মতে আফ্রিকানরা অন্যান্য জাতির তুলনায় নিকৃষ্ট। এই ধরনের মন্তব্য তাঁকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। নিঃসঙ্গতা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে ২০১4 সালে তিনিই প্রথম নোবেল লরিয়েট যিনি অভাবের তাড়নায় নোবেল মেডেল নিলাম করতে বাধ্য হন।

যে নদী মরুপথে

১৯৫৮-র মাঝামাঝি রোজ়ালিণ্ড তাঁর তলপেটে স্ফীতিজনিত অসুস্থতা বুঝতে পারেন। ডাক্তার যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি সন্তানসম্ভবা? তিনি উত্তর দেন—এমন যদি হতো তবে আমার ভালো লাগত! ওই বছরে ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর তলপেটে দুটি টিউমার ধরা পড়ে এবং জানা যায় তাঁর জরায়ুতে ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। এরপর দু'বছর ধরে তাঁর চিকিৎসা চলে, তিনবার অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি। কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি; গবেষণা চালিয়ে গেছেন ১৯৫৮-র ১৬ এপ্রিল মৃত্যুর কয়েকসপ্তাহ আগে পর্যন্ত। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—বিজ্ঞান ও প্রাত্যহিক জীবন পৃথক করা যায় না এবং উচিতও নয়। একজন বড়ো বিজ্ঞানীর ৩৭ বছরে ভালো করে শুরুই হয় না; আর তিনি দু'খানা নোবেল প্রাপ্তির কাজে যুক্ত থেকে কোনো স্বীকৃতির পরোয়া না করে চলে গেলেন। বিষাদসিন্ধুর এক বিরল দৃষ্টান্ত।

অনেকের মতে এক্স-রে নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার অন্যতম কারণ। তাঁর আগে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি নিয়ে গবেষণায় নিবেদিত প্রাণ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মেরি কুরি ও তাঁর কন্যা আইরিন কুরি জোলিও উভয়েই ক্যান্সারের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৫৮-তে লন্ডনের উইলেসডেন-এ বোরোগ অফ ব্রেন্টে সিনাগগ সেমেটেরিতে রোজ়ালিণ্ডকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধি-ফলকে খোদাই করা আছে—ভাইরাসের উপর তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার মানবজাতির উপর দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণকর প্রভাব ফেলবে। ওই সমাধি-ফলকে আরো উৎকীর্ণ আছে— আত্মা বন্দি হয়ে আছে সব প্রাণের সাথে। ভারতীয় দর্শন তো সে কথা বলে এসেছে সুদূর অতীতকালে সভ্যতার প্রথম প্রত্যুষে।

রোজ়ালিণ্ডের মৃত্যুর পর তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং তাঁকে প্রবঞ্চনার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরবর্তী সময়ে এই বিজ্ঞানীকে অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর নামে পুরস্কার, স্কলারশিপ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামাঙ্কিত ল্যাবরেটরি, হল, ভবন, এমনকী মহাকাশে গ্রহাণু চিহ্নিত হয়েছে। বর্ষক্রমে মাত্র কয়েকটিরই উল্লেখ করা হল শুধু এটুকু জানাতে যে বিজ্ঞানজগৎ তাঁকে ভোলেনি। যে প্রাপ্য সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হন তার কিছুটাও যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়।

১৯৭৫ : 'রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন ও ডিএনএ' বইটি প্রকাশ করেন অ্যান সাইরে।

১৯৮৭ : বিবিসি প্রথম হরাইজন সিরিজে রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিনের উপর আধারিত 'দ্য রেস ফর দ্য ডাবল হেলিক্স' ছোট পর্দায় নিয়ে আসেন।

১৯৯৩ : লন্ডনের কিংস কলেজ হ্যামস্ট্রেড ক্যাম্পাসকে রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিনের নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

১৯৯৫ : কেমব্রিজের নিউহ্যাম কলেজে রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন ভবন স্থাপন করে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৯৭ : ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের স্কুল অফ ক্রিস্টালোগ্রাফিতে রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করা হয়। এই বছরে জ্যোতির্বিদ জন ব্রউটন একটি গ্রহাণু আবিষ্কার করেন যার নাম দেন '৯২৪১ রোজফ্রাঙ্কলিন'।

১৯৯৮ : লন্ডনের ন্যাশনাল প্রোট্রেট গ্যালারিতে রোজ়ালিণ্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের ছবি রাখা হয়।

১৯৯৯ : লন্ডনের ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সে রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিনের নামে লেকচার থিয়েটার নামাঙ্কিত হয়।

২০০০ : কিংস কলেজ লন্ডনে ফ্র্যাঙ্কলিন-উইলকিন্স বিল্ডিং স্থাপিত হয়।

২০০১ : অ্যামেরিকান ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট মহিলা ক্যান্সার গবেষণাকারীদের জন্য রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন পুরস্কার চালু করে।

২০০২ : দ্য ইউনিভার্সিটি অফ গ্রনিনজেন ইউরোপীয়ান ইউনিয়ান পোষিত মহিলা গবেষণাকারীদের জন্য রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন

বৃত্তি চালু করে। এই বছরে ব্রেণ্ডা ম্যাড্ডাক্সকৃত 'রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন : দ্য ডার্ক লেডি অফ ডিএনএ' প্রকাশিত হয়।

২০০৩ : রয়্যাল সোসাইটি, লন্ডন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন পুরস্কার চালু করেছে। এছাড়া রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি রোজালিন্ডের কর্মক্ষেত্র কিংস কলেজ, লন্ডনকে 'ন্যাশনাল হিস্টোরিক কেমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিপিএস-নোভাকৃত 'ডিএনএ-সিক্রেট অফ ফটো ৫১' —৫৬ মিনিটের এই ডকুমেন্টারি বিবিসি কর্তৃক সম্প্রচারিত হয়।

২০০৪ : শিকাগো মেডিক্যাল স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল এন্ড সায়েন্স রাখা হয়— যার লোগো-তে আছে 'ফটোগ্রাফ ৫১'। ওই বছরেই গ্রুবার ফাউণ্ডেশান 'রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন ইয়ং ইনভেস্টিগেটার অ্যাওয়ার্ড' চালু করেছে।

২০০৫ : রোজ়ালিণ্ড ও মৌরিস আধারিত ডিএনএ ভাস্কর্য স্থাপিত হয় কেমব্রিজের ক্লেরে কলেজে। ডেব্রা গীয়ারিং-এর লেখা নাটক 'রোজারিও : অ্য কোয়েশ্চেন অফ লাইফ' বার্মিংহাম রিপোরটরি থিয়েটারে অভিনীত হয়।

২০০৬ : রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে নিউইয়র্কে।

২০০৮ : রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যুর ৫০ বছরে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি চালু করেছে লুইসা গ্রস হরউইজ পুরস্কার।

২০১১ : অ্যানা জ়িগলার রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিনের উপর আধারিত নাটক লেখেন যার নাম দেন 'ফটোগ্রাফ-৫১'।

২০১২ : নটিংহোম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় নতুন ভবনের নাম দেন 'দ্য রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন বিল্ডিং'।

২০১৩ : কেমব্রিজের যে পানশালায় ক্রিক, ওয়াটসন যেতেন, ডিএনএ গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতেন, সেখানে তাঁদের নামের ফলকের সাথে রোজ়ালিণ্ডের নামের ফলকও যুক্ত হয়।

২০১৪ : ইউনিভার্সিটি অফ উলভার হাম্পটন রোজ়ালিণ্ড ফ্লাঙ্কলিন সায়েন্স বিল্ডিং স্থাপিত করে।

২০১৫ : লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড হলে 'ফটোগ্রাফ ৫১' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

২০১৮ : দ্য রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় হারওয়েল সায়েন্স এন্ড ইনোভেশন ক্যাম্পাসে।

২০১৯ : ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথে ওয়াটসন হলের নাম পরিবর্তন করে 'রোজ়ালিণ্ড ফ্লাঙ্কলিন হল' নামকরণ করা হয়। ইউরোপীয়ান-রাশিয়ান যৌথ প্রচেষ্টায় রোজ়ালিণ্ড ফ্রাঙ্কলিন নামাঙ্কিত 'মার্কস রোভার'-এর এখন প্রস্তুতিপর্ব চলছে। ২০২১ সালে যা লালগ্রহে প্রাণের চিহ্ন খুঁজবে।

রোজ়ালিণ্ডকে সম্মান জানানোর এর থেকে বড়ো সম্মান আর কী-ই বা হতে পারে? জীবিতকালে তাঁকে নিয়ে কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, কোনো স্বীকৃতিও দেয়নি। জীবন হয়তো ইতিহাসকে অতিনাটকীয় করে তুলবে বলে বর্তমান নিষ্ঠুর হয়ে থাকে কখনো কখনো!

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381

Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 63

তথ্যবিপ্লব এক অন্য লড়াই

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে আদিমতম মানুষের আগমন প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে। যাযাবর, মূলত শিকারি সে মানুষ চাষাবাদ শুরু করেছে কমবেশি চোদ্দ হাজার বছর আগে। নগরপত্তন মাত্র পাঁচ-ছ হাজার বছর। আগুনের ব্যবহার কিংবা চাকা আবিষ্কার, লিপি আবিষ্কার, না কি ধাতু ব্যবহার—কোনটা বৈপ্লবিক উত্তরণ? বৌদ্ধিক পরিবর্তন এল ভারতে বৈদিক যুগে ১৭৫০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বুদ্ধ (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ও সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মানব বিকাশে এক একটি মাইলস্টোন। সারস্বতচর্চার শুরুর সময়গুলি লক্ষণীয়। অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর। উদ্বৃত্ত কৃষিমূল্য রাজা, জমিদার, কুলাকের ঘরে ঢুকেছে। সভ্যতার বিকাশ এক অতি ধীর প্রক্রিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পরেই মানব-বিকাশের ধারা বদলে গেল। সভ্যতা এগোল ঝড়ের গতিতে। এতদিন ছিল পশুশক্তি আর পেশি শক্তি। এখন যান্ত্রিক শক্তি। কয়লা, লোহা ও নানান খনিজ আহরণের লুঠ আর লড়াই। আবেগী মানুষ যন্ত্র-কুশলতায় 'হর্স পাওয়ার' ভুলতে পারেনি। জন হেনরীকে রূপকথার নায়ক বানিয়েছে। মাত্র দু'শো বছরে কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে। আগুনের ব্যবহার থেকে ধাতু আবিষ্কারে পার হয়েছে লক্ষাধিক বছর, কাচ আবিষ্কার থেকে চশমায় উত্তরণ প্রায় পাঁচ হাজার বছর, আর আইনস্টাইন থেকে এ্যাটম বোম চল্লিশ বছরে। তথ্য-প্রযুক্তির যুগে বাস করছি আমরা। টাইম ম্যাগাজিন ১৯৮২ সালে 'পার্সোনাল কমপিউটর'-কে 'মেসিন অফ দি ইয়ার' ঘোষণা করেছিল। ১৯৯৯ সালে বর্ধমানের বাজারে ফোর মেগাবাইট হার্ডডিস্কের একটি কম্পিউটারের (ডেস্কটপ) দাম ছিল নব্বই হাজার টাকা। ২০২০ সালে এর দশভাগের এক ভাগ আকারের এক টেরাবাইটের ল্যাপটপ উনিশ হাজার টাকায় পাওয়া যাবে। এক টেরাবাইট হার্ডডিস্ক মানে দশ লক্ষগুণ বেশি সঞ্চয়-ক্ষমতা। এক টেরাবাইট হার্ডডিস্কে বারোশো পাতার দশ কোটি বই ধরে রাখা সম্ভব। যন্ত্র থেকে মেধার জগতে এক অভূতপূর্ব উল্লম্ফন। ঝড় না কি আমফান?

জন হেনরীর গল্প আমাদের মনে আছে। যন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে জন হেনরী জীবন বাজি রেখে জিতেছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। কমপিউটর ব্লু-জে-এর সঙ্গে দাবা গ্র্যাণ্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভ পরাজিত হন। মানুষ হারলো না কি জিতলো? চালকহীন গাড়ির ইতিহাসে আমরা যাব না। একটু বলা যথেষ্ট যে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি গুগল ২০০৮ সাল থেকে এমন গাড়ির গবেষণায় বহু কোটি ডলার খরচ করেছে। ২০১২ সালে প্রজেক্ট শোফার (Chauffeur) আমেরিকার ব্যস্ততম হাইওয়ে-১০১ পরিক্রমা করেছে। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, আই-ফোনের বিভিন্ন ভারসনের কর্মকাণ্ড আমরা দেখছি। আর্থিক লেনদেনসহ নানা পরিষেবা আমাদের মুঠোফোনের ওয়ান ক্লিক। দু-দশটা বছর আগেও জানতাম কমপিউটর মানে হ্যাঁ / না, ট্রু / ফলস্ বা 0/1 নানান কিসিমের সমন্বয়, আর একঘেয়ে রকমের হিসেব-নিকেশ। জেনারেটিভ প্রি-ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার-৩ (GPT-3) টেকনোলজি সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন অর্থপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে সক্ষম। প্রশ্ন হল, অর্থপূর্ণ প্রবন্ধ বলতে আমরা কী বুঝি? মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের যুক্তিসঙ্গত ও বিষয়মুখী বিন্যাস। এই বিন্যাস কি মননসংপৃক্ত না কি মনন-রহিত। চালকহীন গাড়িতে ফিরে আসি। ব্যস্ত ট্রাফিকে সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ি চলার পূর্বশর্ত হল সময়োচিত গতি নিয়ন্ত্রণ। এখানে গাড়ি একটি যন্ত্র, গতি নিয়ন্ত্রণ একটি কমপিউটার প্রোগ্রাম। 'সময়োচিত' শব্দটি মননের সীমানায়। মনন এখানে নীতি, নৈতিকতা, মানবিক গুণের কাঠামোয় বিচার্য। যান্ত্রিক মেধার এই সমস্যা কল্পবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। আইজাক এ্যাসিমভ (১৯২০-১৯৯২)। বিশ্বখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী। তাঁর নিজের কথায়—''আমি মনে প্রাণে একজন নাস্তিক। এই স্বীকারোক্তিতে

পৌঁছাতে আমার সময় লেগেছে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে আমি এই নাস্তিকতা লালন করেছি। সেই অর্থে মনবতাবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী বলা সহজ, নাস্তিকতা স্বীকার করা কঠিন। মানুষ হিসাবে আমি যুক্তিসঙ্গতভাবে আবেগপ্রবণ। ঈশ্বর আছে কি নেই এসব নিয়ে আলোচনা-গবেষণা সময়ের অপব্যয়।" কথাগুলি বলা হল এই কারণে যে মানুষটিকে বুঝতে সুবিধা হবে। জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে এলাম আমরা। যন্ত্রমানব 'রোবোট' নামটি তাঁরই দেওয়া। সেই সঙ্গে রোবটের নিয়ম। রোবটের নিয়ম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মননের কাল্পনিক শৃঙ্খলা। যেমন—

সূত্র-১ —একটি রোবট কোনোমতেই কোনো মানুষকে আঘাত করবে না বা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনো মানুষের ক্ষতির কারণ হবে না।

সূত্র-২—একটি রোবট সর্বদাই মানুষের প্রদত্ত নির্দেশ মান্য করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই নির্দেশ প্রথম নিয়মকে ভঙ্গ করে।

সূত্র-৩—একটি রোবট সর্বদাই নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত রাখবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার এই চেষ্টা প্রথম অথবা দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধে যায়।

রোবট কী পারবে আর কী পারবে না সেসব ভাবার দিন শেষ। এখন দেখার রোবটের মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন করে মানুষের বহুমুখী ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মবৈচিত্র্যকে রপ্ত করতে পারে। ব্যাঙ্ক, বিমা অটোমেশন বা যাতায়াতের টিকিট বুকিং-এর জটিল কর্মকাণ্ডের বিষয় যন্ত্রগণকের কাছে জলবৎ তরলং। বরং রোবট বনাম মানুষ ব্যাডমিন্টিন খেলা অনেক জটিল। মইয়ে চাপা, গাছে জল দেওয়া বা এই জাতের অতি সাধারণ কাজ আরও কঠিন। গাণিতিক কর্মকাণ্ডের যুক্তি আর প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা অর্জন এক নয়। তবু আমরা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা অতিক্রম করার দরজায় দাঁড়িয়ে। যেমন থ্রি-ডাইমেনশনাল প্রিন্টিং। কুশলী যন্ত্র, প্লাস্টিকের কাঠামো বা ত্রিমাত্রিক ঘনবস্তু তৈরি করতে সক্ষম। অদূর ভবিষ্যতে ধাতব যন্ত্রাংশ তৈরিতে থ্রি-ডাইমেনশনাল প্রিন্টিং কার্যকরী ভূমিকা নেবে। কোন স্বপ্নের জগতে আমরা পৌঁছাব তা এখনি বলা কঠিন। তবে এটা নিশ্চিত যে আমরা এমন এক ডিজিটাল যুগে ঢুকে পড়েছি যেখানে তথ্য—তা সে সংবাদ, ছবি, সঙ্গীত, মানচিত্র, ভিডিও বা সোসাল নেওয়ার্কের কোনো ব্যক্তিগত আলাপ সব কিছু, এমনকি সংবেদনশীল মানবিক দোষ-গুণ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ হয়ে সুদূর কোনো অজানা হার্ডডিস্কে সঞ্চিত হচ্ছে। ফেসবুক, ওয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম—হরেক নামের হরেক ফিকির। মৌলিক যা তা হল সবাই আপনার নাম, ধাম, পছন্দ, অপছন্দ, ভালোলাগা, খারাপ লাগা ইত্যাকার মানবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্টোর-কিপার কাম এক্সিকিউটর। শত শত ভালো লাগা, না লাগা মানুষের মনের ছবি গড়ে তুলতে পারে। অন্তত সেটাই প্রমাণ হয়েছিল ২০১৬-এর ট্রাম্প সাহেবের নির্বাচনে। সংবাদে প্রকাশ ব্রিটিশ সংস্থা কেমব্রিজ অ্যানালিটকা ও ফেসবুক কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গের সহায়তায় আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় আট কোটি মানুষের সমর্থন লাভ করেন। ঘটনার অভিঘাতে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা উঠে যায়। মার্ক জুকেরবার্গ ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যান। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে চলে যেতে হলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান'-এর মতো ১৭৫ বছরের পুরানো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকাও বর্তমান আমেরিকান রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্রচারে সামিল। সোশাল মিডিয়ার ব্যবহারকারীরা জানেন না ব্যক্তিগত প্রোফাইল কেমন করে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতির চেহারা বদলে দিচ্ছে। ২৪ জুলাই ২০১৯। নেটফ্লিক্সে প্রকাশিত হল 'দি গ্রেট হ্যাক' পরিচালক যেহান নুয়াম ও করিম আমের। ডকুমেন্টারি ফিল্মের বিষয় কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ও ফেসবুকের ২০১৬ সালের বৃত্তান্ত। এখানে স্বীকার করা হয়েছে, কেমন করে মানুষের মানসলোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে ক্ষোভ, রাগ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি প্রবৃত্তিকে লালন করে মানুষের অনুভূতিকে প্রভাবিত করা যায়। ২০১৮ সালে ভারতে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল আঠাশ কোটির বেশি, ২০২১-এ এই সংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ২০১৪ সালে হোয়াটসঅ্যাপ কিনেছে ফেসবুক। সে বছরেই মোদি-শাহ জমানার পত্তন। সেদিনের ভোটে সোশাল মিডিয়া কী ভূমিকা পালন করেছিল তা সবার জানা। বিগত ছ'বছরে কী হচ্ছে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন শক্তি আর ভরের অভিন্নতা ব্যাখ্যা করেন। সত্যসন্ধানী একদল বিজ্ঞানী একদিন সেই দানবীয় শক্তি উন্মোচন করেন। বহু ধ্বংসের পরেও বিশ্বমানবতা সেই ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পায়নি। আজ আমরা তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণের যুগে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষের রাগ, দ্বেষ, সংক্ষোভ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা সব কিছু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তিত হয়ে যন্ত্রবন্দি। কখন কীভাবে ব্যবহার হবে আমাদের অজানা। যেমন কৃষক জানে না ফড়ে, আড়কাঠি বা বহুজাতিক কোম্পানির চক্করে কৃষিসম্পদ লুঠমারি হয়। শত কৃষিবিপ্লব কৃষকের দুর্দশা মেটায় না। যেমন মানুষ জানে না কয়লা, লোহা বা খনিজ তেল খুঁজে খুঁজে শেষ হয়ে গেলেও দুঃখমারি শেষ হয় না। শ্রমিকের হাহাকার রেলের লাইনে গড়াগড়ি খায়। তেমনি তথ্যবিপ্লবের যুগে তথ্য-লুঠ আর তথ্য- সন্ত্রাসে মানুষের সংবেদনশীল প্রতিটি আবেগ কায়েমি স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে যায়। আমরা কি এই লড়াইয়ে প্রস্তুত আছি?

(কৃতজ্ঞতা ঃ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত আইজাক এ্যাসিমভের রোবটের তিনটি সূত্র মূল গ্রন্থ হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বন্ধুবর সঞ্জীব চক্রবর্তী মহাশয়।)

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সুন্দর ও মজবুত ইটের জন্য যোগাযোগ করুন

মেমারি ব্রিক ফিল্ড

(মেমারি মার্কা ইট)

পাঁচখেয়া, ঘোষ, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৭৪৮৫৮৭২০, ৯৭৭৫২৫০৩৯১

Sl. No. 52

দিন ও বারের অসামঞ্জস্য

ক্যালেন্ডারের একটি ভুল যা দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে চলছে

তানাজি সাঁতরা

৪৬ খ্রিস্টপূর্বে রোমের সম্রাট জুলিয়াস সিজার এক ক্যালেন্ডার-এর আবিষ্কার করেন। জুলিয়াস সিজারের নাম অনুসারে এই ক্যালেন্ডারের নাম দেওয়া হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে পৃথিবীর বার্ষিক গতিকে ৩৬৫.২৫ দিন ধরা হয়, অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে একবছর এবং প্রতি ৪ বছর পর ৩৬৬ দিনে এক বছর, যেটি লিপ-ইয়ার।

অথচ গণিত অনুযায়ী পৃথিবীর বার্ষিক গতি ৩৬৫.২৫ (বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা) দিনের থেকে কিছুটা কম। এটা ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ৩৬৫.২৪১৮১ দিনের সমান। অর্থাৎ প্রতি বছর একটি অতিরিক্ত ১১ মিনিট যোগ করা হয়েছিল এই জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে। ফলস্বরূপ প্রতি বছর জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ১১ মিনিট করে পিছিয়ে গিয়েছিল।

সমস্যার সমাধান হয় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে, যখন পোপ গ্রেগরী XIII একটি নতুন ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেন, যার নাম হয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। এখানে পৃথিবীর বার্ষিক গতিকে ৩৬৫.২৪২২ দিনের সমান ধরা হয়, যা পৃথিবীর সঠিক বার্ষিক গতির খুব কাছকাছি একটি সংখ্যা।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশিরভাগ দেশই তাদের ক্যালেণ্ডার ব্যবস্থা জুলিয়ান থেকে গ্রেগরিয়ানে পরিবর্তন করে। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সাথে ১১ দিন যোগ করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারে উন্নীত হয়েছিল। এটি করে তারা তারিখ সংশোধন করেছিল, তবে একই সাথে তারা বার গণনা করেনি, অর্থাৎ ১৭৫২ সালের ২ সেপ্টেম্বর (বুধবার)-এর পরের দিন হয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার), এই সমীক্ষায় আমরা দেখব ১৭৫২-এর ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে সোমবার হওয়া উচিত ছিল।

অর্থাৎ সেইদিন থেকে আমরা প্রতিদিন একটি ভুল বার উল্লেখ করে চলেছি।

আমরা পৃথিবী জুড়ে আজ যে ক্যালেন্ডার মেনে চলি তা হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার যা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে পোপগ্রেগরী XIII চালু করেছিলেন। এটা ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সংশোধিত রূপ যা ৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার আবিষ্কার করেছিলেন।

নীচে একটি পার্থক্য দেখান হল এই দুই ক্যালেণ্ডারের।

	জুলিয়ান ক্যালেন্ডার	গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার
আবিষ্কার হয়	৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে	১৫৮২ অক্টোবর মাসে
আবিষ্কার করেন	জুলিয়াস সিজার	পোপগ্রেগরী XIII
গড় বার্ষিক গতি সময়	৩৬৫.২৫ দিন	৩৬৫.২৪২২ দিন
লিপ- ইয়ারএর হিসাব	যদি বছর সংখ্যা ৪ দিয়ে বিভাজ্য হয় তবে।	যদি ৪ দিয়ে বিভাজ্য হয় তবে এবং বছর সংখ্যার শেষ দুই অংক শূন্য হলে তবে তা ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হতে হবে লিপ-ইয়ার এর জন্য।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে পৃথিবীর বার্ষিক গতিকে ৩৬৫.২৫ দিন ধরা হয়, অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে এক বছর এবং প্রতি ৪ বছর পর ৩৬৬ দিনে এক বছর যেটি লিপ-ইয়ার। প্রতি বছর ১১ মিনিট করে পিছিয়ে যায়।

প্রতি ১২৮ বছরে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ১ দিন পিছিয়েছে। এই সমষ্টিগত ভাবে ১১ মিনিট (বা ০.০৩১২৭৬ দিন) ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ১০ দিনে পরিণত হয়েছিল বা ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটেন এই নতুন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে তখন এই ব্যবধান ১১ দিনে পরিণত হয়।

এখন ১৫৮২ সালের অক্টোবর মাসের বা ১৭৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার গুগলে সার্চ করলে যা পাওয়া যায়।

১৫৮২ এর অক্টোবর-এ যখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গৃহীতহয়, ক্যালেন্ডারে ১০ দিন বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১৭৫২-এর সেপ্টেম্বর মাসে যখন ব্রিটেন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহন করে, ক্যালেন্ডারে ১১ দিন বাদ দেওয়া হয়।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে পৃথিবীর বার্ষিক সময়কালকে সঠিক রেখে ১১ দিন বাদ দেওয়ার মাধ্যমে ১৭৫২ সেপ্টেম্বরে (অথবা ১৫৮২ সালের অক্টোবর মাসে ১০ দিন বাদ দিয়ে) তারিখকে সঠিক রাখা হয়েছে। এবং ২ সেপ্টেম্বর (বুধবার) এর পরের দিন ১৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) করা হয়েছে।

* তারিখ সঠিক রাখলেও এই ১১ দিন ক্যালেন্ডার থেকে বাদ পড়লে, ২ তারিখের পর যেমন ১৪ তারিখ হয় সেইভাবেই ১৪ তারিখ (১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৫২) বৃহস্পতি বারের পরিবর্তে সোমবার হওয়া উচিত ছিল।

১৭৫২ সেপ্টেম্বরের গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এবং আমার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার নীচে দেওয়া হল।

১৭৫২ সেপ্টেম্বর ক্যালেন্ডার
(গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার)

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
	1	2	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

(আমার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার)

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
	1	2	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

এই রিসার্চ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৫২ সাল একটি সোমবার হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমাদের গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এটিকে ভুলবশত বৃহস্পতিবার হিসাবে উল্লেখ করেছে। অতএব ১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৫২ সাল থেকে দিন ওবারের একটি অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে এবং আমরা সেইদিন থেকে প্রতিদিন একটি ভুলবার উল্লেখ করে চলেছি।

নিচে আমাদের ক্যালেন্ডারের ভুলবার এবং আমার এই রিসার্চের ভিত্তিতে নির্ণীত সঠিক বারের একটি তালিকা দেওয়া হল।

ক্যালেন্ডারেউল্লিখিত বার (যাভুল)	সঠিকবার
সোমবার	শুক্রবার
মঙ্গলবার	শনিবার
বুধবার	রবিবার
বৃহস্পতিবার	সোমবার
শুক্রবার	মঙ্গলবার
শনিবার	বুধবার
রবিবার	বৃহস্পতিবার

এখন এইবার-এর অসামঞ্জস্য আমাদের সমাজের ওপর আমাদের দৈন্যন্দিন জীবনে এবং ধর্মীয়ক্ষেত্রে যেভাবে প্রভাব ফেলেছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

* গত ৩০০ বছর ধরে যে পবিত্র নামাজ পড়া হয়েছে শুক্রবারে, আসলে সেটি ছিল মঙ্গলবার এবং শনিদেবের পূজা আমরা শনিবারের পরিবর্তে বুধবারে করে এসেছি।

* গত ৩০০ বছর ধরে আমরা রবিবারে অফিস গিয়েছি এবং বৃহস্পতিবারে সপ্তাহান্তের ছুটি নিয়েছি।

(একইভাবে এইবার সংশোধনটি ১৫৮২ এর অক্টোবর মাসেও করা যায়, আমার রিসার্চ কাজে আমি ১৭৫২ সেপ্টেম্বর ধরে করেছি।)

With best wishes from

Amit Paul

Sl. No. 13

কোরোনা তোমার কোন পথ দিয়ে

কৌশিক লাহিড়ী

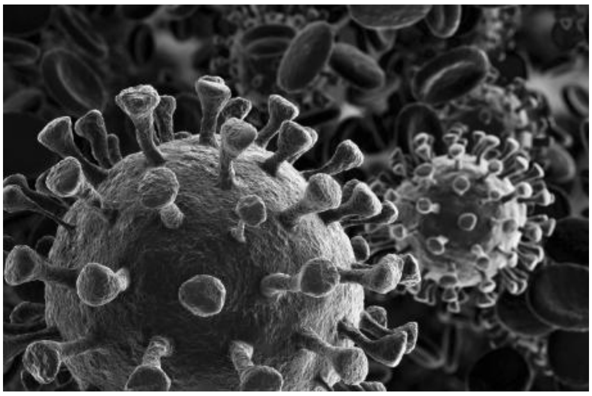

এই সুযোগে পুরোনো কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে কত বছর যে উজানে ফিরে গেলাম !

পুরনো চেকবুকের বাণ্ডিল, 'দেশে' সম্পাদকের দফতরে পাঠানো চিঠি, সিকি শতাব্দী আগের ইলেক্ট্রিসিটি আর টেলিফোন বিল, অকারণে রয়ে যাওয়া বাজারের ফর্দ, উঠে যাওয়া ইস্ট ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের টিকিট, শিলংয়ের হোটেলের বিল, আংশিক পূরণ করা 'আমার শৈশব', আটানব্বই সালের এলআইসি-র রসিদ, আমাদের জংলা সবুজ রঙা প্রথম মারুতির একটা চাবি, প্রথম সন্তান জন্মের হাসপাতালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের ফোটোকপি, শেল্ফের ওপর ভাঁজ করে রাখা ইন্ডিয়ার টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরদিনের খবরের কাগজ, একটা খামের ওপর বাবার হাতের লেখা...

এক এক টুকরো কাগজ ফিরিয়ে দিচ্ছিলো অনেকগুলো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক একটা সকাল সন্ধ্যে!

যেমন প্রায় সিকি শতাব্দী আগে ডালহৌসি ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়নের লেটারহেডে লেখা কেবল শর্মার এই চিঠিটা!

সেবার কেবল ছিল আমাদের ড্রাইভার। ডালহৌসি থেকে খাজিয়ার হয়ে ধরমশালা নিয়ে গিয়েছিলো। সঙ্গে ছিল ওর সঙ্গী সুভাষ। লম্বা, গম্ভীর মুখ। হাসে না একেবারেই! ডান গালে একটা কাটা দাগ ।

ডালহৌসি থেকে বেরিয়ে আধঘন্টার মধ্যে কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে উঠে এলাম বেশ অনেকটা উঁচুতে, আর এসেই লালমোহনবাবুর মতো বলতে ইচ্ছে হলো,

—এ কোতায় এলুম, মশাই !

রাস্তায় বরফ, পাথরে বরফ, গাছে বরফ, ঘাসে বরফ। গাড়ির চাকার দাগ পড়ছে রাস্তার বরফে। মনেও পড়ছে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ।

ছবি তুলতে হবে। লেন্সের পেছন থেকে সামনে আসার ইচ্ছেয় সুভাষ-কে বোঝাতে যাই, কোথায় চোখ, কোনটা শাটার।

রাগ রাগ মুখ করে ও শুধু বলে, 'হাঁ হাঁ মালুম হ্যায়, আপ যাইয়ে না।'

—আরে, অ্যাপারচার, শাটার স্পিড এ সব জানবে কী করে? আর ফ্রেমিং?

—মেরা পাস ভি হ্যায় ক্যামরা ! ক্যানন, মিনোল্টা, পেনট্যাক্স, নিকন সব! ভিডিও ভি হ্যায়! ষ্টুডিও হ্যায় না মেরা উধার, ডালহৌসি মে!

মানে? এ তো মেঘ না চাইতেই জল! পেশাদার আলোকচিত্রী চলেছেন আমাদের সঙ্গে, তাও আবার বিনা পারিশ্রমিকে!

শিলংয়ের হোটেলের বিলটা আবার মনে করিয়ে দিল ড্রাইভার শঙ্কর যাদব-কে!

পাইনউড হোটেল থেকে চেক-আউট করার সময় তাড়াহুড়োয় অ্যাডভান্স বুকিংয়ের টাকাটা ফাইনাল বিলে অ্যাডজাস্ট করতে ভুলে গিয়েছিলাম! ফলে অনেকগুলো টাকা যে বেশি দেওয়া হয়ে গেছে আর সেটা খেয়াল হয়নি!

মনে পড়লো বড়াপানি-তে পৌঁছে!

সেখানে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে সারাটা বেলা জলের দিকে তাকিয়ে থাকা। অলস, অনিমেষ, রোদ-মেঘের খেলায় বেলা বাড়ে, সূর্য ঢলে পড়ে। রং বদলায় লেকের জল। চোখে ধরা পড়ে না সে বদলের মুহূর্ত, শুধু বদলে যাবার পর অবাক লাগে!

সে সব ফেলে সেই প্রাক্-মোবাইল প্রাগিতিহাসের সারা বিকেলটা ফোনে-ফোনে ভ্রষ্ট হয়ে থাকলো উমিয়াম রিসোর্ট থেকে শিলং আর কলকাতার আসাম ভবনে!

ভোর বেলায় দরজায় নক!

রাতেই শিলংয়ের পাইনউড থেকে টাকা নিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই বড়াপানি পৌঁছে গেছেন শঙ্কর! আমাদের স্বল্পপরিচিত স্থানীয় বাহনচালক !

আমাদের মাথার মধ্যে এতো যে মচ্ছপুছারে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা, এতো মেঘ, রোদ্দুর আর কালবৈশাখী, এতো ঝড়খালি আর আয়লা, এতো যে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ ভালোবাসা, অভিমান আর ঝগড়াঝাঁটি, কানের ভেতর এতো যে রহো রহো সাথে, ফিফ্‌থ সিম্ফোনি আর ক্যা করুঁ সজনী, জিভের ওপর এতো রকমের কোয়াইজদাস, সিন্নি, হামাম মশিহ, ঝিঙ্গেপোস্ত আর দস্তরখানের আদর, এতো যে রেলগাড়ি দেখা অপু-দুর্গা, চিলাপাতার জঙ্গল, শিলাবৃষ্টি, অন্তাক্ষরী, এতো রকমের বেড়া আর নিঃসীমানা...

এই সব মুছে দেবে কোরোনা?

ধুর!

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মহাশক্তি কোল্ড স্টোরেজ

সুরেকালনা, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 28

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে
ইঞ্জিনিয়ারের প্রথম পছন্দ

দামোদর ইট ভাটার পাগমিল ইট

দামোদর ব্রিকফিল্ড

DBF
শম্ভুপুর, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান
মোবাইল : 9732161206, 8001769150

Sl. No. 29

With best compliments of

Baba Kaluroy Heemghar Pvt. Ltd.

Vill + P.O. Jaragram, P.S. Jamalpur, Dist. Purba Bardhaman, PIN : 713404
Ph : 03213-258556, Mob. 9434503680

Sl. No. 27

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

প্রফুল্ল কোল্ড স্টোর

চকদিঘি, পূর্ব বর্ধমান

আলু সংরক্ষমের বিশ্বস্ত হিমঘর
সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়

Sl. No. 26

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—কিছু কথা, কিছু স্মৃতি

প্রবাল সেনগুপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয় --- শিক্ষা পিরামিডের সর্বোচ্চ ধাপ। সারা বিশ্ব থেকে আহরিত জ্ঞানভাণ্ডার যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের হস্তগত হয়—নব নব উদ্ভাবনার আলোয় সেই জ্ঞান যেখানে প্রস্ফুটিত হয় নানারূপে, তাই হল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যার এই সমস্ত তীর্থভূমিতে পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে শুধু ‘বেচা-কেনা’ হয় না—গবেষণার আলোকে নতুনতর জ্ঞানের বিকাশ ঘটে সেখানে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিক্ষার এই পীঠস্থান হবে ‘যত্র বিশ্ব ভবেত্যক নীড়ম্’—অর্থাৎ যেখানে সারা বিশ্বের বিদ্বানদের লব্ধ জ্ঞান একই কুলায় অবস্থান করবে। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে এই রকম বিশ্ববিদ্যালয় বহুল সংখ্যায়ই ছিল। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি ‘বিশ্ববিদ্যাতীর্থ’-এর নামের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত।

আধুনিক যুগের ভারতবর্ষে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ঔপনিবেশিক ধাঁচেই গড়ে উঠেছিল। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণেই উদ্ভূত হয়েছিল এই ধরনের বাণীপীঠগুলি। ইংরেজ যখন ভারতবর্ষে প্রথম এসেছিল, তখন আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে কোনো নজরই দেয়নি তারা। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, পুরনো জমিদারতন্ত্র বহুলাংশে অবলুপ্ত হয়। এর ফরে দেশীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান টোল/মাদ্রাসাগুলিও ধ্বংসের মুখে পড়েছিল—কেননা এই পুরনো জমিদারতন্ত্রই সমাজের ‘অছি’ হিসাবে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহন করতো। শিক্ষাক্ষেত্রের এই শূন্যতা অবশ্য আংশিকভাবে পরিপূর্ণ করেছিল রেনেসাঁস-প্রসূত জ্ঞানদীপ্ত দেশীয় মানুষেরা এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা। যদিও সেই ‘বিস্তার’ প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। পরবর্তী কালে অবশ্য নিজেদের প্রয়োজনে ‘কেরানি ও আমলা তৈরির কল’ হিসাবে ঔপনিবেশিক সরকার দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার-প্রসারে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এরই সূত্রে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকার আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনে, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীনস্থ কলেজগুলি, মূলত ‘কেরানি তৈরির আখড়া’ হিসাবে গড়ে তোলা হল্যে। মার্কস-কথিত ‘ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র’ স্বরূপ হলেও ক্রমশ প্রকৃত বিদ্যা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথায় আসি। ঔপনিবেশিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বে, ব্রহ্মদেশ থেকে এলাহাবাদ—গোটা বাংলা সহ উত্তর ও পূর্ব ভারতের প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, পরীক্ষাগ্রহণ এবং ফলপ্রকাশের দায়িত্ব এককভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। ক্রমশ মাথাভারি প্রশাসনের চাপে এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়েছিল ন্যুব্জ। পরিস্থিতি সামাল দেবার কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছিল, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা। অবশ্য তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি।

এদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে ভারতে এল স্বাধীনতা—অন্যদিকে বাংলা হয়ে গেল বিভক্ত। ঢাকা হয়ে গেল পরদেশের বিশ্ববিদ্যালয়। দেশভাগ হওয়া সত্ত্বেও তখনও পূর্ব ভারতের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কাজ করে যেতে হচ্ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এমনকি বিদ্যালয়শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে নব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ছত্রছায়ায় প্রেরণ করেও, সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। ইতোমধ্যে বাংলা ভাগ হয়ে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দফতর সামলাচ্ছেন রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। দেশবিভাগ-এর আগে থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সারা বাংলার শিক্ষার্থীদের চাপে বিব্রত হয়ে পড়েছিল, নতুন পরিস্থিতিতে

পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু ছাত্রদের চাপে তার নাভিশ্বাসের উপক্রম হল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত চাপ হ্রাস করার চেষ্টায়, বিধানবাবু শহর কলকাতার সন্নিকটে এবং কিয়ৎপরিমাণে কিছুটা দূরের জেলায় নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি 'নীল নক্সা' প্রস্তুত করলেন। এই সমস্ত নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল কলকাতার সন্নিকটস্থ যাদবপুর এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দার্জিলিং জেলায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এই একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের আজকের আলোচ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী ছিল এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়—অধীনস্থ কোনো কলেজের দায়ভার নিতে হয়নি তাদের। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড় ও ভার হ্রাস করতে এই দুই প্রতিষ্ঠান খুব একটা সমর্থ হয়নি। উত্তরবঙ্গের কলেজগুলির পরিচালনার দায় ন্যস্ত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। কল্যাণীও চেষ্টা করেছিল নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার দায়ভার গ্রহণ করতে। এদেরই পাশাপাশি রাঢ়বঙ্গের বিশ্ববিদ্যাতীর্থ হিসাবে গড়ে উঠেছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

সেই সময়ে সরকার সবে 'জমিদারতন্ত্রের' উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ফলত বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদার 'বর্ধমানের মহারাজাদের' অনেক জমি সরকারের খাস সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানরাজ উদয়চাঁদ মহতাব বর্ধমান শহরের পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর ভূমিসম্পদের একটা বড় অংশ সরকারকে দিয়ে তো দিলেনই—পাশাপাশি রাজবাটি, চাঁদনি, গোলাপবাগ, কৃষ্ণসায়র অঞ্চলের নয়নাভিরাম অট্টালিকা ও উদ্যান এবং সুবিস্তৃত দিঘি সম্বলিত ভূখণ্ড'-ও দান করলেন বর্ধমানের মানুষের কল্যাণের জন্য। এই পরিস্থিতিতে দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় 'মহারাজা' উদয়চাঁদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। রাঢ়বঙ্গের প্রস্তাবিত এই প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ হ্রাস করবে, তেমনি গ্রামবাংলার ছেলেরা ঘরের কাছেই পড়াশোনার সুবিধা পাবে—এমনটাই ভেবেছিলেন ডা. রায়।

এই চিন্তার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল' পেশ করা হয়েছিল। বিল পেশ করতে গিয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলির প্রয়োজন মাথায় রেখেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য পাঠ্যক্রম অনুশীলনের বন্দোবস্ত থাকলেও, এই নব বিশ্ববিদ্যালয় টেকনোলজিক্যাল শিক্ষার উপরই বেশি জোর দেবে এমনটাই আশা প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রসঙ্গত তখন দুর্গাপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং শ্রীরামপুরের টেক্সটাইল টেকনোলজির কলেজ ছাড়া প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক্ষেত্রে আর কোনো কারিগরি ডিগ্রি কলেজ ছিল না—ফলত কারিগরি শাখায় শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল অত্যল্প।

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য বিরোধী দলের বিধায়কেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলগত বিরোধিতা না করলেও শিক্ষকদের অপ্রতুলতার জন্য এখানে কারিগরি শিক্ষার প্রসার কতটা হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এছাড়া সরকারি বিল-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপোষণের আর্থিক ব্যয়ভার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে বলে যে আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল, তার তীব্র বিরোধিতা করেন বিরোধী দলের সদস্যেরা। সরকারের নিজ দায়িত্ব এভাবে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার তীব্র বিরোধিতাও করেন তাঁরা। বর্ধমানের তৎকালীন বিধায়ক বিনয় চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় বিলের ক্লজ-৮-এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই ক্লজ অনুযায়ী কারিগরি বিদ্যার প্রসারের লক্ষ্যে দুর্গাপুর স্টিল বা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের ম্যানেজারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিনয়বাবু বলেছিলেন, এরা টেকনোক্র্যাট হলেও শিক্ষা প্রসার, বিস্তার, পাঠ্যক্রম রচনা ও পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতাহীন—তাই তাঁদের পরামর্শ বহুলাংশে বিশ্ববিদ্যালয়কে উপকৃত করবে না। পরিশেষে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি গৃহীত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় মূলত কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা সমৃদ্ধ একটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম উপাচার্য পদে আসীন হন বিখ্যাত কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদাধিকারী সুকুমার সেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই একটি কিশলয় বিশ্ববিদ্যালয়কে মহীরূহে পরিণত করার জন্য একজন যোগ্য মানুষকেই মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় বেছে নিয়েছিলেন। সামন্ততন্ত্রের পীঠস্থানকে জনতার শিক্ষাতীর্থে পরিণত করবার কাজে মনপ্রাণ ঢেলে আত্মনিয়োগ করেন সুকুমারবাবু। সহযোগী হিসাবে তিনি পান শৈলেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কয়েকজন কর্মবীরকে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও হুগলি—এই পাঁচটি জেলার পঁয়ত্রিশটি কলেজকে নিয়ে শুরু হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা। আগেই উল্লিখিত, দুর্গাপুর ও শ্রীরামপুরের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানদ্বয় ছাড়াও বত্রিশটি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ এবং একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ তখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। রাতদিন এক করে সুকুমার সেনের নেতৃত্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছিল, সেই সময়েই আকস্মিকভাবে কার্যকালের মাত্র তিনমাস অতিক্রম করার আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সুকুমারবাবুকে দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের উন্নয়ন কর্মসূচির কর্ণধার হিসাবে প্রেরণ করা হয়। কিছুটা ধাক্কা খায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক উন্নয়নের কাজ।

যাইহোক, ১৯৬০-এর এপ্রিলে, সরকারি সিভিল সার্ভিস থেকে সেবানিবৃত্ত 'সিভিলিয়ান' ব্রজকান্ত গুহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন। সুকুমারবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির যে নীলনক্সা প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন তা অনুসরণ করেই ব্রজকান্তবাবু বিশ্ববিদ্যালয়-এর উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োজিত হন। ১৯৬০-এর ৬ জুলাই বর্ধমান রাজবাটি বা মহতাব মঞ্জিলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্য ইউনিভার্সিটি-র অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিচালন কমিটির সভা আহূত হল। আইন অনুযায়ী আচার্য রাজ্যপাল, উপাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব, বর্ধমান বিভাগে অবস্থিত তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থা (চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর ও বার্নপুর)-এর জেনারেল ম্যানেজারগণ এবং ভারত সরকারের কয়লাখনি প্রকল্পের উপদেষ্টা এই সর্বোচ্চ কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রথম বৈঠকে উপস্থিত আচার্য রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর বক্তব্য সম্বন্ধে সভার বিবরণীতে লিখিত আছে, 'The Chancellor next referred to the newly established Regional Engineering College, Durgapur and expressed her confidence that this institution would fully develop and help the University in achieving a technological bias'।

শিল্পসংস্থাগুলির 'টেকনোক্র্যাট'দের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন আচার্য। অবশ্যই পরবর্তীকালের ইতিহাস তাঁর আশাকে ভুল প্রমাণিত করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য অথবা আইন বিভাগের

জন্য—ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিক্যাল শাখায় কখনো অগ্রবর্তী হয়ে ওঠেনি প্রতিষ্ঠানটি। আর সবেধন নীলমণি দুর্গাপুরের কলেজটি তো আজ বহু হাত ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বহু দূরে চলে গেছে—কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়ে।

যাই হোক, প্রাথমিক পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যের বিবরণীতে ফিরে আসা যাক। প্রারম্ভিক পর্বে উপাচার্যের মূল কাজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়টির স্ট্যাটিউট, অর্ডিন্যান্স, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রস্তুত করা। এই কাজে পূর্বের উপাচার্যের সময়কালের মতোই তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন প্রতিষ্ঠানের স্পেশাল অফিসার (ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্ট) শৈলেন্দ্রনাথ সেন। ব্রজকান্তবাবু উপাচার্য থাকাকালীনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব হিসাবে মনোনীত হন ড. সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ফিনান্স অফিসার ও পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক-এর দায়ভার গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডি.সি গুহ এবং ড. হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

অধীনস্থ কলেজগুলির পরিচালনা ছাড়াও উপাচার্য ব্রজকান্তবাবুর অক্লান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগগুলি গড়ে উঠতে থাকে। প্রাথমিকভাবে, এই সমস্ত বিভাগের শ্রেণিপাঠ রাজবাটিতেই অনুষ্ঠিত হতো। অবশ্যই স্থানাভাব ছিল সেখানে। তাই দূরদর্শী ব্রজকান্তবাবুর চেষ্টাতেই গোলাপবাগ প্রাঙ্গণে একের পর এক স্নাতকোত্তর বিভাগগুলির প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলি গড়ে উঠতে থাকে। তারাবাগ, অভয়কানন, ভেড়িখানার আবাসনগুলিও তৈরি হয়েছিল তাঁর আমলে।

এদিকে স্টেশন থেকে গোলাপবাগ হয়ে রাজবাড়ি পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব 'বাস সার্ভিস'। গড়ে তোলা হল বনবাস ছাত্র হস্টেল। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্র ও বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস। আরো পরে একে একে তৈরি হল নেতাজি, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, আইনস্টাইনের নামাঙ্কিত ছাত্রনিবাসগুলি। সবকটিই ছাত্রদের জন্য। দূরবর্তী জেলা থেকে আগত ছাত্রীদের বর্ধমান শহরে থেকে পড়ার সুবিধার্থে প্রথম গড়ে উঠেছিল নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হল সরোজিনী, মীরাবাঈ, গার্গী, প্রীতিলতার নামে পরিচিত ছাত্রীনিবাসসমূহ। এদিকে 'রাজসংগ্রহের' ১০,৩৫০টি পুস্তক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার তার যাত্রা শুরু করলেও, ক্রমশ বহু বই এবং জার্নালের সমারোহে তা পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের একটি হিসাবে আমরা দেখতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,২০,০০০-এরও বেশি। এছাড়াও রয়েছে প্রতিটি বিভাগের সমৃদ্ধ পৃথক গ্রন্থাগার।

শিক্ষক ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা অচল। তাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষকদের স্ব-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদাতা হিসাবে আনয়ন করার প্রক্রিয়াও শুরু করে দেয়। প্রথম বছরে অবশ্য বিজ্ঞানবিভাগে গণিত ছাড়া অন্য কোনো বিভাগ চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপারগ হন। কলাবিভাগে অবশ্য বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে সূচনা থেকেই স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়ে যায়।

অবশ্য কর্ম পরিষদের চতুর্থ সভাতেই (২৪.০২.৬১) ১৯৬১-৬২ শিক্ষা বৎসরে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম শুরু করার জন্য উদ্যোগী হতে উপাচার্যকে অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দেই এই বিভাগদ্বয় পুরোপুরি কাজ করতে থাকে। ক্রমশ স্নাতকোত্তর বিভাগ হিসাবে দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা, বাণিজ্য, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, হিন্দি, সমাজবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, অণুজীববিদ্যা, সাঁওতালি প্রভৃতি বিভাগ গড়ে উঠেছে বর্ধমানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের DSA বা ডিপার্টমেন্ট অব স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স-এর তকমাও লাভ করেছে, অধুনাতন সময়ে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই ক্রমশ বিশিষ্ট শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে টেনে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। যে সমস্ত শিক্ষক অধ্যাপক বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এই প্রসঙ্গে লেখা যেতেই পারে। যেমন তারাপদ মুখোপাধ্যায়, জনার্দন চক্রবর্তী ও ভবতোষ দত্ত (বাংলা), ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় (ইংরাজি), গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সংস্কৃত), শশীভূষণ চৌধুরী, সুমিত সরকার, পার্থসারথী গুপ্ত, বরুণ দে (ইতিহাস), জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি, শিবজীবন ভট্টাচার্য ও মৃণালকান্তি ভদ্র (দর্শন), মিহিরকান্তি রক্ষিত, অজিত বিশ্বাস, হীরেন্দ্রনাথ রায় (অর্থনীতি), এ.পি বৈষ্ণব (গণিত), এস. কে সিদ্ধান্ত, আর. এল দত্ত ও এস. সি রক্ষিত (রসায়ন), রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র ভট (পদার্থবিদ্যা), সত্যশরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণেশ দাস, সীতাংশু চক্রবর্তী ও অমিত কুমার মল্লিক (বাণিজ্য) প্রমুখ। তাঁদের নিজ নিজ বিভাগকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা।

তথাকথিত নবীন বিভাগের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার পি.এন. ভাদুড়ি ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ডি. কে. চৌধুরী এবং ডি. মজুমদার প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ও বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যাবত্তা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ তার যাত্রা শুরুর আগেই অনুমোদিত সরকারি কলেজ হুগলি মহসিন কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠদান করা হতো। পরবর্তীকালে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তকুমার রায়, রাধারমণ চক্রবর্তী প্রমুখের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সূচনা হয়েছিল। এই বিভাগটি ছিল তারকা উজ্জ্বল। উদাহরণস্বরূপ আমরা সুদীপ্ত কবিরাজ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, অমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যশস্বী বিভাগীয় অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমরা পঠনপাঠনের সঙ্গে বর্ধমানের গবেষণা প্রকল্পগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—নিকট অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল বিভাগেই এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি-র গবেষণা সুচারুরূপেই সংঘটিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মুদ্রণ বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তার কাজ চালাচ্ছে। একসময় এই বিভাগ থেকে প্রচুর মূল্যবান বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমাবধি এই মুদ্রণ বিভাগের প্রাণপুরুষ ছিলেন মৃদুলকান্তি সেন।

এবার আসি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত অব-স্নাতক কলেজগুলির কথায়। পাঁচটি জেলার ত্রিশের অধিক মহাবিদ্যালয় নিয়ে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২-তে কলেজগুলির ছাত্রদের স্নাতকস্তরের মূল্যায়ন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবেই রূপায়িত হয়, তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ামক হরেশচন্দ্রবাবুর অক্লান্ত চেষ্টায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের চেষ্টায় এই সময়কাল থেকেই নতুন নতুন কলেজ খোলা হয়েছিল। ১৯৭০-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ৪৩টি। সেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ১০৪টিতে। পরবর্তীকালে অবশ্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানের কলেজগুলির নিয়ন্ত্রণভার নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে চলে গেলে বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির সংখ্যা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

শুধু লেখাপড়া নয়—প্রথমাবধিই সংস্কৃতি চর্চা ও খেলাধূলার ক্ষেত্রেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তার ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাপর্বেই 'চাঁদনী মেস'-এ বাসরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকর্মীদের উদ্যোগে এবং অকিঞ্চন রায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র 'রিক্রিয়েশন ক্লাব'। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থার রূপ পরিবর্তিত হয়ে জন্ম নেয় 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারি সমিতি'। তারাবাগে সদ্য আগত শিক্ষকেরা সবাই মিলে গড়ে তুললেন, 'টিচার্স রিক্রিয়েশন ক্লাব'। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধ্যাপক অমূল্য সেন, সনৎ রায় চৌধুরী এবং সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অবশ্যই স্মরণযোগ্য। ক্রীড়া ও শরীরচর্চাতেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ড. শশীভূষণ চৌধুরীর উপাচার্য হিসাবে কার্যকালে 'রাজার গ্রন্থাগার'-এ ক্রীড়া দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া ভাবনা সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে। স্পোর্টস অফিসার দীপ্তিকুমার ঘোষ ছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে খেলাধূলার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এস্টেট অফিসার শৈলেন্দ্রকুমার সেন এবং রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক উন্মুক্ত মাঠে, সূচনা হয়েছিল ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, ভারোত্তলন, ব্যাডমিন্টন, কবাডি, হকি প্রভৃতি খেলার চর্চা। এদিকে গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জিমন্যাসিয়াম হল।

খেলাধূলার পাশাপাশি এন.সি.সি এবং এন.এস.এস প্রোগামেও ছাত্রছাত্রীদের এক বৃহদংশ অংশ নিত এবং নিয়ে চলেছেও। এই প্রোগ্রামগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের দেশপ্রেম ও সমাজসেবার প্রতি আকর্ষিত করতে অনেকটা পরিমাণেই সফল হয়েছিল। দেশের আদর্শ নাগরিক হিসাবে তাঁদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকাও এইভাবে পালন করেছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাত্রদের কাছে অধ্যয়নই হল তপস্যা, একথা প্রচলিত থাকলেও, একথা আজকের যুগে মানতেই হবে যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র গ্রন্থকীট বা পণ্ডিতন্মণ্য করে গড়ে তুললে তাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ কখনোই হবে না—চারপাশের সমাজ, রাজনীতি সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই হবে। ছাত্ররাও এর পাশাপাশি নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে সামিল হবে চারপাশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপে। এই ভাবনার ফলস্বরূপই আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে ছাত্রসংসদ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের প্রথম নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনৈক কানাই কোনার। প্রাথমিক পর্বে 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের' পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ছাত্ররা সম্যকভাবে সেই অসুবিধা অনুভব করে, নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে সেরকম কোনো আন্দোলন সংগঠিত করেনি। এক প্রাক্তনীর কথায়, ''ছাত্র আন্দোলন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় না হলে আমাদের অনেকের এম.এ পড়াই হত না। বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ায় আমরা এত আপ্লুত ছিলাম যে, অন্য চাহিদা ছিল না। পরবর্তী পর্বে অবশ্য ছাত্রসংসদ অধিকার-সচেতন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বর্ধমান মফস্বল বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় হলেও ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও 'সংসদ'-এর আন্দোলন-সংগ্রামে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এমনকি একাধিকবার ছাত্রীরা ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছাত্র আন্দোলন সমাজের বৃহৎ সংগ্রামের পরিপূরক—এই বৃহত্তর আন্দোলনেও বর্ধমানের ছাত্ররা পিছিয়ে ছিল না। প্রসঙ্গত ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা ধ্বংস হবার পরে, রাত্রি দশটায় ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থনে যে বিশাল পদযাত্রা ছাত্রদের উদ্যোগে হয়েছিল তা বাইরের সংগ্রামের পরিপূরকই ছিল।

এর আগে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই 'রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের দাবি ওঠে। ছাত্র আন্দোলনের অভিঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলির পরিচালন কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে ছাত্ররা তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়াও ছাত্ররা নানা সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তথাকথিত ছাত্রস্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপের বিরোধিতা করে সংগ্রামে সামিল হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণে 'নন-ডেপুটেড' ছাত্রদের জন্য আসন বৃদ্ধি করা, স্নাতকোত্তর স্তরের ভর্তিতে দুর্নীতি বন্ধ করা, চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে 'অবজেকটিভ' প্রশ্ন বৃদ্ধিরে দাবিতে ছাত্ররা এখানে সংগ্রাম করে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

শিক্ষক আন্দোলনেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে ছিল না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স-এ বলা হয়েছিল, 'A teacher of the University shall have full liberty to hold his own opinion regarding any questions relating to a political or a pseudo–political matter, or to any affair of the University...''। তবু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অনেকাংশে শিক্ষকদের স্বাধীন মত প্রকাশে বা আন্দোলন-সংগ্রামে যোগ দেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শেষ পর্যন্ত বারে বারেই তাদের শিক্ষক আন্দোলনের স্রোতের সামনে হঠে যেতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা বহুবার তাদের সর্বভারতীয় সংগঠন AIFUCTO এবং প্রদেশের সংগঠন WBCUTA-র নেতৃত্বে নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে।

এইভাবে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম আলোকজ্জ্বল মশালের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে রাঢ়বাংলার গর্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। 'ভালো, মন্দ / সুখ, দুঃখ / অন্ধকার, আলো' নিয়ে আগামী দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি শুধু ভারতে নয়, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে—এই আশা করাই যেতে পারে।

ঋণস্বীকার

১. সুবর্ণসম্ভার—পঞ্চাশের আলোকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০
২. বর্ধমান পৌরশতবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৬৫
৩. পশ্চিমবঙ্গ—বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
৪. বর্ধমান পরিক্রমা—সুধীরচন্দ্র দাঁ
৫. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
৬. শিক্ষার চালচিত্র : বর্ধমান—নীলা কর
৭. বর্ধমান সমগ্র—গোপীকান্ত কোঙার, ২০০০
৮. Bengal District Gazetteers : Burdwan–JCK Peterson, 1997 (Reprint)
৯. West Bengal District Gazetteers : Burdwan–S.B. Choudhury *et.al*

শতবর্ষে স্মরণ : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

রীনা মিত্র

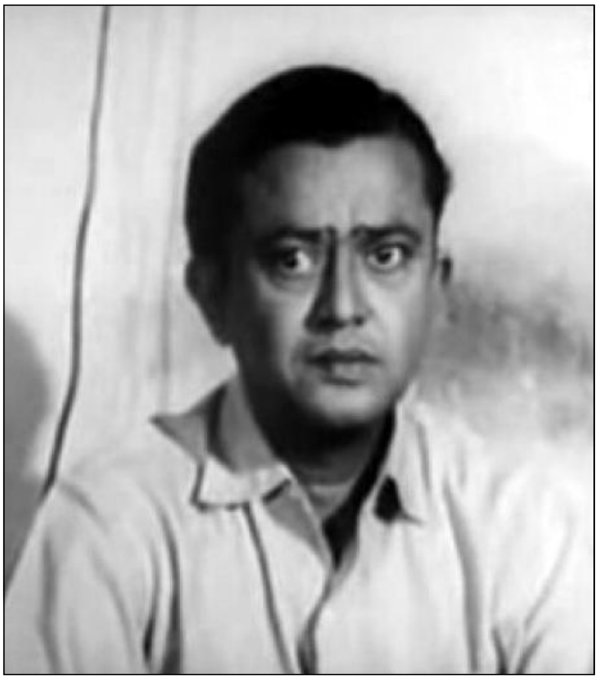

শহিদ দিবস। মহাকরণে অনেক মানুষের সমাগম। প্রত্যেকে বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল রোগাপটকা চেহারার একজন মানুষ ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ফটোতে মালা দিয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন। কৌতুহলী চোখে জনগণ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় সকলেই এই লিকলিকে চেহারার মানুষটিকে চেনেন। তিনি কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২০ তাঁর জন্ম শতবর্ষ।

খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনা করেছেন ঢাকায়। ছোটবেলায় ঢাকা শহরে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্যোগী হন। হঠাৎ করে তাঁর বড় দাদার মৃত্যু হলে দীনেশ গুপ্ত তাঁকে বিপ্লবে যুক্ত হবার পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে ঢাকায় শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারি পরোয়ানা জারি হলে তিনি বাধ্য হয়ে ঢাকা ছেড়ে কলকাতা আসেন ১৯৪১-এর অক্টোবর মাসে। ওই মাসেই আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোল অফিসে চাকুরিতে যোগ দেন।

১৯৪৬-এ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ১৯৪৬-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথম সিনেমার স্যুটিং করেন। ছবির নাম 'জাগরণ'। ছবিটিতে তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা কমেডিয়ান অভিনেতা রূপেই জানি। কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সেই দায়বদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। তিনি কি শুধুই কমিটেড শিল্পী? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন— ‘‘এখন আমাকে যদি কমিটেড শিল্পী বলা হয়, তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকার কথা, নয়, কেবল একটি ছাড়া। নাটকের মধ্যে আমি মানুষের পক্ষে কথা বলতে চাই, সেটা রাজনৈতিক হতেই পারে। তবে আমি কোন পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য আমার নাটকের মধ্যে বলতে চাই না। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু সমাজের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী আমি দরকার মতো ও সাধ্যমতো তার বিরুদ্ধে মানুষকে খোঁচা দিয়ে জাগানোর জন্য নাটক করে যেতে চাই—সে ব্যঙ্গ বা সিরিয়াস যা কিছু হোক না কেন। এটাই আমার কমিটমেন্টের শেষ কথা।’’

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাংলা ছবি ছাড়াও 'বন্দীশ', 'এক গাঁও কি কহানী', 'সাগিনা মাহাতো' প্রমুখ হিন্দি ছবিতে অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন। ১৯৪৮-এ 'নতুন ইহুদি' নাটক করে সুনাম অর্জন করেন। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ও 'সাড়ে চুয়াত্তর' তাঁকে খ্যাতির শীর্ষস্থানে পৌঁছে দেয়। ১৯৭৬-এ তিনি আমেরিকা ও কানাডা যান বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দিতে।

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, ভুমেন রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী—প্রত্যেকের সঙ্গেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেছেন। শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করতে না পাওয়ার কারণে তাঁর জীবনে দুঃখ ও আক্ষেপ ছিল। ছবি বিশ্বাস তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আদর করে কখনো বলতেন 'ভেনো', কখনো বলতেন 'বাঙালটা'। এই স্নেহের একটি উদাহরণ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কথায় জানা গেছে। 'কাঞ্চনমূল্য' ছবির স্যুটিং হওয়াকালীন লাঞ্চের সময় তাঁকে বিশেষ প্রয়োজনে পরিবেশকের অফিসে যেতে হয়। বিকেল হয়ে গেছে ফিরতে। দেখেন তাঁর ছবিদা তখনও লাঞ্চ করেননি। অপেক্ষা করে বসে আছেন। তিনি বলেছেন, এমন দাদা পাওয়া যায়? এমনই মধুর সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। তাঁর বাবার মৃত্যুতে পকেটে ৫০০ টাকা গুঁজে দিয়ে কিছু না খেয়েও ছবিদা সারাদিন পাশে থেকে কাজকর্ম তদারক করেছেন। অথচ সেই ছবিদা যেদিন জাগুলিয়া যাবার সময় পথ-দুর্ঘটনায় মারা যান, সেদিন যাবার সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাজ থাকায় তিনি যেতে পারেননি। এ আক্ষেপ

তিনি জীবনে ভুলতে পারেননি। ছবি বিশ্বাসের মৃত্যুতে তিনি প্রিয়জন হারানোর শোক অনুভব করেছেন।

উত্তমকুমারের সঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর সম্পর্ক ছিল। একে অপরকে সহোদরের মতো দেখতেন। সমস্তরকম বিপদ-আপদে উভয়ে উভয়ের পাশে থাকতেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় দুই জনই কমেডিয়ান হলেও তাঁদের মধ্যে পেশাগত ঈর্ষা ছিল না। বরং সুসম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন ছবিতে দু-জনে একসঙ্গে কাজ করার ফলে জহর-ভানু ব্র্যাকেট হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের নাম দিয়ে ছবি হয়েছিল 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'ভানু পেল লটারি', 'এ জহর সে জহর নয়'। এখন মানুষ হাসতেই জানে না। সবই কৃত্রিম। কাজে কাজেই অভিনয়েও কমেডিয়ানদের মধ্যে কৃত্রিমতা এসেছে। অথচ সে সময়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমেডিয়ানের স্বীকৃতি এমনই ছিল যে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর মায়ের শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার লোক হেসে হেসে বলছে, 'ওই দেখ ভানু কাঁদছে'।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি, বরং প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদী মনোভাবের জন্য ১৯৬৮-৬৯-এ যখন ছায়াছবির জগতে প্রোডিউসার বনাম টেকনিসিয়ানদের আন্দোলন চলছে তখন তিনি অভিনেতৃ সংঙ্ঘের পক্ষে টেকনিসিয়ানদের সমর্থনে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এরপর অভিনেতৃ সংঘ ভাগ হয়ে শিল্পী সংসদ ও সংরক্ষণ সমিতি সৃষ্টি হয়। প্রযোজকরা টেকনিসিয়ানদের পক্ষের শিল্পীদের কাজ থেকে জবাব দেন। অনেকে আপস করেন, মিটিয়ে নেন। কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি। ফলে পাঁচ বছর চলচ্চিত্র জগতে তিনি ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যান। তার অনেক আগেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কষ্টে দিন কাটে। তবু ভেঙে পড়েননি। ছবি করে টাকা পাননি। এই অসাধারণ কৌতুকাভিনেতা এ সময় নিজের জীবনে কৌতুকের অভিনয় করেছেন। নিজের নিকট থেকে পরিচালকের হাত দিয়ে বাড়িতে স্ত্রীর হাতে টাকা পাঠিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট পরিচালকের মুখে নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি জেনেছেন। এরকমই ট্র্যাজিক ছিল অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন।

ছায়াছবির জগতে ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাওয়ার পর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুক্তমঞ্চ' নামে একটি যাত্রাদল গড়ে তোলেন। অমানুষিক পরিশ্রম করতে থাকেন। মাঠে-ঘাটে ঘুরে যাত্রা করে শরীর ভেঙে যেতে লাগলো। তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন ভাবলেন। এ সময় রঙ্গনা থিয়েটারের প্রযোজক হরিদাস সান্যালের অনুরোধে তিনি ১৯৮০-তে রঙ্গনা থিয়েটারে যোগ দেন এবং 'জয় মা কালী বোর্ডিং' নাটকে অভিনয় করেন। একটানা দু-বছর শো চলে। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিন ছুটিতে থাকার পর সুধাংশু মিত্রের প্রযোজনায় রঙ্গনা কয়েকজনকে নিয়ে রঙমহলে আবার 'জয় মা কালী বোর্ডিং' নাটক শুরু করেন। কিছুদিন পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার বিশ্রাম নেন। সেই তাঁর চিরতরে বিশ্রাম।

□

অভিনয়-জগতের সদা হাস্যময় ও সরল প্রকৃতির ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবে কিন্তু স্পষ্টবাদী ছিলেন। মুখে এক কথা মনে এক ভাব—এ-ধরনের মানুষদের তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি আড়ালে কারো নিন্দা করতেন না, আবার কারো অন্যায় দেখলে সামনে গালাগালি করতেও দ্বিধা করতেন না। মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন বলে কারো কাছ থেকে অকারণে আঘাত পেলে অত্যন্ত মুষড়ে পড়তেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি খুব অসুস্থ অবস্থাতেও একজন শিল্পীর অসুখে তাঁকে নিয়মিত দেখতে গেছেন; সাহায্য করেছেন। সেই শিল্পীটি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ছবিটি করার সময় তাঁকে অকারণে ব্যথা দিয়েছেন। এতে তিনি খুবই মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'পাশের বাড়ি', 'বসু পরিবার', 'টনসিল', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'ওরা থাকে ওধারে', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'ছেলে কার', '৮০-তে আসিও না', 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' প্রমুখ ছবি হিট করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তিনি পাননি। নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য খুব কষ্ট পেয়েছেন। তবে উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, প্রতিমা দাশগুপ্তা প্রমুখের সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কথা নীলিমাদেবী স্বীকার করেছেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে উৎপল দত্ত ও শোভা সেন এসেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তাঁর হাতে তুলে দিলেন শ্রীদত্তের লেখা 'গিরীশ মানস' গ্রন্থটি। তিনি খুলে দেখলেন উৎসর্গের পাতায় তাঁর নাম। বিস্ময়ে তিনি হতবাক। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো আনন্দাশ্রু। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের থেকেও সেরা পুরস্কার বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

আর একটি ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে। যাত্রা করে বাড়ি ফিরছেন। পথে দাঁড়িয়ে এক অশীতিপর বৃদ্ধা। হাতে তাঁর মালা। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরে সেই বৃদ্ধা বললেন, ''বৈকুণ্ঠের উইলের জ্যান্ত গোকুলকে দেখবার জন্য পথে দাঁড়িয়ে আছি, বেঁচে থাকো বাবা।'' ভানু নতজানু হয়ে আশীর্বাদ নিলেন। অপরিসীম আনন্দে মনে মনে ভাবলেন কোথায় থাকবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এই পুরস্কার ক'জনের ভাগ্যে জোটে।

□

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র অভিনেতা নন। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন। দেশের জন্য মানুষের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশপ্রেমিক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য ছেলেবেলা থেকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বাবা ঢাকার নবাবের স্টেটে আমমোক্তার ছিলেন। মা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে 'জেনানা গভর্নেস' পদে কাজ করতেন। সে সময় বিপ্লবী দল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গোপনে মিটিং করছে। বাবা-মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও ১২ বছর বয়সে তিনি মিটিং-এ যোগদান করার পর বাড়ি ফিরলে বাবা তাঁকে নিষেধের কথা মনে করিয়ে দেন। বাবাকে তিনি বলেছিলেন ''এ সব মিটিং-এ যদি কেউ নাই যাবে তবে মিটিং হয়ই বা কেন?'' এর থেকেই ছোট ছেলেটির বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া লক্ষ করা যায়। তিনি নিজেই বলেছেন, ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের থেকে রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। তিনি অনুশীলন দলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়দা ও দীনেশদার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। এই দুই ব্যক্তির যুক্তিবাদী বক্তব্যে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন।

তখনকার দিনে বিপ্লবীদের নিয়মানুবর্তিতাকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে বিপ্লবী দীনেশদাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। দীনেশদার মাতৃভক্তি ও দেশভক্তি তাঁকে অনুপ্রাণিত করতো। পাঞ্জাবের একটি মিটিং-এ যাওয়ার সময় সাইকেল বিগড়ে গেলে দীনেশদা চার মাইল রাস্তা সাইকেল কাঁধে নিয়ে সঠিক সময়ে মিটিং-এ হাজির হয়েছেন, একথা জানার পর ওই মানুষটির দেশভক্তি তাঁকে বিস্মিত করেছে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বিপ্লব ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে

বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। তাঁর লেখা থেকে জানা গেছে বুড়ীগঙ্গার তীরে মিডফোর্ড হসপিটাল পরিদর্শন এসেছেন I. G. Prison Loman সাহেব। সবুজ গালিচা পাতার মতো ঘাস-বিছানো শান্ত পরিবেশে হঠাৎ গুলির শব্দ। আশেপাশের সবাই সচকিত হয়ে ওঠে এবং দেখতে পায় এক বাঙালি যুবক ধীরে ধীরে হাঁটছে পাঁচিলের ধার দিয়ে। পেশায় কন্ট্রাকটর একজন বাঙালি ছেলে ওই যুবককে জাপটে ধরে ফেলে। যুবকটি পকেটের পিস্তলে হাত দিয়ে আবার ঢুকিয়ে নেয়, ঘুষি মারে ছেলেটিকে। ছেলেটির দাঁত ভেঙে যায়। সুযেন নামক একজন মেথর পাঁচিলের ছোট্ট দরজা খুলে যুবকটিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাঁর প্রিয় বিপ্লবী বিনয়দা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পুলিশ সুযেনের উপর অত্যাচার করে।

বেড়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, নেতাটি একবারও বললেন না যে জেল থেকে লেখা দীনেশের চিঠিগুলি একসঙ্গে প্রকাশ করা উচিত। তাহলে আমাদের উত্তরসূরিরা জানতে পারতো কী জাতের দামাল ছেলে তখনকার সোনার বাংলায় জন্মেছিল।

এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘আমাদের দেশে এখন অনেক কমিউনিস্ট। কিন্তু মজা হচ্ছে কার্ল মার্কসের বাড়ি যে রাশিয়ায় নয় একথা অনেকেই জানে না।’’ তিনি আরও বলেছেন Communism বোঝাতে আসা এক ভদ্রলোককে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দাদু (মায়ের বাবা) তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘সাম্যময়’। এর থেকে বুঝে নিন আমি কোন পরিবার থেকে এসেছি। ‘That I am a communist, I bear it in by name’.

গল্প বলার ছলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, তাঁর নাতি একবার তাঁকে ‘গাওয়া ঘি’ কাকে বলে জানতে চাওয়ায় তিনি মনে করেছিলেন এরা তো গরুর দুধ দেখেনি, তাই গাওয়া ঘি এদের কাছে রূপকথা। এই উপমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উদাহরণ হিসাবে বিপ্লবের সঠিক সংজ্ঞা কাকে বলে সে প্রসঙ্গে লেখেন, ‘‘১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি। এখন বিপ্লব হল মুখের বুলি। দেওয়ালে দেওয়ালে যত বিপ্লব। তবে কি বিপ্লবের অবস্থা গাওয়া ঘি-এর মতো হবে?’’ তিনি বলেছিলেন, ‘‘জীবিত অবস্থাতেই না বিপ্লব শব্দটিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুমার ঝুলিতে অলংকৃত না দেখে যেতে হয়।’’

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীজীবনেও বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৪৫ সালে ‘বেঙ্গল আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিল্পীদের সহযোগিতায়। এই সংগঠন প্রথমের দিকে রেডিও এবং সিনেমার শিল্পীদের জন্য মালিকদের হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেয়। রাজনৈতিক দলাদলির কারণে শিল্পীদের এই সংস্থাটি ভেঙে যায়। পরবর্তী সময়ে শিল্পীদের আন্দোলনগুলিকে ‘বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন’-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় অর্থ সংগ্রহ অভিযানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অজিত লাহিড়ী, নৃপেন গাঙ্গুলি প্রমুখের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিনি ঘুরেছেন এবং অর্থ সংগ্রহ করে দুঃস্থদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ধর্মঘট চলার সময় ভানু ও ছবি বিশ্বাস একসঙ্গে সিনে টেকনিসিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আন্দোলনে যুক্ত হন। পুলিশ ও গুণ্ডার সাহায্যে মালিকরা আন্দোলন ভাঙতে চাইলেও সাহসের সঙ্গে তাঁরা ধর্মঘট চালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তা মিটিয়ে দেন।

যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবীদের মূর্তিপুজো করেছেন সেই তিনিই ১৯৪৭-এর পর গজিয়ে ওঠা বিপ্লবীদের দেখে বলেছেন ‘‘এই সাজা বিপ্লবীদের দেখলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।’’ তিনি গল্প শুনিয়েছেন, মহাকরণের বারান্দায় বিনয়-বাদল-দীনেশের ছবিতে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে এমন সময় এক আধুনিক নেতা বললেন ফাঁসির আগে দীনেশের ওজন

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের রাজনীতিবিদদের দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল ঃ ‘‘যখনই কোনো নেতা বক্তৃতা দিতে ওঠেন তখনই অন্য দল কী করেনি, দেশের ক্ষতি কী পরিমাণ করেছে তার দলিল তুলে ধরেন, অথচ নিজের সম্পর্কে নীরব।’’ ১৯৪২ সালে দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ যখন আশাবাদী তখন কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন, বিষোদ্গার করেছেন। যদিও এখন সে ভুল অনেকে শুধরে নিচ্ছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্য হল দেশের আপামর জনসাধারণ যে ভুল করেননি অথচ একজন নেতা ভুল করলেন; তাহলে তাঁকে নেতার স্থান দিতে জনগণ ‘রাজি হইল ক্যামনে’। আগস্ট বিপ্লবের ধ্বনি ছিল ‘Do or Die’ কিন্তু Do কি বাস্তবায়িত হয়েছে? দেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাঙালিরাই বাংলাকে দু’ভাগে ভাগ করেছে। এই হল রাজনীতির চেহারা। নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচিত প্রতিনিধি গদিতে বসছেন। সাধারণ মানুষ তারা চিরদিন স্বপ্ন দেখবে। সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন।

রাজনীতি প্রসঙ্গে শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হল আমরা রাজনীতি থেকে নিজেদের পৃথক রাখায় কখনও বিশ্বাসী নই। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা যুক্ত। আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা নির্ভর করছে কার্ল মার্কসের মহান উক্তিতে—‘‘শ্রমিকশ্রেণির বন্ধনমুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হল রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া।’’

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের একশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। শতবর্ষ পরে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সময় আজও যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে শুনতে পাই তাঁর প্রিয় কবি সুনির্মল বসুর ‘বির্বতন’ কবিতাটি—

শহিদের তাজা লোহিত-রক্তে
সিক্ত হলো যে ধূলি
সেই ধূলি হলো রাঙা-চন্দন—
ললাটে লইনু তুলি....।

তথ্যঋণ : লেখালেখি—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা।

With best compliments of

Chandipur
S.K.U.S. Ltd.

Purbasthali, Purba Bardhaman

Sl. No. 72

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

খড়দত্তপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি নং. ৩৪ কে.টি, তাং : ৩০-০৬-৬১
পোঃ হাপানিয়া, পূর্ব বর্ধমান

মানবজাতির কল্যাণ হোক

মহঃ আলী মল্লিক
সভাপতি

আব্দুল সেলিম
সম্পাদক

সাহিদুল ইসলাম মোল্লা
ম্যানেজার

Sl. No. 68

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শাঁকারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

দইচাঁদা, খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান

সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
উপপ্রধান

শিউলি খাঁ
প্রধান

Sl. No. 47

With best compliments of

Krishnendu Roy

GOVT. CONTRACTOR & SUPPLIER

Billagram, Purba Bardhaman
Mob. 9434331093

Sl. No. 46

ধর্মীয় স্থাপত্য নিয়ে গবেষণার বীজ ডেভিডের মধ্যে বপন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়

শ্যামসুন্দর বেরা

সত্যজিৎ রায় জন্মেছিলেন ১৯২১ সালে। তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন শুরু হয়েছে এ-বছরের ২ মে থেকে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি একাধারে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক অন্যদিকে, তিনি ছিলেন গীতিকার, সুরকার, শিল্পী এবং শিল্পনির্দেশক। করোনা আবহে জনসমাগম করে আলোচনাসভা না হলেও তাঁকে নিয়ে নানান আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়েবিনারে, অর্থাৎ অনলাইন ভার্চুয়াল সভায়। এই রচনার বিষয় অবশ্য সরাসরি সত্যজিৎ রায় নয়, বরং তাঁর সান্নিধ্যে এসে, সখ্যের সূত্রে মন্দির স্থাপত্য, টেরাকোটা এবং ভারততত্ত্ব বিষয়ে অনুপ্রাণিত এবং নিবেদিতপ্রাণ এক সাহেবের কথা। তিনি ডেভিড জে. ম্যাক্‌কাচ্চন। বাংলায় তিনি ডেভিডবাবু নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

ডেভিডের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট, ইংল্যান্ডের ক্যাভেনট্রিতে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। সেখান থেকেই স্কুলশিক্ষা শেষ করেন ১৯৪৮-এ। দেশের নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী এক বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। এরপর কেমব্রিজের জেসাস কলেজ থেকে ইংরেজি, জার্মান এবং ফরাসি—এই তিন ভাষায় আধুনিক ভাষাসাহিত্যের স্নাতক হন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। এখান থেকেই প্রাচ্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়। চার বছর পর ১৯৫৭-তে লাভ করেন স্নাতকোত্তর উপাধি। ইতিমধ্যে ফরাসি দেশে দু-বছর অধ্যাপনা করেন। স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চলে আসেন এবং ইংরেজি সাহিত্যের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন বিশ্বভারতীতে। বিশ্বভারতী থেকেই তাঁর ভারতপ্রীতির সূচনা। এই বিশ্বভারতীতেই তিনি প্রথম পরিচিত হন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। ১৯৬০-এ যোগ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। চার বছরের মধ্যেই তিনি উন্নীত হন 'রিডার' পদে।

শান্তিনিকেতন থেকেই তাঁদের প্রথম পরিচয়। চাকরি ছেড়ে কলকাতা এসে ডেভিড গভীর সখ্য গড়ে তোলেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। উভয়েই বারোক সঙ্গীতের গুণগ্রাহী থাকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করতেন। ডেভিড ইতিমধ্যে অল্প অল্প বাংলা শিখে নিয়েছিলেন। আরও জানার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। বিষয়টি নজর এড়ায়নি সত্যজিৎ রায়ের। তিনি সে-সময় তাঁর সিনেমার সংলাপগুলি ইংরেজিতে সাব-টাইটেল হিসেবে ব্যবহারের জন্য একজন যোগ্য অনুবাদক খুঁজছিলেন। সত্যজিৎ রায় ডেভিডকে এই কাজের প্রস্তাব দেন। সানন্দে সম্মতি জানান ডেভিড। এই কাজ তাঁর বাংলা জানার উদগ্র বাসনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে তা তিনি বুঝেছিলেন। কাজ শুরু করেন সত্যজিতের 'তিনকন্যা' (১৯৬১)-র অনুবাদ দিয়ে। তারপর দুই উজ্জ্বল প্রতিভার পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সন্তুষ্টির জায়গা থেকে ছটি সিনেমার অনুবাদ করেছিলেন

ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন। সত্যজিতের 'অভিযান' সিনেমার স্যুটিং চলছিল বীরভূমের দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড় সংলগ্ন স্থানে। সে-সময় তিনি ডেভিডকে তাঁর দলের সঙ্গে সপ্তাহান্ত বীরভূমে কাটাবার কথা বলেন। সদলে সত্যজিত রায় থাকছিলেন হেতমপুর রাজবাড়িতে। ডেভিড তাঁর রুকস্যাক গুছিয়ে জানুয়ারির এক সকালে সটান হাজির হয়ে যান বীরভূমে। পরের দিন সকালে তিনি শ্যুটিং স্পটে আসেন। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ তিনি বেপাত্তা হয়ে যান দীর্ঘ সময়। দুপুরের অনেক পরে হঠাৎ ফিরে আসেন রীতিমতো রক্তিম এবং উদ্দীপ্ত হয়ে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, "এখানে আশেপাশে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে এবং সেই মন্দিরের গায়ে সাহেব-মেমসাহেবদের অনেক টেরাকোটা ফলক আছে!" সত্যজিৎ তাঁকে বলেন, "বীরভূমের টেরাকোটা অলংকার সমৃদ্ধ মন্দির খুবই প্রসিদ্ধ। আমার কিছু ছবি আছে। তোমার যদি দরকার হয় তোমাকে ফিল্ম দেব।" সত্যজিতের মতে বাংলার টেরাকোটা মন্দির সম্পর্কে ডেভিডের আগ্রহের সেটাই ছিল জন্মক্ষণ। এর আগে ডেভিড বিশ্বভারতীতেই পড়াতেন। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের টেরাকোটা বিষয়ে আগ্রহ জন্মাবার সুযোগ আসেনি।

এরপর তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। ডেভিড ফেরেন অন্য এক জ্ঞানপিপাসা নিয়ে। তিনি সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে প্রখ্যাত শিল্পী এবং অধ্যাপক মুকুল দে-র 'বীরভূম টেরাকোটা' বইটি কয়েক দিনের জন্য পড়তে নেন। কয়েকদিনের মধ্যে সে-বই পড়েও ফেলেন। সেটি ফেরত দিয়ে সত্যজিতের কথামতো নিয়ে যান 'বাংলায় ভ্রমণ' শীর্ষক ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়েজ প্রকাশিত দুই খণ্ডের বই। পড়ার পাশাপাশি সত্যজিৎ রায় তাঁকে অবশ্যই বিষ্ণুপুর এবং সঙ্গে কালনা, বাঁশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া ইত্যাদি স্থানের প্রাচীন টেরাকোটা অলংকার সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি ঘুরে দেখতে পরামর্শ দেন।

পরামর্শ মতোই ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়েন একের পর এক মন্দির দেখতে। দেখা মানে শুধু চোখের দেখা নয়—অন্তর দিয়ে দেখা, অনুভবের জায়গা থেকে দেখা। তাদের প্রতিটি অঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখে তাদের প্রতিটির ফটোগ্রাফ নিতে শুরু করেন। মন্দিরের অজস্র টেরাকোটার শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলা কাহিনিগুলি অজস্র প্রশ্ন তুলে দিতে থাকে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনে। মাঝে মাঝে সময় করে এসে সে-সব ছবি দেখাতেন সত্যজিৎ রায়কে। বিরাট ঠোঁটওয়ালা পাখির দুই ঠোঁট চিরে শিরোভূষণ পরা একটি শিশু কী করছে, অজগরের মুখ চিরে হত্যা করা সেই একই শিশুটি কে? এমন নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে সত্যজিৎ রায়কে। ফলকদুটি যে কৃষ্ণের কৌমার লীলার বকাসুর ও অঘাসুরবধ—পৌরাণিক এই গল্প বুঝিয়ে বলতেন তিনি। পৌরাণিক কাহিনি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক প্রভাব, সামাজিক কাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে আরও আরও জানার আগ্রহ যে ডেভিডের নেশায় পরিণত হয়েছে সেটা বুঝতে পারেন সত্যজিৎ রায়।

□

সেই নেশার টান ক্রমশ বাড়ে ডেভিডের। নেশাই একদিন তাঁর মন্দিরস্থাপত্য এবং টেরাকোটা বিষয়ে অমানুষিক ক্লেশসাধ্য গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে। দুই বাংলা সহ বিভিন্ন প্রত্যন্তে ছুটে বেড়িয়েছেন ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্য, টেরাকোটা, পটুয়াদের জীবন, শিল্পকর্ম বিষয়ে নিবিড় অনুসন্ধানে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লেখ্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ, প্রীতি ছিল টেরাকোটা বিষয়ে। গবেষণাকর্মে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন স্বনামখ্যাত তারাপদ সাঁতরা, অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আইএএস), মানিকলাল সিংহ, সুহৃদকুমার ভৌমিক প্রমুখ। এঁরা নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই দিক্‌পাল। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেবের ছাত্র। তিনি মন্দির সহ পটুয়াদের জড়ানো পটশিল্প, তাঁদের জীবনচর্যা বিষয়ে অনুসন্ধানে ডেভিডের সঙ্গী হয়েছিলেন।

ভাষাতত্ত্বের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন এবং দুরূহ এক বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। বলা যায়, তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি দুই বাংলার মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডকুমেন্টেশনের কাজ করেছিলেন। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থের 'ডেভিড জে. ম্যাক্‌কাচ্চন' প্রবন্ধে ডেভিড সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুভবের কথা লিখেছেন। তাঁর কথায়—"ডকুমেন্টেশন বলতে দূর থেকে মন্দিরের এক-আধটি মামুলি ছবি তোলা শুধু নয়, তাদের প্রতি অঙ্গের, প্রতি বৈশিষ্ট্যের বিশদ ফটোগ্রাফ। এছাড়া সর্বাঙ্গীণ মাপজোখ তো ছিলই।" ডেভিডের প্রায়শই বলা কথাকে অমিয়বাবু তুলেছেন এইভাবে—"এই অমূল্য কৃষ্টিসম্পদগুলি রক্ষা করবার জন্য সরকারী বা বেসরকারী কোনোরকম চেষ্টারই যখন অস্তিত্ব নেই তখন অবধারিত বিনষ্টির আগে এদের যতগুলির ডকুমেন্টেশন করে রাখা যায় ততই ভাল। ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথ তাতে সুগম হবে।"

গ্রামগঞ্জে সে-সময় যানবাহনের তেমন সুবিধা ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেভিড ঘুরে বেড়াতেন সাইকেলে করে। কলকাতাতেও বাস-ট্রামের ভিড় এড়িয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়াতে তাঁর ভরসা ছিল সেই সাইকেল। দূরদূরান্তের গ্রামে সেই সাইকেল নিয়ে যেতে পারতেন না। ঘড়ি, জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় করতেন এবং উদ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সাইকেল কিনে নিতেন এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ছুটে বেড়াতেন সাইকেলের প্যাডেল দাবিয়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষায় দুর্গমতা কোনো কিছুই দমাতে পারত না ডেভিডকে। ব্যক্তিগত ক্লেশের দিকে নজর দেবার অবকাশই পাননি তিনি।

শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে, খিদে হজম করে, না ঘুমিয়ে শুধুমাত্র প্রাচীন মন্দির-মসজিদ স্থাপত্য, টেরাকোটার মতো একটি অবহেলিত বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানো গবেষক চিরকালই বিরল। তাঁর সময়ে তো গ্রামগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত ছিল। আরও সময় নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রকে আর বিস্তৃত করবেন বলে এক সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন। তিনি ছিলেন পেটের রোগী। চিকিৎসার জন্য প্রায়শই হাসপাতালে ভর্তি হতেন। এত ক্লেশ তাঁর সহ্য হত না। তবু শরীর কষ্ট দেবে বলে ছেড়েও দেননি।

অধ্যাপনা করার সময়ই অনেক উচ্চমার্গের গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন নানান সাময়িক পত্রিকায়। তাঁর দুঃখ ছিল সেগুলি সংকলিত হয়ে গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা যায়নি। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থির করে তাঁর গবেষণার ফসলকে একত্রিত করে 'লেট মিডাইভেল টেম্পলস অব বেঙ্গল' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করবে। সে-জন্য এক বছরের ছুটিতে দেশে যাবার আগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন। ভেবেছিলেন ফিরে আসার পরই বই প্রকাশিত হবে। কিন্তু নানা কারণে সে-বইয়ের প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

দেশ থেকে ফিরে আসার পরে একবার মধ্যপ্রদেশে গিয়ে নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছিল। খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো হয়নি। যানবাহনের অভাবে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। সেখান

'ব্রিক টেম্পলস্ অব বেঙ্গল ফ্রম দ্য আর্কাইভস অব ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন'-এর ভূমিকায়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জর্জ মিশেল। গ্রন্থটির প্রকাশক প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন, নিউজার্সি।

অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভিডের সরাসরি ছাত্র। তাঁর সঙ্গে ডেভিডের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। ডেভিডের সঙ্গে তাঁর স্মৃতির কথা, ডেভিডের অপ্রকাশিত চিঠি সংকলন করে প্রকাশ করেছেন—'ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন : আনপাবলিসড্ লেটারস্ অ্যান্ড সিলেক্টেড আর্টিকেলস্'। গ্রন্থটি 'মনফকিরা' থেকে প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। এছাড়াও নানা সংস্থা থেকে ডেভিডের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

□

থেকেই ফিরেই ওড়িশার অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় একবার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সফরে গিয়েছিলেন। সেখানেও সেই একই রকম কষ্ট। তার ঠিক সাতদিন আগে তিনি পুরো এক সন্ধ্যা কাটিয়ে যান অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অমিয়বাবু তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, "বললাম—বেশ রোগা হয়ে গেছ ডেভিড, কালোও একটু হয়েছ। অভ্যাসমাফিক এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললে—খাওয়াদাওয়ার সামান্য কিছু অসুবিধা হয়েছে আর যানবাহনের অভাবে হাঁটতেও হয়েছে প্রচুর।" ওড়িশা থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন। দিনটা ছিল ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২। পোলিওর মারাত্মক আক্রমণে তাঁর নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে যায়। কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থায় তাঁকে সকালের দিকেই উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। হাতও সেভাবে কাজ করছিল না। সেই অবস্থাতেও অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে উঠতে সেই বইয়ের শেষ না হওয়া প্রুফ সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য অনুনয়-বিনয় করেন। ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরই অসাড় হয়ে যায়। পরদিন, অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি রাত্রি এগারোটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৫ জানুয়ারি বিকেলে পড়ন্ত আলোয় ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর মরদেহ সমাহিত করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এক সাহেবের কবরের পাশে নতমস্তকে হাজির ছিলেন তাঁর শতাধিক বাঙালি গুণমুগ্ধ। ছিলেন অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও ছাত্রছাত্রী।

□

এশিয়াটিক সোসাইটি ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর 'লেট মিডাইভেল টেম্পলস অব বেঙ্গল' গ্রন্থ প্রকাশ করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডেভিডের বিশেষ সখ্যের জন্যই এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার অনুরোধ জানায়। বাংলার মন্দির গবেষকদের অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন অমিয়বাবু। অমিয়বাবু তাঁর 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন গ্রন্থটি '১৫৬টি আলোকচিত্র, ৬টি ভিত্তি নকশা সমেত বড় সাইজের ৮৮ পৃষ্ঠার'। গ্রন্থটি ২০১৭ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়। রয়্যাল সাইজের নতুন সংস্করণে আছে ১৫৯টি আলোকচিত্র, ৬টি ভিত্তি নকশা এবং ৮৯ পৃষ্ঠা।

প্রবন্ধের শুরু হয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে। সত্যজিৎ রায় ডেভিডের সঙ্গে তাঁর সখ্যের কথা, গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর গবেষণালব্ধ আর একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ

ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব পরিদর্শনে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দামোদর এলাকার এমন চারটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল আকুই দক্ষিণপাড়ার রাধাকান্ত মন্দির (পঞ্চরত্ন, ১৭৬১ খ্রি), আকুই থেকে সাত কিলোমিটার দূরে শাসপুরের কাছে ডোঙ্গালনের রাধাবল্লভ জিউর মন্দির (আটচালা), শাঁকারি গ্রামের মজুমদার পরিবারের গোবিন্দ মন্দির (পঞ্চরত্ন, ১৬৭৩ খ্রি.) এবং শাঁকারি গ্রামেরই ধ্বংসের অপেক্ষায় সিংহবাহিনী মন্দির (পঞ্চরত্ন, ১৭৬২)। উক্ত মন্দিরগুলি যে যে পরিবারের অধীনে আছে তাঁদের বর্তমান প্রজন্মের মানুষজন ম্যাককাচ্চন সাহেব কবে এবং কীসে করে এসেছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন, কেমনভাবে কাজ করেছিলেন ইত্যাদি নানান বিষয় জানিয়েছেন কথাপ্রসঙ্গে।

(১) আকুই গ্রামটি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অধীনে হলেও গ্রামটির অবস্থান একেবারেই বর্ধমান-বাঁকুড়া জেলার সীমানায়। বর্ধমান-আরামবাগ রোডে মোগলমারি, তোড়কোণা হয়ে বৌয়াইচণ্ডীর আগেই পড়ে আকুই। বৌয়াই কিন্তু পূর্ব বর্ধমান জেলায়। যাই হোক, এই আকুই গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় আছে ৩৫ ফুট

আকুই-এর রাধাকান্ত মন্দির। ছবি : লেখক

ডেভিডের তোলা আকুই মন্দিরের টেরাকোটার ছবি রাখা আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া-অ্যালবার্ট মিউজিয়মে। ছবি অমিত গুহ-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

উঁচু, ২২ ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট এবং সামনের দেওয়ালে এবং থামে সামাজিক, পৌরাণিক, রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অপূর্ব টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ পঞ্চরত্ন রাধাকান্ত জিউ মন্দির। আছে হরগৌরী, শুম্ভ-নিশুম্ভ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রামের অভিষেক, তারকা বধ, জটায়ু বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পুতনা বধ, চার অবতার—নৃসিংহ, কূর্ম, বরাহ, মৎস্য ছাড়াও রয়েছে নৌদৃশ্য ও নানান সামাজিক চিত্র। এছাড়া সম্মুখভাগের একেবারে ওপরের দুই কোণে দুটি ড্রাগনের মতো কৌণিক শিল্প আছে। মন্দিরটির নির্মাণপর্ব ১৭৬১-৬৪ খ্রিস্টাব্দ। মন্দিরটি নির্মাণ করান আকুই গ্রামের কানুরাম দাস। তিনি ছিলেন বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্-এর দেওয়ান। কানুরাম 'রায়' উপাধি লাভ করেন বর্ধমানরাজের পক্ষ থেকে। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে মন্দিরটির বিবরণ দিয়েছেন। মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের মূল দরজার সামনে আছে ত্রি-খিলান যুক্ত বারান্দা। বারান্দার ভেতরের দেওয়ালটিতে টেরাকোটার কাজ আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের মূল প্রবেশপথটি পূর্বমুখী এবং উত্তর দিকেও একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো প্রবেশপথ আছে, তবে সেটি বন্ধই থাকে। গর্ভগৃহের দক্ষিণ দিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে।

কানুরাম রায়ের নবম উত্তরপুরুষদের মধ্যে মন্দিরের দেখভালের সঙ্গে বেশি করে যুক্ত আছেন বর্ধমান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তপনকুমার রায় এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিমা রায়। তাঁর কথায়, ইন্দাস থানার শাসপুরের কাছে ডোঙ্গালন মন্দির দেখে ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব আকুই এসেছিলেন সাইকেল চালিয়ে। ১৯৬৮-৬৯ নাগাদ ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন যখন তাঁদের রাধাকান্ত মন্দির দেখতে এসেছিলেন তখন তপনবাবু ছিলেন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ছোটোবেলাকার সে-স্মৃতি ষাট পেরিয়েও উজ্জ্বল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি পাথরে খোদিত নয়। কিছুটা খয়ে যাওয়া লিপি উদ্ধার করতে একটি বড় মইয়ের সাহায্যে সাহেব ওপরে উঠেছিলেন এবং বড় সাদা কাগজ লিপির ওপর রেখে লেড পেন্সিল দিয়ে ঘষে ছাপ তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে-সময় গৃহকর্তা তথা কানুরামের অষ্টম উত্তরপুরুষ অমূল্যরতন রায়কে বলে গিয়েছিলেন—ফলকে কী লেখা আছে তা তাঁদের জানিয়ে দেবেন। জানিয়েও ছিলেন। 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থ উদ্ধৃত করে বলা যায় লিপিটি হল—"শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ..../অশীতিতম শকাব্দে শ্রীল শ্রীরাধাকান্তস্য/শ্রীমন্দিরারম্ভ ইতি। সুভমস্তু সকাব্দা।/১৬৮৩ মাহ মাঘ ১৭ রোজ মন্দির আরম্ভ।/মহারাজা শ্রীযুত তিলোকচন্দ্র রায়স্য অধি-/কার পরিচারক শ্রীকানুরাম দাস সাকিম/আকুই তস্য জায়া শ্রীমতি চাপা দাসি শ্রীশ্রী/চরণে যর্পণ করিলেন। কারিগর শ্রী ইস্বরি.../সাকিম বল্যাড়া সংপূর্ণ সকাব্দা ১৬৮৬।।" উল্লিখিত ঈশ্বরী নামের মন্দির তৈরির কারিগরের বাড়ি ছিল 'বল্যাড়া', সম্ভবত পরবর্তীকালের বহুলাড়া গ্রাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার নানা প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ইটের মন্দির এবং তাদের টেরাকোটা শিল্পকর্মের ছবি তুলেছিলেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন। তাঁর ছবিগুলি রাখা আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে। মন্দির স্থাপত্য এবং মূর্তি ভাস্কর্য গবেষক অমিত গুহ ২০১০ সালে উক্ত মিউজিয়মে ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেবের তোলা ছবিগুলি দেখেছেন এবং ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর তোলা রাধাকান্ত মন্দিরের চারটি ছবি তিনি তাঁর ব্লগে পোস্ট করেছেন।

(২) ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরটিকে পঞ্চরত্ন রীতিপ্রকরণের প্রাচীনতম মন্দির বলা হয়। বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদরের খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত শাঁকারি গ্রামের মজুমদার পরিবারের গোবিন্দ মন্দিরও পঞ্চরত্ন রীতির একটি প্রাচীন মন্দির। শ্যামরায় মন্দির নির্মাণের চল্লিশ বছর পর অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় গোবিন্দ মন্দির। বর্ধমান শহরের বীরহাটা থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শাঁকারি

গ্রামে, দামোদর পেরিয়ে বাঁকুড়া মোড়-কেশবপুর হয়ে কিংবা বর্ধমান-আরামবাগ সড়ক থেকে বেরোনো গৌরাঙ্গ রোড দিয়ে সরাসরি বাসে পৌঁছানো যায়। মজুমদার পরিবারের মন্দির এবং সংলগ্ন পুরোনো ভদ্রাসনের অবস্থান গ্রামের দক্ষিণপাড়ায়। সাড়ে তিনশো বছরের দোরগোড়ায় চলে আসা গোবিন্দ মন্দিরটির সামগ্রিক অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রেখে সংস্কার হওয়া মন্দিরটির নিয়মিত পরিচর্যা বাংলার ইটের মন্দিরের ক্ষয় রোগকে দূরে রেখেছে। সেবাইত পরিবারের অমিতকুমার মজুমদার (৬৩) মন্দিরের স্বাস্থ্য-পরিচর্যা বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন।

টেরাকোটা অলঙ্করণ সমৃদ্ধ প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখতে এসেছেন বহু মানুষ। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলার মন্দির স্থাপত্য গবেষক ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন। তিনি এসেছিলেন ১৯৬৯ সালে। 'লেট মেডিইভেল টেম্পলস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন শাঁকারি গ্রামের পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরকে 'স্ট্যান্ডার্ড ওয়েস্টবেঙ্গল টাইপ'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অমিতকুমার মজুমদারের কথায়, ১৯৬৯ সালের মার্চ-এপ্রিলের এক দুপুরে ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব তিন-চারজন সঙ্গীকে নিয়ে শাঁকারি গ্রামে এসেছিলেন। তখন গৌরাঙ্গ রোড মাটিরই ছিল। সাহেব সাইকেলে এলেও খানিক পরে একটি জিপগাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। গৃহকর্তা তখন সীতেশচন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। পাণ্ডববর্জিত গ্রামে জিপগাড়ি, সাহেব-দর্শন, ইংরাজিতে বাক্যালাপ সপ্তম শ্রেণিতে পড়া কিশোরের কাছে বেশ বিস্ময়ের ছিল। গাড়িতে নিয়ে আসা নানান যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা বোঝার সাধ্য ছিল না তাঁর। কেবল ফিতে দিয়ে মাপজোক করা আর ক্যামেরা দিয়ে মন্দির গাত্রের ছবি তোলা বিষয়টি বোধগম্য হয়েছিল। এটাও বুঝেছিলেন সাহেব মার্কা লোকেরা যখন এসেছেন তখন তাঁদের মন্দির নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব বিশেষ জোর দিয়েছিলেন মূল রত্নের দরজার ওপরে থাকা প্রতিষ্ঠালিপিটির ওপর। প্রতিষ্ঠালিপিটি পোড়া মাটির একটি বড়সড় প্লেট। একটি বড় মই দিয়ে উঠে সেটির বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন তিনি। সাকুল্যে ঘণ্টা চারেক ছিলেন পর্যবেক্ষণকারীরা এবং মন্দির সম্পর্কে বেশ কিছু বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন সে-সময়কার গৃহকর্তাদের।

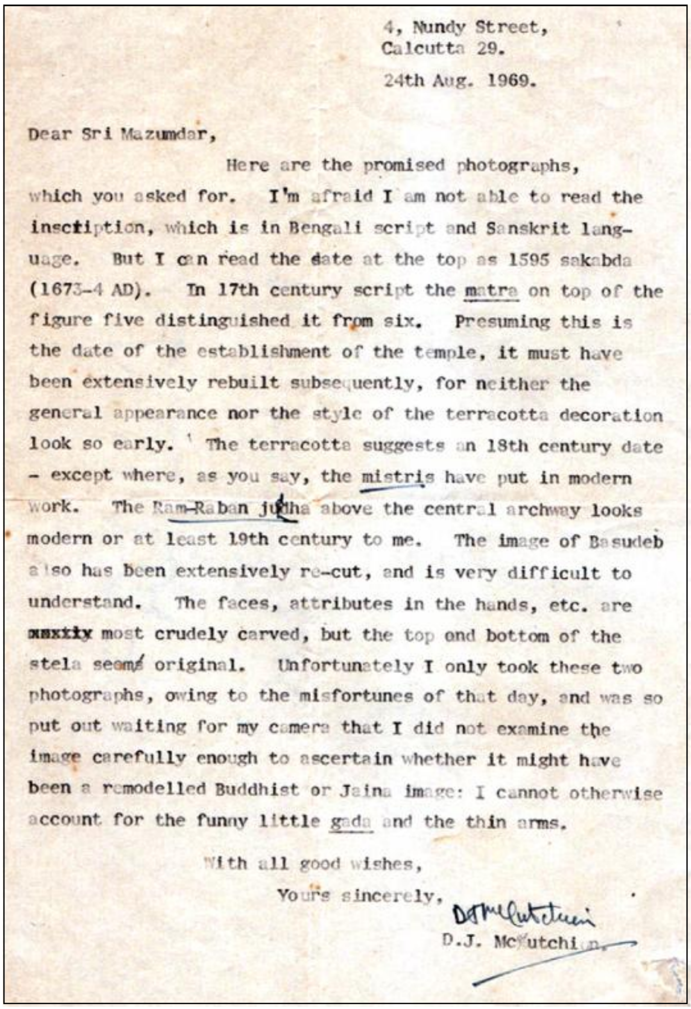

4, Nundy Street,
Calcutta 29.

24th Aug. 1969.

Dear Sri Mazumdar,

Here are the promised photographs, which you asked for. I'm afraid I am not able to read the insciption, which is in Bengali script and Sanskrit language. But I can read the date at the top as 1595 sakabda (1673-4 AD). In 17th century script the matra on top of the figure five distinguished it from six. Presuming this is the date of the establishment of the temple, it must have been extensively rebuilt subsequently, for neither the general appearance nor the style of the terracotta decoration look so early. The terracotta suggests an 18th century date - except where, as you say, the mistris have put in modern work. The Ram-Raban judha above the central archway looks modern or at least 19th century to me. The image of Basudeb also has been extensively re-cut, and is very difficult to understand. The faces, attributes in the hands, etc. are ~~xxxxxx~~ most crudely carved, but the top and bottom of the stela seems original. Unfortunately I only took these two photographs, owing to the misfortunes of that day, and was so put out waiting for my camera that I did not examine the image carefully enough to ascertain whether it might have been a remodelled Buddhist or Jaina image: I cannot otherwise account for the funny little gada and the thin arms.

With all good wishes,
Yours sincerely,

D.J. McCutchion.

শাঁকারি গ্রামের মজুমদার পরিবারকে লেখা ডেভিডের চিঠি। চিঠি অমিত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৯৬৯ সালের ১০ মে এবং ২৪ অগস্ট ৪ নং নন্দী স্ট্রিট, কলকাতা-২৯ ঠিকানা থেকে মজুমদার পরিবারে দুটি চিঠি লিখেছিলেন ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব। অপ্রকাশিত দুটি চিঠিই যত্ন করে সম্পদের মতো রেখে দিয়েছেন অমিতবাবু। টাইপ করে ঠিকানা লেখা খামগুলি কয়েক বছর আগেও দেখেছেন কিন্তু বর্তমানে সেগুলি অ্যালবামে নেই। প্রথম চিঠি লেখার পরের বুধবার তিনি ইংলন্ডে চলে গিয়েছিলেন। চিঠির সঙ্গে তিনি পাঠিয়েছিলেন মন্দিরের তিন কপি ফটোগ্রাফ। অন্য ছবি এবং প্রতিষ্ঠালিপির ছবি তখনও প্রিন্ট করা হয়নি। জুলাই মাসে ফিরে এসে ছবিগুলি পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তবে প্রতিষ্ঠাবর্ষ যে ১৫৯৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ তা জানিয়েছিলেন চিঠিতে। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে 'আর্চওয়ে'-র ওপরের টেবাকোটাগুলি পরবর্তীকালের এবং কিছু মেরামত করা হয়েছিল। মেবামতকাবীদেব মন্দিরশিল্পশৈলী এবং ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে দৃষ্টির অভাব ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। মজুমদার পরিবারের আতিথেয়তা এবং সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব।

দ্বিতীয় চিঠির সঙ্গে সাহেব আরও ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন। বাংলা হরফে এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রতিষ্ঠালিপিটি হয়তো পড়তে পারবেন না বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেব তার পাঠোদ্ধার করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মন্দিরের সামনের দিকে মাঝের খিলানের ওপরে রাম-রাবণের যুদ্ধের টেরাকোটা শিল্পকর্মটি উনিশ শতকের। এছাড়া নতুনভাবে করা বাসুদেব ফলকটি মোটা দাগের। তুলনায় খাড়া দিকের ওপরের এবং নিচের ফলকগুলি ডেভিড ম্যাককাচ্চনের আসল বলে মনে হয়েছিল।

(৩) সিংহবাহিনী মন্দির : 'লেট মেডিইভেল টেম্পলস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন শাঁকারি গ্রামের ইটের তৈরি পঞ্চরত্ন সিংহবাহিনী মন্দিরটিকে 'স্ট্যান্ডার্ড ওয়েস্টবেঙ্গল টাইপ'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর গ্রন্থে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ বলা হলেও পাশে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসানো আছে। মূল প্রবেশপথের ওপরের দিকে আর্চওয়ের টেরাকোটা ফলকগুলির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পোড়ামাটির ফলকে প্রতিষ্ঠালিপি আছে। সেটির মাঝের অংশ ভেঙে গেলেও বাঁদিকে শকাব্দ এবং শেষের দুটি সংখ্যা ৮৪

ধ্বংসের মুখোমুখি শাঁকারি গ্রামের সিংহবাহিনী মন্দির। ছবি : লেখক।

স্পষ্ট। ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেবের গ্রন্থে প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ ধরে শকাব্দের অঙ্কটি নিশ্চিতভাবে ১৬৮৪। দক্ষিণমুখী সিংহবাহিনী মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের মূল দরজার সামনে আছে ত্রি-খিলান যুক্ত বারান্দা। পূর্ব দিকেও একটি প্রবেশপথ আছে। গর্ভগৃহের পশ্চিমদিকে একটি সিঁড়ি আছে। ম্যাক্‌কাচ্চন সাহেবের দেওয়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ধরে বর্তমানে মন্দিরটি ২৫৭ বছরের।

মন্দিরের চতুর্দিকে বেশিরভাগ অংশই বসতবাড়ি বা দোকান হয়ে গেছে। বর্তমানে সেগুলির পিছনে মন্দিরটি একেবারেই পরিত্যক্ত।

(৪) ডোঙ্গালনের রাধাবল্লভ মন্দির : ডোঙ্গালন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত হলেও গ্রামটির অবস্থান পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রান্তসীমা বোঁয়াই-এর কাছাকাছি। বর্ধমান-বোঁয়াইচণ্ডী বাসে আকুই পুলিশ ফাঁড়ির উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে পৌঁছতে হয় এই গ্রামে। একসময় ছুরিকাঁচির জন্য বিখ্যাত গ্রাম সাসপুর থেকে এক কিলোমিটার দূরে ডোঙ্গালন গ্রাম। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিমদিকে রায় পরিবারের রাধাবল্লভ মন্দিরে ১৯৬৯ সাল নাগাদ এসেছিলেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন এবং তিনি মন্দিরটিকে 'লো টাওয়ারড আটচালা' বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই মন্দিরের বিবরণ পাওয়া যায় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' (১৯৭১ খ্রি.) গ্রন্থে। বর্তমানে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এককালে ত্রিখিলান প্রবেশপথ যুক্ত মন্দির যে ছিল তার প্রমাণ দেয় দাঁড়িয়ে থাকা প্রবেশপথ সমেত দেওয়ালটি। তা থেকে কী ধরনের মন্দির ছিল তার বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ উল্লেখ করে বলা যায় মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে তৈরি। সে হিসেবে মন্দিরটির বর্তমানে বয়স আনুমানিক ২০০ বছর। উচ্চতায় ৩০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৬ ফুট ৪ ইঞ্চি বর্গাকার মন্দিরটির নির্মাণে ভিত্তি, থাম ও দেওয়ালের নিচের অংশে ইট ও মাকড়া পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত এসেছিলেন ১৯৬৯-৭০ সালে। তখনও সংস্কার করা মন্দিরটির অবস্থা ভালো ছিল। তাঁর মতে কারিগরির দিক থেকে আধুনিক ও স্থূল টেরাকোটা মূর্তিগুলিতে কৃষ্ণলীলা, নানাবিধ সামাজিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু রূপায়িত। ধ্বংস হওয়া মন্দিরের মাকড়া পাথরগুলি খড়গাদার ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ত্রিখিলান প্রবেশপথগুলি ইট-কাদামাটি দিয়ে বুজিয়ে পাকাপাকি দেওয়ালে রূপান্তরিত হয়েছে। মন্দিরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতার ফলে একসময় গাছ জন্মে যায় এবং তা বড়ো হয়ে ফাটলের সৃষ্টি করে। ১৯৮১ সাল নাগাদ ভেঙে পড়ে মন্দিরটি।

□

শেষোক্ত মন্দিরদুটি যেমন অবস্থায় পৌঁছেছে, এই করুণ ভবিষ্যতের কথা বোধহয় অনুমান করেছিলেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন। তাই তিনি প্রায়শই বলতেন, ''এই অমূল্য কৃষ্টিসম্পদগুলি রক্ষা করবার জন্য সরকারি বা বেসরকারি কোনোরকম চেষ্টারই যখন অস্তিত্ব নেই তখন অবধারিত বিনষ্টির আগে এদের যতগুলির ডকুমেন্টেশন করে রাখা যায় ততই ভাল। ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথ তাতে সুগম হবে।'' তাঁর মতে, ''ভারতীয়, বিশেষ করে দুই বাংলার মন্দিরকলা সম্পর্কে বিশদভাবে সবকথা লিখতে গেলে দশ ভল্যুম বই হয়।'' মন্দির গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিরাট কাজ, বিরাট কভারেজ দেওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতেন। কোনো পিছুটান না রেখে টানা দু-বছর অনলসভাবে এই কাজ করতে চেয়েছিলেন। তারপর কেমব্রিজে ফিরে গিয়ে ভারতীয় ও বাংলা-মন্দিরকলা বিষয়ে সত্যিকারের একটা বড়ো কাজে হাত দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে-স্বপ্ন তাঁর অধরাই থেকে গেছে। তবে তিনি শিখিয়ে গেছেন প্রাচীন স্থাপত্যের ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারটি। ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর পথ অনুসরণ করে প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, টেরাকোটা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম হয়। সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত থাকা মানুষজনের কাছে তিনি দিকনির্দেশক।

তথ্যসূত্র

১. Satyajit Ray, Preface, *Brick Temples of Bengal from the Archives of David McCutchion*, Edited by George Michell, published by : Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983

২. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ডেভিড জে. ম্যাক্‌কাচ্চন', দেখা হয় নাই, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৪ ব., আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৩. Suhrid Kumar Bhowmick, Introduction, David McCutchion, Unpublished Letters and Selected Articles, 1st edition, 2008, Monfakira

৩. David J. McCutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal*, The Asiatic Society, Kolkata, first publised in 1972, reprinted in July 2017.

কৃতজ্ঞতা

১. সত্যজিৎ রায়-ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর ছবি সত্যজিৎ গবেষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (দে.মু.)-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২. ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-এর সমাধির ছবি ইন্টারনেটে থেকে নেওয়া।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম বাঙালি শহিদ সোমেন চন্দ—জন্মশতবর্ষ

ঘনশ্যাম সরকার

বছর বাইশের তরুণ সোমেন চন্দ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের প্রথম শহিদ এক বাঙালি। ১৯২০ সালের ২৪ মে তারিখে অধুনা বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায় নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে সোমেন চন্দ পগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ভর্তি হন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজে, কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে সেখানের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেননি। ছোটবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সোমেনের, সেকারণেই অত্যন্ত পাঠাগারমুখী ছিলেন তিনি। সোমেন চন্দের জীবনের বড় সময় কেটেছে অভাব-অনটনে শহর ঢাকায়। তারুণ্য আদর্শবাদে আকৃষ্ট হওয়ার সময়। একদিকে তাঁর বই পড়ার নেশা, প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা পাঠ, মার্কসবাদী সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ, অন্যদিকে ঘর-বাইরের সহায়ক পরিবেশ তাঁকে রাজনীতিতে টেনে আনে। সে রাজনীতি—সমাজবদলের, কমিউনিস্ট আন্দোলনের, সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বৈষম্য হ্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী লেখক সোমেন চন্দ শ্রেণি-শোষণের বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার ছিলেন। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন—যেমন রাজনৈতিকভাবে, তেমনি লেখনীতে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ২১ এবং কথাশিল্পী সোমেন চন্দ ২২ বছর আয়ু পেয়েছিলেন। প্রগতিমনা দু'জনেরই অকাল প্রয়াণ। সুকান্তর মৃত্যু প্রথমে ম্যালেরিয়া পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে, কিন্তু সোমেনের মৃত্যুটা ছিল দাঙ্গায় ঢাকার রাজপথে। মাত্র ২২ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় তাঁকে—৮ মার্চ ১৯৪২। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এই দুই সাহিত্যিকই।

সময়টা ছিল সোমেন চন্দের জন্য বহুমাত্রিক—শ্রমের রাজনীতি, সাহিত্য, সাংগঠনিক কাজ, বই পড়া—সব কিছু মিলে। তাঁর আন্তরিকতা, নিখাদ আদর্শবাদ ও শ্রমনিষ্ঠার কারণে কমিউনিস্ট নেতাদের দৃষ্টি পড়ে এই তরুণ সোমেন চন্দের ওপর। এই সময় বিশ্বযুদ্ধাবস্থার কারণে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একটা বড় অংশ তখন কারাগারে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সব দায়িত্ব পড়ে সোমেন চন্দের কাঁধে। বহু সংখ্যক মেহনতি মানুষ এবং সংগ্রামী মানুষের সংস্পর্শে আসেন সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে। অভিজ্ঞতা বাড়ে। যা তাঁর গল্প সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। রণেশ দাশগুপ্তের মতে—এখানেই লেখক হিসেবে তাঁর উত্তরণ ঘটে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর লেখা উপন্যাস 'বন্যা'।

এই সময়কালে ১৯৩৫ সালে লখনৌতে স্থাপিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি সংঘ', যার বঙ্গীয় শাখার অন্যতম প্রশাখা দুটির একটি ছিল কলকাতায়, অন্যটি ঢাকায়। ১৯৩৯ সালে কলকাতা শাখা থেকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সংকলনগ্রন্থ 'প্রগতি' এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল 'ক্রান্তি'। 'ক্রান্তি'-র প্রকাশক ছিলেন সোমেন চন্দ স্বয়ং। তিনি 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এ যোগদান করেন। মার্কসবাদী রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যান। তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম গণসাহিত্যের কাজ করেন। ১৯৪১ সালে সোমন চন্দ 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'ক্রান্তি' সংকলনে তাঁর 'বনস্পতি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সোমেন চন্দর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। 'ক্রান্তি'-র শ-খানেক কপি নিয়ে সোমেন কলকাতায় গিয়ে 'প্রগতি'-র লেখক-লেখিকাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকার জন্য দিয়ে আসেন। এই সময় সোমেন চন্দ বন্ধুদের সাথে কলকাতার স্টুডিওতে গিয়ে একটি ছবি তোলেন। এই ছবিটিই তাঁর একমাত্র ছবি। তাঁর শোকাবহ মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর' 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়।

'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটিকে পছন্দ করতেন না সোমেন। এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''লেখার জন্য একটুকুও সময় পাই না, তবুও লিখতে হবে মেহনতি মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য। রাল্ফ ফকস-এর বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি।'' তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে প্রধানত ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সময়-পরিসরে রাজনীতি ও সাহিত্য হাত ধরাধরি করে চলেছে। সাহিত্য বলতে শুধু গল্প লেখা বা অন্য সাহিত্যকর্মই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির সাংগঠনিক দিকেও ছিল তাঁর যথেষ্ট অবদান। পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ঢাকা রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ইউনিট গঠনে কিংবা প্রগতি লেখক সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির গোড়াপত্তনে সোমেন চন্দের ছিল শ্রমনিষ্ঠ অসাধারণ ভূমিকা। এসব কারণে কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের চোখে হয়ে ওঠেন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী, এক কথায় শত্রু ও হত্যার টার্গেট। সোমেনের হত্যার নির্মমতা এমনটাই প্রমাণ করে।

সোমেন মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ

রচনাসমূহ পাঠের মাধ্যমে একজন সুশিক্ষিত মার্কসবাদী হয়ে উঠতে অবিশ্বাস্য মাত্রায় শ্রম ব্যয় করেছেন। তাঁর সাহিত্যচর্চা যদি হয়ে থাকে সহজাত নান্দনিক তাগিদে, তাতে ছিল আদর্শের প্রভাব। আর সেই আদর্শ ও সমাজ বদলের প্রেরণায় তাঁর প্রগতিশীল রাজনীতি। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক অবিভাবকপ্রতিম সতীশ পাকড়াশির আদর্শিক কথাগুলি তাঁর মনে গভীর দাগ কেটে স্থায়িত্ব পেয়ে থাকবে। আসলে এই তরুণ বয়সেই সোমেন চন্দ কমিউনিস্ট আদর্শের বাস্তবায়নে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন, তাই একাধিক ধারায় তাঁর কার্যক্রমের বিস্তৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার (২২ জুন, ১৯৪১) পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করে নীতিগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অবস্থান নেয়। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে চলে যুদ্ধ-বিরোধী তৎপরতা, গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন বাংলার সব জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে ঢাকা ছিল অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র। ৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির পরিস্থিতিতে নাৎসি জার্মানির হাতে আক্রান্ত সোভিয়েতের পাশে দাঁড়ানো উচিত, না কি এই সুযোগে তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধিতাই একমাত্র লক্ষ্য, এই প্রশ্নে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। সেই কারণেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র কর্মকাণ্ডে মন-প্রাণ দিয়ে জড়িয়ে পড়া বোধ হয় সোমেনের বিপদ ডেকে আনে। সেই সঙ্গে রেল ইউনিয়নে তাঁর জনপ্রিয়তা। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি ছিল 'জনযুদ্ধ' নীতির ঘোর বিরোধী। ১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় স্থাপিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। ঢাকা শহরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এর উদ্বোধক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন গোপাল হালদার। আয়োজনটিকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কবি জসীমুদ্দিন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সোভিয়েত মেলার অন্যতম উদ্যোগী কর্মী ছিলেন সোমেন চন্দ। এর পরেই সেই ভয়ংকর দিন ৮ মার্চ ১৯৪২।

ঢাকার সুতাকল শ্রমিকদের সমর্থনে আয়োজিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি', নেপথ্যে সোমন চন্দ। ঢাকার সুনাপুর বাজারের কাছে সেবাশ্রমের মাঠে সেই সম্মেলন। এই সম্মেলনে যোগ দেন শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা, রেল ইউনিয়নের নেতা জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সুরেন গোস্বামী, স্নেহাংশু আচার্য, সাধন গুপ্ত প্রমুখ স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্কিম মুখার্জী। সম্মেলন সফল করতে সোমেন চন্দ মনে হয় সমগ্র সত্তা উজাড় করে দিয়েছিলেন। ঢাকার রেল শ্রমিকদের এ উদ্দেশ্যে সংগঠিত করে একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলনের সভামঞ্চের দিকে যাত্রা করেন সোমেন। মিছিলের নেতৃত্বে সোমেন, হাতে শ্রমিকশ্রেণির লাল পতাকা। ইতিমধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের একদল জঙ্গি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সম্মেলনস্থলে হামলা চালায়। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিরোধে তারা পিছু হটে। ব্যর্থ আক্রোশে ফেরার পথে এই স্বশস্ত্র বাহিনী সোমেনের নেতৃত্বে অগ্রসরমান মিছিলে হামলা চালায়। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল সোমেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘিরে ধরা লোকগুলোর মধ্যে একজন তাঁর পেটে ছুরি গেঁথে দেয়। মুহূর্তের আক্রমণে হতচকিত, ছত্রভঙ্গ মিছিল। রক্তাক্ত সোমেন চন্দ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এবারে মাথায় পড়লো লোহার রডের বারি, ভোজালি ফালাফালা করে দিল পেট, রক্তের স্রোতের সাথে বেরিয়ে এল নাড়িভুঁড়ি। এরই মধ্যে শাবল দিয়ে দুটি চোখ খুবলে নিল, জিভটা বের করে কেটে ফেলল একদল ফ্যাসিস্ট গুণ্ডা। পেশায় শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁর বাড়ির জানালা দিয়ে এই হত্যালীলা দেখেছিলেন, তিনি বলেন, ''আমার বাড়ির জানালা দিয়ে কী বর্বরের মতো তাঁকে হত্যা করা হয় তা আমি নিজের চোখে দেখেছি... সে দৃশ্য ভোলার নয়। এমন মর্মান্তিক হত্যা সহ্যের অতীত।'' একফোঁটা জল তার মৃত্যুর সময় দিতে কেউ এগিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারেনি।

পরদিন সোমেন চন্দর মৃতদেহ ঢাকার উডফোর্ড হাসপাতালে পোস্টমর্টেম হয়েছিল। শবাগারের বারান্দায় রাখা ছিল তাঁর মৃতদেহ। সোমেন চন্দর বন্ধু কবি সরলানন্দ সেন লিখেছিলেন, ''সোমেনকে শেষ দেখিয়াছিলাম শব-পরীক্ষাগারে। পুরানো কোঠাটি রক্তে ভরিয়া গিয়াছে; রক্ত আসিয়া জমিয়াছে বাইরের সিঁড়ির উপর।'' একুশ বছর নয় মাস পনেরো দিনের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের সোমেন চন্দকে লালবাগ শ্মশানে দাহ করা হয়। জ্যোতি বসু ছিলেন শবদেহের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত। শবযাত্রীদের মধ্যে কোনো একজন দেয়ালে খোদাই করে দিয়েছিলেন নিজেদের ক্ষোভকে—''সোমেন চন্দ ঃ আমাদের প্রিয় সংগ্রামী লেখক।''

ক্ষোভে ফেটে পড়লো গোটা বাংলা, ক্ষোভ আছড়ে পড়লো কলকাতাতেও। ১৯৪২-এর ২৩ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সৈয়দ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, সমর সেন, তরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকেরা একযোগে বিবৃতি দিলেন : ''আমরা এই রক্তলিপ্সা এবং বিষকলুষ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে একবাক্যে তীব্র ঘৃণা জ্ঞাপন করিতে আবেদন জানাইতেছি।'' ২৮ মার্চ বিকালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৯ মার্চ লেখা হল : ''ঢাকার তরুণ লেখক ও শ্রমিক কর্মী সোমেন চন্দের শোচনীয় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।'' কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাত্র ষোল বছর বয়সে এই নৃশংস হত্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কবিতা লিখে : ''বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ্-বৃন্তে / সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।/ শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য/গুপ্তঘাতী শত্রুদের করিনা আজ গণ্য।''

অ-কমিউনিস্ট বুদ্ধদেব বসুও তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তাঁর কবিতায় : ''ক্ষমা? এরও ক্ষমা আছে? এ উন্মত্ত হনন বৃত্তিরে/নীরবে সহিতে পারে এত বড়ো মানবমহিমা / জানি না সম্ভব কিনা।'' এত কিছুর পরেও বিস্ময় জাগায়, সোমেন চন্দর হত্যাকারী কারা, সেদিন ঢাকা শহরের সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু পুলিশ এই হত্যা নিয়ে কোনো কেস ফাইল করেনি বা কাউকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যেভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়, তা নিয়ে কবি সরলানন্দ সেন লিখলেন, ''এতবড় মহাভারতের মধ্যে একমাত্র অভিমন্যু বধেই তাহার নজির মেলে।'' সোমেন চন্দর সত্তরতম জন্মবর্ষ উপলক্ষে যে গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল সেখানে অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র 'ক্ষতবিক্ষত সেই মৃতদেহ' শিরোনামে লিখলেন : ''তিনি গল্প লিখতেন বলে খুন হননি, মিছিল নিয়ে আসছিলেন বলেই খুন করা হয়েছিল তাঁকে। ...যারা সোমেন চন্দকে হত্যা করেছিল ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনামাফিকই করেছিল। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করা চলবে না, খেটে-খাওয়া মানুষদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোট বেঁধে আন্দোলন করা চলবে না; যারা এ সমস্ত কুকর্মে এগিয়ে আসবে, তাঁদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।'' সতীশ পাকড়াশি লিখেছিলেন, ''প্রতিক্রিয়াশীল বর্বর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল উন্নত গণতন্ত্রবাদের সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দই এদেশে প্রথম জীবন উৎসর্গ করল।''

কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি

চন্দ্রাবলী সেন

কমরেড অশোক ব্যানার্জী সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ একেবারেই বক্তিগত। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম না। তাঁর মূল্যায়ন করার স্পর্ধাও আমার নেই। আমি জানতাম তাঁকে বাবার এক ভাই হিসেবে। আমার কাকা অমল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান এবং আদর্শগত অবস্থান এক হওয়ায় সহকর্মী থেকে পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠা যেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমার দাদু ও ঠাকুমাও তাঁকে ছেলের মতোই মনে করতেন।

বর্ধমান তখন বড় অশান্ত। যুক্তফ্রন্ট তৈরি হওয়া, সেটা ভেঙে যাওয়া। আমাদের তখন ছাত্রজীবন। কাজেই পথে নেমেই আমরা কর্তব্য পালন করতাম। এসময় আমার এক বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষ্যে যাবো ভাবছি চুলটা একটু অন্যরকম করে গোঁজামিল (ট্যাসল) দিয়ে। কাকু বলেছিলেন, কমিউনিস্ট হতে গেলে গোঁজামিল দিবি না। যা আছে তাই প্রকাশ করবি। কাকুর কথা মনে হতেই আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল। সেটা পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

বিভিন্নজনের স্মৃতিতেই ১৯৭০ সালের কথা এসেছে তাঁদের কলমে। আমিও অনেক কিছু জানলাম। নিজের কথা তো কখনোই বলতেন না।

বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেখানে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। আমার ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম বা চাহিদাসম্পন্ন যাই হোক না কেন, একটু সমস্যা হয়েছিল। সেকথা জানতে পেরে নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিধাননগরে 'বিচিত্রা' আবাসনে একটা ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। কাকু থাকতেন একতলায়, আমি দোতলায়। সেই পাঁচ বছর খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমার ছেলের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ, দাদুভাই বলে ডাকতেন, আর মেয়েকে ডাকতেন ম্যাডাম। ডায়াবেটিসের রুগি বলে বোঝাই যেত না, এত পরিশ্রম করতেন। বকাবকি করলে বলতেন, কী করব বল—কাজ করে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তখন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে। আর সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি কাকু। উপরে এসে নিরুপমের সাথে গভীর আলোচনায়। যদি কিছু খাবার কথা বলতাম, তখন রাজি হতেন। কাকু বড় টাকার কথাই বলতেন, কখনো হাজার কোটি টাকাতেও উঠতো। আমি শুধু বলতাম, আসতে বলো, রাস্তার ধারে বাড়ি কখন না ডাকাত আসে, ভাববে এরা সব কোটি টাকার মালিক। সমবায় আন্দোলনকে এত উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সমবায় ব্যাঙ্ক খোলার জন্য বিধাননগরে কত উদ্যোগ, যাতে গ্রাহকদের সুবিধা হয়। তাই রবিবার খোলা রেখে সোমবার বন্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল।

খুব অল্পে সন্তুষ্ট। আমার বাবা বলতেন, ''অশোক যেভাবে উচ্ছে সিদ্ধ দিয়ে রুটি খায়, মনে হয় যেন মাংস দিয়ে রুটি খাচ্ছে।'' কাকুর একজন সাহায্যকারী ছিল, নিমাই তার নাম। অদ্ভুত ক্ষমতায় প্রায় তেলবিহীন মাছ, তরকারি সব রান্না করতো। কাকিমা মাঝেমধ্যে কলকাতায় এলে অবাক হয়ে নিমাইয়ের অসাধ্যসাধন দেখতেন। আমাদের কাছে কাকু ছিলেন ভীষণভাবে নিজের। আমার কাকু অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যখন বাইপাস অপারেশন হয়, একতলা বলে কাকুর কাছেই থাকতেন। দাদা ও ছোট (কাকিমা)-কে পেয়ে গল্পের ভাণ্ডার ফুরোতেই চাইতো না। আমি নিজস্ব একটা বাসস্থান করে চলে আসার পর প্রায় নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একদিন দেখা করতে যেতাম। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর পর কাকুর সহনক্ষমতা আমাকে বিস্মিত করেছে। আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন কষ্ট পাচ্ছি বলে।

নিরুপমের অসুস্থতার সময় হাসপাতালে বসে থাকতেন। সঙ্গে খাবার নিয়ে যেতেন। ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিয়ে খাবারটা খেতেন। আমার সঙ্গে থাকতেন চিন্তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতেন কিন্তু কিছুতেই কথা বলতেন না। হাসপাতালে গিয়ে দেখা করতাম, তাতেও চিন্তা যে আমার কষ্ট হতো। গত বছর ২০১৯ ডিসেম্বরে বর্ধমান গিয়েছিলাম। কাকু আমার ছেলেকে দেখতে চাইতেন খুব, তাই নিয়ে গিয়েছিলাম। তখনই আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম মনের জোর থাকলেও স্বাস্থ্য সেটা মানছে না। তখন তো আর বুঝিনি, আর দেখা হবে না। কোভিড এসে আমাদের বন্দি করে দিল, আমি যেতে পারিনি। এ দুঃখ আমার থেকেই গেল। স্মরণ অনুষ্ঠানেও যেতে পারিনি নিজের অসুস্থতার কারণে। কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, এটাও আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে। অসীম সহ্যশক্তি নিয়ে কাকু-কাকিমা লড়াই করেছিলেন। এখন কাকিমা থাকবেন অনেক সমব্যথীর সঙ্গে। আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাই।

Happy Puja Greetings from

Saradamayee Rice Mill

Vill. Rokona, P.O. Jharul, Dist Purba Bardhaman

Sl. No. 12

উৎসব শুভেচ্ছা জানাই

সরকারি ও বেসরকারি চাকরি নিশ্চিত করতে
GNM BSc নার্সিং
D. Pharma, B. Pharma
I N C   A P P R O V E D
Bank Loan-এর সুবিধা
সম্পূর্ণ বাঙালি খাওয়ার সুবিধা

GUIDE & GROW

Sk. Azizul Haque
M : 9733557895

Sl. No. 44

উৎসব শুভেচ্ছা জানাই

সারদা ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক

মাশিলা, শশঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান
[S.A.B.]

পরিবেশ বাঁচাতে—মাটি ক্ষয় রোধ করুন
সারদা ফ্লাই অ্যাশ ইট ব্যবহার করুন।

Sl. No. 43

উৎসব শুভেচ্ছা জানাই

পরেশ মিত্র

সগড়াই বাজার, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 45

ভ্রমণ

গোমুখ-তপোবন যাত্রা

বিলাস চ্যাটার্জী

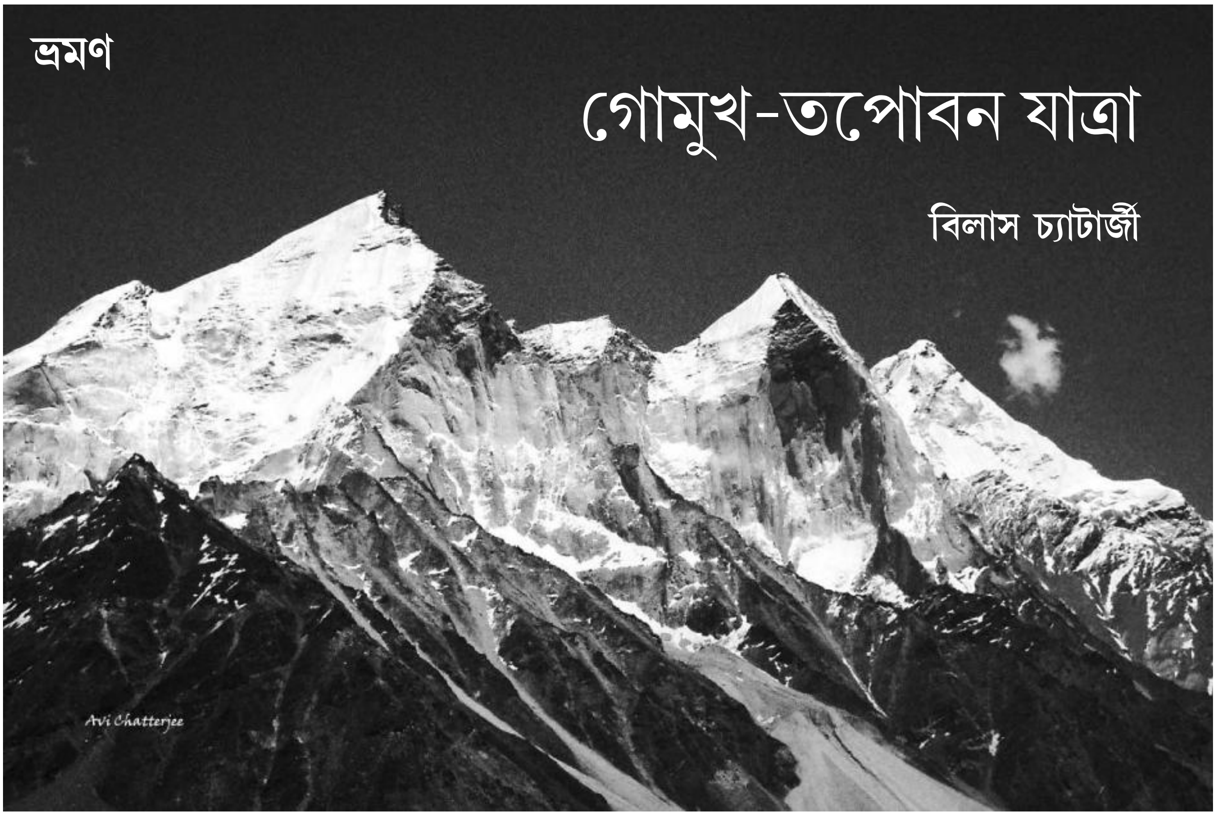

রাজকুমার আমাদের সাথেই কাজ করতো। কম কথা বলা ছেলেটির সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকে। ঘুরে বেড়ানোর প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ খুব বেশি হতো না। তবে সুযোগ পেলেই আমার সাথে বেড়ানোর চেষ্টা করতো। সাধারণত শীতকালে ছুটির দিনগুলো মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়ানো আমার অনেক দিনের অভ্যাস। সকালে বেড়িয়ে বাড়ি কখন ফিরব তার ঠিক থাকে না। যে পথে আগে কখনো যাইনি সেদিকে ঘুরে ফিরে দেখে আসা গ্রাম, গ্রাম্যপ্রকৃতির শোভা, মানুষজন। সকালে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়া, কোথায় খাবার জুটবে তা না জেনেই ভ্রমণ। দুপুরে অনেক দিন আমাদের ভাত রুটি জোটে না। বিকালের দিকে বড় রাস্তায় উঠে লাইনের হোটেলে খাবার পেয়েছি, আবার কোনোদিন না খেয়েই বাড়ি ফিরেছি সন্ধ্যায়। এমন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল রাজকুমারের। তাই আমার সঙ্গী হয়ে প্রায় শনি-রবিবার ঘুরতে যেতো। রাজকুমারের অনেকদিনের সখ আমার সাথে ট্রেক করবে। সে বছর ঠিক হল গোমুখ হয়ে তপোবন যাব। লম্বা সুঠাম চেহারা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী রাজকুমারকে হিমালয় পদযাত্রার সাথী করে নিলাম। সাথে যাবে কৌশিক চক্রবর্তী আর আমি। এই তিনজনের দল আমাদের। আজ যখন এই লেখা লিখতে বসেছি, রাজকুমার কয়েক বছর আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। একটি পথ-দুর্ঘটনায় হঠাৎ সে পরলোকের পথে চলে যায়। এই লেখা রাজকুমারের স্মৃতিতেই উৎসর্গ করলাম।

বর্ধমান থেকে মে মাসের শেষ দিকে একদিন উঠে পড়লাম দুন এক্সপ্রেসে। পরদিন ট্রেনেই কাটিয়ে তৃতীয় দিন ভোরে নামলাম হরিদ্বার স্টেশনে। যাওয়ার সময় হরিদ্বারে থাকব না, তাই বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে উত্তরকাশীর বাসে টিকিট কেটে উঠে পড়লাম। কখনো ঘুমিয়ে কখনো বা জেগে পথের চারপাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকালে পৌঁছালাম উত্তরকাশী। সেখান থেকে আরো ৪ কিলোমিটার দূরে গাঙ্গোরীতে চেতনস্বামীর আশ্রম হিমগিরি গুহা। সেখানেই আমরা থাকব। একটি শেয়ার জীপে উঠে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে গেলাম।

উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী যাওয়ার রাস্তায় চার কিমি পরে ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে অসিগঙ্গা নদী। এই সঙ্গম বা মিলনস্থলে যে জনপদ গড়ে উঠেছে তার নাম গঙ্গোত্রী। সেখান থেকে অসিগঙ্গার বাম তীর বেয়ে অপর একটি পথ চলেছে উপরের দিকে। ডোডিতাল যাওয়ার পথ সেটি। সেই পথে উঠেই বাম দিকে অসিগঙ্গার তীরে নেমে গেলে পৌঁছানো যাবে হিমগিরি গুহায়, যা চেতনস্বামীর আশ্রম। আমাদের আপাতত আশ্রয়স্থল। চেতনস্বামী বয়সে আমার থেকে ছোট হলেও বন্ধুসম সন্ন্যাসী। ছোট থেকে এক পাড়াতেই বাস ছিল। হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করেন। বহুদিন তার কোনো খোঁজ ছিল না। ১৯৯২ সালে আমি এই অঞ্চলে ডোডিতাল ট্রেক করতে এসে ওনার সন্ধান পাই। সেই থেকে এই অঞ্চলে ট্রেক করতে এলে উত্তরকাশী নয়, গঙ্গোরিতেই আমার বেস-ক্যাম্প হয়। চার কামরার একতলা বাড়িতে এই আশ্রম। একটি ঘর আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এখানে দিন দুই থেকে গঙ্গোত্রী যাব। সেখান থেকেই শুরু হবে আমাদের এই অভিযান।

আশ্রমে আর এক সন্ন্যাসীর বাস, নাম ধ্যানানন্দ স্বামী। কয়েক বছর ধরে এখানে আছে। আমার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে প্রথম থেকেই। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, সর্বদা মুখে হাসি লেগেই থাকে। তিনি এতদিন এখানে আছেন কিন্তু গোমুখ দর্শন তাঁর হয়ে ওঠেনি। আসলে সমতলের মানুষ, তাই চেতন স্বামী একা তাঁকে যেতে দেন না। আমি আসছি জেনে চেতন স্বামীর কাছে আর্জি রেখেছেন যাতে আমাদের সাথে গিয়ে গোমুখ তপোবন দর্শন তিনি করতে পারেন। আমাদের চার জনের থাকার তাবু আছে। খাবার সব এখান থেকেই কেনা

হবে। তাহলে অসুবিধার কিছু থাকে না। রাজি হয়ে গেলাম ধ্যানানন্দকে নিয়ে যেতে। আমাদের দল হয়ে গেল চার জনের। একজন মালবাহক সাথে নিতে হবে, যে রান্নার সরঞ্জাম, খাবারের জিনিস আর তাবুটি বয়ে নিয়ে যাবে। এমন একজনকে চেতন স্বামী ঠিক করে দিলেন, যার থাকার ব্যবস্থা সে নিজেই করে নেবে। তপোবনের জন্যই শুধু থাকা খাওয়ার সরঞ্জাম নেওয়া হল। বাকিটা পথেই পাওয়া যাবে।

পরদিন গঙ্গোরি থেকে ১০টার বাসে উঠলাম গঙ্গোত্রী যাওয়ার জন্য। বাসে এই মাঝ পথে বসার সিট পাওয়া যায় না। চেতন স্বামী উত্তরকাশীতে পরিচিত কাউকে ফোন করে বাসের টিকিট কাটিয়ে নিয়েছিলেন। সেই টিকিট বাস ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমরা বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। বাস চলেছে গণেশপুর, মিনেরি হয়ে গঙ্গোত্রীর দিকে। ভাগীরথীর দক্ষিণগাত্রে পাহাড় কেটে তৈরি পিচ-ঢালা পাকা রাস্তা। আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডী বেয়ে এগিয়ে চলেছে বাস। মাঝে মাঝে দু-একটি গ্রাম দেখা গেলেও বেশিটাই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছি। জানালায় বসে দেখি প্রকৃতির কী অপরূপ দান, এই হিমালয়। পৌঁছালাম ভাটোয়ারি, সেখানে চা পানের বিরতি মিনিট ১৫। সকলেই বাস থেকে নেমে দোকানে চা জলখাবার খাচ্ছে। আমরাও এক কাপ করে চা খেয়ে নিলাম। একটু ঘুরে দেখে নিলাম জনপদটিকে। এখান থেকে বাম দিকে আর একটি পাকা রাস্তা চলেছে বারসুর দিকে। সেখান থেকে দয়ারা বুগিয়াল ট্রেক হয়। বাসের হর্ন দিতেই উঠে বসলাম নিজের জায়গায়। বাস আবার এগিয়ে চলল। পরের গ্রাম ডাকোয়ানী এলে তাকিয়ে থাকি জঙ্গলের দিকে। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়েই কয়েক বছর আগে একটি বড় অভিযানে গিয়েছিলাম। 'শ্রীকণ্ঠ শৃঙ্গ' দক্ষিণ গাত্র দিয়ে জয়ের লক্ষ্যে সেই অভিযান সংগঠিত হয় আমাদের ক্লাব 'ভ্রামণিক' থেকে। সেই অভিযানের নানান ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকি মনে মনে। পৌঁছাই গাঙ্গনানি। এখানে একটি গরম জলের ধারা আছে। অনেকেই এখানে একবার থামে সেই জলে স্নান করার জন্য। আমাদের সে সুযোগ নেই, বাস এতক্ষণ দাঁড়াবে না।

আমার এই পথে চতুর্থ বারের জন্য আসা হল। একবার আমি আর নয়নদা গিয়েছিলাম গোমুখ পর্যন্ত। ভুজবাসা থেকে গোমুখ দর্শন করে সেই দিনেই নেমে আসি গঙ্গোত্রী। পৌঁছাতে বিকাল হয়ে যায়। একটি বাস উত্তরকাশী যাচ্ছে দেখে গঙ্গোত্রীতে না থেকে ড্রাইভারকে অনুরোধ করি আমাদের নিয়ে যেতে। সিট না থাকলেও ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঙ্গনানি পৌঁছাই। গাঙ্গনানি পৌঁছে জানতে পারি গাড়ি আজ আর যাবে না। সামনে রাস্তা ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছোট বড় গাড়ি এসে আটকে আছে এখানে। কয়েকটা মাত্র হোটেল, সব বুক হয়ে গেছে। আমরা দুজনে গ্রামের ভিতরে গিয়ে একটি ঘর পেলাম রাতের জন্য। খাবার কিছু না পেলেও রাতে শীতের হাত থেকে বেঁচেছিলাম, ক্লান্ত শরীরে ঘুমও ভাল হয়েছিল। পরদিন সকালে গরম জলে স্নান করে রাস্তার ধারের হোটেলে গিয়ে রুটি সবজি খেলাম। বেলার দিকে রাস্তা সারানো হলে উত্তরকাশী যাই সেই বাসে। যাক সে কথা। বাস চলেছে গঙ্গোত্রীর দিকে। হরশিল, ধরাসু, লঙ্কা হয়ে দুপুরের পর পৌঁছাই গঙ্গোত্রী। ছোট এক হোটেলে চার শয্যার একটি ঘর নিয়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল।

কৌশিক, রাজকুমার দুজনেই এই প্রথম গঙ্গোত্রী এসেছে। হোটেলে না বসে থেকে সকলেই গেলাম মন্দির দর্শন করতে। গাড়োয়াল হিমালয়ে অবস্থিত চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রী মন্দির ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। দুই দিকে পাহাড়ের মাঝে খরস্রোতা ভাগীরথী নদী বয়ে চলেছে। নদীর এই দক্ষিণ তীরেই দোকান বাজার সহ কিছু হোটেল গড়ে উঠেছে। অপর পারে সাধুদের কুঠিয়া আর আশ্রম। এছাড়াও রয়েছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের হোটেল। পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল চির, পাইনের। সেখান থেকে ভাগীরথীর অপর পারে ঘুরতে গেলাম। নদী পারাপারের জন্য দুটি সেতু আছে। একটি মন্দিরের দিকে, অপরটি কিছুটা নিচে। আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে সেতু ধরে অপর পারে যাই। এদিকটা বেশ নির্জন, শান্ত পরিবেশ। ধীর পায়ে হেঁটে যেতে ভাল লাগে। কাছেই কেদার গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে। সেও বেশ গতিশীল। অনেকটা নিচে আছড়ে পড়ছে ভাগীরথীর উপর। এই নদী এসেছে কেদার তাল থেকে। এখান থেকে ট্রেক করে সে তাল দেখতে যায় অনেকে। কেদার গঙ্গার উপর আবার একটি সেতু পার হয়ে এগিয়ে চলি। পরপর কয়েকটি আশ্রম কুঠিয়া পার হয়ে পৌঁছাই মাতাজীর আশ্রমে। আগেও এসেছি এই আশ্রমে। পরিবেশটি আমার ভাল লাগে। মাতাজী পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেন, সকলকে চা দিলেন। বর্ধমান থেকে এসেছি জেনে খুব খুশি হয়ে অনেক চেনা মানুষের খবর নিলেন। জানার ইচ্ছা হলেও জানতে পারলাম না মাতাজীর শরীর কোথাকার। জন্মের কথা জানতে চাইলে বিরক্ত বোধ করেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। বর্ধমানের না হলে এত খবর জানবেন কী করে! সে প্রশ্ন মনে নিয়েই ফিরে আসি হোটেলে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তায়, হোটেলে।

পরদিন আমাদের পদযাত্রা শুরু হল। ৭টা নাগাদ একটি হোটেলে বসে আলুর পরোটা খেয়ে পথ চলা শুরু করলাম। আমরা মন্দিরের দিকে গেলাম। ধ্যানানন্দজী মন্দিরে প্রণাম করে এসে চড়ায় ওঠা শুরু হল। দিনের শুরুতে এমন চড়ায় উঠতে বেশ কষ্ট হয়। প্রথম চড়াইটা উঠে এসে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলা। কিছুটা এগিয়েই বনদপ্তরের অফিস বা চেকপোস্ট। সেখানে নাম লিখিয়ে জনপ্রতি ফিস জমা দিয়ে তবে সামনে যাওয়া যাবে। আমরা সেই

কাজ করে পাশেই ফলাহারী বাবার আশ্রম দেখে আবার এগিয়ে চলি। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হালকা চড়াই পথ। গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যায় সুদর্শন শৃঙ্গকে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে। নানান পাখির ডাক, অনেক নিচে বয়ে চলা খরস্রোতা ভাগীরথীর গর্জন পথ চলার সঙ্গী হয় আমাদের। এক সময় গাছের সংখ্যা কমে আসে। নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে। আরও কিছুটা এগিয়ে পৌঁছাই চির গাছের জঙ্গলে। বাম দিকের পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি খরস্রোতা জলধারা পার হই কাঠের তৈরি সেতুর উপর দিয়ে। জায়গার নাম চিরবাসা।

চিরবাসাতে বেশ কিছু তাবু হোটেল ছিল তখন। সেখানে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা থাকতো। এখন সব বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছিল বলে। আগে নাকি এই পথের বেশিটাই ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। আবার সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে বনদপ্তর। আমরা একটি হোটেলে বসলাম বিশ্রাম নেবার জন্য। রুটি আর সব্জির অর্ডার দেওয়া হল ৫ জনের। আমরা চার জন ছাড়াও সাথে আছে রাম সিং, মালবাহক। ৯ কি.মি. পথ চলার পর ক্লান্ত হয়েছিলাম সবাই, খিদেও পেয়েছিল। গরম রুটি আর আলুর তরকারি দিয়ে খিদে ও ক্লান্তি কাটালাম। আবার যাত্রা শুরু করলাম ভুজবাসার দিকে। কিছুটা এগোতেই জঙ্গল শেষ হল। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথে চলেছি। দমের ঘাটতি হচ্ছে। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। তবে দাঁড়িয়েই, বসার সময় নেয়। এই উচ্চতায় বিকালের দিকে আবহাওয়া প্রায়শঃ খারাপ হয়। তাই বিকালের আগেই যাতে পৌঁছাতে পারি তার চেষ্টা করছি সকলে। অনেকটা উপরে উঠে এসে ভাগীরথী শৃঙ্গ দেখা দিল। ভাগীরথীর তিনটি শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনেই। পৌছালাম ভূজবাসা।

ভাগীরথীর তীরে অনেকটা জায়গা জুড়ে ভুজবাসা। সামনে মাত্র ৫ কি.মি. দূরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের শুরু। ভাগীরথী নদীর উৎস গোমুখ থেকে। তার পিছনে ভাগীরথী শৃঙ্গের অবস্থান। ডান দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শিবলিং শৃঙ্গ। এক কথায় অপূর্ব সুন্দর এই ভুজবাসা। অনেকটা উপরে থাকায় বহুদূর পর্যন্ত নজর যায় এখান থেকে। কিছুটা নিচে নেমে ভাগীরথীর তীরে লালবাবার আশ্রমে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাবু খাটিয়ে থাকতে হলে নদীর তীরেই যেতে হবে। এখানে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশি হবে, তাই তাঁবু খাটাব না ঠিক করলাম। এছাড়াও আছে জি.এম.ভি.এন-এর সুন্দর হোটেল, সেখানে খরচ কিঞ্চিৎ বেশি। আমরা নিচে নদীর চরে নামলাম না। উপরে রাস্তার ধারে আছে তাবু খাটানো ঝুপড়ি হোটেল, সেখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পিছনের দিকে ঢালাও বিছানা পাতা, সামনে হোটেল। আমরা এখানে একরাত থাকব, তাই বেশি খরচ না করে এই ঝুপড়ি হোটেলেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে, কিছু খাবার সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম ৭টায়। পাহাড়ের গা বেয়ে সহজ পথে চলেছি। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠেছি। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাচ্ছিল। এখন রোদ এসে গায়ে পড়তে বেশ আরাম বোধ করি। সকালের মিষ্টি আলোয় চারদিকের প্রাকৃতি অন্য রূপে যেন সেজে ওঠে। পাহাড় থেকে নেমে আসি নদীর তীরে। বালিমাটি ঘাসের উপর দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ পথে পথচলা। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে পৌঁছাই গোমুখের একটু আগে, যেখানে ঘোড়ার পথ শেষ হয়েছে সেখানে। যারা ঘোড়ায় চড়ে গোমুখ দর্শনে আসেন, তাদের এখানে নামিয়ে দেওয়া হয়। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হয়। ছোট তাবু-হোটেল এখানেও একটি আছে। চা পাওয়া যাচ্ছে জেনে আমরা সকলে এক কাপ করে খেয়ে নিলাম। এবার এগিয়ে যাই গোমুখের দিকে। একটি ছোট চড়াই-এ উঠে নেমে আসি ভাগীরথীর তীরে। তীর ধরে আরো একটু এগিয়ে পৌঁছাই গোমুখের সামনে।

হাজার হাজার বছরের জমে থাকা হিমালয়ের হিমবাহ আমাদের দেশের অন্যতম সম্পদ। যতগুলি নদী হিমালয় থেকে সমতলে নেমেছে তাদের সারা বছরের জল এই সম্পদ থেকেই সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে পাহাড়ের খাঁজে বরফ জমতে জমতে তৈরি হয়েছে হিমবাহ। গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় ৪৫ কি.মি. লম্বা আর দেড় কি.মি চওড়া। নিচে শক্ত বরফের উপর ধুলো মাটি নুড়ি বা ছোট বড় পাথরের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা থাকে হিমবাহ। বরফের নিচ থেকে জলধারা বইতে থাকে, সেই জলধারাতেই ভাগীরথীর সৃষ্টি হয়েছে। সামনে দেখা যায় নীলাভ শক্ত বরফ-প্রাচীর। তার নিচে একটি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে ভাগীরথী নদী। রোদের তাপ বাড়ার সাথে সাথে এই বরফ প্রচীরের অংশ ছোট বড় আকারে ভেঙে পড়ে। তাই বেশি কাছে না গিয়ে একটু দূর থেকেই দেখি সকলে প্রকৃতির এমন রূপের সাজ। আর এই জন্যই আমাদের বারে বারে ফিরে আসতে হয় হিমালয়ে।

সময় নষ্ট না করে ফিরে আসি সেই ঘোড়াওয়ালাদের ডেরায়। সেখান থেকেই চড়াই বেয়ে উঠে চলি মাটি পাথরের পথহীন পথ ধরে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ গ্রাব রেখা ধরে উঠতে হবে হিমবাহের উপরে। রোদের তাপ বাড়ার সাথে সাথে বাম দিকের পাহাড়ের গা থেকে পাথর ভেঙে পড়ে। ছিটকে আসে এখানেও। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই জায়গাটি পেরিয়ে যেতে চাই। হিমালয়ের এতটা উপরে বাতাসে অক্সিজেন কম থাকায় দমের ঘাটতি পড়ে। তবু দাঁড়ানো যায় না, এগিয়ে চলতে হয়। উঠে এলাম হিমবাহ-এর উপরে। এবার আর সামনে নয়, আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে হিমবাহের অপর পারে যেতে হবে আমাদের। কোনো পথরেখা নেই, রাম সিং যে দিকে নিয়ে যায় তার দেখানো পথেই হেঁটে চলি। হিমবাহ জুড়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় বরফ ফাটল বা ক্রিভার্স। হিমবাহের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ এখানে লুকিয়ে থাকে। বহু পর্বতপ্রেমীর জীবন এই ক্রিভার্সে পড়েই শেষ হয়েছে। যখন তাকে দেখা যায় এড়িয়ে চলতে পারি। যখন দেখা যায় না, লুকিয়ে থাকে, তখন বিপদ বাড়ে।

রাম সিং চলেছে সামনে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে আমাদের। তার পিছনে পরপর চলেছি ধ্যানানন্দজী, আমি, রাজকুমার, শেষে কৌশিক। সকলে একটি লাইনে করে এগিয়ে চলি। একটি বড় ক্রিভার্সের পাশ দিয়ে চলছিলাম। রাজকুমারকে বললাম, সাবধানে এই জায়গাটি পার হয়ে নে, দাঁড়াবি না। পাশেই পাথরের মতো দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বরফের ভেঙে-পড়া অংশ। আমি বিপজ্জনক জায়গাটি পার হলাম। কী মনে হল, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি রাজকুমার সেই দেওয়ালটিতে হাত দিয়ে পরখ করছে সেটি সত্যি বরফ কি না! আমাকে পিছন ফিরতে দেখে তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে এলো। তখন আর কিছু না বলে পরে ওকে বুঝিয়ে বললাম কী বিপদ ওখানে লুকিয়ে থাকে। একসময় পৌঁছালাম গঙ্গোত্রী হিমবাহের বাম তটে। হিমবাহের বিপদ কাটিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে সকলে পাথরের উপর বসলাম। সাথে নিয়ে আসা রুটি সবজি দিয়ে খিদে মেটালাম। সামনে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন এক চড়াই। সেটি আমাদের উঠতে হবে। বসে না থেকে আবার যাত্রা শুরু করি। দিনের শেষে এমন কঠিন চড়াই উঠতে বেশ কষ্ট হয়। কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই, নেই বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ। আধ ঘন্টার চেষ্টায় উঠে এলাম সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত প্রায় সমতল ভূমিতে। পৌঁছালাম আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য তপোবনে। আমাদের ওঠার পথের পাশে একটি জলধারা নেমে যেতে দেখছিলাম হিমবাহের দিকে।

সেই ধারাটি তপোবন থেকেই নেমেছে। ধারাটি নেমেছে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা শিবলিং শৃঙ্গের গা থেকে। বয়ে চলেছে তপোবনের উপর দিয়ে। আমরা জলধারাটি পার হয়ে ডান দিকে কিছুটা এগিয়ে আমাদের তাঁবু খাটালাম। একটু আগেই একটি গুহায় কয়েকজন স্থানীয় লোক আছে, যারা জড়িবুটি সংগ্রহ করতে এসেছে এখানে। বাম দিকে এগিয়ে গেলে শিমলীবাবার আশ্রম আছে। খুব প্রয়োজন হলে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেন তিনি।

তপোবন। তপোবন হল উপাসনা বা সাধনাক্ষেত্র। সমুদ্রতল থেকে ১৪,৬৪০ ফুট উচ্চতায় সুন্দর প্রায় সমতল এই জায়গায় উপাসনা ছাড়া কী বা হতে পারে! শিবলিং শৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থিত এই নির্জন ভূমি প্রকৃতির বিস্ময়। গাড়োয়াল হিমালয়ে আরো কয়েকটি জায়গা আছে 'তপোবন' নামে। তাদের মধ্যে এই জায়গার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি। বহুদিন থেকে মূলতঃ সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে আসছেন সাধনার জন্য। সারা বছরে কিছু আমার মতো হিমালয়-পদযাত্রীরাও এসে থাকে এখানে। চওড়ায় এক থেকে দেড় কি.মি. ও লম্বায় প্রায় ৩ কি.মি এই তৃণাচ্ছাদিত ভূমি নির্জন, শান্ত ও মনোরম। তৃণভূমি জুড়ে নানান রঙের ফুল ফুটে আছে। চলতে হচ্ছে সেই ফুলের উপর পা দিয়ে। রাম সিং জানালো বর্ষায় এই জায়গা আরো রঙিন হয়ে ওঠে নানান ফুলের রঙে। শিবলিং শৃঙ্গের গা থেকে একটি জলধারা নেমে এসে বয়ে চলেছে তপোবনের উপর দিয়ে। রাম সিং জানালো এই জলধারাটির নাম 'রামগঙ্গা'। চারদিকে বেশ কিছু তুষারশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা। শিবলিং শৃঙ্গকে মাথা তুলে দেখতে হয়, যেহেতু তার পাদদেশেই তপোবনের অবস্থান। গঙ্গোত্রী হিমবাহের বাম তটে তপোবন, আবার ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্গোত্রী। হিমবাহের দক্ষিণ তটে এমনই সুন্দর আরও একটি জায়গার নাম 'নন্দনবন'। সেই নন্দনবনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ভাগীরথীর তিনটি শৃঙ্গ। এছাড়াও এই অঞ্চল থেকে দেখা যায় কেদারডোম, ভৃগু, খর্চাকুণ্ড সহ এক ঝাঁক শৃঙ্গকে। পাহাড়ের ঢালে ঝাঁক ঝাঁক পাহাড়ি হরিণ ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভয়হীন অবাধ বিচরণ এই পুণ্যভূমিতে। দিনের শেষে সূর্যের সোনা ঢালা রঙ এসে পড়ে এই ভূমিতে। ধীরে ধীরে যখন এই ভূমিতে নেমে আসে অন্ধকার, তখনো শৃঙ্গগুলির মাথায় থাকে সোনা-ঢালা রঙের বাহার। মনে হয় কেউ যেন সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে এই জায়গা শরীর-মনকে দেয় এক অনাবিল আনন্দ।

অন্ধকার নেমে আসার সাথেসাথেই কনকনে ঠাণ্ডা নেমে আসে পাহাড় জুড়ে। সেই ঠাণ্ডা আপনাকে তাবুর ভিতর ঢোকানোর চেষ্টা করবে। তাকে যদি জয় করা যায়, তাহলে অন্ধকারেরও যে মোহময় রূপ থাকে তাকে দেখা যাবে এখান থেকেই। যা আমাদের ইট কাঠ পাথরের নগর-সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে রূপ প্রকৃতির নিজস্ব। রাতশেষে ভোরের আলো ফুটলে প্রকৃতি আবার অন্য সাজে সেজে ওঠে। তুষারশৃঙ্গগুলো রক্তিম হয়ে ওঠে। মনে হয় কেউ যেন টন টন লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে শৃঙ্গগুলির মাথায়। এমন ভাবেই প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, রঙ বদলায়। যার সব কিছু যান্ত্রিক ক্যামেরায় ধরে রাখা যায় না। সেই রূপ রস গন্ধ ধরা থাকে মন-ক্যামেরায়, গেঁথে যায় আমাদের মনের মণিকোঠায়। তাই বারে বারে ফিরে আসতে হয় হিমালয়ের অন্দরে।

আন্দামান ভ্রমণ

উৎপল দত্ত

কথায় বলে বাঙালির পায়ের তলায় সরষে। সেই ঐতিহ্য অনুসারে চাকুরিজীবনের শুরু (৭০-এর দশক) থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নিয়ম করে প্রতিবছর পুজোর ছুটিতে বেরিয়ে পড়তাম প্রথমদিকে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, পরবর্তীকালে সপরিবারে। কিন্তু ২০১৭ সালে হঠাৎ করে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। ডাক্তারের নিষেধের ফলে ২০১৮ সালেও কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই ২০১৯ সালে প্রস্তুত হলাম স্ত্রী-পুত্র সহ আন্দামান সফরে। এতদিন পর্যন্ত নিজেই ভ্রমণসূচি তৈরি করতাম, কিন্তু এবার চিকিৎসক ও শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে একটি অভিজ্ঞ ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে যাওয়া ঠিক করলাম। যদিও আমার নিজের ইচ্ছা ছিল অন্তত একপিঠ সমুদ্রপথে যাবার, কিন্তু ভ্রমণসংস্থার সূচি অনুসারে শেষ পর্যন্ত দুপিঠই আকাশপথে যেতে হল। যাইহোক ৭ অক্টোবর সকাল ৮.৪০ নাগাদ কলকাতা (নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দর) থেকে গো-এয়ার-এর উড়ানে রওনা হয়ে ১০.৩০ নাগাদ পোর্টব্লেয়ার (বীর সাভারকার বিমানবন্দর) পৌঁছুলাম। ভ্রমণসংস্থার প্রতিনিধি বিমান বন্দরেই অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর সঙ্গেই আমরা পোর্টব্লেয়ার-এর আবাসস্থল 'রিপল লজ'-এ পৌঁছে গেলাম।

এইবেলা সংক্ষেপে আন্দামান নিকোবরের ইতিহাসটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। বঙ্গোপসাগরের জলে ৫৭২টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দীপপুঞ্জের ১৩০টি দ্বীপে মানুষ পৌঁছতে পারলেও মাত্র ৩৬টি দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে আন্দামানে ২৪ ও নিকোবরে ১২টি। যদিও এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিক কারণে পর্যটকদের নিকোবরে যাওয়া নিষেধ। ১৭৮৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর সময়ে ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড লোকজন নিয়ে এসে পোর্টব্লেয়ার-এর চাথামে বসতি স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য এটিকে 'পেনাল কলোনি' বা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের আবাসস্থল হিসাবে গড়ে তোলা। ১৮৫৭-র ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে ভীত ব্রিটিশরাজ প্রথমে এখানে ৭৭৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বন্দি হিসাবে পাঠান। তবে ব্রিটিশ সেনার অত্যাচারে মাত্র ২ মাসের মধ্যে ২৯২ জনের মৃত্যু ঘটে। এরপর ১৯৪৩ সালে জাপানি সহায়তায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এটি দখল করে। ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর নেতাজি এখানে পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৪৫-এ ব্রিটিশ এটি পুনর্দখল করে। এরপর ১৯৪৭-এ এটি পাকাপাকিভাবে স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়।

যাই হোক, পোর্টব্লেয়ারে আমাদের সাময়িক আবাসস্থলটি ছিল ছবির মতো সুন্দর। ফুলগাছে ঘেরা রিসর্টের ঘরগুলিও ক্রমিক সংখ্যার বদলে বিভিন্ন ফুলের নামে। বঙ্গোপসাগর অনতিদূরে হলেও এখানে সেটি অত্যন্ত শান্ত, পুরীর মতো দূর থেকে সমুদ্র গর্জন শোনা যায় না। জিনিসপত্র ঘরে রেখে মধ্যাহ্নভোজ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম আন্দামানের সেরা আকর্ষণ 'সেলুলার জেল' দেখতে।

দীর্ঘদিন ধরে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এখানে রেখে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে, অনেকেই মারা গেছেন। উল্লাসকর দত্তের মতো কেউ কেউ পাগল হয়ে গেছেন। তাই আমার কাছে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন বা অযোধ্যা নয়, সেলুলার জেলই ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ জেনারেল সেলুলার জেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৭টি উইং-এ মোট ৬৯৮টি সেল ছিল। আবার প্রতিটি উইং একটি কেন্দ্রীয় টাওয়ারের সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকেই সশস্ত্র সৈন্যরা এটি পাহারা দিত। এর পেছনেও খাড়া পাহাড় এবং তার পরেই সমুদ্র। প্রতিটি সেলেই (কক্ষ) কেবলমাত্র একজন বন্দীকেই রাখা হতো। এর নির্মাণকৌশল এমনই যে কোনো বন্দীই তার সহবন্দীকে দেখতে পাবে না। অথচ ফাসির মঞ্চ এবং বন্দীদের উপর অত্যাচার করার জায়গা যাতে প্রত্যেকে দেখতে পারে সে বন্দাবস্ত করা ছিল। জাপানিদের আক্রমণ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে

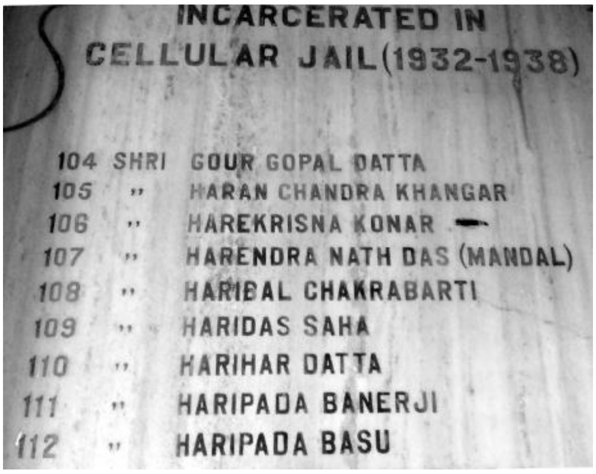

এখন একটি মাত্র উইংই অবশিষ্ট আছে। দ্বিতলে ১৩টি প্রস্তর ফলকে মোট ৩৩৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর (যারা সেলুলার জেলে বন্দি ছিলেন) নাম উৎকীর্ণ আছে।

বর্ধমানের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ছাত্রজীবন কাটানোর ফলে কোনোকালেই সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক কোনো অনুভূতি কখনো ছিল না। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই এই প্রস্তরফলকগুলির সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাঙালি হিসেবে গর্ব অনুভব করেছিলাম। এই তালিকার ৮০ শতাংশেরও বেশি বাঙালি, ১০ শতাংশ পাঞ্জাবি এবং অবশিষ্ট ভারতের সমস্ত প্রদেশ নিয়ে ১০ শতাংশেরও কম। আজ আবারও বুঝতে পারলাম ব্রিটিশ কেন যাবার আগে বাংলা আর পাঞ্জাবকেই ভাগ করে গেছিল। ছোট থেকে যেসব বিপ্লবীদের নাম শুনে এসেছি তাঁদের সবাইকেই এখানে খুঁজে পেলাম—বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, উল্লাসকর দত্ত থেকে আমাদের জেলার গর্ব হরেকৃষ্ণ কোঙার। আরও আশ্চর্যের কথা যারা ভারতের স্বাধীনতার পরে এখান থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন তারা সকলেই সিপিআই (অবিভক্ত), আর সিপিআই বলশেভিক পার্টি প্রভৃতি কোনো না কোন কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন, ব্যতিক্রম অবশ্যই একজন ছিলেন তিনি হলেন স্বনামধন্য 'বীর' সাভারকর। যিনি বার-ছয়েক ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে অবশেষে সরকারবাহাদুরকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নিজের মুক্তি ক্রয় করেন। অথচ সেলুলার জেল প্রাঙ্গণের লাইট-এন্ড-সাউন্ড প্রদর্শনী দেখলে মনে হয় এই বিখ্যাত জেলে বোধহয় ওই একজনই বন্দী ছিলেন। যে সেলে সাভারকার ছিলেন একমাত্র সেখানেই তাম্রফলক লাগানো হয়েছে এবং পোর্টব্লেয়ার বিমানবন্দরটিকে 'বীর সাভারকার বিমানবন্দর' নাম দেওয়া হয়েছে।

পরদিন ভোরবেলায় বেরিয়ে আন্দামানের জেটিতে পৌছলাম। সেখানে নৌ-সেনার তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে 'ম্যাকক্রুজ' নামে একটি সুসজ্জিত ছোট জাহাজে উঠলাম। গন্তব্য 'হ্যাভলক' দ্বীপ। ঠিক দেড় ঘন্টায় ৫০ কিমি পথ বঙ্গোপসাগর-এর শান্ত সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পার হয়ে ১০০ কিমি পরিব্যাপ্ত দ্বীপটিতে পৌছলাম। পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ পোর্টব্লেয়ার-এর পরেই। এই দ্বীপটিতে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। হ্যাভলক পৌছবার পর জাহাজ থেকে নেমে আমরা ভ্রমণ-সংস্থার গাড়িতে আমাদের হ্যাভলক-এ আবাসস্থল 'এলডোরাডো'-তে পৌছলাম। ব্রাজিলের চিররহস্যময় স্বপ্নগরীর নামে নামাঙ্কিত এই রিসর্টটিও ফলে-ফুলে ভরা। এখানে মোট ২২টি কটেজ এবং নিজস্ব সি-বিচ রয়েছে। যাইহোক সামান্য কিছু খেয়ে আমরা ছুটলাম ২০ কিমি দূরে 'রাধানগর বিচ'-এ। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা অর্ধবৃত্তকার বিচটি যেন কেরালার বিখ্যাত কোভালম বিচকে মনে পড়িয়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে নেমে পড়া গেল সমুদ্রে। প্রায় ১ ঘন্টা সমুদ্রস্নান করার পর উঠে বালুকাবেলায় আন্দামানের বিখ্যাত কিংকোকোনাট অর্থাৎ বিশাল সাইজের সোনালি ডাবের আস্বাদ নিলাম। এই ডাবে একই সঙ্গে প্রচুর জল এবং প্রচুর সাঁস থাকে। দুটিই অত্যন্ত সুস্বাদু।

এরপর রিসর্টে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিলাম। বিকেলে ওদের নিজস্ব সমুদ্র-সৈকতে বসে সূর্যাস্ত উপভোগ করলাম। পরদিন ভোরে ওখান থেকেই সূর্যোদয় দেখে হ্যাভলক জেটিতে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের সেই ছোট্ট জাহাজ 'ম্যাকক্রুজ' অপেক্ষা করছিল, এবার আমাদের গন্তব্য 'নীল' দ্বীপ। আকারে মাত্র ১৮.৯০ কিমি হলেও এই দ্বীপের সীতাপুর বিচটি অপূর্ব। এখানে আমরা 'গ্লাস বটম বোট' অর্থাৎ নীচে ফাইবার গ্লাস মোটর বোটে চেপে সমুদ্রের বেশ কিছুটা ভিতরে গেলাম। আসা-যাওয়ার সময় নিচ দিয়ে প্রচুর জীবজন্তু, কোরাল এবং বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ দেখতে পেলাম। এরপর নীল দ্বীপেই মধ্যাহ্নভোজন সেরে আবার সেই ছোট্ট জাহাজে চেপে পোর্টব্লেয়ার ফিরে এলাম। সামান্য জলযোগ ও চা-পানের পর আমরা গেলাম পোর্টব্লেয়ার-এর সি-বিচে। সেখানে ওয়াটার স্কী সহ নানান ধরনের সমুদ্রক্রীড়ার আকর্ষণে পর্যটকদের অত্যধিক ভিড়। আমরা সেখান থেকে নিকটবর্তী রামকৃষ্ণ মিশনে গেলাম, সেখানকার শান্ত পরিবেশে আমরা কিছুক্ষণ আরতি দর্শনের পর প্রধান মহারাজ আমাদের আশ্রম এবং দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যালয় দেখালেন। তাঁর কাছ থেকে আন্দামান-নিকোবরের অনেক অজানা কাহিনি জানতে পারলাম।

এর পরদিন ছিল আমাদের সফরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। আন্দামানের বহুশ্রুত 'জারোয়া' উপজাতিদের এলাকায়

যাওয়া। রাত তিনটের সময় আমরা হোটেলের সামনে থেকে বাসে উঠলাম, আমাদের গন্তব্য 'জিরগাথান' যাকে বলা হয় গেটওয়ে অব জারোয়াল্যান্ড। এত ভোরে রওনা হবার কারণ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক যানবাহনকেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়, তারপরেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। জারোয়াদের জন্য সংরক্ষিত এই এলাকাটি পার হতে মোটামুটি দেড় ঘন্টা লাগে। যেমন জোরে হর্ন বাজানো বন্ধ, গাড়ির দরজা-জানালার কাচ বন্ধ রাখতে হবে। ফটো তোলা, এমনকি মোবাইলেও, কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আন্দামান-নিকোবরের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র জারোয়াদের সঙ্গেই তথাকথিত সভ্যসমাজের কিছুটা যোগাযোগ আছে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বীপটি জাপানি অধিকারে আসার পর এখানে জাহাজঘাটা বিমানবন্দর প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার অনুষঙ্গ তৈরি হয়, সেটা আন্দামান ও নিকোবরের মূল আদিবাসী প্রকৃতির সন্তানদের পছন্দ হয়নি। এখানে জারোয়া ছাড়াও ওঙ্গি, সেন্টিনিলস, গ্রেট আন্দামানিজ সহ ছয় রকমের আদিবাসীদের বাস। সকলেই অত্যন্ত হিংস্র এবং তথাকথিত সভ্য মানুষদের এরা বিষ-মাখানো তীর দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। ১৯৬৮ সালে একদল জারোয়াকে জোর করে ধরে পোর্টব্লেয়ার-এ নিয়ে এসে অনেক আদরযত্ন করা হয় এবং অনেক উপহারসামগ্রী সহ আবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। কিন্তু শহরের ছোঁয়া লাগা এই মানুষগুলিকে তাদের পরিজনরা সম্পূর্ণ বয়কট করে। সেই মানুষগুলি অথবা তাদের উত্তরপুরুষেরা আজও জঙ্গলের মধ্যে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে জারোয়াদের সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। কিন্তু বিভিন্ন মহামারী, সুনামি প্রভৃতির পর এরা মুষ্টিমেয় সংখ্যকই বেঁচে আছে বলে অনুমিত হয়। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে এদের জন্য কিছু খড়ের বসস্থান করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কিছু এন.জি.ও অনেক চেষ্টায় এদের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ করতে পেরেছে। কিছু জারোয়া যুবককেও কিছুটা ট্রেনিং দিয়েছে। এরাই বাসগুলি যাবার সময় রাস্তার পাশে পাহারা দেয় যাতে কেউ রাস্তায় চলে এসে তীর না ছোঁড়ে। আমরাও যাতায়াতের সময় এরকম কিছু যুবককে দেখেছি। যদিও প্রতিদিন পর্যটক দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা ছিল না।

যাই হোক, দেড়ঘন্টা পর জারোয়া এলাকা পার হয়ে আমরা সমুদ্রের জেটিতে পৌছলাম। সেখানে সঙ্গের গাড়িগুলিকে রেখে আমরা বার্জে উঠে সমুদ্রের খাঁড়ির অপর প্রান্তে পৌঁছলাম। সেখান থেকে অপেক্ষমান স্পিডবোটে চেপে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা বারটাং লাইমস্টোন কেভ-এর কাছাকাছি পৌঁছলাম। এখান থেকে ভেজা ও দুর্গম ১ কিলোমিটার পথ পার হয়ে গুহায় পৌঁছে যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠা ভাস্কর্য দেখা গেল। এর আগে আরাকুভ্যালি দেখা থাকায় এগুলি আমাকে ততটা আকর্ষণ করেনি। যাইহোক, এরপর জেটিতে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার জারোয়া অধ্যুষিত এলাকা পরে হয়ে পোর্টব্লেয়ার-এ ফিরে এলাম।

আমাদের পরদিন সকালের গন্তব্য ছিল পোর্টব্লেয়ার থেকে স্পিডবোটে চেপে 'রস আইল্যান্ড'। এটিই ছিল আন্দামানের ব্রিটিশ শাসকদের বাসস্থান। তাই স্বাভবিক কারণেই ১৯৪৩ সালের জাপানি আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল এই দ্বীপ। পরবর্তীকালে অনেককিছু মেরামত করা হলেও এখনও ভগ্ন নীচঘর, ক্লাবহাউস, বেকারি, লাইট হাউস তার সাক্ষ্য দেয়। স্পিডবোটে রস আইল্যান্ড পৌছানোর পর অপেক্ষমান ব্যাটারিচালিত যানে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই দ্বীপটি দেখে নেওয়া যায়। পরদিন ভোরে ফিরতে হবে বলে সেদিন একটা ছোটখাটো ক্যাম্পফায়ার অনুষ্ঠান হলো। পরদিন সকাল সাড়ে আটটার ইন্ডিগো বিমানে চেপে সাড়ে দশটা নাগাদ কলকাতা পৌঁছলাম।

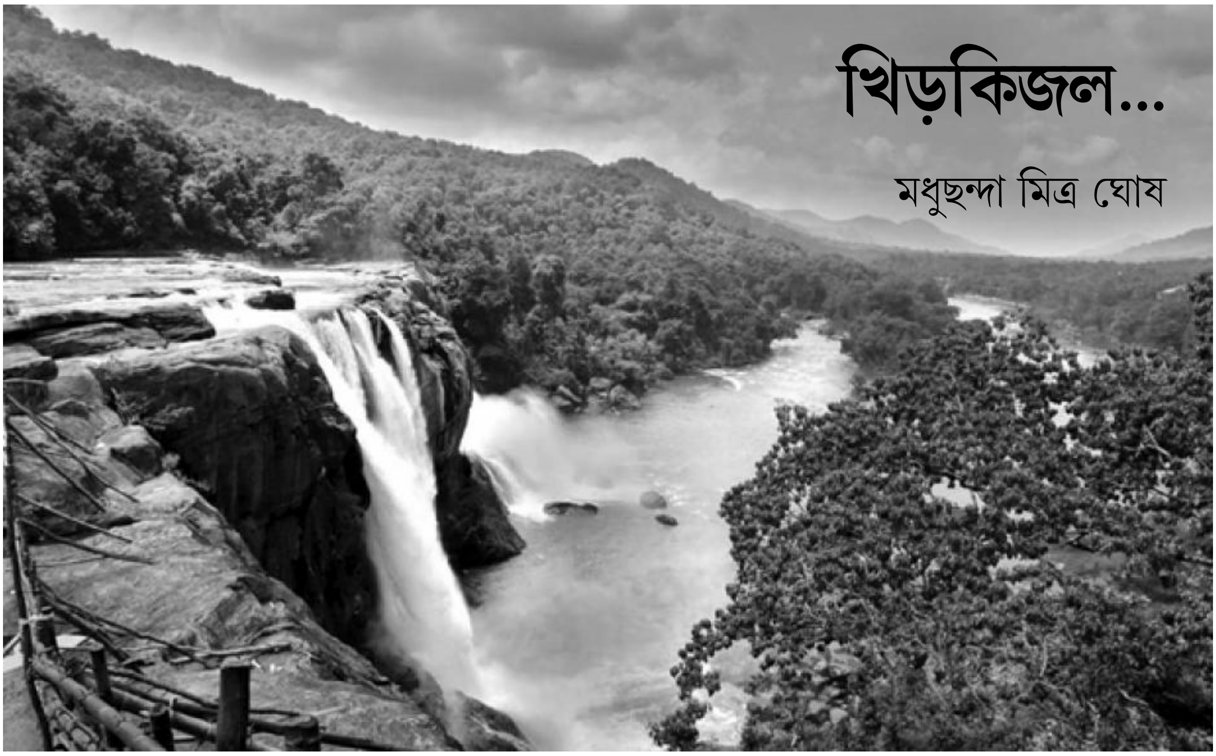

খিড়কিজল...

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

মালাবার উপকূল সফরে যাবো। বহুল শোনা, প্রচুর ছবিতে দেখা কেরালা ব্যাকওয়াটারে ভেসে বেড়ানোর সুপ্ত ইচ্ছেকথা মনে বাসা বেঁধে ছিলই। ভ্রমণের দরজার পাল্লা দুটো হাটখোলা রেখেই কিছু কিছু ইচ্ছের কথা মন যত্ন করে পুষে রাখে। কদাচিৎ সুযোগ এলে, সেগুলো কেমন সত্যিও হয়ে যায়। প্রকৃতির কারিকুরি নিয়ে, বাস্তবের রূঢ় ডাকাবুকো ভাব থেকে অনেকদূরে আমার যাত্রাকে এনে ফেলে মালাবার উপকূলে। ঘরপোড়া হাওয়াদের নিষেধ করা আছে কাছে ঘেঁষতে। পরিচিতজনেরা বলেন, আমার পায়ের তলায় নাকি সর্ষেদানা ছড়ানো। সেই সর্ষেদানা নির্ভর করেই এবারের গন্তব্য ছিল 'ঈশ্বরের আপন দেশ'। যাবতীয় ভালোবাসা জমা করে রাখি, কেরলের নিরুপম দৃশ্যগুলির অপেক্ষায়।

রূপকথায় পাহাড় ও সাগরের সঙ্গে হৃদয় মিশিয়ে আঁকা, কেরল রাজ্য। দাক্ষিণাত্যের কেরলকে বলা হয় 'ঈশ্বরের আপন দেশ'। খাল-খাঁড়ি-হ্রদ-এর জালি-আকার বিস্তৃতি, নারকেলকুঞ্জ শোভিত বেলাভূমির অদ্বিতীয় কোলাজ নিয়েই 'God's Own Country' নামে পরিচিত কেরল রাজ্যটি। আবার নারকেল বনবীথিকায় ছাওয়া কেরলের অন্য প্রতিশব্দ, যেটির মালয়ালাম শব্দ 'কেরা', মানে হল 'নারকেল' আর 'লাম' মানে হল 'দেশ'। অর্থাৎ নারকেলের আধিক্য থাকায় কেরলকে বলা যেতে পারে 'নারকেলের দেশভূম'। উত্তর-দক্ষিণে মালাবার উপকূল জুড়ে লম্বালম্বি বিস্তৃত এই রাজ্য। পুরাণমতে পরশুরাম তাঁর শিষ্য তথা নাম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণদের বসবাসের জন্য এবং মর্ত্যভূমে স্বর্গ-সদৃশ যোগ্য বাসভূমির সন্ধান করতে একদা সহ্যাদ্রি পর্বতশীর্ষ থেকে তাঁর হাতের কুঠারটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সমুদ্র সরে গিয়ে সৃষ্টি হয় মালাবার উপত্যকা। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ইতিহাস এখানে লতায়-পাতায় জড়ানো। আদুর গায়ে নিসর্গ পড়ে থাকে এখানে। কেরালার বেশ কিছু অঞ্চল শুধুই জলনির্ভর। কেরলের অনেকখানি অংশে আরবসাগরের লোনা জল ঢুকে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে খাঁড়ি। কোথাও আবার গড়ে উঠেছে খাঁড়ি-নদী-হ্রদের ত্রিবেণী সঙ্গম। আর এই বিখ্যাত খাঁড়িপথে, ততোধিক বিখ্যাত 'হাউসবোটে' ঘুরে বেড়ানো ও রাত্রিবাস যেন সব পর্যটকের কাছেই এক ভরপুর বিনোদিনী স্বপ্ন।

অবাক অনুসন্ধানকে বাস্তবায়িত করার অছিলায়, আগেভাগেই কলকাতা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে গাড়ি, হোটেল, হাউসবোট যা কিছু বন্দোবস্ত করা ছিল। তারমধ্যে সাধের জলজভ্রমণ ছিল এক্কেবারে প্রথমেই। আগেই বলেছি কেরলের অনেকটা অংশই জলনির্ভর। সাগরবাহিত সেইসব খাঁড়ির ধার ঘেঁষে চারপাশের সবুজ লাস্যে স্থানীয়দের ঘরদুয়ার, গাছগাছালি, জনপদ। এই এলাকাগুলির রোজনামচায় যানবাহন বলতে শুধুই নৌকা। এমনতর নৌকা-জীবনেই তাঁরা অভ্যস্ত। জলপথেই তাঁরা স্কুল-কলেজ-বাজারহাট-অফিস-চিকিৎসালয়-পণ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকেন। এমনকী প্রায় প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে নিজস্ব নৌকা। এই জলনির্ভর জীবিকা সামলান স্থানীয় মানুষজন। কেরল রাজ্যের প্রায় ৯০০ কিলোমিটার খাঁড়িপথ ঘিরে সে এক অন্য জগৎ। প্রতিদিনের একমাত্র যানবাহন বলতে এই নৌকা। হ্যাঁ, শুধুমাত্র নৌকাই। মালয়ালাম ভাষায় এই নৌকাগুলিকে বলা হয় 'কেট্টুভালম্'।

কেরল রাজ্যে সরকারি মদতে এই কেট্টুভালম্-কেই সামান্য অদলবদল করে হাউসবোটের আদল দিয়ে কেরলে পর্যটকদের জন্য সফরের আয়োজন করা হয়। বহু বেসরকারি সংস্থাও ক্রমশ এই হাউসবোট প্রকল্পে সামিল হতে থাকে। কেরল পর্যটন উন্নয়ন নিগম বা সংক্ষেপে KTDC তারপর থেকে বিভিন্ন ধরনের হাউসবোট প্যাকেজ টুরে উদ্যোগী হয়। বর্তমানে কেরল ভ্রমণে এক বা দুই রাত্রি হাউসবোট সফরের জন্য বরাদ্দ রাখেন বেশিরভাগ উৎসাহী পর্যটক। বিভিন্ন মানের ও দামের হাউসবোট রয়েছে। বাইরে থেকে দেখতেও ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো। আর ভেতরটা রীতিমতো চমক লাগানো। ঘরগুলি বিলাসবহুল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। ফুল হাউসবোট মানে সেখানে থাকে দুইখানি দুই শয্যার ঘর, খাবার ঘর তথা বসার

বিলাসবহুল একটি ঘর। লাগোয়া রান্নাঘর। সেখানে পাচক মালয়ালাম রান্না অথবা সফরকারীর নিজস্ব ফরমায়েস মতো রান্না করে দেবেন। এছাড়াও কিছুটা সাধারণ মানের হাউসবোটও রয়েছে। দামেও সেইগুলি কিছুটা হলেও সস্তা। প্রতিটিতেই রয়েছে বিস্তারিত কাঁচের জানলা ও শৌখিন পর্দা টাঙানো শয়নকক্ষ এবং লাগোয়া স্নানাগার। বিশাল এই হাউসবোটগুলি সারা দিনমান নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় ঘোরাফেরা করে রাতে স্থলের ধার ঘেঁষে নোঙর করে থিতু হয়। আমাদের আজকের গন্তব্য কেরলের কুইলন।

কত সফর যে লেগে থাকে ভ্রমণ মজলিসের পাতায় পাতায়। এই এখন যেমন চোখের নাগালে একঢাল লাবণ্য নিয়ে অপার জলরাশি। তাবৎ এই জলরঙকে কেমন নিবিড় মনে হয়। রূপকথার মতো। আমার সাবেকি বিস্ময়গুলো জোট বাঁধে। কেরালার বিখ্যাত 'বোট ক্রুজ' বা 'হাউসবোট সফরের' আরও একটি সুরম্য জলপথ হল কুইলন বা কোল্লাম থেকে আলপুজ্জাহ্ বা আলেপ্পি পর্যন্ত খাঁড়ি পথ পরিক্রমা। অসামান্য জলকথায়, কুইলন থেকে আট ঘন্টার জলপথে এই সফর, ভ্রমণ মানসিকতায় এক সেরা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। পরিব্রাজকের ঝুলি তো এমনি করেই টইটুম্বুর হয়ে ওঠে। অদ্ভুত সুন্দর যাত্রাপথ। উন্মাদনায় দিশেহারা করছে এই পথের সারল্য। ভারি মনোরম সে সফরপথে, নীল-সবুজ নিসর্গ ও নিপাট নির্জনতা। জমাটবাঁধা অনেকখানি সবুজ। দুই পাশে নিবিড় বনানী, আঁচলে তার সবুজ মায়ারঙের কারুকাজ। নিভৃত জলরাশির পাড়ে গ্রামীণ পথ, জেলে-বস্তি, ঘরদুয়ার, বসতি। জলই যাদের জীবন-ভঙ্গিমার অনেক কিছুই। একফালি গ্রামগুলির চোখের পাতায় যেন এখনও লেগে রয়েছে ঘুমের আদর। তাদের স্যাঁতস্যাঁতে শরীরে আলো-ছায়া, বাঁক, জল, জলগন্ধ।

অতীতের কুইলন এখন 'কোল্লাম' নামে পরিচিত। সংস্কৃত শব্দ 'কোল্লাম' মানে 'মরিচ'। যদিও আগে অঞ্চলটির 'কুইলন' নাম ছিল। বর্তমানে নাম হয়েছে 'কোল্লাম'। তবে এখনও কুইলন বলেই চেনেন অনেকে। কেরলের মালাবার উপকূলে কোল্লাম বা কুইলন একটি অতীতদিনের বাণিজ্যশহর। এমনকি এখনও এটি কেরলের অতি ব্যস্ত বাণিজ্যিক শহর। সুদূর অতীতে জলপথেই কুইলন থেকে আলেপ্পি ও কোচিনে পণ্যবাহী জলযান চলাচল করতো। ৭.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ কোল্লাম খাঁড়ি পারাভুর হ্রদ এবং অষ্টমুড়ি হ্রদকেও জলের ভালোবাসায় জুড়েছে। কাল্লাদা নদী বাঁধা পড়েছে অষ্টমুড়ি হ্রদে। ইথিক্কারা নদী মিশেছে পারাভুর কয়াল হ্রদে। স্ফটিক স্বচ্ছ জলপথ, সবুজের সমারোহ। অসম্ভব সুন্দর কোল্লাম কেরলের অন্যান্য দ্রষ্টব্য পর্যটনপ্রিয় স্থলগুলি থেকে কোনও অংশে কম নয়। আদিগন্ত জলগাথার কাছে অবসর বিনোদনের, নৌবিহারের উসকানিকে সামলানোই দায়।

আটটি খাঁড়িপথ মিলে সৃষ্টি হয়েছে 'অষ্টমুড়ি' হ্রদ। এই অষ্টমুড়ি লেক হল 'গেটওয়ে অফ কেরল ব্যাকওয়াটার'। এই হ্রদ ৭১ কিলোমিটার প্রসারিত তিরুবন্তপুরমের দিকে। হ্রদের ধারেই কেরল সরকারি পর্যটনাবাস। হাউসবোটে যেতে যেতেই দেখতে পাওয়া যায় কোথাও ধানজমি, কোথাও আবার এক টুকরো জলাজমি। সেখানে ভিড় করে আছে নানান সামুদ্রিক পাখ্-পাখালি। উৎসাহী পর্যটকের কাছে বেশ লোভনীয় দ্রষ্টব্য। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। এন্তার সাটার টেপার আওয়াজ তখন পর্যটকমহলে। অনেক পর্যটক ডিঙি নৌকায়ও ভেসে চলেছে। চলেছে সাজানো গোছানো মোটরবোট। সার দিয়ে বেতের চেয়ার পাতা মোটরবোটগুলিতে। জলের মধ্যে ঝোপঝাড়, কিছু নারকেল গাছ নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপের মত স্থলভূমি। কোথাও কোথাও জলরেখার ধার ঘেঁষে গাছপালা ঘরবাড়ি। মন্দির মসজিদ গির্জাও রয়েছে। কখনও একাকী পথ চলে গেছে গ্রামের ভেতর পানে। কোনও গ্রামের সামনে টিনের পাতে 'কথাকলি শিক্ষা কেন্দ্র' বিজ্ঞাপন লেখা। কোচির বিখ্যাত 'চায়না নেট'-এর মাধ্যমে মাছ ধরার তোড়জোড়ও নজর এড়াবে না। ব্যাকওয়াটারের জলে রুপোলি শস্যই যাদের রুজিরুটি।

কেরল রাজ্য জলযান পরিবহন বিভাগ (KSWTC) এবং নানান বেসরকারি সংস্থাও ফেরি টার্মিনাল থেকে ডবল-ডেকার লাক্সারি বোটে আলপুঝাহ বা আলেপ্পি ছাড়াও অন্যান্য দ্বীপ ঘুরিয়ে আনে পর্যটন মরসুমে। অষ্টমুড়ি হ্রদ ও কাল্লদা নদীর সঙ্গমে রয়েছে মুনরো নামের এক দ্বীপ। ব্রিটিশ শাসক কর্নেল জন মুনরোর সম্মানে স্থানটির নামকরণ হয়েছে। তিনি কয়েকটি খাল খনন করে বেশ কয়েকটি ব্যাকওয়াটার অঞ্চল একীভূত করেছিলেন। বোট-সাফারিতে বেরিয়ে আসা যায় এখানে। এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ হল, 'ওনম্' মরসুমে নৌকা-বাইচ। প্রতি বছর ওনামের সময় সুদীর্ঘ নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এর জৌলুস চোখে দেখা ও খাতায় টুকে

রাখার মতো। মহাকাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক এবং নানাবিধ কিংবদন্তিও আছে এই নৌকাযাত্রা নিয়ে। কেরলের প্রাচীন নৌবাইচগুলির মধ্যে অন্যতম, আদ্যন্ত ধর্মীয় এই অনুষ্ঠান। কথিত আছে মধ্যম পাণ্ডবের জন্মতিথিতে প্রতি বছর এই নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কাট্টাকয়াল নামের স্বচ্ছ হ্রদটির জল বয়ে গেছে ভাট্টাকয়াল জলায়। এইসব হরেক জলজ দৃশ্য ভুলিয়ে রাখে কদিনের জন্য ঘুরতে আসা ভ্রমণবিলাসী মনকে।

বশ্যতা না মানা সোঁদা গন্ধে মাতোয়ারা তাবৎ জলাভূম। কখনও শহরতলির কাছে আঁশটে গন্ধমাখা কোনও খালের ধারে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের হাউসবোট 'ইন্দ্রপ্রস্থম্'। স্নানাগার ও রান্নাঘরে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ, বাসনপত্র ধোয়াধুয়ি, বাড়তি জল ছেঁচে পরিষ্কার করা ইত্যাদি নিত্য আবশ্যিক কাজকর্ম সারা হতে থাকে তখন। রেলিং দেওয়া স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় খাবারঘর। সেখানে থরে থরে রাখা পেল্লাই ক্যাসারলে সাজানো থাকে রুটি, ভাত, স্যালাড, দু'রকম তরকারি, মাছভাজা, ডাল, দই ইত্যাদি। রাতে মুরগি আর মালয়ালাম পদ্ধতিতে রান্না করা পোলাও বা বিরিয়ানি। সঙ্গে মিষ্টি। আর থাকে নানান ফল। আমরা দগ্ধ দিনে আকাশের কাছে জল চাই। এখানে অঢেল জল। ভেজা বাতাস, দূরে বিন্দু বিন্দু আলো, বিন্দু বিন্দু ছায়া। নাব্য এই কথামালায় জল ও জীবনের কী আশ্চর্য আনাগোনা।

গতে বাঁধা সফরসূচি থেকে জরা হট্-কে এই হাউসবোট যাত্রা বয়ে আনে এক অন্য আনন্দ, সন্দেহ নেই। হাউসবোটের 'ভিজিটার লগ বুকে' লিখে দিয়ে আসি ভালোলাগা মনের কয়েক ছত্র। অভিজ্ঞতার রসদ জমা হতে থাকে মনের কুঠুরিতে। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া অন্য হাউসবোটের যাত্রীরা যখন অজানা বন্ধুত্ব আহ্বানে হাত নাড়েন, তখন বিনিময়ে আমাদেরও হাত নেড়ে জবাব দেওয়া—কী যে মজার ছেলেমানুষি। প্রাপ্তির ঝুলি মায়ায় ভরে ওঠে কানায় কানায়। জলবিহারের রমনীয় সৌন্দর্য, মুগ্ধতার অধিকারটুকু অচিরেই কেড়ে নেবে। বেশ টের পাই এই সফরনামায় ঋণী হয়ে পড়েছি মালাবার উপকূলের রূপসী জলবিভাজিকাগুলির কাছে।

আগেই বলেছি, ব্যাকওয়াটারের দুই ধারে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিনলিপি ঠারেঠোরে পরখ করতে জলবিহার যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় ভাস্বর হয়ে থাকে। বাড়িঘর থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কাছারি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ সম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবনের 'লাইফলাইন' তথা জীবনরেখা এই ব্যাকওয়াটার। 'ঈশ্বরের নিজের দেশ' বলেই হয়তো ঈশ্বর এই শহরকে এত সুন্দর করে নিজের হাতে রঙতুলির টান দিয়েছেন। মাঝে প্রশিক্ষণরত একটি 'স্নেক্-বোট' দেখতে পেলাম। এখানে পম্পা নদীতে স্নেক্-বোট রেস, কেরলের একটি অতি বিখ্যাত ও দর্শনীয় প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় শনিবার পম্পা নদী ও পুন্যামুঢ়া হ্রদে 'চুন্দন ভাল্লম্' অর্থাৎ স্নেক্-বোটরেস মাতিয়ে তোলে। উপচে পড়ে ভিড় নদীর পাড় বরাবর। সুবিশাল শতাধিক চুন্দন ভাল্লম্-নৌকা বা স্নেকবোট। কমবেশি ১০০ ফুট লম্বা, কালো রঙ করা, কাঠের নৌকাগুলির একপাশটা আবার বেশ খানিকটা উঁচু। তাতে নানা রঙের ফুলের গোড়ের মালা টাঙানো। প্রত্যেকটির ওপর প্রায় আধ শতাধিক মানুষ। সবার পরনেই সোনালি-পাড় সাদা কেরল ধুতি, মাথায় পাগড়ি বা ফেট্টি বাঁধা। ভেঁপু, কাড়া-নাকাড়া, কাঁসর-ঘন্টাসহ বাজনদার। প্রতিটি চুন্দনভাল্লমে সিংহাসনে আসীন, ফুলমালায় সজ্জিত দেবমূর্তি। কারুকার্যমণ্ডিত রঙিন ছাতা হাতে ছত্রধর। এক একটি গ্রামের তরফে একেকটি নৌকা ও প্রতিযোগীরা আসেন। ঘোষিত ১ লক্ষ টাকা মূল্যের 'নেহেরু ট্রফি' প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। কণ্ঠে তাঁদের থাকে চমৎকার ছন্দে গাওয়া 'ভাঞ্চিপাট্টু' লোকগান।

জলের মজলিসে কোথা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়ের অনেকখানি। সূর্য তার সোনা রঙের ঝিলিক্ দিচ্ছিল জলে। তারপর কখন টুপ্ করে ঝরে গেল নরম রোদ। এই সুরম্য ভ্রমণ একবার শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকতেই ভুলে গেছিলাম আমার আগের অন্যান্য সব জলভ্রমণগুলির কথা। আগেও তো ভারতের বিভিন্ন স্থানে নদী, সাগর, হ্রদ, খাঁড়িতে কতো জলবিহার করেছি। আজ কেরলের হাউসবোটের ব্যালকনিতে বসে, দু-পাশের অলীক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে বেজায় নিঃস্ব হতে থাকি। নিজেকে ছুঁয়ে দেখি, আমার নিপাট নিজস্ব ভুবন কেমন ছোট হয়ে গেছে ওই বিশাল জল-বৈভবের কাছটিতে।

ছবি : জয়ন্ত দাস

ফেরা

অনন্য ভট্টাচার্য

অবশযে ফিরতেই হয়
বসন্ত সন্ধ্যার অলীক জ্যোৎস্নায়
চন্দ্রাহত কৃষ্ণগোলাপ
তখনো হলুদ ফুটে আছে
ভাঙা দরজার কোণে

এই স্বাগত দৃশ্যে
পুলকিত স্বেদবিন্দু
কিভাবে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে
চিবুক বেয়ে

আর তখনই
মোহিনী আড়াল সরিয়ে
বেজে ওঠে তোমার কৌতুক হাসি

অযুত নক্ষত্ররা
তারাবাতি হয়ে ঝরতেই থাকে
রাতভোর

এভাবে কি কবিতা আছে?

মৌসুমী মুখার্জী (ভট্টাচার্য)

এভাবে কি কবিতা আসে
হতোদ্যম সময়ের পাশে?
নিষ্ফলা রাতের বাগানে
মৃত স্বর শুনি কানে কানে।
এতো ভয়, এতো অন্ধকার!
বাকি কত রইলো যে আর
প্রতিদিন হিসেবের পর
তোলপাড় প্রশ্নের ঝড়
ভেঙে ফেলে এ ডাল ও ডাল;
স্বপ্ন যে দেখি না কত কাল!

সে ছিল খেলনা বাড়ি ঘর,..
দূরবর্তী কোনও প্রান্তর।
ছিল প্রাণ, ছিল কোলাহল;
ভালোবাসা ছিল সম্বল।
ছিল যত সহজিয়া গান,
গলায় তুলেছি আপ্রাণ।
সবই আজ বিস্মৃত প্রায়
ক্রমশ অতীত হয়ে যায়।
এ জীবন ধুলো-মাটিময়;
তবু কেন এতো সংশয়?

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে নামি
সময় হোক আলোর পথগামী।

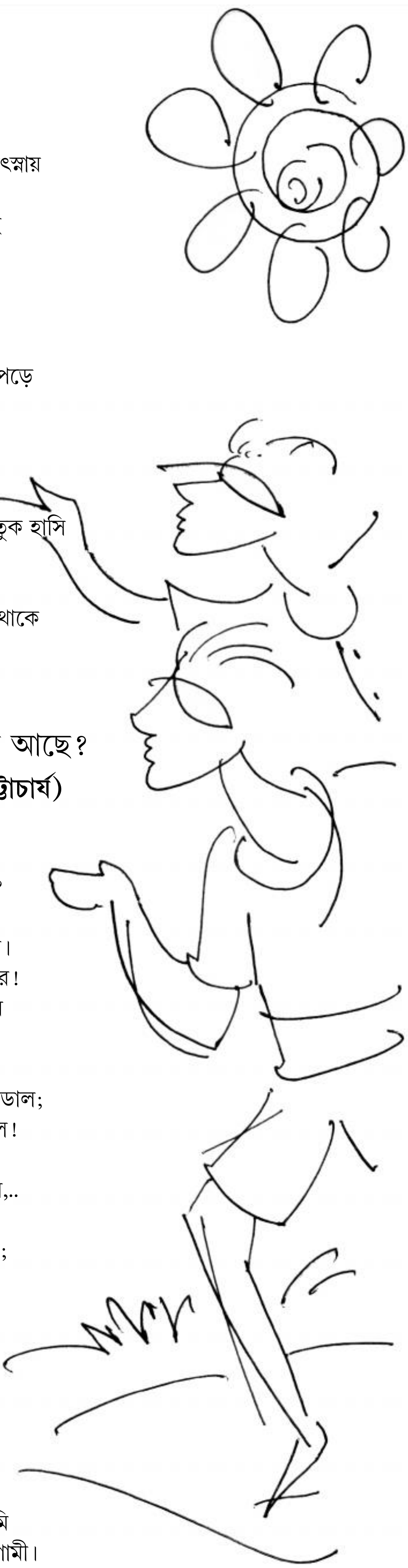

কানাকড়ি

কুমুদবন্ধু নাথ

নিদ্রায় আছে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষ
আবহমান কাল বিশ্বাসেই ভর করে

কে কাকে পায় নিজের বন্ধনে
টেনেটুনে ছিঁড়ে হিঁচড়ে শেয়াল কুকুর

একচক্ষু তাকায় চারিদিক
দেখতে পায় দিন ফুরানো বিকেল

এভাবে সন্ধ্যা পার হয় পাহাড়ের ওপারে
গুটিগুটি আলো নেভে আর জ্বলে

হীরের কুসুমে মোড়া রাত্রি কোঁচর ভরে
তুলে নেয় জীবনের কাঁকর-কানাকড়ি

দিন নেই রাত নেই এগিয়ে যায় ক্রমাগত
আবহমানের নিদ্রিত মানুষ বিশ্বাসের দিকে

ডাক

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

ঠোঁটের আগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসার পর
তোমার কোমরে বেঁধে নাও বসিরহাটের গামছা
তরুণ-তরুণী সব এসো আমরা সবাই মিলে
খুঁড়ে ফেলি টলটলে একটি পুকুর
নদীর প্রবাহ ধরে পলি তুলি
আবার ফিরিয়ে আনি ইছামতীর স্রোত
এসো আমরা গল্পের রুটিন বদলে ফেলি
সুপার মার্কেট থেকে নয়, জৈবচাষের ফসল কিনি
মেমারির দুঃখীরামের থেকে
ওর ছেলে দক্ষিণের পথে বেরিয়েছিল কাজের সন্ধানে
আর বাড়ি ফেরেনি!

এক রাতের গল্প

মধুরা মিত্র

একটা নির্ঘুম রাত নদীর এপারে
ওপারেও নীদ্রাহীন অনভ্যস্ত কঠিন সময়
কার চোখে সুখ নামবে আগে? আর
কে ভাসাবে অনন্ত শয্যা নদীবুকে?
ধরা যাক দুজনেই বিনিদ্র কাটাতে চেয়ে
কাটালো এক পক্ষ কাল! তারপর?
নটে গাছ মুড়োলেই খেলা শেষ
অজান্তেই ঢুকে যাবে রোজনামচায়!
বাস্তব গুলে খেতে খেতে
শ্লথ হবে গতি
নদীও ভাঙনে মাতবে,
অজানা গতিপথে পড়ে থাকবে
দুজনার নির্ঘুম রাত।

কাকতাড়ুয়ার দেশে

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

আয়ু এক আজীবন মায়া।
আয়ু এক আজীবন মায়া।
নিশ্চিত আশ্রয় ভেবে,
পরিযায়ী দুনিয়ার পথে পথে হেঁটে
অরণ্য, নদীপথ শেষে,
কতিপয় পথ বাঁক নিয়েছিল
ডানাহীন এক কাকতাড়ুয়ার দেশে।
কথা ছিল, রাজ্যে ফিরে যাবে তারা
নিজ নিজ ঘরে।
কেউ ঠিক জানতো না
পথে পথে খিদে মেলে দিয়ে
এইভাবে ঢুকে যাবে তারা না-ফেরার দেশে!

অলীক কুহক

কালিদাস ভদ্র

খোলা জানালার দিকে
জয় শ্রীরাম ধ্বনি চেয়ে আছে।

লকডাউনে শুনশান রাস্তা
কপালে গেরুয়া ফেট্টি
ক'জন শ্লোগানে শ্লোগানে
ছুটে যাচ্ছে অযোধ্যা।

করোনা আতঙ্কে সারা বিশ্ব দিশেহারা
রাম জন্মভূমি কি তবে কোভিড-এর শুশ্রূষা জানে

কাজ খোয়া পরিযায়ী শ্রমিকের
পেটে বড় জ্বালা,
শ্রীরাম সরাও তোমার অলীক কুহক
কাজ দাও হাতে, ভাত দাও পাতে...

ক্রমিক

গৌরী সেনগুপ্ত

শস্য যেমন নিংড়ানো শ্রমের কথা বলে
কবিতা তেমনই বলে সংগ্রাম
পাক খাওয়া সময়ের পরিক্রমায়
বিনিদ্র রাত জাগতে জাগতে
হাজার হাজার কণ্ঠ জোরালো গাইতে থাকে
মায়ের পেটে থাকা অভিমন্যুর মতো
ঘুমিয়ে থাকা কবিতা জন্ম নেয় ভিয়েতনাম
রাত ভেঙে নামে ভোর
মেঘ ভেঙে ওঠে জীবন
ক্ষত ধুয়ে শুরু হয় আলিঙ্গন।

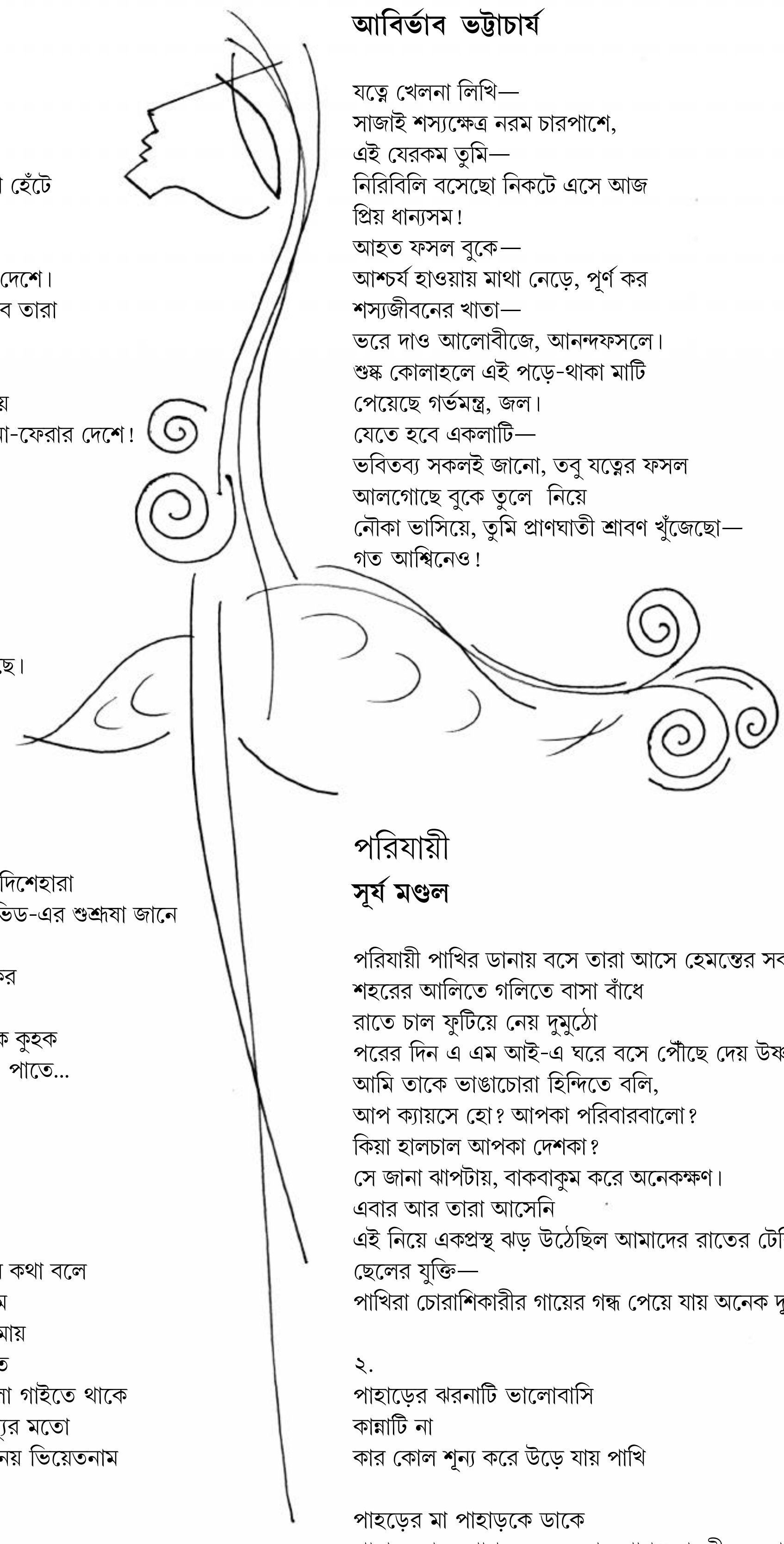

ধান্য বালিকাটিকে

আবির্ভাব ভট্টাচার্য

যত্নে খেলনা লিখি—
সাজাই শস্যক্ষেত্র নরম চারপাশে,
এই যেরকম তুমি—
নিরিবিলি বসেছো নিকটে এসে আজ
প্রিয় ধান্যসম!
আহত ফসল বুকে—
আশ্চর্য হাওয়ায় মাথা নেড়ে, পূর্ণ কর
শস্যজীবনের খাতা—
ভরে দাও আলোবীজে, আনন্দফসলে।
শুষ্ক কোলাহলে এই পড়ে-থাকা মাটি
পেয়েছে গর্ভমন্ত্র, জল।
যেতে হবে একলাটি—
ভবিতব্য সকলই জানো, তবু যত্নের ফসল
আলগোছে বুকে তুলে নিয়ে
নৌকা ভাসিয়ে, তুমি প্রাণঘাতী শ্রাবণ খুঁজেছো—
গত আশ্বিনেও!

পরিযায়ী

সূর্য মণ্ডল

পরিযায়ী পাখির ডানায় বসে তারা আসে হেমন্তের সকালে
শহরের আলিতে গলিতে বাসা বাঁধে
রাতে চাল ফুটিয়ে নেয় দুমুঠো
পরের দিন এ এম আই-এ ঘরে বসে পৌঁছে দেয় উষ্ণতা।
আমি তাকে ভাঙাচোরা হিন্দিতে বলি,
আপ ক্যায়সে হো? আপকা পরিবারবালো?
কিয়া হালচাল আপকা দেশকা?
সে জানা ঝাপটায়, বাকবাকুম করে অনেকক্ষণ।
এবার আর তারা আসেনি
এই নিয়ে একপ্রস্থ ঝড় উঠেছিল আমাদের রাতের টেবিলে
ছেলের যুক্তি—
পাখিরা চোরাশিকারীর গায়ের গন্ধ পেয়ে যায় অনেক দূর থেকে।

২.
পাহাড়ের ঝরনাটি ভালোবাসি
কান্নাটি না
কার কোল শূন্য করে উড়ে যায় পাখি

পাহড়ের মা পাহাড়কে ডাকে
পাহাড় গেছে পাথর ছুড়তে তার পাথর বান্ধবীদের সাথে।

অস্ত্র বনাম খিদে

সৌরভ দত্ত

তোমার ধর্মঘটে ভয়—
তুমি লকডাউনের পক্ষে!
সেটা আধপেটাদের সয়,
যার কেড়ে খাওয়াতেই রক্ষে?

তোমার ভাইরাসদের নাম—
কোভিড, ফ্লু বা সার্স।
যাদের রাস্তা শুধু বাম,
ভাবে—সত্যিই এসব ফার্স!

একটা ভাইরাস, নাম 'খিদে'—
কোন্ মাস্ক পরনে হয় জব্দ?
যারা লড়াই বোঝে সিধে—
তুমি করবেই নিস্তব্ধ?

তুমি পারবে হে, নিউ নর্মাল—
তাদের সেই বাঁধনে বাঁধতে,
যারা 'নতুন' মানে তো ফর্মাল
কোনো আর্ট জানে না কাঁদতে?

ওরা চিৎকার ক'রে কাঁদবে
ওরা শেকল ছেঁড়ে যে অনুক্ষণ
তুমি আইন-রশিতে বাঁধবে,
ওরা প্রতিবাদী হবে প্রাণপণ!

ওদের কিচ্ছুটি নেই হারাবার—
শুধু আছে ভরপেট খিদে!
ওরা অগণিত, যেন পারাবার
ভরা রক্ত-অশ্রু জিদের!

খালিপেটই যার শক্তি—
তারা অগণিত, তাই হবে জয়!
তুমি অনেক পেয়েছো ভক্তি
'নব নর্মাল', তব হবে ক্ষয়!

তুমি বিদ্রোহ রোখো বন্দুকে
আর লকডাউনের ফাঁসে!
ওরা বুক পেতে দেয় বন্ধুকে,
হাসি সর্বনাশের হাসে!!!

ওরা ক্ষুধার্ত, তাই জিতবে
তুমি পারলে ওদের রুখে দাও!
তোমার রক্তের স্বাদ মিটবে
তবে, পরাজয় হবে—জেনে নাও!

বড়ো কথা

কঙ্কন সরকার

দেখো কোন মানুষটা বড়ো
সেটা বড়ো কথা নয়
কোন মানুষটা দেখতে অতীব সুন্দর
সেটাও বড়ো কথা নয়
কোন মানুষটা পরাজিত
আর কে দ্রুত ছিনিয়ে আনছে জয়
কে খুব ভালো বাসতে পারে
আর কে কতো সক্রিয়, চঞ্চল
কে অল্পস্বল্প দিতে পারে, দেয়
আর কে দেয় সর্বাধিক দক্ষিণা
সেটা বড়ো কথা নায়
বড়ো কথা হলো সে মানুষ কিনা!

এসো মানুষ হওয়ার দিকে আর একটু এগিয়ে যাই
এসো বিচ্ছিন্ন ভাঙাচোরা মানুষের হাত ধরি, বলি ঃ ভাই
তুমি আমার ভাই, আমার একান্ত স্বজন
ভাষাভেদে জাতিভেদে ধনীদরিদ্র ভেদে কেউ যেন বিচ্ছিন্ন না হয় এখন
বিভেদের দুষ্টচক্র ভয়ানক সক্রিয় আমাদের চারিদিকে
বন্ধুর মতোই চেহারা তাদের, অভিজ্ঞতায় বুঝে নাও,
নাও লিখে দ্রুত, দ্রুত ঐক্য গড়ে তোলো সহনশীল মানবিক বোধে
এই দুরন্ত-অবাধ্য-বর্বর হিংস্র বিদ্বেষীদের চক্রান্ত প্রতিরোধে!

খিদে নামক রূপকথার জগতে

অভিজিৎ ঘোষ

গরম ভাতের থালা—উড়ছে ধোঁয়া
ধোঁয়ায় ভেসে নীল দিগন্ত পেরিয়ে যাই আমি

উড়তে থাকি
পৌঁছে যাই তারাদের দেশে

টগরের মতো সাদা ড্রেসে
পরীরা ইশারা করে, মায়াবী হাসিতে
অবশ করে মন, সব ঠেলে এগিয়ে যাই
পথে পড়ে দ্রাক্ষাবন, আপেল বাগান
কত মনভুলানো আইটেম...
আমার লড়াই জারি থাকে, এগিয়ে যাই
আমি এগিয়ে যাই, এগিয়ে যাই...

তারপর একসময় ভাত ঠাণ্ডা হয়,
ধোঁয়া ওঠা থেমে যায়
গোগ্রাসে শেষ করে
আবার বেরিয়ে পড়ি
একথালা ভাতের খোঁজে...

শাল সেগুনের শপথ

সুকমল ঘোষ

স্বপ্নগুলো নেহাৎ
ভুলো
শিলান্যাসের হুলোর
তাড়ায়
মেঘের পিঠে বাঁধা পড়েছে মিথ্যে
কুলো
কুলো ঝাড়ছে নবান্নের নোংরা
ধুলো
ধুলোয়
ঢাকা শিল্প-চুলো
বাজারঘাট
ঘাটের কূলে
খোঁট বেঁধেছে
বন্ধ কারখানা
খানাখন্দে
বইছে সুখে ধর্ষিতার
পলাশ নদী
নদীর কূলে
চরায় ভরা
বেওয়ারিশ
লাশ
লাশের গন্ধে
ছড়িয়ে আছে উন্নয়নের শ্বাস
শ্বাস-প্রশ্বাস
চলছে
তবু
বাহির এবং
অন্তরে
শাল-সেগুনের
শপথ নিয়ে
অন্য হাওয়া
বইছে এবার
গ্রাম থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে
ঝড়
বৃষ্টির
রাত পেরিয়ে
ফুটফুটে এক মিষ্টি সকাল
হাসছে
বসে রোদ্দুরে।

আত্মত্যাগের ঠিকানা

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

দশ গুনতে গুনতে চোখ বুড়ে চলে যাই আত্মত্যাগের ঠিকানায়।
যেখানে রাজনীতির প্যাঁচে হাত-পা বাঁধ অনাহারে ঘুমায় অর্ধেক দেশ
স্বনির্ভর স্বয়ম্বরসভায় এয়োতি কৌটো বাজায়।
জায়মান খিদেয় শিশু টেনে ধরে পথে হাঁটা মায়ের আঁচল।
কণ্ঠনালী ছোঁড়া ভাষণে মিথ্যার ইন্দ্রজালে বাঁচে গণতন্ত্র।
মৃত্যুর প্রতিটি লাভে সত্যের অপঘাত তবুও পুনর্জন্ম ঘটায় আমার অস্তিত্ব।
সাক্ষী থাকে ক্ষমতার প্রয়াসে দারিদ্রসীমা।
চিকন চিত্র ফোটায় অন্ধকারে মোহন স্ফুরণ।
কিশোরীর শরীরে ধরা দেয় উঠতি যৌবন।
কৃষকের স্যাঁৎ স্যাঁৎ চোখে সোনালি ফসলের মাঠ।
জানতে চাও এমন লক্ষ্মীমন্ত কোথায় বেঁধেছে বাসা?
এমন স্থাপত্য রহস্য লুকিয়ে আছে কোথায়?
যুগসন্ধানীরা হিসাব করে না
পরকিয়া প্রেমের চোরাস্রোত।
বাঁকাচোখে মেপো না হৃদয় উতোলা ঢেউ
সার্বভৌম ক্ষমতাই পৌঁছে দিয়েছে আমাকে আত্মত্যাগের ঠিকানায়।

অবরুদ্ধ দিন

রবীন বসু

রাত্রির আকাশ থেকে নেমে এলো ক্ষোভ;

এলিয়নরা যে পথ দিয়ে চলে
আলোহীন নীল সহস্র শতাব্দীব্যাপী
মহাবিশ্বের অক্ষ বরাবর
সেই পথ আজ অবরুদ্ধ। শব্দহীন
নৈঃশব্দের মায়াজাদু স্পর্শ রাখে
আগ্রহলালিত এই ঐকান্তিক টান;
তারও গভরে অজানা বিস্ময় দেখি
অপ্রত্যাশিত অনাগ্রহ চলাচল ঘিরে
মানব সভ্যতা আজ ভেংচি কেটে সহমরণে যায়।

তোমাকে

উদয়ন ভট্টাচার্য

কতখানি আমি জানতে চাই
আর কতটা তুমি জানাতে চেয়েছিলে
সেই বিরোধাভাসের মধ্যেই তর্কের অবসান হলো
তুমি প্রকৃতির দিকে চলে গেলে
আমি জীবনের দিকে
নদী ও নারী।
কোনো অনুশাসন ছিলো না, সংঘাত ছিলো না।
তাই তরঙ্গায়িত উৎসবের মধ্যেও
আজন্ম দেখাই হলো না
বিপরীতমুখী এই স্রোতের নামই বিরহ।

মধ্যাহ্নের পাখি

তপন দাস

দমকা ঝড়ের রত্রাতে শিকড় নড়ে গেলে
দীর্ঘ প্রতীপময় গাছও পাতাল ছিঁড়ে ফ্যালে
প্রসিদ্ধ সাকাশের, কেউ মাটি খোঁজে অন্ধের মতো
নিমেষে উড়ে যায় ভীত মধ্যাহ্নের পাখি

এখনই অবাবি জানায় শিরা-ফুলিয়ে নামে
কত বৃক্ষচ্যুত দিশাহীন জোনাকি। কালান্তরে
রোদ্দুর ভিজিয়ে সুখচর দিতে গেলে
ডালে পাতায় নীল ছড়িয়ে ফ্যালে বন্য পশুর দল
অথচ তাদেরই গলায় ঝুলতে দেখা যায়
বিষাদের আরোগ্য শিকল। সেই প্রতিধ্বনী শুনে
অন্য সব গাছের হারানো মনোবল এ-সময়
যদি বনভূমির হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে
তবেই ধ্রুবস্রোত পথ পায় জ্যোতিরেখা ধরে
পড়তন্ত প্রতাপময় গাছও পাতাল ছিঁড়ে ফালে
প্রসিদ্ধ সাকাশের।

মৃত সত্তায়

রীতা বসু

হাসপাতাল থেকে লোকটা বেমালুম হাওয়া।
মর্গে নেই, শ্মশানে চলে গেছে
না, মানুষের শরীর বেচা-কেনা হাটে
চলে গেছে কিডনি, চোখ, না নরকঙ্কাল।

রোগটা ভাইরাস, কোবিদ—নাইনটিন।
হাঁকডাকের মার্কেটে লাখ টাকায়
চিকিৎসা হয় বটে, সোনালি মোড়কে....।
নদীপাড়ে পড়ে থাকা নগ্ন লাশটার
ছিলো কি করোনা ভাইরাস।

রাত বাড়ে, আলোচনা চলতেই থাকে
অবশেষে কুকুর-শেয়ালের আস্ফালনে
শেকড় মাটির ভিতরে মিশে যায়
নিছকই কোন এক আগাছার মৃত সত্তায়।

খিদে

মলয়কান্তি মণ্ডল

পেটের মধ্যে দমকে উঠছে দাউদাউ খিদে
শূন্য থালা...
শাবকের জন্য শূন্য ঠোঁট—নিস্তব্ধ নিশ্চল।

বারান্দা থেকে সরে যাচ্ছে রোদ

নায়কের ডায়লগে ছড়িয়ে পড়ছে
গরম ভাতের গন্ধ

উৎসব

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

পথে পথে স্বপ্নের অজস্র ঢেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায় শত শত প্রাণ
প্রাণে প্রাণে সূর্য, ডেকে যায় কেউ
মুখে তার মিলনের উজ্জ্বল গান

গানে গানে সম্প্রীতি, হাতে হাতে হাত
ব্যবধান মুছে গিয়ে হৃদয়ে জোয়ার
ভাঙে ভুল, ফোটে ফুল, নতুন প্রভাত
খুলে যায়, খুলে যায়, বন্ধ দুয়ার
খোলে দ্বার, এ জোয়ার, চেতনায় লীন
সূর্যের সোনারোদে সে এসে দাঁড়ায়
বিশ্বাসে, নিঃশ্বাসে, সোনাঝরা দিন
ভেঙে দিয়ে শৃঙ্খল সে হাত বাড়ায়।
হাতে হাতে, এ শপথে, সূর্যের আলো
প্রান্তরে, অন্তরে, প্রাণের মিছিল
মিলনের উৎসবে, এসো, দীপ জ্বালো
বন্ধুর বন্ধনে আকাশের নীল।

আহ্বান

বিবেকানন্দ চক্রবর্তী

সূর্যেরা সব রাত্রি জাগছে
দরজাটা খোলা রেখো
আগামীর বুকে বিজয়ের ছবি
ঠিক এঁকে দেবে দেখো।

আগুন জ্বালাও ওই দু চোখে
যে চোখ ভেসেছে জলে
প্রতিশোধে ঋণ মিটিয়ে দেবো
বুক জ্বলা দাবানলে।

সব সম্ভব, কঠিন বাঁকের
যেটুকু কঠিন আছে,
অসম্ভবেরা পরাজিত হবে
সম্ভাবনার কাছে।

পুড়ে ছাই হবে ছেঁড়া তমসুক,
দাসখত লেখা যাতে,
নতুন দলিল ফের লেখা হবে
দিনবদলের সাথে।

লেখাপড়ার কারবারি নাম দিয়েছে নার্সারি

রবীনকুমার দাস

আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল ছেলেবেলার দিনগুলো
হঠাৎ করেই পাল্টে গেল বাংলা হরফ সবগুলো,
অ-অ-ক-খ উল্টে গিয়ে বাংলা হল ইংরাজি
বাংলা ভাষা নিজের দেশে খাচ্ছে এখন ডিগবাজি।

মরছে কেঁদে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর খাচ্ছে লাট
ইংরাজিটা শিখতে হবে শিখিয়ে গেছে বড়লাট,
পাঠশালা তো উঠেই গেছে বিদায় বাংলা ইস্কুলও
প্রমোটারে নিচ্ছে দখল দিচ্ছে ভেঙে শেষ চুলো!

তাই বলে কি থেমে গেছে লেখাপড়ার কারবারি
খাটিয়ে মাথা বার করছে নাম দিয়েছে নার্সারি,
একটু বেশি চার্জ তা বলে শেখাবেনা ইংরিজি
বাংলা শেখার থেকে ভালো ইংরিজিতে থাক বিজি।

ছুটছি আমি, ছুটছো তুমি বলছি বাংলা দে ফেলে
ওই ভাষাতে আছে কি ছাই বড্ড ভাষা সেকেলে,
হোক বিদেশি ভাষা সেটা, এ বি সি ডি লেখাচ্ছি
নার্সারিরও আগে থেকে নেট খুলে সব শেখাচ্ছি।

থাক বেঁচে ইংরিজি আজ বিশ্বজুড়ে করছে মাত
তোমরা যারা পুরানো লোক তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ।

৩টে লিমেরিক

বিকাশ বিশ্বাস

কুম্ভিলক

ভালো লেখা আগে পড়ো, মাতো নতুন ভাবনায়
তোমার সৃষ্টি নতুন কিনা, দ্যাখো সমাজ আয়নায়
কুম্ভিলকের ঠাঁই নেই কোনো
দু'দিন পরে বাতিল জেনো
নিমগ্ন হও ল্যাং মেরোনা হীরের ম্লান ঐ রোশনায়।

নেতা

দেশকে যারা ভালোবেসে জীবনকে রাখে বাজি
আমজনতার চোখের মণি জননেতা বলতে রাজি
সম্প্রীতির বাণী থাকবে সতত মুখে
মানুষের নিত্য সাথী হবে সুখে ও দুখে
ক্ষুধা দারিদ্র্য অজ্ঞতা বেশমীর মুক্তিদান হোক কাজ-ই।

সর্বহারা যোদ্ধা

কাটমানি আর তোলাবাজে ওস্তাদ কারা?
স্বনামে বেনামে আমফান ত্রাণ লুঠল যারা
নেই রাজ্যে শুনি প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি
সততার ফেস্টুন হাতে মিথ্যা ভুরি ভুরি
মুখোশ তাদের খুলতে পারে সাহসী সর্বহারা।

ঋণ

(প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে)

পরেশ ঘোষ

একদিন ঠিক ফিরে যাব
যে পথ দিয়ে হেঁটে এসেছি
সেই পুরনো পথ ধরে।

অসমতল বন্ধুর পথ
খানা-খন্দ এবড়ো খেবড়ো
শ্বাস নিতে পারি না বুক ভরে।

কাছে ছিল এক নদী
বর্ষায় কানায়-কানায় জল
পুণ্যতোয়া স্বচ্ছ টলটল।

এখন দিগ্‌ভ্রম হয়
সবুজ মাঠ লাল মাটির রাস্তা
খুঁজে পেতে শ্রান্ত বিফল।

কেউ কি প্রহর গোণে
কেউ কি বসে থাকে আজও প্রতীক্ষায়
বছরের বিশেষ কোন দিনে!

নদী জল জানে না
ঢেউ মনে রাখেনি
আমি চির অনিঃশেষ তোমাদের ঋণে।

কবি যদি বন্দী হয়

(ভারবারা রাওয়ের উদ্দেশ্যে)

স্বরাজ ঘোষ

এই যুদ্ধে জিতবে কে,
রক্তচক্ষু নাকি কলম?
এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে
বহুযুগ আগে।

তবু আজো রাজার শাসন
ভয় দেখিয়ে নস্যাৎ করে পথের দাবি
বন্ধ করতে চায় অগ্নিবীণার ঝংকার;
ভুলে যায়—কবি যদি বন্দী হয়
কবিতা ডানা মেলে।

মা

রাজর্ষি মাইতি

মা যে আছে অনেক অনেক দূরে
সকালবেলা শিশিরে ভেজা ঘাসে
সূর্য যখন দুহাত তুলে নাচে,
কান্না ভেজা বালিশটাকে ফেলে
মাকে খুঁজি ঘুমভাঙা রোদ্দুরে।

মা গিয়েছে আমায় ছেড়ে চলে
খেলনাপাতি লাগছে নাকো ভালো
পুতুলবউ হয়েছে মনমরা,
আঁকার খাতায় রং যে শুধুই কালো,
চোখের কোণে কাজল নাইকো বলে।

মা কি তবে আমার উপর রাগ করে
হারিয়ে গেছে মেঘলা আকাশ পরে?
আমিও যে বড্ড একা এখন
মেঘের দেশে একলা চাঁদের মতন!
হচ্ছি বড় তোমার মতো করে।

পিছু হঠতে হঠতে

পরিমল ঘোষ

এখন সময়টা বড়ো জটিল,
চারিদিক থেকে নানা অন্যায়-অত্যাচার
বঞ্চিতদের ঘিরে ধরছে বার বার,
এগিয়ে চলার পথে নানা বাধা-বিঘ্ন
সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলছে।

আঘাত পেয়ে পেয়ে সবার শরীর-মন
ক্রমে কঠিন হয়ে উঠেছে,
ধাক্কা খেয়ে পিছু হঠতে হঠতে
কঠিন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে
আর পিছনোর জায়গা নেই।

ভয় পেয়ে আর কী ফল হবে?
এবার সব শক্তি ও সাহস সংহত করে
সোজা হয়ে দাঁড়াতেই হবে,
এখন আঘাতের বিনিময়ে
শুধু প্রত্যাঘাতের পালা,
এভাবেই এগিয়ে চলার ভাবনা।

ডানা

সৌরভ চট্টোপাধ্যায়

ঘুমের ভিতর জাগিয়ে রাখি ডানা
সুযোগ পেলেই উড়ে যাব
ডানার ভিতর লালন করি আগুন
পাখিরা সব ঝলসে ওঠে প্রতিদিনই
পুড়তে থাকে একটু আধটু উড়বার ইচ্ছাগুলি
সয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়তে পুড়ে যাবার গন্ধগুলি,
সুযোগ পেলে ডানাদের গায়ে হাত বুলাই, ফুঁ দিই,
সুযোগ পেলে আগুন ছিঁড়ে উড়ে যাব একদিন

বজ্রআঁটুনি ফস্কাগেরো

জয়গোপাল মণ্ডল

ধীরে ধীরে গিঁট আলগা হয়ে যায়
সময়ের খাদে যত নামবে
ততই ধূসর হয় রাগ
পার্বতী মালকোষ গাইলেও
রাগ কি আর কমে?

মায়ামৃদঙ্গের বোলে জেগে ওঠে আলো
দূরত্বের প্লুটোঘরে তোমার মৃত্যু যখন
তখন ব্যথা উথলে ওঠে ঠুমরি ঢঙে
ব্যবধান রেখে যত দিন গড়াবে
পৃথিবীর ফাটলে পাতাল প্রবেশ
অপেক্ষা মাত্র...
হাত বাড়াও বন্ধু নিদ্রাহীন রাতে

ভাঙন

শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

মধুবনী আঁচলে শরীরী জ্যোৎস্নাটুকু সন্তর্পণে বাঁধা ছিল,
যুবতী-নাভিপদ্ম থেকে উঠে আসা ঘ্রাণ—
ছড়িয়ে দেয়নি ভীরু মেয়ে, মোহের হাওয়ায়...
সাধনপীঠের মতো শুদ্ধতা দেহময়,
গেরুয়া আলোয় ডুবে মন—মা শেখায় শুচিতার পাঠ।
তবু, প্রেমহীন শুধু সপ্তপদী অধিকারে বিষহাত নীল লোভে
ভেঙে দিলে শুদ্ধতা—শর্তহীন পুড়ে-পুড়ে ছাই হয় রমণীয় মন...
মেয়েটি চেয়ে-চেয়ে দেখে তার জানালার কার্নিসে কবতুর দম্পতি
সোহাগে ভাসার আগে প্রিয়মন মাধুকরী করে।।

প্রতিবাদসভার পর

তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবাদসভার পর
মেঘ করে আসে!
বৃষ্টি হয় পরবর্তী দু'দিন।
মানুষের চোখ তবু জ্বলতে থাকে!

নিভৃতে ভারি ঝড়—
তুফানের অলংকরণ ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় আকাশে,
হৃদয়ে।

প্রতিবাদসভার পর
অজস্র মানুষ কাস্তে, কুড়ুল, টাঙ্গি, বর্ষাতি হাতে—
মাঠে, খামারে ফিরে যায়!
আর,
তাদের পেট ভরার শব্দ শুনতে শুনতে একটি পতাকা
আরও বেশি জেগে ওঠে সমগ্র চরাচরে।

শ্রাবণ ও ভালোবাসা

বিধানেন্দু পুরকাইত

আমার উঠোনে শ্রাবণ আসার শব্দ
এতো গাংচিল কেন কবিতার মতো ওড়ে?
ওরা তো জানে শিকার ধরার কাব্য
কে ফেলে নিশ্বাস বিঘ্ন সমস্বরে?

ঘরকুনো ব্যাঙ ভালোবাসা খোঁজে একা
শ্রাবণ কখন ভিজায় উঠোন মাটি
কবিতা না হয় তোমার কাছেই থাক
গাংচিল সাথে আমরাও চলো হাঁটি।

তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি কবিতার সংলাপে
গাংচিল যত উড়ে চলে গেল আমাকে একলা ফেলে
শ্রাবণ যদি উঠান ভিজাতে পারে
তুমি শুধু থেকো আমার সন্ধ্যাকালে।

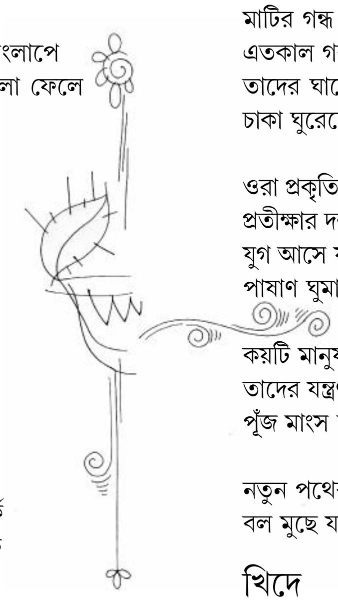

যাকে ছেড়ে দিতে হলো

অশোক অধিকারী

যাকে ছেড়ে দিতে হলো তার কোনো
আরোগ্যনিকেতন ছিল না তবু
ফুল ছড়ানোর পর জানা গেল তার
একটি ফুলের বাগান ছিল

অসুখের সঙ্গে ফুলের ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক
কমলে শুভেচ্ছা নাহলে বিদায়ের জন্য ঠিক
যতোটা লাগে তাই দিয়ে দর কষাকষি
পৃথিবীর সমস্ত শোকপ্রস্তাবের লাইনগুলো
সোজা হয় বাঁকাচোরা থাকে দলিত প্রণয়

সেলস্‌ম্যানশিপ যেভাবে রাষ্ট্র দখল করে

তাপস রায়

বৃষ্টি আসবে। পাখির বাসার ভেতরে নবীন পাখিটি
ততটা নিরাপদ নয়, এই শহর
মিশে গেছে দেশের ভেতরে, দেশ সমুদ্রের পথে
তুমি বলবে অখণ্ড আকাশের রঙে নীল
নীল মানে বেদনার ভাষা—ঘোষণা হয়েছে
প্রতিদিন যুদ্ধ বিক্রি করে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে দেখে
সন্তান-সন্ততি সহ সেও একটু একটু করে ভীতু হয়ে যায়

যে আমাকে ভোরবেলা দেয়, যে আমাকে
গঙ্গা পেরোতে বলে, অস্বস্তি হবে না।
আমার ঘোরাফেরা থেকে অনেকেই পাগল সন্দেহে থুথু দেবে
সবটা দেখব বলে রেললাইন ব্যাগে ভরে আমিও
মুখোমুখি তৈরি করি ঘরবাড়ি, দেখা হয়
কত কী গোপন মাঠ ভেঙে ছুটে আসে।

কালবেলা

শতদল চক্রবর্তী

পথে পায়ে রক্ত লেগে আছে—

যারা যারা গিয়েছিল, একজনও ফেরেনি এখনও;
উঠোন তুলসিতলা সন্ধ্যাপ্রদীপ শাঁখ,
পৃথিবীর দীর্ঘতম অন্ধকারে পাহাড়ি ময়াল,
নববধূ বুড়ো বাপ হিজিবিজি মায়ের কপাল,
ফিরবে না জেনে—ধন্য আশা কুহকিনী...

সবাই কি দোষ করেছিল? প্রতিবাদী কিংবা গরিব,
মাটির গন্ধ নিয়ে প্রতিদিন রাতে
এতকাল গরম ভাতের গ্রাস তুলে যারা ঘুমিয়েছে,
তাদের ঘামের কথকতা ইতিহাস হবে তাই
চাকা ঘুরেছে, চাকা ঘুরছে—চাকা ঘুরেই চলেছে!

ওরা প্রকৃতিসন্তান,
প্রতীক্ষার দশক শতক শেষে—
যুগ আসে যায়;
পাষাণ ঘুমায়।

কয়টি মানুষ জেগে থাকে সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে,
তাদের যন্ত্রণা—
পুঁজ মাংস ঘিলু অস্থি হৃদয়

নতুন পথের দিশা দেবে,
বল মুছে যাবে।

খিদে

যযাতি দেবল

এখানে ওখানে লটকানো অস্থি সমাচার

আজ শ্রাবণের দুপুরে যেন শারদীয়া রোদের আলাপন
দেখ বিপুল রহস্যখনির উঁকিঝুঁকি সামনের বাঁশবনে
গুটিগুটি পায়ে পোকা খোঁটে তিন চারটি ডাহুক
খিদে মানে পেট চুঁইচুঁই, অন্য কোনও রহস্য নেই
খিদের হয় না কোনো ভাবানুবাদ।

অভিমান কিছু কথা নীরবেই বলে
যে আবেগ দুমড়ে মুচড়ে ছুড়ে ফেলে যুক্তির প্রসারতা
কতদূর যাবে সে ভেসে? তার তলা ফুটো হলে
ঝলকে ঝলকে জল আবেগী সরাকে ডোবায়।
কল্পছক ভেঙে গেলে কান্না জেগে থাকে

যদি চিতা জ্বলে,
যদি ছাই ওড়ে অনিঃশেষ!
শান্তিমন্ত্র বাজে নিরুপায়;
অন্নচিন্তা চমৎকারা জানে নচিকেতা
অন্নই ব্রহ্ম! খিদের কোনও ভাবানুবাদ নেই।

গৃহবন্দির ডায়েরি
বিকাশ পণ্ডিত

ছোটবেলায় লক্ষ্মণরেখা কেটে মা বলতেন—
গণ্ডি ছাড়াস না।
সীতার সর্বনাশের কথা ভেবে আঁতকে উঠতাম।
ঠাম্মা সামলাতে না পেরে কোমরে দড়ি দিয়ে
জানালায় বেঁধে রাখলে,
কেঁদে কেঁদে পাড়া অস্থির করে তুলতাম।
দাদা হেসে বলতেন, ওকে ছেড়ে দাও;
ঘুরুক, পৃথিবীকে দেখুক দুচোখ ভরে।

একদিন ঘর ছেড়ে বাইরে রেখেছি পা।
আকাশে দেখেছি অদ্ভুত উল্লাস।
পাখিদের ডানার গন্ধে ভরেছি ছোটো জীবন।
খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে যে বাতাসে
মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে
তেমনি সুবাতাসে বুকটা ভরে
অনেককাল বাঁচার স্বপ্ন বুনেছি।
সূর্যের সোনা রোদ গায়ে মেখে
হাঁটতে চেয়েছি আলপথে, নদীর ধারে
কিংবা ছায়া ছায়া নির্জন বনের গভীরে।
কখনো ভেবেছি সুবর্ণ দিঘির পাড়ে
কৃষ্ণচূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে
চৈতির হাতে হাত রেখে
পাহাড়ি ঝোরার মতো খলখল হাসব
বসন্তের আগুনে ওর কালো চুলে
দেখব আলোছায়ার অভিনব খেলা।
দিনের প্রথম আলোর মতো ওর দুটি চোখে
এঁকেছি আগামী ভবিষ্যৎ।
তার অধরপল্লবে জড়িয়ে থাকা হাসিতে
মুদ্রিত হয়েছে গান্ধর্ব সংলাপ।
ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সুবর্ণদিঘির কাকচক্ষু জলে
যে আবর্ত রচনা করেছি
সেই আবর্তে হারিয়ে গেছি নিখাদ অন্যমনস্কতায়।

বিকেল গড়িয়েছে
পাখিদের ডানার শব্দে ঘরে ফিরতে চেয়েছি।
হাতের মুদ্রায় দুজন দুজনকে বুঝিয়ে দিয়েছি—
আবার দেখা হবে।

এখন অদ্ভুত স্তব্ধতা চারিদিকে।
শঙ্কিত মানুষ শম্বুক প্রবৃত্তিতে গুটিয়ে নিচ্ছে।
লকডাউন নামক আনকোরা শব্দ উঠছে বাতাসে।
অতিমারি করোনা কেড়ে নিয়েছে
আমার আকাশ, শ্যামল প্রান্তর,
সুবর্ণদিঘির টলটলে জল।
কোরেন্টাইনে তুমি, আমি—সবাই।
জানি না এ বন্দিদশার মুক্তি আছে কিনা;
কিংবা কবে হবে?
শুধু জানি পৃথিবী আবার শান্ত হবে,
ঝড়ের শেষে মানুষ ছড়িয়ে পড়বে
দেশে-দেশান্তরে, গ্রহে-গ্রহান্তরে।

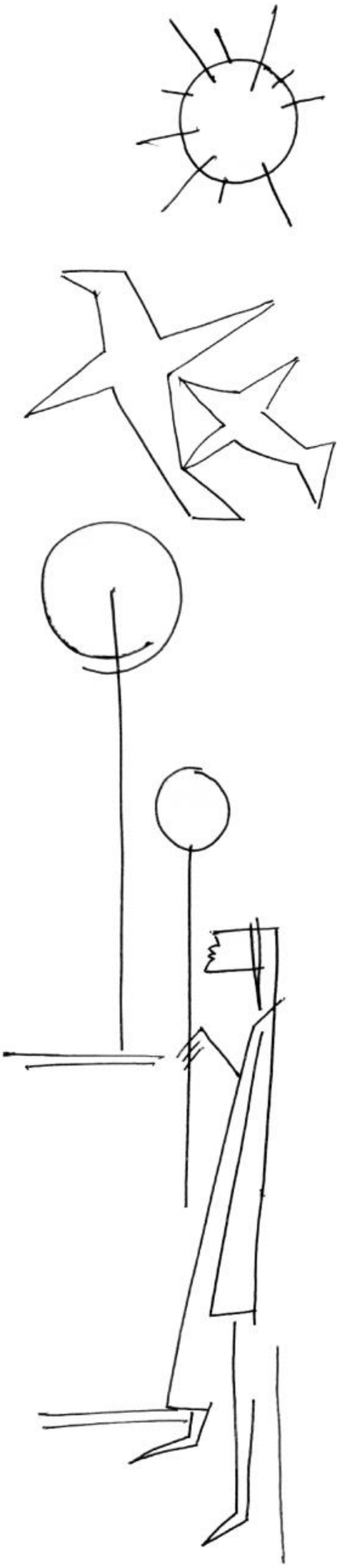

দায় কি একা আমার-ই!
গৌতম সাহা

কোথায় গেলি রে লক্ষ্মী ও সরো,
বাক্স-বিছানা বাঁধ,
বাবা কার্তিক, আজ বিকেলের
রান্না-টা তুই রাঁধ।

গোছ-গাছ করে যেতে হবে ওরে
কাটাতে ক-দিন মর্ত্যে,
কর্তা মশাই দেন অনুমতি
প্রতিবার-ই এক শর্তে।

মর্ত্যের জল, তেলেভাজা, ফল
চলবে না কিছু খাওয়া,
পেট যদি ছাড়ে জেনে রেখো তবে
এবারেই শেষ যাওয়া।

তাই চিঁড়ে বাঁধি, কলা পাঁচ কাদি,
ভেলি গুড় বারো হাঁড়ি,
গণা বলে গেছে লাড্ডু বানাতে,
একলা কি অ্যাতো পারি?

গাঁজা খেয়ে ওই পড়ে আছে ঘরে,
বাজার-টা কে যে করে!
নন্দী-টা গেছে বদ্যির বাড়ি,
ভুগছে ও ব্যাটা জ্বরে।

ভৃঙ্গী-টা ঢোলে সিদ্ধির ঘোরে,
শুনছে না কথা কোনো,
খুলছে না দোর, ধরছে না ছোঁড়া
এলে কারো কোনো ফোন-ও!

দশ হাতে তাই নিজে করে যাই
হাজার-টা কাজ একা,
লাঞ্চ-ডিনারের সময়-টা হলে
সব ক-টা দেবে দেখা।

নতুন মানবসমাজ
কানাইলাল বিশ্বাস

শ্রমশ্রী শ্রমে ঘামে রক্তে
দেশ রূপবতী হয়ে ওঠে
নিদারুণ শোষণ আর অত্যাচারে
দেশবাসী মৃত্যুর পথে হাঁটে।
মেহনতি মানুষ যে দিন পরস্পরে
মিলাবে হাত
গড়ে উঠবে এক নতুন মানব সমাজ
শোষক আর অত্যাচারীরা হবে
ছারখার।

নবজন্ম

পলাশ দাশ

জনমানবশূন্য পাড়াটা। যদিও ভোর ৪টের সময় রাস্তায় লোকজন থাকার কথাও নয়। তাও আবার আজকের সময়ে। প্রদীপ ওর রংচটা হ্যান্ডেল-বাঁকা সাইকেলটার টায়ার টিপে হাওয়া পরীক্ষা করল। অনেকটা দূর যেতে হবে। কেমন একটা নার্ভাস লাগছে ওর। বিপুলটা এখনো এলো না। ভোলার বন্ধ চায়ের দোকানের গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করতে করতেই দেখতে পেল বিপুল আসছে। প্রদীপদের ঘরের দরজায় এখনও দোলা দাঁড়িয়ে। ওর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগছে। প্রদীপ হাত নাড়ে বৌয়ের উদ্দেশ্যে। দোলাকে এমন লাগলো কেন! এমন শীর্ণ, পাংশু! হতে পারে ঘুম থেকে মাঝরাতে ওঠায় ক্লান্তি জড়িয়ে আছে মুখে, আর অল্প আলোয় ওর মুখ কিছুটা দূর থেকে অমন পাংশু মনে হচ্ছে। এই ১০/১২ দিন ধরে যা চলছে তার ধকল, নানা দুশ্চিন্তায় ওর শরীরের কথা আলাদা করে জিজ্ঞেস করা হয়নি। শরীর খারাপ লাগলেও মেয়েটা হয়তো এই সময়ে নিজের শরীরের কথা বলতে চায়নি! আজ ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করতে হবে। ওষুধ খাচ্ছে কি ঠিক মতো! প্রদীপের মনটা আরো বিষণ্ণ হল—ওষুধ খাবে কী করে, টাকা কোথায়!

—“প্রদীপ, মুখে মাস্কটা পরে নে। এত ভোরে যদিও পুলিশ থাকবে না, তবু নিজেদের জন্যও ওটা দরকার বুঝলি। আড়তে গেলেই বুঝবি কত লোক, কত জায়গা থেকে আসছে। কার জ্বর, সর্দিকাশি আছে জানা তো নেই। করে খেতে হবে আমাদের। একবার পড়ে গেলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে।”

সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে প্রদীপ ঘাড় নাড়ে, “হুঁ। ঠিকই বলেছিস রে বিপুল। গতকাল রাতে বরফকলের উলটোদিকের বিল্ডিংটায় পুলিশ এসেছিল এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। একটা ফ্যামিলির সবাইকে বেলেঘাটা আই.ডি হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ওই যে কি বলে না কোয়ারানটাইন, তাই নাকি করেছে! বুঝলি, ভয়ই লাগছে মাঝে মধ্যে। বাড়িতে তো সবাই বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে। এত সাবান কোথায় পাব, দাম বেড়ে যাচ্ছে এক-দুদিন পরপর।”

বিপুল সাইকেলের স্পিড বাড়াতে বাড়াতে বলে—“সমস্যা লেগেই আছে বুঝলি। রোজগার কমে গেছে। মাছ আর কতটুকু বিক্রি করতে পারছি! খদ্দের কমেছে, পরিমাণও কমেছে। এদিকে বাড়িওয়ালা রোজ দুবেলা শাসাচ্ছে ভাড়ার জন্য। ইলেকট্রিকের টাকা আলাদা দিতে হয়, এরপর আছে রান্নার গ্যাস, মায়ের ওষুধ। পাঁচ জনের খাওয়া খরচ, যাই খাস না কেন সেটা আসবে কোথা থেকে বল! এভাবে আর কতদিন চলবে!”

প্রদীপের একটু যেন হাঁফ ধরেছে। বিপুলটা বেশ জোরে চালাচ্ছে। প্রদীপের বহুকাল সাইকেল চালানোর অভ্যেস নেই। তার ওপর সেই কোন ছোটো থেকে বিড়ি সিগারেট ধরেছে। আজকাল বেশ দম কমে গেছে বুঝতে পারে।

—একটু আস্তে চালা না বিপুল, তোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি না।

—এমনিতে একটু দেরি হয়েছে আজ বেরোতে বুঝলি, গিয়ে দেখব পছন্দের মাল সব বিক্রি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, বলছিস

যখন তখন না হয় একটু আস্তেই যাচ্ছি। হ্যাঁ রে, বাড়িতে কিছু বলল মাছ বিক্রি করবি শুনে?

—মা শোনেনি। বয়স হয়েছে, রোগব্যাধির চিন্তাতে কাবু। তারপর আবার এইসব কথা বলে আরো দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে কী হবে?

—বৌ, বৌ কী বলল?

—কিছু বলেনি শুনে। শুধু বলল, তোমার খুব কষ্ট হবে। তারপর মুখটা দেখে বুঝলাম বর মাছ বিক্রি করবে এটা মন থেকে ঠিক মানতে পারছে না।

—শোন প্রদীপ, এ নিয়ে বেশি ভাবিস না। কত লোক কত কিছু করতে বাধ্য হচ্ছে দেখছিস তো। বান্টির বাবাকে দেখলাম কাল মাঠের কোণায় বসে সবজি বিক্রি করছে। করোনা কাকে যে কোথায় নামাবে, কাকে কী করাবে শুধু দেখতে থাক।

—আচ্ছা বিপুল, তুই মাছের কারবার করছিস কতদিন হলো?

—সে অনেক দিন। আমি অটো চালানো ছেড়ে মাছের কারবারে ঢুকি তা প্রায় বছর পাঁচ হবে। তখন ছোটন আসছে সবে। বৌ তো রেগে কাঁই। বলে আমার বাবা তো মাছওয়ালার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়নি, এখন আমি বাপের বাড়িতে কী বলব! এরপর হলো গন্ধ। একটা গোটা সাবান ঘষে সারা গায়ে অর্ধেক শিশি সেন্ট মেরে ঘরে ঢোকার পরেও সে নাক সিঁটকিয়ে থাকতো। আঁশটে গন্ধে নাকি ওর বমি আসতো। সে এক অশান্তির সময় গেছেরে ভাই।

—এখন কি মেনে নিয়েছে?

—না মেনে কোথায় যাবে। আমিও বলে দিয়েছি, না পোষালে বাপের বাড়ি চলে যাও, এদিকে আর এসো না। তোমার বাবা একটা ডাক্তার, মাস্টারের সাথে কেন বিয়ে দিল না তোমার! দেখ আবার চেষ্টা করে, বাপকে বলো। এত রূপবতী, গুণবতী কন্যার জন্য নিশ্চয়ই অনেক ভদ্দরলোক মালা নিয়ে লাইন লাগাবে। এরপর আরো কয়েকবার অশান্তি করেছিল, তো আমি অত মেয়েছেলের কথায় চলা পাবলিক নই। বুঝলি। এমন ধমক দিয়েছি যে আর কোনোদিন দুর্গন্ধের কথা বলতে আসেনি। আর একটা কথা কী হলো জানিস? রোজগারটা বেড়ে গেল। অটো চালিয়ে যা পেতাম তার থেকে অনেক বেশি বুঝলি। ঘরে যেই টাকা ঢুকল, দীঘা, পুরি, সিনেমা, নাইটি, শাড়ি কেনার সুযোগ এল, সব তখন সুন্দর হয়ে গেল। আরে ভাই, বিউটি পার্লার, সাজের জিনিস যোগান দাও, বাপের বাড়ি গিয়ে যাতে নতুন গায়না দেখাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও, ব্যাস সব প্রবলেম উধাও। ব্যাস শালা তারপর থেকে সেন্ট না মারলেও আঁশটে গন্ধ আর পায় না। মাছওয়ালার বৌ ভাবতে বমি পায় না। টাকা বুঝলি, টাকাই সব। টাকা নেই বলে এখন বাড়িওয়ালার রোয়াব শুনতে হচ্ছে।”

প্রদীপ সামনের দিকে তাকিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবতে থাকে। মনটা খারাপ হয়ে আছে। একটা অস্বস্তি হচ্ছে। ঠিক কী কারণে মনটা এত খারাপ লাগছে বুঝতে পারছে না। আসলে সব কিছু মিলিয়ে এ্ কদিন ধরে মনে মনে ও ভেঙে পড়েছিল। এ পাড়ায় ওরা এসেছে তাও সাত আট বছর হলো। দু-একজন বন্ধু ছাড়া মেশে না কারো সঙ্গে। দোলা অবশ্য বেশ মিশুকে স্বভাবের। পাড়ার বৌ, মেয়েদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছে। এর বাড়ি ওর বাড়ি যায়। বিপুল ওর পুরানো বন্ধু, সেই স্কুল থেকে। ক্লাস নাইনের পর বিপুল আর স্কুলমুখো হয়নি। এটা ওটা নানা কিছু করেছে। তো সেই বন্ধুর কাছে প্রদীপ দিন সাতেক আগে নিজের সমস্যার কথা বলে। কিছু একটা না করলেই নয়, একদম পথে বসতে হবে নইলে। বুদ্ধিটা বিপুলই দেয় ওকে। ওর লাইনের কারবারে নামাতে। সব ও দেখিয়ে, শিখিয়ে নেবে। কত দামে, কত কি কিনবে, কী দামে বিক্রি করবে—সব বলে দেবে। প্রদীপকে শুধু শিখে নিতে হবে আর এ লাইনে লাজ-লজ্জা ভুলে গাধার মতো খাটতে হবে। এই কদিন রোজ বিপুলের সঙ্গে ওর দোকানে গেছে প্রদীপ। ওজন করা, আঁশ ছাড়িয়ে মাস পিস করে কাটা রপ্ত করার চেষ্টা করেছে। দোলা গুম মেরে থেকেছে। ঝগড়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু ও যে এটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না, তা হাবেভাবে বোঝা যায়।

—শোন প্রদীপ, প্রথম কয়েকদিন অল্প মাল তুলিস। বিক্রিটাও সমস্যার। আমার পাশে বসতে পারলে অসুবিধে তেমন হতো না। কিন্তু অন্যরা বসতে দেবে না। তুইতো ভ্যান নিয়ে বেরোবি, প্রথমে চেষ্টা করিস মাঠের কোণায় ভ্যান রেখে বিক্রি করা যায় কিনা। আশে পাশের লোক যদি তেড়ে আসে তো গেল। যদি তেমন হয় তাহলে তুই ভ্যান নিয়ে আশেপাশের দু-একটা পাড়ার ভেতরে ঢুকে রানিং-এ বিক্রি করিস। হাঁকতে হবে বুঝলি—মাছ নিয়ে যান, মাছ, একদম ফ্রেস কাটা পোনা, সস্তায় চিংড়ি, জ্যান্ত ত্যালাপিয়া পাবেন। একবার বেরিয়ে দেখুন দাদা, বৌদিমণি, কাকিমা, মেসোমশাই। কেনা কাটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, শুধু দেখে যান জ্যান্ত মাছের বাহার। কী রে, এমন করে পারবি তো হাঁকতে?

বিপুলের ভলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে প্রদীপ। এই কদিনে প্রথম হাসি এল মুখে।

—আরে তোর ট্রেনিং-এ পেরে যাব ঠিক। পারতে হবেই, নাহলে মাছ থেকে যাবে যে। বাড়িতে মাছ রাখা যাবে না বলেই মনে হয়। ফ্রিজও নেই। অত বরফ কোথায় পাব! তাই মাল একটু কম নিয়ে দেখি কী হয়। চেষ্টা করব যাতে সবটা বিক্রি করেই বাড়ি ঢুকতে পারি।

—শোন প্রদীপ, আর একটা কথা তোকে বলে রাখি। বুঝলি, প্রথম প্রথম যখন অটো ছেড়ে মাছের কারবার শুরু করি তখন আমারও একটা অস্বস্তি হতো, ভয় করতো আর একটা কোথাও লাগতো। শত হলেও ড্রাইভার ছিলাম যে। আর সেখান থেকে রাস্তায় ড্রেনের ধারে প্লাস্টিক পেতে বসে মাছওয়ালা হয়ে যেতে মনের ভেতর একটু খচখচ করতো বঝুলি। চেনা লোকেদের মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। আর যখন কেউ বলতো, আরে বিপুল তুই কবে মাছের দোকান লাগালি রে? যাক একদিকে ভালোই হয়েছে। চেনা লোক ঠকিয়ে দেবে না। এরকম কত কী বলত। আর আমি লজ্জায় মরে যেতাম। এরপর হলো দর কষাকষির ব্যাপার। আগে বাজারে গিয়ে আমিও তো দাম কমাতে চাইতাম। কত কি দোকানদারকে বলতাম। দোকানদার সবাইতো সমান নয়। কেউ মুখের কথার জালে, মাছের মতো খদ্দেরকে জড়িয়ে ধরে, চলে যেতে দেয় না। আবার কেউ দেমাক নিয়ে বলে, যান যান মার্কেট ঘুরে দেখুন এই দামে কেউ দেয় কিনা। কখনো ঝগড়াও হয়েছে, দেখেছি কত। যেই আমি হলাম মাছওয়ালা অমনি সবটা উল্টে গেল। শালা এতদিন ছিলাম নায়ক আর এবার অভিনয় করতে হবে ভিলেনের।

হো হো করে বিপুলের হাসির মধ্যেই ওরা মাছের আড়তে এসে পড়ে। প্রদীপ এই আড়তের পাশ দিয়ে বাসে কতবার এসেছে, গেছে তার ঠিক নেই। বাইরে লরি, ম্যাটাডোর, ৪০৭ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। পেল্লায় ঝুড়িতে, ট্রে-তে বরফ দেওয়া মাছ নিয়ে লেবারদের দৌড়াদৌড়ি চলে। রাস্তায় ভোরবেলায়ই জ্যাম লেগে যায়। মার্কেটের ভেতরটায় ও যায়নি কখনো। বিপুলের কাছে শুনছে আড়তে

ওর চেনা লোকের কাঁটা আছে। মার্কেটে অকশন হয় মাছের। অন্ধ্র থেকে লরি-ভর্তি মাছ আসে। প্রদীপ এসবের নাড়ি-নক্ষত্র কিছুই জানে না। বিস্মিত চোখে অচেনা, অজানা, এক জগতকে দেখতে দেখতে ও ঢুকে পড়ে ফিস মার্কেটের ভেতরে বন্ধুর সঙ্গে।

২.

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের দুদিকে দুটো ব্যাগে রুই আর চিংড়ি। পেছনের ক্যারিয়ারে বেঁধেছে হাঁড়ি। গামছা দিয়ে হাঁড়ির মুখ আটকানো হয়েছে, যাতে জ্যান্ত তেলাপিয়া পড়ে না যায়। বিপুলেরও হয়ে গেছে। ওর মাল বেশি।

—দাঁড়া দাঁড়া প্রদীপ। একটা ছোট্ট কাজ করে বিড়ি জ্বালিয়ে সাইকেলে উঠবো।

আচমকাই বিপুল মোবাইল ফোন তাক করে কয়েক পা এগিয়ে আসে ওর দিকে। ফটাফট কয়েকটা ছবি তুলে এবার পাশে এসে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে খান কয়েক সেলফি তুলে নেয়।

—শালা চাকরিজীবী গ্র্যাজুয়েট ১০টা-৫টার বাবু করোনার কামড়ে হয়ে গেল মাছওয়ালা। নতুন জন্ম হল রে তোর। আর পাশে কেলাস নাইন ফেল আমি, যে তোর নতুন জন্ম দিল। ফাটাফাটি ছবি হয়েছে রে বুঝলি। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেব। বাড়িতে বৌকে দেখাস।

দুলে দুলে সশব্দে হেসে উঠল ও। প্রদীপ অপ্রস্তুত, মুহ্যমান যেন। হাসির দমক সামলিয়ে দুজনে বিড়ি ধরিয়ে ফেরার পথ ধরলো, এখন আকাশ খানিকটা ফরসা হচ্ছে।

—গাড্ডা দেখে চালাস প্রদীপ। পেছনের হাঁড়ির জল চলকে তোর জামা, প্যান্ট ভিজিয়ে দেবে ঝাঁকুনিতে।

প্রদীপ গুম মেরে গেছে। একমনে সাইকেল চালায় ও। বিড়ি ঠোঁটেই নিভে যাওয়ায় ফেলে দেয়। তিতকুটে স্বাদ লেগে থাকে কালো ঠোঁটে আর জিভের ডগায়। বিপুল ঠিকই বলেছে, নতুন জন্মই বটে! আজ বাবা থাকলে কী ভাবতো, এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে শেষে কিনা ছেলে হলো মাছওয়ালা। নতুন জন্ম! ডালহৌসির একটা বিখ্যাত ঘড়ির শোরুমের কেরানি হয়ে গেল একজন মাছওয়ালা।

—প্রদীপ, খুব রাগ করলি না রে! আমি সত্যিই একটু বাড়িবাড়ি করে ফেলেছি। তোকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম। মনে কিছু করিস না ভাই। আমি ভাবলাম তুই এত গম্ভীর হয়ে আছিস, তাই একটু ইয়ার্কি করে তোকে হাসাই।

—আরে না না। ভালোই করেছিল ছবিটা তুলে। সত্যিই তো নবজন্ম হলো আমার। সবারই হয়। তুই কি জানতিস তোর বাবার অত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে! জানতিস কি আমরা সবাই স্কুলে যাব আর তুই গ্যারেজে কাজে লাগবি! জানতিস কি তুই অটো ছেড়ে মাছওয়ালা হবি! তোর বউ কি জানতো যে তার বর মাছওয়ালা হবে! কেউ কিছু জানতি না, কেউ কিছু জানতো না। কিন্তু এগুলো সব হয়েছে, হচ্ছে আর হতেই থাকবে। বান্টি কি জানতো ওর বাবা সবজি বিক্রি করবে! পিন্টু সেদিন দেখলাম দুধ, ডিম নিয়ে বাড়ির সামনে টেবিল সাজিয়ে বসেছে। সে কি জানতো? কেউ কিছু জানতো না। সব শালা ওই ভাইরাসটা জানতো, কাকে দিয়ে কী করাবে। আমাদের মন খারাপ করা সাজে না। মন খারাপ শুনবে কে? বাড়িওয়ালাও শুনবে না, আবার কোম্পানির মালিকও শুনবে না। তাই আমি মাছওয়ালা হলাম, না কি দুধওয়ালা—পৃথিবীর কারো কিছু এসে যায় না তাতে। বরং খুশি হবে বাড়িওয়ালা, ভাড়ার টাকা পেয়ে। বাড়িতে অন্তত হাঁড়ি চড়বে। সরকারি ত্রাণ নেওয়ার জন্য খোলা রাস্তায় দারিদ্র দেখিয়ে হাত পেতে দোলাকে ছুটতে হবে না ত্রাণগাড়িতে বসা নেতার দিকে। হ্যাঁ, আজ থেকে আমি মাছওয়ালা তাতে কার বাপের কী!

বেশ একটানা কথা বলার উত্তেজনায় হাঁফ ধরে যেন প্রদীপের। ভোর বেলায় মনোরম বাতাসেও যেন ঘামের বিন্দু জমে কপালে। বাকি রাস্তা আর কেউ কোনো কথা বলে না। ভারি হয়ে যায় নরম ভোর। একসময় পথ ফুরায়। এবার আরেক ব্যস্ততা, নতুন কাজ।

৩.

তরুণ সংঘের মাঠের কোণায় আজ একটা সাইকেল ভ্যান এসে দাঁড়ায়। তখন সকাল ৬টা বেজে গেছে। দু-একজন করে মাস্ক পরা মানুষরা বেরোচ্ছে রাস্তায়। কেউ দুধ, পাঁউরুটি কিনবে, কেউবা বাজারের থলি হাতে বেরিয়েছে বাজার করবে বলে। একজন, দুজন করে খদ্দের আসতে থাকে। মাস্কের একটা বড় গুণ আবিষ্কার করল প্রদীপ। বিভাসদা ভালো করে মাছ নিরীক্ষণ করে দরদাম করে চিংড়ি কিনল, তেলাপিয়া নিল, কিন্তু মাস্কের আড়ালে থাকা মাছওয়ালাকে চিনতে পারল না। ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ঝামেলা হল কাটা পোনায়। ওজন মেলাতে গিয়ে বার দুই ব্যর্থ হয়ে বেশ অনেকটা বড় টুকরো চলে গেল। বিপুল শুনলে গাল দেবে। লোকটাকে ৩০০ গ্রাম মাছ কেটে দিতে গিয়ে প্রথমে কিছুটা কম হলো ওজনে। ছোটো একটা পিস কেটে দাঁড়িপাল্লায় ফেলে দেখে কম হলো ফলে আবার একটা পিস কাটলো, এবার মাছের পাল্লাটা ভ্যানকে ছুঁয়ে ফেলল। কতবার কাটবে পিস, দিয়েই দিল শেষে। খদ্দেরের মুখে স্বর্গ জয়ের হাসির আভাস দেখল যেন। দরদাম করে দাম মিটিয়ে যাওয়ার সময় খদ্দের বলল, তুমি ভাই দামটা বেশিই নিলে। বাজার যেতে হলো না বলে নিয়ে নিলাম, কিন্তু এত লাভ কারাটা ঠিক নয়। প্রদীপের মাথাটা গরম হয়ে গেল, কিন্তু মনে পড়ে গেল বিপুলের কোচিং। খদ্দের হলো লক্ষ্মী। অমনি প্রদীপের মুখে উঠে এল পেশাদারি হাসি।

—না না এ কী বলছেন মেসোমশাই, আপনার থেকে বেশি নিতে পারি! আরে আপনারা আছেন বলেই না আমাদের পেট চলছে। খেয়ে দেখুন মাছটা, কাল বলবেন কেমন খেলেন। আবার আসবেন কিন্তু, ভালো মাছ রেখে দেব আপনার জন্য।

বুড়ো খুশি মনে বিজয়ীর গর্বে ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ি গিয়ে কেন জিতেছে সে গল্প বেশ রসিয়ে রসিয়ে বৌকে বলবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে। প্রদীপ যেন দৃশ্যটা দেখছে। আবার হাসি এল মুখে। ধীরে ধীরে ওর সাহস বেড়ে গেছে। বিপুলের ট্রেনিং অনুযায়ী ভলোই সামলাচ্ছে খদ্দের। খদ্দেরও বাড়ছে ধীরে ধীরে। কেউ কিনছে, কেউ দেখে চলে যাচ্ছে। বেলা বাড়ছে।

—আরে প্রদীপ না! তুই মাছ বিক্রি করছিস কী ব্যাপার রে!

প্রদীপ মুখ তুলে দেখে সমীরদা। একসঙ্গে অফিস যায় ওরা। সরকারি কমচারী।

—কাহাতক ঘরে বসে থাকা যায় বলুন। আর একটু টানাটানিও চলছে। সবতো বন্ধ। কবে সব স্বাভাবিক হবে কে জানে! দেখলাম এ অবস্থায় রোজগারের একমাত্র রাস্তা কিছু কারবারে নেমে পড়া। বন্ধুর সাহায্যে নেমে পড়লাম। এই কদিনের মামলা। লকডাউনের ব্যবসা আর কি। রোজগারও হলো, সময়ও কাটলো।

—কী দিন এল রে বাবু! তুই মাছ বিক্রি করবি আর আমি কিনবো, এটা ভাবতেই পারছি না রে। তোর থেকে মাছ কিনতে কেমন কিন্তু কিন্তু করছে রে।

—কী যে বলেন না সমীরদা। বরং আপনারা পাশে থাকলে আমার মতো অনেকে এ যাত্রা বেঁচে যাবে দাদা।

সমীরদাকেও সবটা বলা হলো না। কারো করুণা প্রদীপ কখনো চায়নি। কোম্পানি জানিয়েছে আর মাইনে দিতে পারবে না। দু-মাস আগেই দোলার অপারেশনের জন্য ধার করতে হয়েছে। সে টাকাও শোধ হয়নি। এর মধ্যে লকডাউন। মাইনে বন্ধ। কোম্পানি কবে খুলবে, আদৌ কাজ থাকবে কিনা স্পষ্ট নয়। এ অবস্থায় কারবারে নামা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল! যত দেরি করতো বিপদ তত বাড়তো।

ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। পোনা মাছ প্রায় শেষ। খানকয়েক তেলাপিয়া আছে আর কিছু চিংড়ি। প্রথম দিনের তুলনায় ভালোই হয়েছে। অনেক চেনা লোক দেখেছে, কেউ কিনেছে কেউ কেনেনি। অনেক অনেক রকম উপদেশ দিয়েছে গায়ে পড়ে। কেউ ভুরু কুঁচকে দেখেছে, কেউ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জ্ঞান দিয়েছে। তবে কয়েকজন বাহবাও দিয়েছে। উৎসাহ দিয়েছে 'কোনো কাজ ছোটো নয়' স্মরণ করিয়ে। সব মিলিয়ে কী হলো সেটা বাড়ি গিয়ে টাকা গুনে দেখে তবে বোঝা যাবে। তবে লাভ থাকবে বলেই মনে হয়। বিপুল বলেছে ১০টার মধ্যে বিক্রি বাট্টা শেষ করতে হবে, থানার নির্দেশ। পুলিশ, সিভিক পুলিশ আর শাসক দলের নেতারা টহল দেওয়া শুরু করবে। রোজ দু-একজনকে ধরে নিয়ে যায় থানায়, পরে অবশ্য ছেড়ে দেয়, কিন্তু কিছু মালকড়ি খসে সবারই। কী দরকার বেশি ঝামেলায় গিয়ে। তাড়াতাড়ি ফেরাই ভালো। কিছু যদি বেঁচে যায় তো বাড়িতে লেগে যাবে। মাছটা আজ ভালোই তুলেছিল। চিংড়ির সাইজটা খারাপ নয়। পোনা মাছটাও দেখে মনে হচ্ছে স্বাদ ভালো হবে। তেলাপিয়া তো লাফাচ্ছে। বাড়ি গিয়ে হাঁড়ির জল বদলিয়ে ওদের রেখে দেবে। ওদের কিছু খেতে টেতে দিতে হয় কিনা বিপুলের থেকে জানতে হবে। এখনও আধ ঘন্টা সময় আছে হাতে। যদি চিংড়িটা উঠে যায় তো ভালো, পোনা মাছ যদি পুরোটা বিক্রি না হয় তো বাড়িতে আজ মাছ ভাত খাওয়া যাবে। বাবলু খুশি হবে খুব। বেশ কিছুদিন একবেলা ডিম খাচ্ছে আর একবেলা নিরামিষ। মাছ ঢোকেনি এই সময়ে বাড়িতে। এত মাছ বিক্রি করলাম সকাল থেকে, আর নিজের ছেলে, বৌয়ের মুখে যদি এক টুকরো মাছ তুলে দিতে না পারি তো এত কষ্ট করা কেন?

সকাল ১০টার মধ্যেই অল্প কিছু অবিক্রিত মাছ নিয়ে প্রদীপ ফিরে চলল বাড়ি এক নতুন পরিচিতি নিয়ে। রাজুর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিদিনের ভ্যান ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে মাছওয়ালা প্রদীপ। এখন ওর জামা, প্যান্টে মাছের রক্তের দাগ, নোংরা ছোপ ছোপ দাগ। হাতে, গায়ে এখানে ওখানে আঁশ আর কালো হয়ে যাওয়া রক্ত। ওর শরীর জুড়ে মাছেদের গন্ধ—পোনা, চিংড়ি, তেলাপিয়া, শরীরের ঘাম, মাছের রক্তের আলাদা আলাদা গন্ধ মিলে মিশে নাকে আসছে জীবনের তীব্র সুগন্ধ।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

সমুদ্রগড়, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৬২৫৬, ৯৩৩৩২১২৬৭০

আমাদের পরিষেবা

● ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা। ● ব্যাঙ্কে সকল রকম আমানতের ব্যবস্থা। ● কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। ● অভাবি চাষিদের পাট ক্রয়। ● মিনি ডিপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা। ● হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা। ● হাসকিং মিলে ধান ভাঙানোর ব্যবস্থা। ● কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ।

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

সাহাদুল খান
সম্পাদক

হামরাজ সেখ
ম্যানেজার

Sl. No. 71

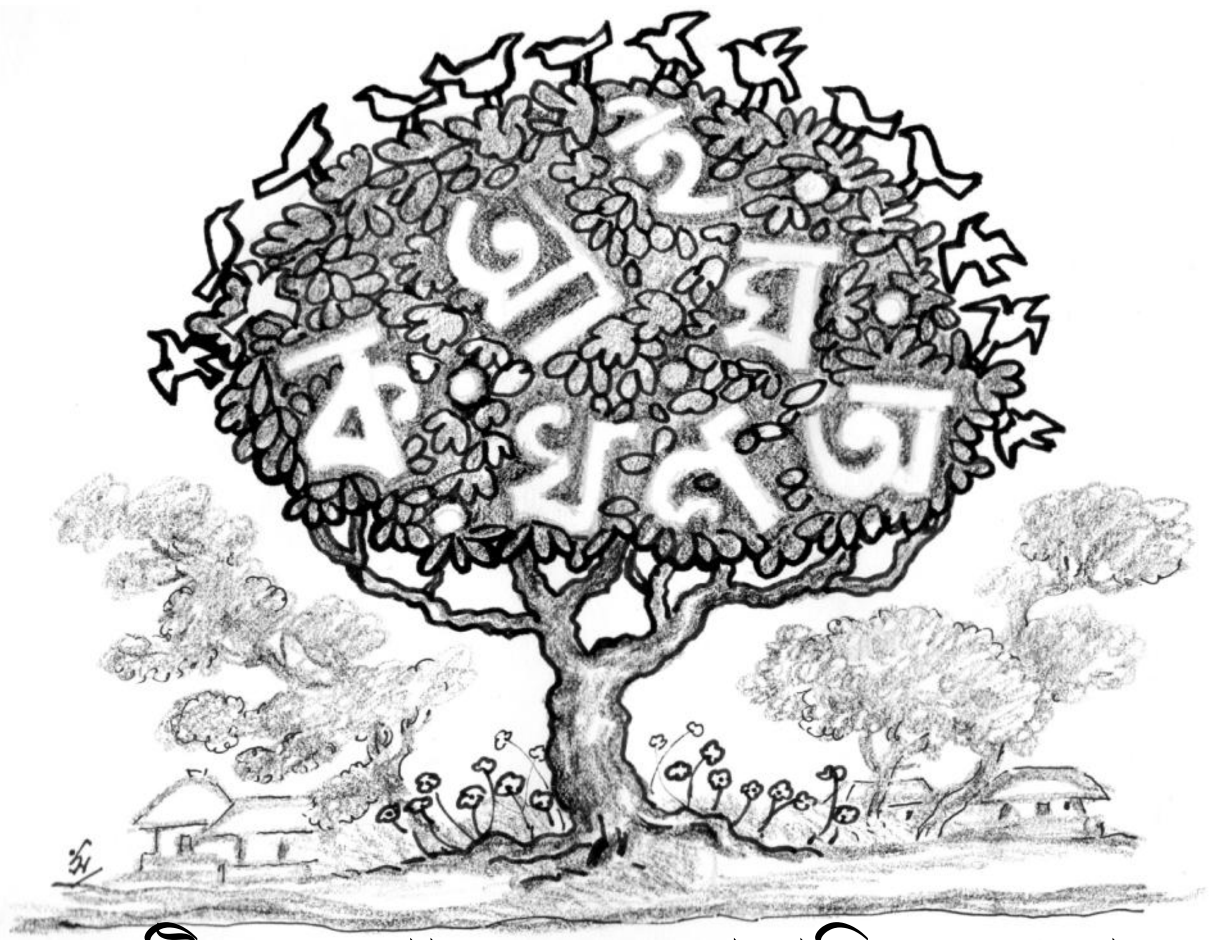

একটি কদমগাছ এবং ভাষাদিবসের গল্প

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

হিম মাখা আকাশে একটুকরো চাঁদ ঝুলে আছে। পূর্ণিমার এখনও দশ দিন বাকি। কলাগাছের ফাঁকে চাঁদটাকে বাঁকা ত্যাবড়ানো চাকুর পারা দেখায়। অচেনা অদ্ভুত আড়ষ্ট। কুয়োর পানিতে তার ছায়া পড়ে না। আসশ্যাওড়ার পাতা থেকে উড়ে যাওয়া জোনাকির মতো একটুকরো জোসনা ছলকে ওঠে তারপর আকাশটাকে নিভিয়ে দিয়ে কোথায় যে চলে যায় টের পায় না ইমতিয়াজ। 'ই চাঁদ হামদের লয়।' সালমা বলে ওঠে একসময়।

ইমতিয়াজ নিজেও কি এরকম ভাবেনি? কতবারই তো ভেবেছে এই ভাড়াবাড়ি থেকে এই বিদেশ বিভুঁই ছেড়ে একদিন গাঁয়ে ফিরবে। মনে মনে সে কলকারখানার ধুঁয়ো সরিয়ে জামাপ্যান্টের কালি মুছে হালিমগঞ্জের ভঙ্গিতে পড়ে আছে। বিষণ্ণ মনমরা চোখে শুকনো বালির শব্দ। সাইকেলের টুংটাং আওয়াজ তুলে কেউ হাট থেকে ফিরছে এখন। তার হাটের কথা মনে পড়ে। মাছের কথা মনে পড়ে। বেকো নদীতে এর মধ্যেই জল শুকিয়ে যায়নি নিশ্চয়ই। ভেলসা তুড় মাগুর এবং বাঁশপাতা মাছেরা খলবল করছে রুপোলি জলে। বেকো নদীর নড়বড়ে সেতু পেরিয়ে বাঁদিকের ঝোড়ঝাড় পেরিয়ে ভাঙা একতলা জিন বাড়ি। সেখানে রাতপরীরা এসে কল্পনার ডানা মেলে ওড়ে। ঘরের গা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা সজনে গাছ। গাছের ডালে একটা লক্ষ্মী প্যাঁচার অবিরাম উল্লাস। মাথার উপর ঝুলে আছ মহব্বতী চাঁদ। তার রোশনাইয়ে চিকচিক করছে চারপাশ। মরা চাঁদ দেখতে দেখতে ইমতিয়াজ নিজেও তো এরকম ভেবেছিল— দ্যাশ ছাড়লে চাঁদও পাল্টে যায়।

গাঁ ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে মন টেকেনি তার। অথচ পেটের দায়ে তাকে ফেলে আসতে হয়েছে সবকিছুই। মাটি শেকড় এমনকি নিজের চৌদ্দ পুরুষের শেখানো বুলিও। গাঁয়ে ঘরে এখন আর তেমন কাজকম্ম নেই। পাঁচ বিঘা জমিজিরেত যা আছে তা দিয়ে সম্বচ্ছর ভাত জোটে না। কলেজে ভর্তি হয়েই তাই পড়া ছাড়তে হয়েছিল তাকে। খরচ চালাতে পারেনি তার বাপ নিজাম শেখ। ধান না হলে পেট চালানোই দায়, তার আবার কলেজ! সে তো গোদের উপর বিষফোঁড়া। পড়াশোনায় দিমাগ ভালো না হলেও গড়পড়তা মাঝারি মানের তো ছিল। ঘষে মেজে নিলে হতেও পারত। নিজের এই আফশোস সে পুষিয়ে নিতে চায় পোলাপানের মধ্যে। তাই বলে সাহেব বানাতে হবে এমন মাথার কিরা কেউ দেয়নি। এ নিয়ে বচসা হয় সালমার সাথে।

দিনরাত খেটেখুটে দুটো কাঁচা পয়সার

মুখ দেখেছে ইমতিয়াজ। এর মধ্যে সালমার বায়নার শেষ নেই। নতুন আলমারি, টিভি, ফ্রিজ তো আছেই। মাস গেলে এটা ওটা সাতকাহন। আব্বা, চাচাদের কথা বললেই বলবে, গায়ে জলকাদা মাইখে খোয়াব ভুইলে জনমভর চাষাই থাক তুমি। হায়াত মউত আল্লার দখলে কিন্তু কাম ইনসানের নিজের হাতে। এর জন্যই ইমতিয়াজের দৌড়ঝাঁপের মাঝে বিশ্রাম অল্পই। কিন্তু সে তো অন্য জীবনই চেয়েছিল। কলমকাঠি চালের জীবন। আসনলয়া ধানশীষের অদ্ভুত হাতসান দেওয়া ডাক। সবকিছু খিচড়ে দিয়েছিল হরেন মাস্টার। কলেজ ছাড়ার পরের দিনই সামনের আধভাঙা দুটো দাঁত নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, কিরে পড়া ছাড়লিস কেনে, ইমতিয়াস? আর ত কিছু হবেক নাই, লকের ভাগচাষ কর।' এর মধ্যে লাজশরমের কিছু নেই, তবু মাথাটা আচমকা গরম হয়ে গিয়েছিল—'পড়াশুনা শিকলেই আমারে কে চাকরি দিবেক স্যার? ই ত আর গাছের কেন্দ পাকা লয় যে হিলালেই টুপটাপ কইরে পড়বেক।' কিন্তু মনে মনে ভেবেছিল যে-করেই হোক হরেন মাস্টারকে দেখিয়ে দিতে হবে যে তার মুরাদ কিছু কম নয়। হিলানোর মতো হিম্মত না থাকলেও হিল্লে একটা হয়েছিল। গায়ে গতরে জোর ছিল বলে টুকটাক কিছু মিস্ত্রির কাজ শিখেছিল বলে মেহনতের একটা চাকরি জুটে গিয়েছিল ভিন তালুকে। সারাদিন খেটেখুটে পেটের অভাব মরে তো মন দুখায়। প্রাণ খুলে বুকের দুয়ার দোহাট করে কথা বলার তেমন লোক নেই, যাদের গা থেকে মাটির ভাপ বেরোয়। হিন্দি ভোজপুরি মিলিয়ে এক অদ্ভুত খোট্টা ভাষা। দায়ে পড়ে দাঁত চিপে কথা বলে বটে, কিন্তু ভিতরটা আইঢাই করে। কোঁথ পেড়ে বাতচিত করলে মন সাফ হয় না কিছুতেই। পেট খোলসা করে ভিতরের সব দমবন্ধ কষ্ট সে ভাগ করে নিতে পারে না সবার সঙ্গে। মায়ের কথা মনে পড়ে। ভাষা তো মা। মনর সব আঁকুপাঁকু তুলে আনে। চোখের জল মুছায়। হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়।

মাটি বদলে গেলে ভাষা বদলে যায়। তখন আলাদা ভূগোল আলাদা চাঁদ আলাদা গাছ আলাদা পাখি। তারা কেউ তার চোখমুখের আঁকিবুকি পড়তে পারে না। সে কথা সে সালমাকে বলতেও থমকায়। বললেই বলবে, 'তুমি মরদ না আওরাত বল তো। এত লরম মন তুমার। কী আছে হালিমগঞ্জে। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেইললেও পেটের গাভা ভরে না।' সেই সালামই এই সহজ কথাগুলোকে তার মুখ থেকে টেনে বাতাসে ভাসিয়ে দিল আলগোছে ভাবে। হাওয়ার ভেতর থেকে শব্দগুলোকে টেনে আরেকবার শুনতে ইচ্ছে করল ইমতিয়াজের। কথাগুলো সত্যিই সালমা বলছে তো।

দিনের বেলা কাজেকম্মে সময় বিতায় ইমতিয়াজের। তখন সাতপাঁচ নানা কথা ভাবার ফুরসত কোথায়। রাত এলেই কথার পিঠে কথা গেঁথে ফিরে আসে গজ-বিল, হাতিখেদার মাঠ। পিলপিল করে তারা ঢুকে পড়ে মনে। তখন সে দেখতে পায় হাতিখেদার মাঠে নেমে এসেছে ভুতুড়ে আঁধার। চারদিক কেমন কালো কুচকুচে হয়ে আছে। এক আচ্ছন্নতার মধ্যে দু-একটা শেয়াল ডেকে উঠে—হুক্কাহুয়া। ইমতিয়াজ জানে চোরা শেয়ালগুলো এখন বেরিয়ে আসবে মাঠেঘাটের গর্ত থেকে। তারপর গেরস্থের ঘরে ঢুকে মুখে মুর্গি নিয়ে বেরিয়ে যাবে হিমঝরা নৈঃশব্দের ভেতর। একটা কদম-চারা লাগিয়ে এসেছিল উঠোনে। তার কথাও মনে পড়ল। দাদা আব্বাকে বলেছিল, আমার এন্তেকাল হলে একটা গাছ লাগাস। গাছটা দেখলেই আমার কথা মনে পড়বে। আব্বা লাগায় নি। মানুষ কি গাছ হয় কখনো? সাদির এক বছরের মাথায় ইমতিয়াজ উঠোনে কদমগাছটা লাগিয়ে এসেছিল নিজের হাতে। এই গাছের সাথে জড়িয়ে থাকে মুনির শেখ, জড়িয়ে থাক তাদের মহব্বতের স্মৃতি। এই সাত বছরে কত বড় হয়েছে সেই গাছটা সে জানে না। তবু মনে মনে সে তার একটা আকার বানিয়ে নেয়। মাথা পেরিয়ে গাছটা হয়তো ছুঁয়ে ফেলেছে আশমানের সীমা। মানুষটা গাছের ভেতর বেঁচে থাকুক শেকড় ছড়িয়ে।

মায়ের বাতের ব্যথাটা কি বেড়েছে? অমাবস্যা পূর্ণিমা এলে তা চাগান দিয়ে ওঠে। আজ তো তেমন কিছু নয়। এখনও দশদিন বাকি। এইসব ভাবনার ভেতর দিয়ে একটা ট্রেন চলে যায় রেলসেতু পেরিয়ে। তখনই সম্বিত ফেরে ইমতিয়াজের। ছেঁড়া ছেঁড়া শেকড়গুলো জোড়া লাগাতে গিয়েও টুকরো হয়ে যায় ট্রেনের ধাতব শব্দে।

—আজ কী দিন মনে আছ তুমার?

চায়ের কাপটা নামিয়ে ধোঁয়া লাগা চোখ তুলে সালমা বলল একসময়। হর রাত কাজ থেকে ফিরলে এক কাপ চা তার চাই। এটা তার রুটিন। সালমার সওয়াল ছুঁয়ে সে ভাবছিল এখন তো মাসের মাঝামাঝি। বেতন ফুরিয়ে এসেছে। হাতে পয়সাকড়িও তেমন নেই। দোকানে কি ধার দেনা বাকি পড়ে আছে কিছু?

ইমতিয়াজ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল—কেনে বল ত?

—ই বাবা, তুমার দেখি কিছুই খেয়াল থাকে না আইজকাল।

হারানো গরু খুঁজে পেলে যেমন আনন্দ হয় সেভাবেই ইমতিয়াজ উৎফুল্লভাবে বলল—খুব মনে আছে। আইজ একুশা ফেব্রুয়ারি। ই দিন আইলে দাদুরে বেদম মনে পড়ে।

হো হো করে হেসে উঠল সালমা।

—হাইসছ যে?

—হাসব নাই? তুমি ইটও ভুইলে গেছ আইজ হামদের শাদির দিন।

কাজের চাপে মন থেকে সরে যায় অনেককিছুই। কেউ যেন ফুসলিয়ে নিয়ে চলে যায় এক চঞ্চলনগরে। কিন্তু এখন নামতার মতো সবকিছু ঝরঝর করে মনে পড়ে ইমতিয়াজের। বুঝতে পারে সালমার এই কথাগুলোর লক্ষ্য কী। তার গা থেকে আতরের খুসবু আসছে। ইমতিয়াজ জানে এই শীতের সাঁঝেও সালমা গোসল করেছে। বাথরুম থেকে গা ধুয়ে এলে শরীরে একটু আতর ছড়িয়ে নেয় সালমা। এ তার বহুদিনের অভ্যাস।

সেদিনও ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। গোল চাঁদ ছিল আকাশে। হাতে হাত রেখ সালাম বলেছিল— আইজকের দিনটা আলাদা। আইজ মহব্বতের দিন।

—ঠিক। কী সোন্দর জোসনা ফুইটে আছে, ঝকঝক কইরছে চাইরদিক। তুমারে খুবসুরত লাইগছে এই আলায়।

হাত বাড়িয়ে সালমার ডান হাত ধরেছিল ইমতিয়াজ। বিজলিবাতির ঘোরলাগা আলোয় শরমের আভা দেখতে পাচ্ছিল মুখে। স্পর্শের ভেতর সমস্ত কাঁপুনি, সমস্ত শিহরণ নিয়ে হাসছিল সালমা। এই হাসিতে আজও তাকে অন্যরকম লাগছে।

—কী দিই তুমাকে আইজ?

—কিছুই না। আইজ শুধু এই দিনটাকে আমরা ভালবাইসব দুজনে।

চমকে গিয়েছিল ইমতিয়াজ। সালমা এরকম কথা সাধারণত বলে না। একুশে ফেব্রুয়ারি তেরোই মে বা ১ নভেম্বর এলে সব কেমন ওলটপালট হয়ে যায়। ভালোবাসা এরকমই বেহিসাবি। বুকের গাভাটা বড় করে দেয় আচমকা। নিজের জীবন দিয়ে মানুষ তখন দেশের দশের মুখ রাঙিয়ে দেয়। বদলে দেয় ভূগোল, ইতিহাস। চাওয়াপাওয়ার ছোটখাটো হিসেব নিকেশ নিজের জীবনের তহবিলের খাতা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দেয় হাসতে হাসতে।

আইজ একটা ভালোবাসার দিন, মহব্বতের দিন, নিজের দ্যাশকে, ভাষাকে ভালোবাসার দিন। ইমতিয়াজ জানে। তার বুকের রক্তে টগবগ করে ফুটতে থাকে রফিক,

জব্বর, বরকতের নাম। ইতিহাস-কাঁপানো সেই গল্প। তারা নিজের ভাষাকে বাঁচানোর জন্য জীবন দিয়েছে। বাংলা ভাষা। যে ভাষায় কথা বলে সে নিজে। কথা বলে এত এত লোক। ইতিহাস সেই পলিমাটি বয়ে নিয়ে যায় কাল থেকে কালান্তরে। লিখে রাখে পাতায় পাতায়। কিন্তু কেউ জানে না তার দাদু মনির শেখের কথা। তার নাম কোথাও লেখা নেই। অথচ মানভূম যখন উথাল পাথাল। ইস্কুলে ইস্কুলে অফিসে অফিসে কাছারিতে কাছারিতে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল খোট্টা ভাষা। গর্জে উঠল মানুষ—'শুন বিহারী ভাই তরা রাইখতে লারবি ডাং দেখাই।' ডাং-এর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল গান। তার দাদু লিখেছিল। টুসুগান। কবিগান। সুর করে করে বলত। মানুষটাকে খুব একটা মনে পড়ে না ইমতিয়াজের। দাদির হাহাকার থেকে আব্বার গল্প থেকে আবছা আবছা আলো নিয়ে মানুষটার ছবি আঁকতো খাতার পাতায়। চাষাভুষা মানুষ, তবু পড়াতো একটা পাঠশালায়। সেখানে পাগড়িবাঁধা পুলিশ এসে মুনিরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়—ইস্কুলমে আপকো হিন্দিই পড়ানা হোগা। এহি সরকারকা হুকুম হ্যায়।

যারা বাংলা পড়াবে তাদের মাইনে বন্ধ হয়ে যাবে। সবাইকে শিখতে হবে হিন্দি। লাঠির ঘা দিয়ে জোর করে শেখানো হবে।

মুনির তৎক্ষণাৎ কাজে ইস্তফা দিয়ে বলেছিল—রইল তদের চাকরি। অমন চাকরিতে থুথু ফেলি— থুঃ থুঃ।

গটগট করে বেরিয়ে এসেছিল থানা থেকে। পরে জেল হাজত অনেককিছুই হয়েছিল, কিন্তু মুনিরকে টলানো যায়নি।

ইমতিয়াজ বারন্দার আবছায়া থেকে মুখ তুলে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—এই কথাগুলো কুথাও লেখা নেই। দু-একটা তারা মিটিমিট করে হাসছে।

সালমা স্তব্ধ হয়ে দেখছিল ইমতিয়াজের মুখে অদ্ভুত রোশনি এসে পড়েছে। চিকচিক করছে তার গাল। চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে তেজ। এই মানুষটাই যেন একটা চাঁদ। জোৎস্না ছড়িয়ে যচ্ছে লাগাতার।

সালমা বলল, কেউ না লেখুক। আমরা লেইখে রাইখব আমাদের মনে।

হাজার মাইল দূরের কদমগাছটা যেন চকিতে বড় হয়ে ওঠে। অনেক অনেক দূর ছাড়িয়ে যায় তার ডালপালা। হিম হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপতে থাকে উৎফুল্ল পাতারা। একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সে যেন দোল খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। ঝাকড়া গাছের শাখা থেকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মানুষটা। তার মুখ ঢেকে আছে পল্লবে পল্লবে।

—আমারে চিনতে পারছিস ইমতাজ? ই হাতের দিকে তাকা, কনহ শিকল নাই বেড়ি নাই। গায়ে চাবুকের দাগ, লাঠির দাগ দেইখতে পাচ্ছিস? চাবুক মাইরেও মাথাটা নুয়াতে লাইরেছে।

ধাদসে পিছিয়ে যায় ইমতিয়াজ, তার বুক ধুপপুক করতে থাকে ভয়ে। তবু চোখদুটো ঘোর লাগা, চিনা-চিনাই ত লাগে, যেন কুথাও দেইখেছি কখনও।

—আমি মুনির শেখ। তর ভিতরেই ত আমি লুকাই। দেইখতে পাইস না?

—মাঝে মইধ্যে পাই, কিন্তুক তুমি ইখেনে? গাছের ডালে ঝুইল্যে আছ কেনে?

—ইখেনেই ত থাকি। যে বীজ আমরা বুনলম, গাছ লাগাইলম, তার ডাল কাটা হইছে। গাছ মরি গেলে আমরা থাইকব কুথায়? ইট আঁইকড়েই ত আছি।

সালমা বলল, কী ভাইবছ অমন হাঁ কইরে আশমানের দিকে তাইকে?

ইমতিয়াজ কোনো উত্তর দিল না, সে ভাবতে লাগল কদমগাছটার কথা। শিকড় কতটা গভীরে গেলে গাছ ছায়া দেয়।

With best compliments of

brm
Bhadreswar Rice Mill
....WE CARE FOR YOUR HEALTH....

Sl. No. 10

With best compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 70

হিরের আংটি

রেণুকা মুখার্জী

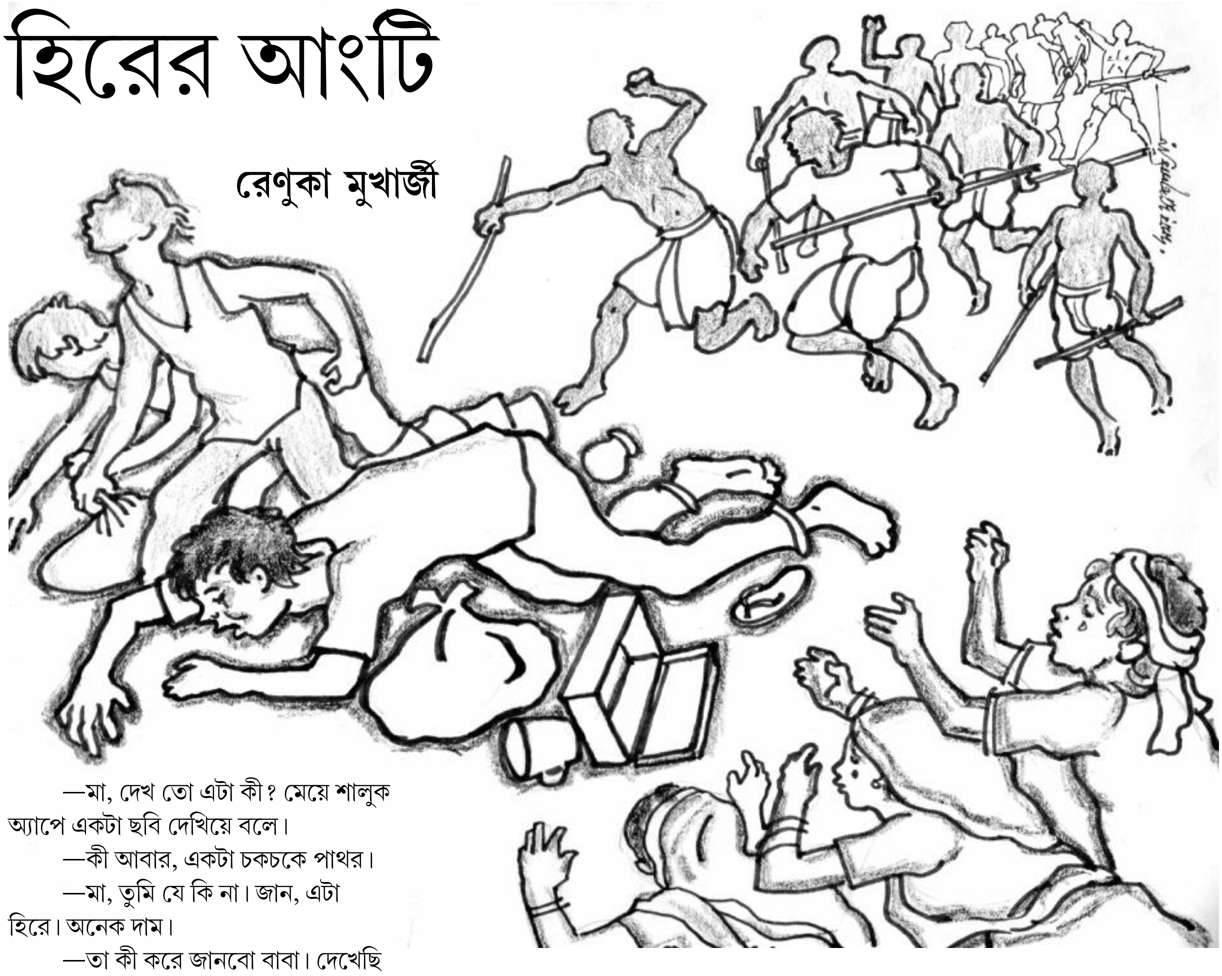

—মা, দেখ তো এটা কী? মেয়ে শালুক অ্যাপে একটা ছবি দেখিয়ে বলে।

—কী আবার, একটা চকচকে পাথর।

—মা, তুমি যে কি না। জান, এটা হিরে। অনেক দাম।

—তা কী করে জানবো বাবা। দেখেছি কখনো। লোকের মুখে নাম শুনেছি।

—জান তো সঞ্জয় এটা কিনেছে! ওটা দিয়ে আমাকে আংটি করে দেবে।

বলেই সামনে থেকে চলে গেল।

মা জানে, মেয়ে এখন ফোন নিয়ে বসবে। কোনো দিকে খেয়াল থাকবে না। ঘরের কাজেও সামান্য সাহায্য করবে না। মা কিছু বলেন না। এখন তো ওদের নতুন জীবন শুরু হতে চলেছে। আর তো মাত্র কটা মাস। মেয়ে তার হিরের আংটি পরবে। তিনি তো একজোড়া পাতলা সোনার দুল ছাড়া আর কোনো সোনার জিনিস ছুঁয়েও দেখেননি কোনোদিন। কী পেয়েছেন তিনি জীবনে। শ্বশুর-শাশুড়ি বড় বড় দুই ননদ। রাতে শোবার জায়গাটুকুও ছিল না ঠিক মতো। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকা, এই বুঝি কারো চোখে পড়বেন। তার উপর সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি। এরই মধ্যে তাঁর শান্তি ছিল স্বামী তাঁকে ভালোবাসতেন। আর সে ছিল সৎ আর পরিশ্রমী। কী যে হলো মানুষটার। একদিন কাজ থেকে এসে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। কতই বা বয়স তখন। মাত্র বছর পঁয়তাল্লিশ।

তার পরের জীবনের কথা তিনি ভুলে যেতে চান। পারেন কই! লোকের বাড়ি কাজ করা, শাকসব্জি বিক্রি করা, শিক্ষকদের হাতে পায়ে ধরে মেয়েটার লেখাপড়া চালানো। শালুকের বাবা প্রায়ই বলতো—আমার মেয়েকে যেমন করে হোক লেখাপড়া শেখাবো। তুমি দেখে নিও মলিনা।

সে পেরেছে। মেয়েকে একটা পাশ তো করিয়েছে। সেই মেয়ে তার হিরের আংটি পরবে। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। মেয়েকে সাধ্যমতো ঘটা করে বিয়ে দেবেন। মেয়ের টিউশনির সব টাকা জমিয়েছেন। আর কোনো পিছুটান নেই তার। দরকার হলে না হয় কোনো বাড়িতে সবসময়ের লোক হিসাবে থেকে যাবেন। রাতদিন এসবই ভেবে চলেছেন শালুকের মা।

—এই, অত দাম দিয়ে হিরে কেন কিনলে? টাকাটা হাতে থাকলে কত কাজে লাগতো। শালুক বলে।

—বেশ করেছি কিনেছি। আমার বুঝি কোনো সাধ থাকতে নেই! আমরা তো হিরে কেটে পালিশ করি। সেই উজ্জ্বল হিরের গয়না যখন মহিলারা পরেন তখন তাদের চেহারাই বদলে যায়।

—ওরা সব বড় ঘরের সুন্দরী মহিলা।

—আমার শালুক কি দেখতে খারাপ! না হয় একটু কালো। কী যেন সেই লাইনটা— 'দেখেছিলাম কালো মেয়ের / কালো হরিণ চোখ'। আমি তো সেই কালো চোখেই মজেছি। তাছাড়া কি জানিস তো, হিরেটা অনেক কম দামে পেয়েছি। মালিক একদিন বললেন—এই কাজটা দুদিনের মধ্যে উঠিয়ে দিতে পারলে তোদের ইনাম দেব। আমরা চারজন মিলে কোনো রকম বিশ্রাম না করে বলতে পারিস না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কাজটা শেষ করলাম। ওরা টাকা পেল। আমি সস্তায় হিরেটা কিনলাম।

এর ক'দিন পরেই সঞ্জয় কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। বেশি কথা বলে না। শালুক বার বার জিজ্ঞেসা করে—কী হয়েছে তোর?

— কই কিছু হয়নি তো।

শালুকের মা মনে মনে হিসাব করেন। কতজনকে নিমন্ত্রণ করবেন। দানে কী কী দেবেন। সঞ্জয় গ্রামেরই ছেলে। ছোটবেলা থেকে চেনেন। সবাই ভালো ছেলে বলে জানে। শালুকের চেয়ে বড় পরীক্ষায় পাশ

করেছে। টাকার অভাবে সঞ্জয় বা শালুক কেউই কলেজে যেতে পারেনি। বাড়ি থেকে কলেজ অনেক দূরে। সঞ্জয়েরও বাবা নেই, মা আর এক ভাই আছে।

একদিন সঞ্জয়ের মা এলেন শালুকদের বাড়ি।

—শালুক মা, সঞ্জয়ের খবর কিছু জান? কেমন আছে সঞ্জয়?

—ওতো ভালোই আছে, আমার সঙ্গে গতকালও কথা হয়েছে।

—সঞ্জু তোমাকে কিছু বলেনি?

—না তো।

—তুমি জান না সঞ্জু যেখানে কাজ করে সেই সুরাটে কীসব অসুখের জন্য দোকান বন্ধ। এমাসে মাইনে পেয়েছে। সামনের মাস থেকে পাবে না। ওরা পাঁচজন একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতো। তিনজন এখানকার গ্রামের ছেলে, তারা চলে গেছে। এখন থাকলে পুরো ভাড়া ওদের দুজনকে দিতে হবে। লকডাউনে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম। ওরা যে বাড়ি ফিরবে তারও উপায় নেই। আমার ছেলেটার কী হবে দিদি?

শালুকের মা সঞ্জয়ের মা'র পিঠে হাত রাখলেন।

—কাঁদবেন না দিদি । দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তোমার নাকি দোকান বন্ধ? তোমরা নাকি মাইনে পাবে না? শালুক ফোনে জিজ্ঞাসা করে।

সঞ্জয় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে—

—হ্যাঁ।

শালুক এরপর অনেক কথা বলে যায়।

—কী হবে? তোমরা এখন কী করবে?

—দেখি, বলেই সঞ্জয় ফোন রেখে দেয়।

লকডাউন প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়—বেড়েই চলেছে। টাকা তলানিতে। কোনো রকমে ভাড়া মিটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একজন পশ্চিম বর্ধমানের অন্য জন বাঁকুড়ার। পথে পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক যাত্রী মেলে। ওরা এখন নামহীন, পরিচয়হীন শ্রমিক। ওদের একমাত্র পরিচয় পরিযায়ী শ্রমিক। ওরা এন.এইচ.-৫৩ রোড ধরে হাঁটছে তো হাঁটছে। ওরা দেখেছে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাতে প্রায় ১৬/১৭ দিন লাগবে। ওদের ক্ষেত্রে হয়তো আরও বেশি লাগতে পারে। সব সময় তো সমান তালে হাঁটতে পারবে না। নাগপুর, রায়পুর উড়িষ্যা, জামসেদপুর পেরিয়ে খড়গপুর হয়ে যেতে হবে। সঙ্গের খাবার কবেই শেষ। প্রথম প্রথম দুবেলা সস্তার হোটেলে খেলেও এখন একবেলাই খায়। স্নান প্রায়ই হয়না। কোথাও সাধারণের জন্য টয়লেট পেলে তবেই একটু স্নান। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হলেও উপায় থাকে না। একটু ছায়া পেলে খানিক বিশ্রাম। সারারাত ধরে পথ চলা। চটি ছিঁড়ে গেছে। শার্ট প্যান্ট চরম নোংরা। চুল প্রায় পাগলের মতো। চোখ লাল। এখন ওরা আয়না দেখলে নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারবে না। একদিন পরিচয় হয় নিকিতা নামে আঠারো বছরের পরিচারিকার সঙ্গে। নিকিতাকে দেখেই সঞ্জয়ের শালুককে বড়বেশি করে মনে পড়ে। যথাসাধ্য চেষ্টা করে নিকিতাকে সাহায্য করার। হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয়। এ পর্যন্ত দুজায়গায় যুবকরা ওদের দুবেলা খাবার দিয়েছে। এরই মধ্যে খবর পায় ট্রেনে কাটা পড়ে ষোল জন শ্রমিক মারা গেছেন। ট্রাকচাপা পড়েও মারা গেছেন আরো শ্রমিক। কী জানি ওদের ভাগ্যে কী আছে, সঞ্জয় ভাবে। খড়গপুর পেরিয়ে ওরা একটা ট্রাক পেয়েছে। ট্রাকটা ওদের বর্ধমান বাসস্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে নিজের গন্তব্যে।

এক সময় সঞ্জয় একা হয়ে গেছে। পথের সাথীরা পথেই হারিয়ে গেছে। সঞ্জয়ের মাথা ঘুরছে। চোখেও ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। পা টলে যাচ্ছে মাতালের মতো। ওর মনে পড়ে সেই বিখ্যাত গান 'কত দূর, আর কতদূর, বল মা।' সে আর দেখতে পাচ্ছে না। প্রচণ্ড রোদ। দুদিন না খাওয়া। আর পারছে না সঞ্জয়। এবারই হয়তো পড়ে যাবে। আন্দাজে আন্দাজে পথ চলা। সূর্য চলেছে পশ্চিমে। সঞ্জয়ও বাড়ির পথে। ওই তো ঝুরি নামা বট। ঘোষেদের পুকুর, ছেলেদের খেলার মাঠ। মনটা ভরে ওঠে। একটু পরেই মায়ের হাতের এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। ওই তো ওর প্রাইমারি স্কুল। মাস্টারমশাইরা কত ভালোবাসতেন। এখনও দেখা হলে....। ওরা কারা? ওদের হাতে লাঠি কেন! সঞ্জয় ভাবে।

—এই শালা একদম গ্রামে ঢুকবি না। কোথা থেকে কী রোগ বয়ে এনেছিস তার ঠিক আছে! তোর পাপে আমরা মরবো কেন? শালা বোকা...। ভিনরাজ্যে কামাতে গেছে।

বলেই লাঠি তোলে। সঞ্জয় মারার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে শালুক আর সঞ্জয়ের মা। সঞ্জয়ের মা পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে ছেলের দিকে। গ্রামের কিছু লোক তাকে আটকায়।

—তোমরা ওকে একদম ছোঁবে না। তোমাদেরও সংক্রমণ হবে।

সঞ্জয় একবার চোখ তুলে তাকায়। আবছা দৃষ্টিতে দেখে মায়ের আর শালুকের মুখ। হাত তুলতে চেষ্টা করে পারে না। একসময় সব শেষ হয় মায়ের চোখের সামনে। একটু জলও দিতে পারেন না। দাদারা চলে গেছে। ওরা প্রিয়জনের মৃতদেহ পাহারা দিয়েছে। নেমেছে অন্ধকার রাত। কালো পেঁচারা উড়ে গেছে। শেয়ালরাও ওৎ পেতে আছে একটু দূরে। রাত শেষ। মৃতদেহ সৎকার হবে। জীর্ণ শার্টের পকেটে একটা ছোট্ট কৌটোয় পাওয়া যায় একখণ্ড উজ্জ্বল হিরে। প্রেমের দ্যুতিতে আরও উজ্জ্বল সে হিরে।

With best compliments of

RADHAKRISHNA AGRO PRODUCTS
&
RADHABALLAV AGRO PRODUCTS

Banpas Rly. Station Road, Belari, Purba Bardhaman, Mob. 7797278671, 72

Our Brand Name of Product
'RADHASHREE RICE'

Sl. No. 49

৭০ কোটির চিঠি

অভিজিৎ মিত্র

ভারতীয় নৌবাহিনীর ভাইস চিফ অ্যাডমিরাল সান্যাল সদ্য জাহাজ থেকে নেমে নাভাল কমাণ্ডের মুম্বই অফিসে এসে বসলেন। আরব সাগরে লাল আবির ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঠিক যেন ক্লদ মনে'র পেইন্টিং। বিগত পনেরো দিন জাহাজে একটানা কাজ। আরব সাগর চষে ফেলতে হয়েছে। কেউ এই সময় পাকিস্তান থেকে আরব সাগর হয়ে ভারতে ঢুকছে কিনা, কেউ জলপথে নৌকা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে কিনা, আবার সাথে সাথে জাহাজে কোনো কেবিন ক্রু করোনায় সংক্রমিত হলো কিনা— একসাথে সবকিছু সামলাতে হয়েছে। সৌভাগ্য, এই পনেরো দিন জাহাজে কারো কিছু হয়নি। সবাই সুস্থ। তাই জাহাজ থেকে নেমেই সোজা নিজের অফিসে এসেছেন, একটা কাজ আজ করেই যাবেন।

কাল বিকেলে একটা ঘটনা সান্যাল সাহেবের মনে ঘা দিয়ে গেছে। জাহাজে ডেকের ওপর রাখা চারটে প্লেনের একটার চাকা কিভাবে জ্যাম হয়ে গেছিল। স্টাফ-অফিসার কেউ পারল না ওটা সচল করতে। পাড় থেকে এক স্পিডবোটে দুজন খালাসি এসেছিল জাহাজে তেল ভরতে। ওরা এসে অদ্ভুতভাবে দড়ি আর শাবল দিয়ে সেই চাকা উদ্ধার করে দিল। সেই প্লেন তারপর উড়ে গিয়ে সমুদ্রে এক চক্কর দিয়েও এল। উনি দুজনকে ডেকে পাঠালেন।

—তোমাদের নাম কী?

প্রশ্নটা শুনে দুজনে দুজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একজন আমতা আমতা করে উত্তর দিল।

—স্যার, আমাদের তো নাম হয় না। আমরা এখানে ক্যাজুয়াল খালাসি। আমাদের বুকপকেটে একটা করে নম্বর সেলাই করে দেওয়া হয়। আমাদের দুজনের নম্বর ৫০ আর ৫১। এই যে দেখুন।

সান্যালবাবু দেখে একটু অবাক হলেন।

—নাম হয় না মানে? তোমাদের নাম নেই?

—না স্যার, আমাদের কেউ নাম ধরে ডাকে না। নম্বর ধরেই ডাকে। এটাই বহু বছরের রেওয়াজ। আমরা সরকারি হিসেবে তেল কোম্পানির কাছে দিনে ৩৮৭ টাকা পাই। একমাস কাজ করি। পরের মাস বসি। আমাদের জায়গায় অন্য খালাসি আসে। পরের মাসে আবার আমরা। এভাবেই বছরে ছ'মাস কাজ করি আর ছ'মাস ঘরে বসি।

—কী কী কাজ পারো?

—সব পারি স্যার। পেটের জ্বালায় সব কাজ শিখে রাখতে হয়েছে। বাথরুম পরিষ্কার থেকে ফ্ল্যাগম্যানের কাজ, সব।

আজ তাই সান্যালসাহেব অফিসে এসেছেন ওনার বস চিফ অ্যাডমিরালকে চিঠি লিখতে। এইসব কাজের মানুষগুলোকে যাতে মানুষ হিসেবে ট্রিট করা হয় একটা মিনিমাম সম্মান পায়। অন্তত একটা আইডেন্টিটি কার্ড, যাতে ওদের নির্দিষ্ট কোনো ক্যাডেট হিসেবে উল্লেখ করা থাকবে। আর সেখানে ওদের ফটো সমেত নাম লেখা থাকবে। সেই নাম ধরেই ওদের ডাকা হবে, ৫০-৫১ হিসেবে নয়। ল্যাপটপটা সবে অন করেছেন, ওনার আর্দালি ঢুকল।

—স্যার, একটা পার্সোনাল চিঠি আছে। আপনার নামে। একটু আগে ড্রপবক্স খুলে এটা পাওয়া গেছে।

চিঠি? তার নামে? সান্যালসাহেব একটু অবাক হলেন। উনি মাত্র দুমাস হল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। তাকে তো কেউ চেনে না!

—দেখি, কী রকম চিঠি। কে দিয়েছে? কার হাতে দিয়ে গেছে?

—কেউ জানে না স্যার। রাস্তার ওপর বক্স খুলে পাওয়া গেছে। চিঠিটা হিন্দিতে নয় বলে কেউ পড়তে পারেনি। আপনার জন্যই রেখে দেওয়া হয়েছে। চা আনাব স্যার?

—হ্যাঁ আনো।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সান্যালসাহেব অবাক হলেন। দুটো নোংরা ভাঁজ হয়ে যাওয়া ফুলস্কেপ কাগজ। চারভাঁজ। চিঠির ওপর গোটা গোটা অক্ষরে কাঁচা হাতের লেখায় ইংরাজিতে লেখা অ্যাডমিরাল সান্যাল। ভেতরে বাংলায় লেখা এক চিঠি। কাঁপা হাতের লেখা। পেন্সিলে। ওরা চেনা কেউ নয়। শেষে কোনো নাম নেই।

—স্যার খুব কষ্টে পড়ে আপনার কাছে এই চিঠি লিখিছি। দু'মাস আগে আমরা এক কনস্ট্রাকশন সাইটে দিনমজুরের কাজ করছিলাম। আমাদের একজন লোহার খাঁচায় উঁচু থেকে পড়ে মাথা ফেটে রাস্তায় ছটফট করছিল। পুলিশ আসেনি। পাবলিক দেখছিল, সেই সময় আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের কাঁদতে দেখে আপনি গাড়ি থামিয়ে নেমে আমার সঙ্গে পুলিশকে বলেছিলেন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। হাসপাতালে যাবার পর চিকিৎসায় আমাদের

সেই বন্ধু ভালো হয়ে যায়। সেদিন দেখেছিলাম আপনার বুকে জ্বলজ্বল করছে সোনার পাতে লেখা নাম 'অ্যাডমিরাল সান্যাল'। বুঝেছিলাম আপনি বাঙালি। আজ তাই বিপদে পড়ে আপনাকেই লিখছি স্যার।

সান্যালসাহেবের মনে পড়ল। সেদিনই উনি এখানে কাজে জয়েন করেছিলেন। অফিসে আসার মুখে ঘটেছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উনি আবার চিঠিতে চোখ রাখলেন।

—আমাদের একটু মাঝসমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসতে পারেন স্যার? জীবনের বাকি কটা দিন অন্তত শান্তিতে প্রকৃতির মাঝে বাঁচতে চাই। এভাবে কুকুর-ছাগলের মতো জীবনে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি। আপনার মতো অনেক বড় বড় জাহাজ আছে। মাঝ সাগরে আমাদের সঙ্গে কিছু কাঠের গুঁড়ি বা বাঁশ বা প্লাস্টিকের জঞ্জাল ফেলে দেবেন। যে'কদিন বাঁচব, আমরা সেগুলো ধরেই ভেসে থাকব। আর কিছু চাই না।

সান্যালসাহেবের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। এরকম বেয়াড়া আবদার তো কেউ কখনো করে না! আরেকবার প্রথম থেকে চিঠিটা পড়লেন। মাথা খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। চিঠির ভাষা থেকে অশিক্ষিত বলেও মনে হচ্ছে না। তাহলে?

—আমার বাড়ি সুন্দরবনে। বাবা নেই। দাদু সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরেনি। পরিবারে আমি একা পুরুষ মানুষ। তাই উচ্চমাধ্যমিক দিয়েই কাজে লেগে পড়লাম। মাছ ধরে আর মধু বেচে কি অতগুলো পেট চলে? বিপিএল কার্ড আছে; কিন্তু রেশন দোকানে অর্থেক জিনিস দেয় না, কম কম দেয়। কিছু বললে পার্টির ভয় দেখায়। তাই মুম্বাই চলে এলাম বাড়ি তৈরির মিস্ত্রি হয়ে। বিয়ে করলাম। বউ বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। একটা ছোট্ট এক বছরের ছেলে। দিন আনি দিন খাই। বাড়িতে মা'কে কিছু টাকা পাঠাই। কিন্তু আপনার সঙ্গে যেদিন দেখা হল, তার ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় সবকিছু হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমার কাজ, আমার বউয়ের কাজ। আমাদের দেশে নাকি মহামারি লেগেছে। কারো ছোঁয়া লাগলে মানুষ মারা যাচ্ছে। মালিক কাজ বন্ধ রেখে চলে গেল। আমাদের বলল, বাড়ি চলে যা। কিন্তু কোথায় যাব? কীভাবে যাব? সব তো বন্ধ। মালিকের ফ্ল্যাটবাড়ি যেখানে বানাচ্ছিলাম, সেখানে পাশে ঝুপড়ি বেঁধে থাকতাম। কদিন পর পুলিশ এসে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। দৌড়ে গেলাম সামনের ওভারব্রিজের নিচে। সেখানে গিজগিজ করছে মানুষ, সবাই পুলিশের লাঠি খেয়ে এসে মাথা গুঁজেছে। পেটে ভাত নেই। পরের দিন পুলিশ আবার এসে বেদম মারতে মারতে সেখান থেকেও তাড়িয়ে দিল। এবার গিয়ে উঠলাম একটা নালার পাশে, ঝোপে ঘেরা, দুর্গন্ধ। পুলিশ এখানে দেখতে পাবে না। আমরা ছয় বন্ধু, পরিবার নিয়ে। তিনদিন আমরা কেউ কিছু খাইনি। ছেলেটা দুধ না পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। গায়ে জ্বর। শুনলাম কোথায় নাকি এক পার্টি খেতে দিচ্ছে। আমরা দৌড়লাম। তিনদিন পর সেই প্রথমবার রাস্তার ওপর বসে কুকুরদের সঙ্গে খেলাম। ফেলে দেওয়া খাবার এনে ছেলেটাকে খাওয়ালাম। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে হেঁটে গেলাম মালিকের বাড়ি। যদি কিছু টাকা পাই। দারোয়ান তাড়িয়ে দিল। তারপর যখন কোনো পার্টি খেতে দেয়, খাই। আবার দু'দিন না খেয়ে থাকি। কয়েকদিন পর বলল, বান্দ্রায় নাকি সরকার আমাদের ট্রেনে চাপিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দেবে। ছেলেটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে গেলাম। কিন্তু আবার পুলিশের মার খেয়ে ফিরলাম। এবার বউয়ের গলার রুপোর হারটা এক পুলিশকে দিলাম। সে আমাদের একটা ঝুপড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। এগুলো নাকি সরকার বানিয়েছে এই মহামারির জন্য। খাবার নেই। শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই। মাঝে মাছে এক ডাক্তারবাবু এসে আমাদের দেখে যান। তো, এক সপ্তাহ পর এসে আমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। বলল, হাসপাতালে দিতে হবে। সঙ্গে আমাদের যেতে দিল না। শুধু একজন পুলিশ বলে গেল, আমরা নাকি কুকুর-বেড়ালের জাত। আগে ৩০ কোটি ছিলাম, এবার মাহমারির পর ৭০ কোটি হয়ে যাব। আমরা জন্মেই কেন মরে যাই না! আমার বন্ধুরা খিদে সহ্য করতে না পেরে ঠিক করল ১৫০০ কিলোমিটার হেঁটে তেলেঙ্গানা হয়ে ছত্তিশগড় হয়ে ওড়িষা হয়ে সুন্দরবন যাবে। ঘুরপথে, জঙ্গলের ভেতরের রাস্তা দিয়ে। এক দালাল টাকা নিয়ে ওদের রাস্তা দেখাবে। ১৫০০ কিলোমিটার হাঁটব কী করে স্যার? পেটে দানা নেই, জল নেই। আমার বন্ধুর বছর দশেকের হাড়-জিরজিরে মেয়েটা কি পারবে? হয়তো ওর নিথর ছোট্ট দেহ মাঝরাস্তায় সেই বনজঙ্গলের ভেতরেই পড়ে থাকবে। কে জানে! কিন্তু আমরা কী করে যাব? আমাদের ছেলেকে না নিয়ে?

সান্যাল সাহেব চিঠি থেকে চোখ সরিয়ে একবার শ্বাস নিলেন। লকডাউনের মাঝে দেশের শ্রমিকদের এত কষ্ট-দুঃখ উনি শোনেননি। শেষ ১৫ দিন জাহাজের ভেতর কেটেছে। আর ওনার ফ্যামিলি থাকে নৌসেনার সুরক্ষিত ঘেরাটোপে, যেখানে সরকারের তরফ থেকে সবকিছুই সময়ে পৌঁছে যায়। অফিসের হাওয়াটা কেমন যেন গুমোট হয়ে উঠেছে। উনি উঠে গিয়ে আরব সাগরের একটা জানালা খুলে দিলেন।

—চল্লিশ দিন হয়ে গেল স্যার। দেশে সব কিছু বন্ধ। বাংলার সরকার নাকি আমাদের ফিরিয়ে নিতে চায় না। তাই আমাদের এখানেই পড়ে থাকতে হবে। এখানকার সরকার চায় না আমরা থাকি, কারণ আমরা তো এখানকার ভোটার নই। ছেলেটার এখনো খোঁজ পেলাম না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে কিছু উত্তর দেয় না। সবাই বলছে, ভুলে যা। আর পাবি না। এইসব ঝুপড়ি থেকে যাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আর কেউ ফিরছে না। একজন ছেলে এসে বলল, আমাদের মতো শ্রমিকের লাশ পোড়াতে না পেরে হাসপাতালের মধ্যেই একটা ঘরে ওরা ডাঁই করে রেখে দিচ্ছে। আমাদের কেউ নেই স্যার। শুধু ভোটের সময় নেতারা আমাদের গায়ে হাত বুলোয়। ভোট হয়ে গেলে আমরা আবার কুকুরের বাচ্চা হয়ে যাই সবার চোখে। সেজন্য বলছিলাম, এভাবে রোজ মরতে আর ভাল্লাগে না স্যার। আমি আমাদের মতো ৭০ কোটি গরিবের হয়ে আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। আমাদের শুধু গিয়ে মাঝসমুদ্রে নামিয়ে দিন। আর কিছু চাই না। যে কদিন বাঁচব, বুকভরে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বাঁচব। দু'চোখ ভরে প্রকৃতি দেখব। মানুষের নোংরামো দেখে মন ভরে গেছে। আমরা, ৭০ কোটি কুকুর-ছাগলেরা, এই জঞ্জাল থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চাই।

সান্যালসাহেব বুঝে পাচ্ছিলেন না এই চিঠি নিয়ে কী করবেন। কাকে পাঠাবেন, কে এর প্রতিকার করবে। কীভাবে উনি এই মানুষদের সাহায্য করতে পারেন। আর তখনি ওনার দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল ল্যাপটপের অনলাইন খবরের কাগজে। আজ সকালের খবর।

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের কাছ রেললাইনে শুয়ে থাকা ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর দিয়ে সকালের আলোয় মালগাড়ি চলে গেছে। সবাই মৃত। পেটের জ্বালায় এরা রেললাইন ধরে লক-ডাউনের মাঝেই বাড়ি ফিরতে চাইছিল। অনলাইন খবরের কাগজের পাতাজুড়ে তাদের ছিন্নভিন্ন মাংসের টুকরোর ছবি।

পারমিতার কয়েকটা দিন

শিবানী পাল

সব কাজ শেষ করে পারমিতা যখন হাসপাতালের গেটে এসে দাঁড়ালো তখনই ও এক ঘন্টা লেট। বাড়ি পৌঁছাতে কম করে আরও আধঘন্টা। চিন্তা করবে তাই মাকে একটা ফোন করে রিক্সা বা টোটোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

হাসপাতাল থেকে এসে নিচে টয়লেট থেকে ফ্রেস হয়ে তবেই উপরে যাবার অনুমতি মেলে ডাঃ পারমিতা রায়ের। নিয়মমতো ফ্রেস হয়ে উপরে এসে দেখে মা চা-জলখাবার নিয়ে ডাইনিং-এ তার অপেক্ষায় বসে।

—'আজ এত দেরি হলো?' চায়ে চুমুক দিতে দিতে মা অপর্ণার জিজ্ঞাসা।

— 'আর বোলো না মা। ডিউটি শেষ হবার ঠিক আগে এক বৃদ্ধা পেশেন্ট এলেন। অজ্ঞান। নিয়ে এসেছে আর একজন মহিলা। আজ স্নিগ্ধা-দির ডে-ডিউটি। ফোন করে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছিলেন—'দেরি হবে একটু চালিয়ে নিস'।

— 'ঠিক আছে। বাকি কথা পরে হবে। যা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।'

— 'না মা এখন আর বিশ্রাম নেওয়া হবে না। সুধীরকাকু ফোন করেছিলেন। ওঁর নাতির কি সমস্যা। একবার আমার সাথে কথা বলতে চান। ওঁকে এগারোটার সময় আসতে বলেছি।'

অপর্ণা আর কোনো কথা বললেন না।

— 'হাসপাতালের ডিউটির পর কেন যে তুমি বাড়িতে রোগী দেখো! নিজেকে একটু দেখো, সারা রাত জেগে চোখ-মুখের কী অবস্থা। তাও আবার বিনা পয়সায়।' বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো আশা—এ বাড়ির সর্বক্ষণের তৃতীয় সদস্যা, যাকে ছাড়া বাড়ি অচল। ঠিক তখনই বেজে উঠল কলিং বেল। বেলের আওয়াজে একবার রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে পারমিতার দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সামনে সুন্দর বাগান নিয়ে পারিমিতাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। নিচে একটা ছোট্ট ফ্যামিলিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এক পাশে গ্যারেজ। তার পাশে টয়লেট, যেটা সাধারণত পারমিতাই ব্যবহার করে। তার পাশে ওর ছোট্ট চেম্বার—প্রতিবেশী বা বিশেষ পরিচিতদের জন্য। পারমিতা নিচে এসে দেখল সুধীরকাকু আর তাঁর নাতি অরিন্দম। অরিন্দমের অসুবিধার কথা শুনে, উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে ও নিজের ঘরে এল।

ঘরে এসে সেদিনের খবরের কাগজ আর না-পড়া ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে বসতেই অপর্ণাদেবী দু-কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন

— 'সুধীবরবাবুর নাতির কী হয়েছে রে?'

— 'কী বলবো মা, আজকালকার ছেলে, ক্লাস টেনে উঠেই নানারকম বদ নেশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমি কাকুকে কিছু বলতে পারলাম না। অরিন্দমকে কাল সকাল আটটার মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে কিছু ওষুধ নিয়ে আসতে বললাম। যদি যায় তখন ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

— 'সত্যি পৃথিবীটা যে কোন দিকে যাচ্ছে'—কথাটা শেষ না করেই চায়ের খালি কাপ দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেলেন অপর্ণা।

আবার ম্যাগাজিনে মন দেবার চেষ্টা করলো পারমিতা। কিন্তু মিনিট পনেরো পরই হাসপাতালের এডমিশন ক্লার্কের ফোন— 'ম্যাডাম' আপনি যাবার আগে যে পেশেন্টকে দেখলেন তাকে তো এ্যাডমিশন রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয়নি।'

— 'ওঁর সঙ্গে যে মহিলা ছিলেন?'

— 'উনিও তো চলে গেছেন।'

— 'ঠিক আছে। ওই জায়গাটা খালি রাখুন। দেখছি কী করা যায়।'

চিন্তায় পড়ে গেল পারমিতা। বৃদ্ধার অবস্থা দেখে ফরম্যালিটির চিন্তা না করেই চিকিৎসা শুরু করেছিল। ভেবেছিল অফিসের লোকেরাই ওগুলো করে নেবে সঙ্গের মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওয়ার্ডে বৃদ্ধাকে নিয়ে যাবার আগে তার কাছ থেকে ফোন নম্বর চেয়ে ওই মহিলা একটা মিস-কল দিয়েছিল তার মোবাইলে। মোবাইল থেকে নম্বরটা বার করে অফিসকে জানিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় আশ্রয় নিল।

নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে গিয়ে স্নিগ্ধাদির কাছ থেকে চার্জ নিতে গিয়ে জানতে পারল বৃদ্ধার অবস্থার কোনা উন্নতি হয়নি। ওয়ার্ডে ঢুকেই পারমিতা এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধার সামনে। কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লো না। প্রেসার, পালস্ সকালের মতোই। স্যালাইনের স্পিড একটু বাড়িয়ে দিয়ে পাতলা করে হরলিক্স বানিয়ে নার্সকে বলল খাইয়ে দিতে। ডিউটি নার্স পায়েল একটু অবাক হলেও ম্যাডামের কথা শুনতে বাধ্য, কিন্তু ওর একার চেষ্টায় হলো না, পারমিতাকেও হাত লাগাতে হলো। যৌথ চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিটে ছোট এক কাপ হরলিক্স খাওয়ানো গেল।

এরপর অন্য রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পারমিতা। রাউণ্ড দেওয়া শেষ হলে আবার এল বৃদ্ধার কাছে প্রায় দেড় ঘন্টা পর। দেখে মনে হলো একটু উন্নতি হয়েছে। পায়েলকে বললো অবার হরলিক্স বানিয়ে আনতে।

এরপর বাড়ি থেকে আনা খাবার দিয়ে ডিনার শেষ করে আর একবার রাউণ্ডে বার হলো পারমিতা। আজ আর তেমন ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট নেই। সব কাজ শেষ করে আবার এলো বৃদ্ধার কাছে। পাল্‌স্ আগের চেয়ে আরও একটু ভালো। বুঝতে পারলো না-খাওয়াই ওর অসুস্থতার প্রধান কারণ। তাহলেও আগামী কাল কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। এই বয়সে রিস্ক না নেওয়াই ভালো।

ওয়ার্ডের পাশেই রেস্টরুম। পারমিতা পায়েলকে বললো— 'এখন রাত একটা। আমি ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম করি। আমাকে তিনটে নাগাদ ডেকে দিয়ে তুমি বিশ্রাম নেবে। এর মধ্যে দরকার পড়লে অবশ্যই আমাকে ডাকবে।'

পায়েল মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। সে জানে পারমিতা ম্যাডামের সঙ্গে ডিউটি থাকলে কাজে অনেক হাল্কা হয়। বিশ্রাম করার সুযোগও পাওয়া যায়। তাই সব নার্সই ওঁর সঙ্গে ডিউটি থাকলে খুশি হয়।

সকালে রাউণ্ডে বেরিয়ে বৃদ্ধার পাল্‌স্ দেখে ওর মুখ উজ্জ্বল হলো। পায়েলের দিকে তাকাতেই ও বলল— 'হ্যাঁ ম্যাডাম, কাল সন্ধ্যার চেয়ে বেটার।'

□

আজ আর স্নিগ্ধাদির দেরি হয়নি। ওঁকে চার্জ বোঝাতে বোঝাতে বৃদ্ধার প্রেসক্রিপশনে নামের জায়গায় বিজয়লক্ষ্মী রায় আর তার নিচে ওয়াইফ অফ তারাপদ রায় দেখে ওর মনে হলো নাম দুটো ওর খুব চেনা। তবে চার্জ দেয়া-নেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় মনের এই ভাবনাকে সরিয়ে রেখে কাজটা শেষ করলো। ওয়ার্ড থেকে বার হবার সময় স্নিগ্ধাকে বললো বৃদ্ধাকে দু-তিনবার হরলিক্স খাইয়ে দিতে।

—'কী ব্যাপার বল্ তো? কাল থেকে দেখছি ওঁর প্রতি তোর একটু বেশি নজর! কেউ হয় নাকি?'

পারমিতা যেন আবার ধাক্কা খেল। কিন্তু এবারও ভাবনাটাকে দূরে সরিয়ে দিল বাড়ি ফেরার তাড়ায়।

বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে যখন নিজের ঘরে এসে একান্ত হলো তখন আবার ওই নামদুটো ওর মনের সামনে এসে দাঁড়ালো। নিশ্চিন্ত হবার জন্য একটা ডায়রিতে, যেখানে ওর জরুরি রেকর্ড থাকে, সেখানে দেখল তার ভুল হয়নি। নাম-দুটি তার চেনা-ই। হয়তো কাকতালীয় হতে পারে, তবুও ওই নামদুটো তাকে নিয়ে গেল কয়েক বছর আগের একটা তিক্ত স্মৃতিতে—

পারমিতা জনে ওর বাবা নেই। মায়ের আকার-ইঙ্গিতে আর পরিচিতদের কথাবার্তায় ও ধরে নিয়েছিল বাবা মৃত। মামাবাড়ি বা বাবার বাড়ির কারো সঙ্গেই ওদের যোগাযোগ ছিল না। আর এই ব্যাপারে পারমিতার আগ্রহও ছিল না। মায়ের স্নেহ, শাসনই তাকে ভরিয়ে রেখেছিল। মা অপর্ণা একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর মা একদিন পারমিতাকে বিশেষ কথা আছে বলে নিজের ঘরে ডাকলেন। কোনো ভূমিকা না করেই জানালেন,

—'আজ তোকে যা বলবো তাতে আমাকে ভুল বুঝিস না যেন।'

অবাক পারমিতা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল শোনার অপেক্ষায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে অপর্ণা শুরু করলেন—'আজ তোর বয়স ১৯। বাড়ির একমাত্র ছেলে তোর বাবা তপোজিৎ রায় আজও জীবিত। তুই যখন আমার পেটে তখন তপোজিৎ তার এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে আলট্রা সোনোগ্রাফি করায়। রিপোর্টে আসে আমি কন্যা-সন্তানের জন্ম দিতে চলেছি। তোর ঠাকুমার জিদ, এ্যাবোরশন করাতে হবে। বংশের প্রথম সন্তান ছেলে হওয়া চাই। আমার মত নেই বুঝতে পেরে তপোজিৎ অফিসে বেরিয়ে গেলেই আরম্ভ হতো তার অশ্লীল আর অবান্তর দোষারোপ। কয়েকদিন একনাগাড়ে এই অসভ্যতা চলতে থাকলে অসহ্য হয়ে এক রাত্রে তপোজিৎকে বললাম— যে আসছে সে আমাদের প্রথম সন্তান। সে ছেলে না মেয়ে সেটা বড় কথা নয়। তাই না?'

তোর বাবার উত্তর ছিল—'বাড়িতে থাকতে হলে মায়ের কথা মানতেই হবে। এ বাড়িতে মায়ের কথাই শেষ কথা।'

বুঝতে পারলাম তপোজিতের প্রশ্রয়েই তার মায়ের এই ব্যবহার। খুব অপমানিত বোধ করলাম। কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার বাবা নেই। দাদাদের সংসারে মা-নিজেই আশ্রিত। সেখানে আমার জায়গা কোথায়? কী করব? কী করে তোকে বাঁচাবো—এই চিন্তায় আমার খাওয়া ঘুম চলে গেল। এই সময় একটা সুযোগ এলো। আমাদের স্কুলের ১০০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সব প্রাক্তন

ছাত্রীদের চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। দাদা জানালো 'আমারও চিঠি এসেছে। তোর বাবার কাছে যাবার কথা বললে সে আপত্তি করলো না। তোর ঠাকুমারও আপত্তি ছিল না।

'বাবার বাড়ি এসেই আমার প্রিয় বন্ধু সুজাতাকে ফোন করলাম। জানতাম ও একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। হয়তো আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। ভাগ্য ভালো ছিল তাই সুজাতার সুপারিশে ওদের কোম্পানিতেই চাকরি পেলাম। ম্যানেজার খুবই সহৃদয় লোক ছিলেন। শরীর ও মনের অবস্থা বুঝে আমাকে অফিসিয়াল জবই তিলেন।

'চাকরি হলো। তুই বাঁচতে পারলি। বাড়ি থেকে চলে আসার পর তপোজিৎ একবার এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে, কিন্তু একটাই শর্ত' এ্যাবোরশন করাতে হবে। আমি রাজি হতে পারলাম না। এরপর ওরা আর আমার সঙ্গে কোনো যাগাযোগ রাখেনি। আমিও না।

'আজ তুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিস। জয়েন্টেও বসেছিস। মনে হয় ডাক্তারিতে চান্স পেয়ে যাবি। এখন তোর সব কথা জানা দরকার। এবার আমাকে ক্ষমা করতে পারবি কিনা সেটা তোর উপরেই নির্ভর করছে। '

—'ক্ষমা—একথা উচ্চারণ করে আমার আমাকে কষ্ট দিও না মা। আমার খুনিদের ক্ষমা করতে পারব কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করো।' এরপর পারমিতা মায়ের কাছ থেকে ঠাকুমা-দাদু-বাবার নাম জেনে নিয়ে ডায়রিতে লিখে রেখেছিল।

□

এই বয়সেও গায়ের ধবধবে ফর্সা রঙ, শরীরের মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের আভাস। তার উপর অনাহার বৃদ্ধার প্রতি পারমিতাকে আকৃষ্ট করেছিল। আজ নাম দেখে ও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

পরশু পারমিতার অফ-ডে। তারপর এক সপ্তাহ ডে-শিফ্‌ট। কাল-পরশু ওই বৃদ্ধা কেমন থাকবে? কিন্তু একবার যখন নাম নিয়ে খটকা জেগেছে তখন এর সমাধন করেই ছাড়বে।

অতীত-বর্তমানের আবর্তে পড়ে পারমিতা সময়ের গোলমাল করে ফেললো। সাড়ে ছ'টার মধ্যে রেডি হয়ে ডাইনিং টেবিলে এসে বসলো চায়ের জন্য। ওকে দেখে অবাক আশার জিজ্ঞাসা—'আজ এত তাড়াতাড়ি?'

—'চা দাও। রাতের খাবার তৈরি তো?' উত্তর দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলো। আশাকে ও মায়ের চেয়েও বেশি ভয় করে।

—'খাবার তৈরি। কাকিমা আসুক। একসঙ্গে চা খাবে তো?'

অগত্যা পারমিতাকে অপেক্ষা করতেই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য অপর্ণা এসে পড়লেন। সবাই একসঙ্গে হালকা টিফিনের সঙ্গে চা খেলেন। পারমিতার নাইট ডিউটি থাকলে অপর্ণা বাড়ির গাড়িতে ওকে পৌঁছে দেন।

হাসপাতালে পৌঁছেই স্নিগ্ধাদির কাছ থেকে বৃদ্ধার খোঁজ নিয়ে জানলো বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। জ্ঞানও ফেরেনি। চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধাদি চলে গেলে বৃদ্ধার সামনে এসে বুঝতে পারল স্নিগ্ধাদির কথাই ঠিক। সকালে যেমন দেখে গিয়েছিল উনি ওই রকমই আছেন। কাল রাতের মতো আবার এক কাপ হরলিক্স খাওয়ালো। তারপর স্নিগ্ধাদির লিখে রাখা অন্য রোগীদের চার্ট দেখে রাউণ্ডে বার হলো। প্রায় দুঘন্টা পর রাউণ্ড শেষ করে ফিরে এসে আবার বৃদ্ধাকে হরলিক্স খাওয়ালো।

এবার তাকে সব পেশেন্টের রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আজও কালকের নার্স পায়েল ওর সঙ্গে ডিউটিতে আছে। দুজনের যৌথ প্রয়াসে খুব তাড়াতাড়িই রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে একসাথেই ডিনার সেরে নিল।

খাওয়া শেষ করে আবার দুজনে চলল রাউণ্ডে। এবার তাড়াতাড়িই ওদের কাজ শেষ হয়ে গেল কারণ প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্রাম নিতে যাবার আগে বৃদ্ধাকে আর একবার পরীক্ষা করে পারমিতার মনে হলো খুব তাড়াতাড়িই ওঁর জ্ঞান ফিরবে। অর্থাৎ ওর চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বৃদ্ধা।

পরের সকালে বৃদ্ধার জ্ঞান ফিরল, তবে সম্পূর্ণ নয়। টেস্টের রিপোর্টগুলোও এসে গিয়েছিল। অন্যান্য রিপোর্ট ঠিক থাকলেও রক্ত খুব কম। রক্ত দিতে হবে। ততক্ষণে তাপসীদেবীও এসে গেছেন। তাকে সুখবরটা দিয়ে, রক্তের ব্যবস্থা করে, স্নিগ্ধাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ির পথে এগিয়ে গেল।

□

কাল ওর অফ-ডে। পরশু থেকে ডে-শিফ্‌ট। দুদিন বিশ্রাম নেবার সুন্দর সুযোগ নষ্ট করে দিল বৃদ্ধা আর তার স্বামীর নাম। কিছুতেই নাম দুটো মন থেকে তাড়াতে পারছিল না। ওর মনে হচ্ছিল তাপসীর ফ্ল্যাটে গেলে হয়তো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। সকালের ব্রেকফাস্টের পর কিছু জরুরি কাজ আছে বলে তাপসীর ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে বার হলো। ঠিকানাটা আগেই হাসপাতাল থেকে নিয়ে রেখেছিল। তাপসীর বাড়ির কাছাকাছি এসে ফোন করল—

—'আপনি কি বাড়ি আছেন? এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

ওপার থেকে উচ্ছ্বসিত আহ্বান—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি বাড়িতেই আছি, আসুন আসুন।'

গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছাল পারমিতা। গল্পে গল্পে জেনে নিল বৃদ্ধা বিজয়লক্ষ্মী রায়ের সব কথা। এক ছেলে। বৌ মেয়ে নিয়ে বোম্বেতে থাকে। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কাকিমাও খুব জেদি। ছেলের কাছ থেকে এক পয়সাও নেন না। আর সামনের ফ্ল্যাটটাই ওঁর।

—'এবার একটু চা হোক।' তাপসীর অনুরোধ।

—'হোক। একটা অনুরোধ ছিল তাপসী দি। আমি একবার ফ্ল্যাটটা দেখব। আপনার আপত্তি নেই তো।'

—'না না। কোনো অসুবিধা নেই।' বিনা বাক্যব্যয়ে তাপসী ফ্ল্যাটের চাবি পারমিতার হাতে দিয়ে বলল—'আপনি দরজা খুলে দেখুন আমি ততক্ষণে চা বানিয়ে ফেলি।'

পারমিতা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বসবার ঘরেই ফ্রেমে বাঁধানো স্বামী-স্ত্রীর যুগল ফটো দেখতে পেলো। মহিলাকে চিনতে অসুবিধা হলো না—তার পেশেন্ট বিজয়লক্ষ্মী রায়। তাপসী আসার আগেই মোবাইলে একটা ফটো তুলে রাখলো।

চা এসে গেল, সঙ্গে কিছু মিষ্টি ও নোনতা। চা আর একটু নোনতা খেয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বাড়ি ফিরে এল পারমিতা।

□

ওরা সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ চা খায়। তার আগেই পারমিতা অপর্ণাদেবীর ঘরে গিয়ে বিনা ভূমিকায় মোবাইলের ছবিটা বার করে জিজ্ঞাসা করল—'দেখো তো মা, এদের চেনো কিনা?'

ছবির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন অপর্ণা। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন

—'কোথায় পেলি এই ছবি?'

—'তুমি চেনো কিনা আগে বলো।'

—'হ্যাঁ চিনি। তোর দাদু-ঠাকুমা।'

—'মা, যে বৃদ্ধা পেশেন্টের কথা তোমাকে বলেছি, উনিই এই বৃদ্ধা।' বলে ছবির বৃদ্ধাকে নির্দেশে করলো—'পেশেন্টের প্রেসক্রিপশনে তার নাম এবং ঠিকানা থাকে। সেখান ওই নাম দুটো দেখে আমার সন্দেহ হয়। তারপর আজ তাপসীদির কাছে গিয়ে বৃদ্ধার ফ্ল্যাটে ঢুকে ওই ফটোটা তুলেছি।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পারমিতা নিজের ঘরে ফিরে এলো।

বিকেলের চা আজ আর জমলো না। রাতে পারমিতা বাড়ি থাকলে তিনজনের ডিনার টেবিল জমজমাট হয়ে থাকে। আজ সেখানেও ফাঁক থেকে গেল। আশা শুয়ে পড়লে মা তার ঘরে আসবে অনুমান করে অন্যমনস্ক ভাবে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল পারমিতা। তার অনুমান সত্যি করে অপর্ণা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ফ্ল্যাটে আর কেউ ছিল না?'

—'না। উনি একাই থাকেন। ছেলে বৌ-বাচ্চা নিয়ে বোম্বেতে।'

—'তাপসী আমাদের কথা কিছু জানে?'

—'অতটা ঘনিষ্ঠতা তো হয়নি। দেখ মা, উনি রোগী, আমি ডাক্তার। এর বেশি নয়। ভালো হবেন, বাড়ি যাবেন। একটা সন্দেহ ছিল সেটা দূর করলাম মাত্র।'

□

পরের সপ্তাহে দিন ডিউটি। হাসপাতালে পৌঁছাতেই উচ্ছ্বসিত পায়েল জানালো—'ম্যাডাম, ঠাকুমা দারুণ আছেন, জ্ঞান তো ফিরছেই। দু-একটা কথাও বলছেন। আপনি ঠিকই ধরেছেন, না খেয়েই ওঁর ওই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাডাম আর একটা সমস্যা হয়েছে।'

—'আবার কী সমস্যা?'

—'আপনি দু-বোতল রক্ত প্রেসক্রাইব করেছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে ওঁর গ্রুপের এক বোতল রক্তই পাওয়া গেছে। আর এক বোতল রক্তের জন্য কি তাপসীদেবীকে বলবো?'

—'না না তার দরকার নেই। ওঁর আর আমার রক্তের গ্রুপ এক। তেমন হলে আমিই না হয় দিয়ে দেব।'

এ কদিন একসঙ্গে ডিউটি করে পারমিতাকে ভালো মতোই বুঝে গেছে পায়েল। তাই আজ আর অবাক হলো না।

রুটিন চেক-আপ শেষ করে সকলের ডায়েট নির্দিষ্ট করে দিল পারমিতা। পায়েল দেখলো আজ বৃদ্ধার জন্য বরাদ্দ ভাত। এগারোটা নাগাদ তাপসী এসে বিজয়লক্ষ্মী দেবীকে দেখে খুব খুশি। ভিজিটার আওয়ার শেষ হলে আর একবার রাউণ্ড দিয়ে বৃদ্ধার কাছে এসে বসলো পারমিতা—

—'ঠাকুমা, আপনার বাড়ির কেউ তো এলো না? তারা কোথায়?'

—'ছেলে তো বৌ-মেয়ে নিয়ে বোম্বেতে।'

—'আপনার একটাই ছেলে, একটাই নাতনি?'

—'হ্যাঁ।' বলেই একবার তাকালো পারমিতার দিকে। পারমিতার মনে হলো সে দৃষ্টিতে অপরাধের ছায়া।

—'ঠিক আছে, এবার আপনি খেয়ে নিন।' বলে পায়েলকে ইশারা করলো।

পরের দিন বিজয়লক্ষ্মী দেবী আরও সুস্থ। ইতোমধ্যে পারমিতা বৃদ্ধাকে রক্ত দিয়েছে। পারমিতার অনুমান ওর দিন-ডিউটি থাকতে থাকতেই ওঁকে রিলিজ করে দিতে পারবে।

পরের দিন দুপুরবেলা খাওয়ার সময় পারমিতা আবার জিজ্ঞাসা করলো—'আচ্ছা ঠাকুমা, আপনার চলে কী করে?'

এবার পারমিতা বৃদ্ধার চোখে জলের আসা দেখতে পেলো।

—'আমি যে ফ্লাটে থাকি সেটা আর তাপসীরটা—দুটোই আমার। তাপসীর কাছ থেকে ভাড়া নিই না। ওর কাছেই খাই। ওরও কেউ নেই। ওর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।'

—'কেন, ছেলে টাকা পাঠায় না?'

—'দরকার হয় না। তোমার দাদু যা রেখে গেছেন আমার পক্ষে তা যথেষ্ট।'

□

পারমিতার ডে-ডিউটি শেষ হবার দিন বিজয়লক্ষ্মী দেবীকে রিলিজ করা হলো। যাবার সময় তাপসী বলল—'আমাদের ফ্ল্যাট তো আপনি চেনেন। যদি কখনো যান খুব ভালো লাগবে। কী বলুন কাকিমা?'

—'হ্যাঁ খুব খুশি হবো।' তারপরই উনি বললেন—'তুমি তো আমার কাছে মা দুর্গা। তুমি না থাকলে তাপসী আমাকে এ যাত্রায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না।'

—'না, ঠাকুমা, আমি কোনো দুর্গা টুর্গা নই। তুমি যে নাতনিকে মায়ের পেটেই মেরে ফেলতে চিয়েছিলে, যার মাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলে, আমি তোমার সেই নাতনি।'

বলেই পিছন ফিরে হন্ হন্ করে ওয়ার্ডের ভিতরে ঢুকে গেল।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নীলকমল হিন্দু হোটেল

আলিশা বাসস্ট্যান্ড, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : 9002004435

মিল সিস্টেম : মুড়ি, ঘুগনি, রুটি, ভাত, মাংস, ডিম ইত্যাদি পাওয়া যায়

Sl. No. 48

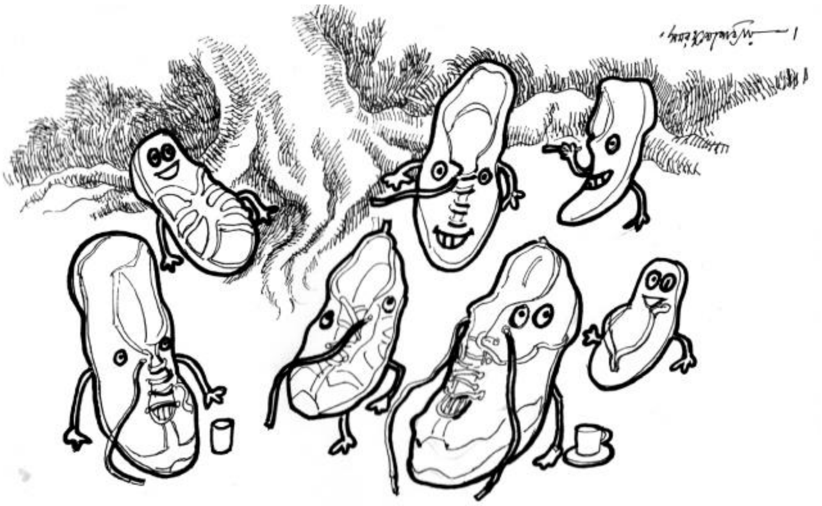

বোধিবৃক্ষ

শুভময়

১.

সে এক আশ্চর্য গাঁয়ের গল্প।

সে গাঁয়ের কিনারায় ছিল এক বৃক্ষ। রাত থমথমে হলে সেই বৃক্ষের তলায় বসত গল্পগুজব। গাঁয়ের সকল চৌকাঠের বার পিঠ থেকে যাবত জুতোরা উলটোমুখো হয়ে তারপর হেঁটে হাজির হতো সেই বৃক্ষতলে।

মালিকরা ঘুমোলে তবে জুতোরা হেঁটে যেত গাছতলায়। সারাদিন তারা খোলা বল বা পরা বল কথা কইবার ফুরসত পায় না। রাতে মালিকরা ঘুমিয়ে কাদা হলে গাছতলায় জড়ো হয়ে তবে তারা পরস্পরে সকলের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারে প্রাণ খুলে।

জুতোর মতো মনিষ্যির কথা, মাটির কথা, বাজার হাট পথ দেশের কত কথা অত কে জানে!

কাক ডাকার আগে আবার যে-যার ঠাঁইয়ে ফিরে আসা।

বর্ষা-বাদলের রাতে খানিক গোলযোগ হতো বটে।

বাদল নেমেছে খুব। মাথার উপরে ছাদ আছে যাদের, ছাদে নেই ফুটোফাটা, তারা তো বাদলার নরমে সাত-তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে কাদা। জুতোরাও অমনি মওকা বুঝে আগেভাগে হাঁটা দেয় গাছতলা পানে। পথের বাদলে অথবা গাছতলার টোপানো জলে সারা নিশি তারা চপচপে হয়। কাকভোরে ফিরে আসে বটে, মুখ বুজে বসেও পড়ে ঠিকঠাক। কিন্তু বাড়ির লোক উঠে হয়তো ঠাহর করে, জুতো একেবারে জলে-কাদায় একসা। পুরুষ মানুষটি হয়তো বলে ওঠে, ‘হা দেখো, কাণ্ড।’

— কি হলো গো?

—কাল রাতে তো বাদল নামার আগেই ঘরে ফিরলাম গো!

—তাতে কি হল!

—কিন্তু জুতো জোড়া এমন কাদা-মাখামাখি। চোরে এসে জুতো পরে গাঁ-ঘুরে কাদাজলে চরে বেড়াল নাকি!

—ভারী ভদ্রনোক চোর এসেছিল বলতে হবে। জুতোখানা পরল, গাঁ-দিগর ঘুরে বেড়াল আবার ফিরে এসে চৌকাঠে সাজিয়ে রেখে গেল!

—তোর জুতোজোড়াও কাদা মাখামাখি!

—কি জানি বাপু অত জানিনে। সাত সকালে জুতো জুতো করে পড়ে থাকতি পারব না।

কথা থামলে জুতোগুলোর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

আবার রাতের ওই মজলিশে জুতোদের নিত্য জমায়েত আর কথা কওয়াকইয়ি নিয়ে মাঝেমধ্যে কৌতুকও বেধেছে বেশ।

ধরো, এক বাড়ির কর্তা-জুতো হাটে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে চুপিসারে ঘুরে এসেছে আনবাড়ি। তারপর সাঁঝ পার করে ফিরে নিপাট ভালোমানুষটির মতো ধুলমাখা হয়ে বসেছে চৌকাঠের বার গোড়ায়। রাতে গাছতলায় আড্ডায় দেখা গিন্নি-জুতোর সঙ্গে। পুরুষ জুতোটি আদ্যোপান্ত সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে মেয়েমানুষ জুতোটার কানে।

আবার উল্টো ফেরও তো হতে পারে। মেয়েমানুষ জুতোটা আঘাটায় গিয়ে দেখা করে এসেছে কতকাল আগের স্বপনের মানুষটার সনে। পিদিম জ্বালা সলতে পাকানোর আগেই ফিরে এসেছে হাঁড়ি-হেঁসেলে। পরদিন প্রভাতবেলায় কর্তা-গিন্নি গেরস্ত-পিরিতির অভিনয় করলে দুই জোড়া জুতো চৌকাঠের বাইরে বসে মুখ টিপে খুব হেসেছে।

এইরকম শতেক কথা হয় রাতে থইথই আঘ্রানে পিঁজিয়ে ওঠে সেই গাঁয়ের সেই গাছতলায়। কোনো ঘুমন্ত পাখি হয়তো কোনো দমকা কথায় হঠাৎ জেগে উঠে দু-বার কুক কুক করে ডেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ফের ঘুমিয়ে পড়ার আগে ডানায় ভালো করে মুড়ে নেয় ছানাগুলোকে। কোনো পতঙ্গ সুড়ঙ থেকে মুখ বাড়িয়ে শুঁড় বার করে শোনে কত কথা। কোনো জুতোর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ফের নেমে যায় বাসার সুড়ঙে। টিপ টিপ করে জোনাক জ্বলে বৃক্ষের ডালপালা-পাতায়। রাত যত ভার হয় নেহর পড়ে টুপটাপ করে। সেই বৃক্ষ যেন তার সারা শরীর নুইয়ে জোনাক-চোখে জেগে একমনে শোনে শতকথা।

বৃক্ষ এত কথা জানে। বৃক্ষ সব জানে।

২.

কিন্তু এ তো নেহাত মজা-মজলিশ কৌতুককালের কথা হচ্ছে না।

এমনকি চলা-চলতি স্বাভাবিক কালের কথাও নয়। এ এক ব্যাঘাতকালের কথা। বেহদ্দ দুর্ঘটকালের কথা।

এমনিতে পৌষ থেকে জষ্টি-আষাঢ় মজলিশ খানিক হালকা থাকে। খানিক। গাঁয়ের জওয়ান-যুবা কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পথ পায়। এ সময়ে গাঁয়ে যে নতুন মুখের জুতো ঢোকে না, তা নয়, তবে সে কতিপয়। এই ধরো, সাঁওতাল মুনিষরা ঢুকল ধান কাটার বরাত নিয়ে। তাদের আবার কেউ কেউ নাকি খালি পায়েই ভালো থাকে। তাছাড়া, নতুন মুখের জুতো, তারা গাঁয়ে এসে বাসিন্দা জুতোদের সঙ্গে গলাগলি করে গাছতলে বসে গল্পগাছা করবে, এমন ভরসা পায় না। তাদের

আড়ষ্ট ঠেকে। ফলে সে সব মানিষ্যির পরাণকথা বৃক্ষের আর জানা হয়ে ওঠে না।

সে-সব আপশোসের কথা অন্যকথা।

এখনকার কথা হল, চৈত্র মাসের দিন সাতেক পার হতে না হতে বৃক্ষ খবর পায় ভিনদেশের নানা ঠাঁইয়ে নাকি এ গাঁয়ের নানা জুতো ফাঁদে পড়েছে। শুধু এ গাঁয়ের কেন, হাজার গাঁয়ের হাজারে হাজারে জুতো। সেদিন রাতে পুরুষ-মদ্দ যে জুতোরা রোজ আসে তারা এল মলিন মুখে। তারা বলাবলি করে, এ গাঁয়ের কত জুতো আটকে পড়েছে ভিন রাজ্যের নানা শহরে। তাদের হাতে রেস্ত নেই, পেটে দানা নেই। মাথার উপরে ছাদও নেই সবার। গাঁয়ে ফিরে আসার কোনো পথ নেই। গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, রেল নেই। এক ফুঁয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে পড়েছে, লুকিয়ে পড়েছে সব চাকা।

জুতোরা বলাবলি করে। বলতে বলতে কথা বেধে যায়। কথাগুলো কান্নার দলার মতো তাদের বুক ফেড়ে বার হতে চায়। অলীক এক বাতাসের মতো, আওয়াজের মতো পাক খায় সেই রাতের গাছতলায়। জোনাকিরা এ-ডাল ও-ডাল ওড়াউড়ি বন্ধ করে আলো মুড়ে চুপ করে বসে পড়ে। পাখিগুলো বুকের পালকে মুখ গুঁজে ভাবে, কেন ভোরের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না! পতঙ্গরা আনমনে সুড়ঙে ঢুকে যায়।

বৃক্ষ শুধু চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে। চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পাতাগুলো কেঁপে ওঠে হঠাৎ।

পরের রাতে জুতোরা যখন গাছতলায় আসে, তাদের মুখ মলিন নয়। বরং আশঙ্কায় যেন থমথম করছে। তারা বলাবলি করে, হাজার হাজার জুতো নানা পথ—রেললাইন, সড়ক এমনকি সমুদ্রের কিনারা ধরেও নানা গাঁয়ে ফিরতে চাইছে। ফাঁদে পড়া জুতোরা বে-রোজগার, খিদের থাবার তলায় পড়ে এমনি এমনি মরে যাবে নাকি! তার থেকে ফাঁদের বাঁধের ফাটল ফেড়ে তারা কলকল ভেসে পড়েছে দুঃসাহসে। গাঁয়ের জুতোরা পথের জুতোদের কষ্টের সাহসের খিদের নানা কথা কয়।

বৃক্ষ কেঁপে ওঠে। কিন্তু কেঁপে ওঠে না। সে কাঁপুনি গোপন রাখে পাঁজরের তলায়। শুধু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে থাকে নক্ষত্রদের দিকে। ওদের পথ দেখাও! এই মোনাজাতে—প্রার্থনায়।

৩.

চোত-বৈশেখে সেইসব রাতে বৃক্ষ শোনে, গাঁয়ের শেষে কৈবর্ত পাড়ার মুখের সেই শুনে যায় গাঁয়ের জুতোদের মুখে পথের জুতোদের খবর।

নানা গল্পের মধ্যে সেদিন এক জুতো বলেছিল, 'আমাদের আবার পরান কী! মনিষ্যির যতক্ষণ পরান আমাদেরও ততক্ষণ পরান! মনিষ্যের পরান বাঁচাতেই আমাদের পরান।'

—তবে আমাদের থেকে মনিষ্যির পরানের আয়ু অনেক কড়া। আমরা পথের পাশে রগছেঁড়া হয়ে মরে পড়ে থাকলেও মনিষ্যিরা হেঁটে যায়!

—তবে জানলে একখানে আমরা মনিষ্যির বাড়া!' এক জুতো বলে—কোনখানে!

—আমরা পথেরও নাড়ি চিনি মনিষ্যের নাড়ি চিনি।

সেইসময় এক বুড়ো জুতো একটা গল্প বলতে শুরু করে। গল্পটা এইরকম—মাঝ-চোতের সড়ক ধরে মানুষ আসছিল বানবন্যের মতো, এক পত্রকার খবর করবে বলে মানুষের সঙ্গে হাঁটছিল অনেক পথ। সে যুবা এক পরিবারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কথা কইছিল। মেয়েমানুষটার পায়ে জুতো আছে। পুরুষটার পায়ে নেই। মেয়ে মানুষটার কাঁখে বাচ্চা। পুরুষটার মাথায় বাক্স-প্যাঁটরা। পুরুষটার পা কেটে রক্ত পড়ছিল। পত্রকার জিজ্ঞাসা করে, আপনারা শেষ খেয়েছেন কখন?

—মনে নেই।

—জল খেতে পেয়েছেন?

—পথের ধারে একটা গাঁ থেকে বোতল দিয়েছিল।

—আমি কি কিছু দিতে পারি? পত্রকার জিজ্ঞাসা করে।

পুরুষটা কোনো উত্তর দেয় না। অনন্ত চলার শব্দ নৈঃশব্দের সঙ্গে কথা কইছে তখন। কথা বলে ওঠে মেয়েমানুষটা। বলে, 'দেবে?'

—কি দেব, বলুন? যদি কিছু দিতে পারি আমার সাধ্যমতো।

—ওকে একটা জুতো কিনে দেবে?

পত্রকার সেই যুবা পথ চলতে খানিক ভাবে। লহমামাত্র। তারপর নিজের জুতোটা খুলে ধরিয়ে দেয় পুরুষমানুষটার হাতে।

সে আর সেখানে দাঁড়ায় না। ভাবে তাকে খালি পায়ে দেখলে পুরুষটা লজ্জা পাবে। পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করে। অন্য কোনো পথচলতি মানুষের কথা নেবে বলে। খালি পায়ে সড়কের উপর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে সে টের পায়, পথ তার দেহ নিয়ে তার সকল স্নায়ুর সঙ্গে কথা কইছে। সে বোঝে, এতক্ষণে সে পথ আর পথের মানুষের কথা বলতে-লিখতে পারবে।

কত পিছনে, ক-ত পি-ছ-নে পড়েছিল সেই পুরুষমানুষটার একপাটি ভালো আর এক পাটি ছেঁড়া জুতোখানা। এবার তারা নিশ্চিন্তে একসঙ্গে চোখ বুজে মরতে পারে।

৪.

পরের রাতে সেই বুড়ো জুতোজোড়া শুরু করে, ওই বাসি গল্পটার রেশ টেনেই, আমাদের ওই এক সমস্যা। জোড়ায় জন্মা, জোড়ায় মরো। একপাটি পরিপাটি হয়ে আছো, আর একপাটি চামড়া ছ্যাঁচা, সে বড়ো বিকট মরণ। অথবা একপাটি নিরুদ্দেশ, আর একপাটি আঁকড়ে আছো পা, সেও বড়ো...

অস্তিত্বের দর্শন নিয়ে বুড়ো জুতার এই জ্ঞানগম্যি থামিয়ে দিয়ে আর এক বুড়ো জুতো আর এক গল্প শুরু করে। একেবারে নয়া গল্প।

এক মরদ, আর মেয়েমানুষ আর তাদের বছর দেড়-দুয়ের বাচ্চাটা ফিরছিল গাঁয়ের দিকে। দিনরাত তারা পায়ের ভাটিতে চলে। বাচ্চাটা নিয়ে কোল বদলা-বদলি। দু-জনেরই ঘাড়ে মাথায় উপড়ে-আনা সংসারের বোঝা। কোলেই ঘুমোয়, কোলেই জেগে পথ পার করে বাচ্চাটা। বড্ডো ক্লান্ত হলে, ঘাড়ের শিরা পেশি ছিঁড়ে এলে কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে তারা খানিক পথ হাঁটিয়েও নেয় দুধের বাচ্চাটাকে। অসহ্য খিদে, ঘুম, টানা পথ, দিনের রোদ, রাতের নেহরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি রাগঝাল করতে করতেই তারা দিন পার করছিল গাঁয়ের ঠিকানার তেষ্টায়, যার কোনো কিরানাই দেখা যাচ্ছে না। একদিনের কথা।...

এটুকুও বলে বুড়ো জুতোটা ঘাড় উঁচু করে উপরের দিকে তাকায়। গাছের ছাউনি ছাদের মতো। ডালপালাগুলো যেন কড়ি বরগার মতো। এমন নিপাট নিখুঁত ছাদের দিকে চেয়ে তার বুকের মধ্যে ছাদ-ছাড়া যাবৎ মানুষের কষ্ট যেন দলা দলা হয়ে ওঠে। দুঃখের দলার সেই ভারে সে শুরু করে নীচু স্বরে। অন্য জুতোগুলো যেন খানিকটা ঘন হয়ে আসে তাকে ঘিরে।

সে বলতে শুরু করে আবার, একদিনের কথা, আঁধার পাতলা হতে হতে সবে দানা বাঁধছে ভোরের আলো। ঘুম

থেকে জাগা মানুষ তো নয়, চলন্ত মানুষ এ আলো চায় বটে, কিন্তু চোখের ওপর, নাকের পাটার উপর এ আলো কেমন লোনা ফোঁটার মতো খরখরে হয়ে পড়ে। ভোরের আলোর সেই খরুটে স্বাদের মধ্যে মেয়েমানুষটা হঠাৎ লক্ষ করে, ঘোরের মধ্যে চলা বাপের কোলের মধ্যে মেয়েটার এক পায়ের জুতো নেই। সে আরো খর স্বরে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, হা দেখ, পুরুষ মানুষের কাণ্ড দেখ, মেয়েটার পা থেকে একখানা জুতো যে খসে পড়ে গেল, সে সাড়ও নেই পুরুষের।

সে ঝাঁঝে বাপের ঘোর কাটে, চলন থামে না। সে দুধের শিশুটার দু-পায় বারবার হাত বোলায়। এক পায়ে কিনারা পায়, অন্য পায়ে পায় না। কিনারাহীন প-খানায় বারংবার সে হাত বোলাতে থাকে লম্বালম্বি। ঠাঁই ঠেকে না। সে দেখে মেয়েমানুষটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে ফের, তখন হাত বুলিয়ে কী হবেটা কি! কোন্ মুলুকে সে পড়ে রয়েছে কে জানে! যাই দেখি?

মেয়েমানুষটা হনহন করে পিছনপানে হাঁটতে চায়, সেই একপাটি জুতোর খোঁজে।

পুরুষমানুষটা যেন হঠাৎ সম্বিৎ পায়। সে ঘাড় ধরে হ্যাঁচকাটানে দাঁড় করায় মেয়েমানুষটাকে, দাঁড়া!

মেয়েমানুষটার থেকে বয়সে বড়ো হওয়ার কারণেই বোধহয়, অথবা কোন কারণে কে জানে, সে জানে ভেসে পড়া পথে উলটো দিকে বাইতে নেই। কখনো বাইতে নেই। তাতে ধাক্কা খেতে হয়। চাইকি, তলিয়েও যেতে পারো!

পুরুষমানুষটা মেয়েমানুষটাকে দাঁড় করিয়ে শিরদাঁড়ার মতো গলায় বলে, দাঁড়া! সামনে চল। জুতো আবার হবে। পৌঁছতে পারলে।

দাঁড়-করানোর এই ঝাঁকুনিতে মেয়েমানুষটা থামে বটে, সামনের দিকে মুখ ফেরায়ও বটে, চলতে শুরু করেও বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দপদপ পোড়ে। সেই পোড়ার ঝাঁঝেই সে দুধের শিশুটার গালে চড় কষায়! হারামজাদি মেয়ে, মরণের ঘুম ঘুমিয়েছে। ঘাড়ে চেপে মরণের ঘুম...

পুরুষমানুষটা তফাতে হাঁটে। তাতে মেয়ের গায়ে আর মার পড়তে পারে না।

মেয়েমানুষটার রাগের তাত কমে, কিন্তু নেভে না। কষ্ট সে রাগের সে তাপে কুলোর বাতাস দেয়। বলে, বলতে থাকে, আবার আর এক পাও হাঁটানো যাবে না। সারা পথ ঘাড়ে চেপে চলবে।...

বুড়ো জুতোর গল্প শেষ হয় না। হবেও না যেন। পথের মতোই যেন কিনারাহীন।

সেই রাতের মজলিশেই বুড়ো জুতো সেই পরিবারের সেই পথেরই আরো এক রাতের গল্প শুরু করে।

শেষ রাতের দিকে। পুরুষ মানুষটা পথের পাশে দু-হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসে পড়েছিল। মেয়েমানুষটা মাই দিচ্ছিল বাচ্চাটাকে। বুকের দুধ ছাড়িয়েছে ক-মাস আগেই। কিন্তু পথে সে অভ্যাস আবার শুরু করেছিল সে। তাতে বাচ্চাটা বাঁচার জন্যে আরেকটু খাবার পায়। বুকের বোঁটায় বাচ্চাটার মুখ খানিকক্ষণ পড়তেই ও কী গহিন ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে পথের পাশে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে, সেই হারিয়ে যাওয়া একখানা জুতো তাদের ফেলে কত পথ এগিয়ে গেছে। গিলগিল করে হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু সে ছুটে যেতে পারছে না, পারছে না, কিসের যেন কামড় তাকে আটকে রেখেছে পথের পাশে। সে কিছুতেই এগোতে পারছে না। সে যত এগোতে চায়, কামড় যেন তত মাংস কেটে বসে... মা-মেয়ে-মানুষটা ধড়ফড় করে জেগে ওঠে স্বপন ভেঙে।

জুতোগুলো বুড়ো জুতোটার আরও কাছাকাছি চলে আসে। রাত শেষ হয়ে আসছে। তাদের ফিরতে হবে যে যার চৌকাঠে। কিন্তু ভয়ানক ওই স্বপনটার মতো অসহ্য ওই গল্পটা যেন শেষই হচ্ছে না। গল্পটার কামড়ে তারা আটকে আছে গাছতলার ওই শেষ রাতে।

বুড়ো জুতো বলে যায়, জেগে উঠেই মেয়েমানুষটা তার বাচ্চার এক পাটি জুতো হাতড়ায়, যেটা সে রেখে দিয়েছিল, জোড় হারাতেও ফেলে দেয়নি। সেটা লহমাতেই পেয়ে যায়। কামড়ের মধ্যেও সে নিখুঁত হাতড়ানোয় পেয়ে যায় থেকে-যাওয়া একপাটি জুতো! কিন্তু কামড় সে ছাড়াতে পারে না!

—কামড়? কিসের কামড়! অন্য জুতোরা খসখসে স্বরে জানতে চায়। জানতে চেয়ে তাকিয়ে থাকে বৃক্ষ।

—বুকের বোঁটায় কামড়। খিদেয় কখন ঠাণ্ডা কাঠ হয়ে যাওয়া বাচ্চাটার মরণ কামড় মায়ের বুকের বোঁটায়!

জুতোগুলো কাছাকাছি জড়ো হয়ে দম আটকে বসে থাকে।

বুড়ো জুতো বলে যায়, বরফের কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে ধরা বাচ্চাটাকে মা-মেয়েমানুষটা আরো জোরে নিজের পাঁজরে চেপে ধরে। নিজের শরীরের জিয়নতাপ চারিয়ে দিতে চায় ঠাণ্ডা কাঠ হয়ে-যাওয়া বাচ্চাটার একরত্তি শরীরে। এই চেষ্টাটা চলে। খুব তাড়াতাড়ি সে বুঝে যায়, আর লাভ হবে না। তখন সে নিজের শরীরটা ঝাঁকায়, বাচ্চাটাকে ছাড়াতে চায়, বলে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বাপ, যে একপাটি জুতোটার জন্যি তোরে মেরেছিলুম, তারে এনে দিচ্ছি। সে ডাকছে। তোর দুই পায়ে জুতো হবে। আবার। আবার।

এইসব ঘোরকথায় পুরুষ মানুষটা জেগে ওঠে। জেগে উঠেই বাচ্চাটার গায়ে হাত ছুঁইয়ে জন্তুর মতো উর্ধ্বমুখে গোংড়ে ওঠে। তারই মধ্যে সে দেখে, বুক ছাড়িয়ে কোনোমতে বুক ঢেকে মা-মেয়েমানুষটা রাত আর ভোর, এই সন্ধিক্ষণের আলোর মধ্যে ফেলে আসা পথের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে। ক্রমশ তার নাগালের বাইরে...

পথের মতো বুড়ো জুতোর বলা এই গল্পটার কোনো ঠিকঠাক শেষ নেই বুঝে জুতোরা আর কথা না-বাড়িয়ে যে-যার নিজেদের চৌকাঠমুখো মাথা নিচু করে হাঁটা দেয় সেই শেষ রাতে।

৫.

পরের রাতে আবার জুতোরা গাছতলায় আসে, যেমন নিত্য ঘটে।

দেশজোড়া এমন অগুনতি গল্প জন্মাচ্ছে মরছে ট্রাকের চাকার তলায়, রেললাইনের উপর, সড়কের ধারে। গল্প টানা ভেসে যাচ্ছে অথবা ফাঁদের ইঁদুরের মতো আটকে পড়ছে শহরে-নগরে। কত আর তারা বলাবলি করবে।

বৃক্ষ সব জানে।

নানা গল্পের শোকে তারা মুখ তুলে হাহাকার করে। মাথা ঝাঁকায় বৃক্ষ।

গাঁয়ের লোক বলাবলি করে সকাল হলে, কৈবর্তপাড়ার বিশাল গাছটার দিক থেকে, মাঝরাতে যেন হু হু করে হাহাকারের হাওয়া ভেসে আসে।

একদিন সাঁঝ শেষ হতেই অন্ধকার করে ঝড় আসে। জুতোরা দ্রুত চলে য়ায় বৃক্ষতলে।

এত গল্পের ভার বৃক্ষ বইবে কী করে!

সকল ঝড়টাই নিখুঁত দাঁড়িয়ে থেকে সে বুকের মধ্যে নেয়। পাঁজরের মধ্যে নেয়।

কদিন পরে গাঁয়ের লোক দেখে সকল পাতা আমরে মরে টানটান দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। আর মরা গাছটার তলায় কোথা থেকে এসে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে আছে এক জোড়া শিশু পায়ের টুকটুকে জুতো।

With best compliments from

CLW CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

রেজি. নং ৪৭ (২৪.০১.১৯৫২) ।। পোঃ চিত্তরঞ্জন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩৩১

'সমবায় প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।' *—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

আমাদের পরিষেবা

● কম সুদে ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান। ● ১,২০,০০০ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান। ● ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উৎসব ঋণ প্রদান। ● শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ● কম ভাড়ায় পুরীতে হলিডে হোম। ● এলাকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান। ● বিদায়ী সদস্যদের সম্মানের সাথে বিদায় দেওয়া। ● আমরা আমাদের সদস্যদের আর্থিক মান উন্নয়নের সতর্কপ্রহরী।

পরিচালন পর্ষদ

Sl. No. 77

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেশ্বর এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি নং ৫৪ তারিখ : ১৪-০৪-১৯৩০ ।। পোঃ কুচুট, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪২- ২৭১৯২৭০

আমাদের কার্যসমূহ

সার, কীটনাশক, বন্ধকী, ট্রাক্টর, কুটিমাড়া মেশিন, ১৮টি সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেওয়া। এছাড়া ব্যাঙ্কিং, এস.বি., আর.ডি., টি.ডি. করা হয় এবং যে-কোনো ব্যাঙ্কের চেক ভাঙানো হয়। টি.ডি বন্ধক রেখে লোন দেওয়া হয়।

Sl. No. 78

With best compliments from

M/s. G.C. Saw

M.R. DISTRIBUTOR

Raina-II Block, Badulia, Bardhaman

Sl. No. 17

Happy Puja Greetings from

ARYA ENTERPRISE

Kakuna, Khandaghosh, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 55

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

প্রিয়া মেডিকেল হল

কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট

প্রোঃ সেখ নুরউদ্দিন

এখানে সমস্ত কোম্পানির জীবনদায়ী ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়।

নবাবহাট (সিউড়ি রোড), বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 76

With Best compliments from

SOBISCO®

The taste of good health

Sl. No. 84

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি

মাধবপুর, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান-৭১২৪০২

আমরা আমাদের অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে উন্নত গুণমানের টিস্যু কালচার কলাচারা প্রস্তুত করছি। নিয়মিতভাবে মাঠে বসানোর উপযুক্ত G-9 কলা-চারা সরবরাহ করে থাকি। এই চারাগুলি অত্যন্ত সুফল দেয়। G-9 কলা ব্যবসায়ী ভিত্তিতে চাষ করা অত্যন্ত লাভদায়ক হওয়ায় এই প্রজাতি কলা মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই কলাগুলি প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষজনের শরীর-স্বাস্থ্য পুষ্টিগতভাবে খুব ভালো থাকে। আমাদের অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এই ধরনের বিশেষত G-9 কালা-চারার প্রতি ভীষণভাবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আগ্রহী।

Sl. No. 80

With Best Compliments from

M/s. Hazra Enterprise

Prop. : *Ram Sanjit Hazra*

(Mechanical Contractor & Transporter)
Vill. + P.O. Kajora Gram, (R. K. Cinema Hall)
Dist. Paschim Barahaman, W.B.
PIN-713338, Mob. : 9564454709, 9832222330

We deal in Heary Earth Equipment, JCB, L&T, Poclain, Loader, Dumper Etc.

Sl. No. 83

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী

Sl. No. 81

সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হামুনপুর এস.কে. ইউ. লিঃ, মেমারি-২

বিক্রয়কেন্দ্র : রায়বাটী বাজার

আমাদের দাবি : **এলাকার টাকা এলাকায় রাখুন**

আমরা যে সকল পরিষেবা দিয়ে থাকি :

এন.এফ.টি, আ.টি.জি.এস., এ.টি.এম, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচের জল সরবরাহ ইত্যাদি

দীনবন্ধু হালদার
ম্যানেজার
মোবাইল : ৯৪৩৪৩৪৩৯৫৯

Sl. No. 82